সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

২য় খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

২য় খন্ড

সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন
(২য় খন্ড সূরা আল বাকারার শেষ অংশ)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫
১২তম সংস্করণ
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩১ মে ২০১০ বৈশাখ ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত ষাট টাকা মাত্র

Bengali Translation of Tafseer
'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
2nd Volume
(Last part of Sura Al Baqara)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar. Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1995
12th Edition
Jamadiul Awal 1431 May 2010
Price Tk. 260 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-NO-984-8490-04-9

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে ঊর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো : এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۤءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ
قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ
لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِ ۚ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ

১৪২. (কেবলা বদলের ব্যাপারে) মানুষদের ভেতর থেকে কিছু মূর্খ লোক অচিরেই বলতে শুরু করবে (এ কি হলো), এতোদিন যে কেবলার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, (আজ) কিসে তাদের সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিলো? (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলে দাও, পূর্ব পশ্চিম (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ১৪৩. এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের ওপর (হেদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো (এবং একইভাবে) রসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে, যে কেবলার ওপর তোমরা (এতোদিন) প্রতিষ্ঠিত ছিলে, আমি তা এ উদ্দেশেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে তার কথা থেকে ফিরে যায়, তাদের ওপর এটা ছিলো কঠিন (পরীক্ষা), অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাদের হেদায়াত দান করেছেন তাদের কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে বড়ো দয়ালু ও একান্ত মেহেরবান। ১৪৪. (কেবলা পরিবর্তনের জন্যে) তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে (যেভাবে আমার আদেশের অপেক্ষায়) থাকতে, তা আমি অবশ্যই দেখতে পেয়েছি, তাই আমি তোমার পছন্দমতো (দিককেই) কেবলা বানিয়ে দিচ্ছি, (এখন থেকে) তোমরা এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে ফিরে (নামায আদায় করতে) থাকবে; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের মুখমন্ডল সে দিকেই ফিরিয়ে দেবে; এসব লোক– যাদের কাছে আগেই কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো, তারা ভালো করেই জানে; এ ব্যাপারটা *তোমার*

أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ
اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

মালিকের পক্ষ থেকে আসা সম্পূর্ণ একটি সত্য (ঘটনা, এ সত্ত্বেও) তারা (এর সাথে) যে আচরণ করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে মোটেই অনবহিত নন। ১৪৫. যাদের ইতিপূর্বে কেতাব দেয়া হয়েছে তাদের সামনে যদি তুমি (দুনিয়ার) সব কয়টি প্রমাণও এনে হাযির করো, (তারপরও) এরা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, আর (এর পর) তুমিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী হতে পারো না, (তাছাড়া) এদের এক দলও তো আরেক দলের কেবলার অনুসরণ করে না; আমার পক্ষ থেকে এ জ্ঞান তোমাদের কাছে পৌঁছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবে। ১৪৬. যাদের আমি কেতাব দান করেছি এরা তাকে এতো ভালো করে চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলেদের; এদের একদল সত্য গোপন করার চেষ্টা করছে, অথচ এরা তো সব কিছুই জানে। ১৪৭. (হে নবী, তুমি তাদের বলো,) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে) একমাত্র সত্য, সুতরাং কোনো অবস্থায়ই তোমরা সন্দেহ পোষণকারীদের দলে শামিল হয়ো না।

রুকু ১৮

১৪৮. প্রত্যেক (জাতির) জন্যে (এবাদাতের) একটা দিক (নির্দিষ্ট) থাকে, যে দিকে সে (জাতি) মুখ করে (দাঁড়ায়), অতএব তোমরা (আসল) কল্যাণের দিকে অগ্রসর হবার কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সবাইকে (একই স্থানে) এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۙ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۙ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۙ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا
أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

১৪৯. তুমি যে কোনো স্থান থেকেই বেরিয়ে আসো না কেন, (নামাযের জন্যে) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও, কেননা এটাই হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (কেবলা সংক্রান্ত) সঠিক (সিদ্ধান্ত); আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন। ১৫০. (হে নবী,) যে দিক থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে, (নামাযের জন্যে সেখান থেকেই) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে (দাঁড়িয়ে) যেও; (এ সময়) যেখানেই তুমি থাকো না কেন সে (কাবার) দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাহলে (প্রতিপক্ষের) লোকদের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে খাড়া করানোর মতো কোনো যুক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, তাদের মধ্য থেকে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের কথা অবশ্য আলাদা, তোমরা এসব ব্যক্তিদের ভয় করো না, তোমরা বরং ভয় করো আমাকে, যাতে করে আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিতে পারি, এর ফলে তোমরাও সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো, ১৫১. (এই সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যেই) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার 'আয়াত' পড়ে শোনাবে, (দ্বিতীয়ত) সে তোমাদের (জীবন) পরিশুদ্ধ করে দেবে এবং (তৃতীয়ত) সে তোমাদের আমার কেতাব ও (তার অন্তর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দেবে, (সর্বোপরি) সে তোমাদের এমন বিষয়সমূহের জ্ঞানও শেখাবে, যা তোমরা কখনো জানতে না। ১৫২. অতএব (এসব অনুগ্রহের জন্যে) তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, (তাহলে) আমিও তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো তোমরা আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ، اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ، بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا

تَشْعُرُوْنَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ

الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ، وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ

مُّصِيْبَةٌ ، قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ

رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

রুকু ১৯

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, (পরম) ধৈর্য ও (খালেস) নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন। ১৫৪. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা (কখনো) মৃত বলো না; বরং তারাই হচ্ছে (আসল) জীবিত (মানুষ), কিন্তু (এ বিষয়টির) কিছুই তোমরা জানো না। ১৫৫. আমি অবশ্যই (ঈমানের দাবীতে) তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করো, ১৫৬. যখনি তাদের সামনে (কোনো) পরীক্ষা এসে হাযির হয় তখনি তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ১৫৭. (বস্তুত) এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের ওপর রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে অবারিত রহমত ও অপার করুণা; আর এরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

তাফসীর
আয়াত-১৪২-১৫৭

এই পারার শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাই সমস্ত আলোচনাটাই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে মুসলিম উম্মাহকে ওই আমানত বহন করার যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে– যার দায়িত্ব স্বয়ং নবী (স.) তাদেরকে দিয়ে গেছেন। ইহুদীদের সেই আমানতগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় হচ্ছে খেলাফতের দায়িত্ব, যা এই আক্বিদার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র আলোচনার মধ্যেই বিরোধীদের তৎপরতা ও মুসলিম জামায়াতকে ধ্বংস করে দেয়ার অপচেষ্টা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে ইহুদীদের ভূমিকাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। এরা সর্বদাই মুসলমানদের আকীদাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রে মেতে ছিলো।

আর এই কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনও তাদেরকে দমন করার জন্যে সর্বপ্রকার সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে বলেছেন। যেন অতীতে যে যে পথে তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো পুনরায় সে সুযোগ না পায়।

সুতরাং এই পারার এবং এই সূরার অবশিষ্ট অংশের মৌলিক আলোচনা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহকে খেলাফতের জন্যে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈশিষ্টমন্ডিত করা এবং তাদের প্রত্যেকের মাঝে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। এই স্বাতন্ত্র্য দান করার জন্যে প্রয়োজন ছিলো তাদের পৃথক কেবলা ও পৃথক শরীয়ত (আইন কানুন) যা আল্লাহপ্রেরিত অন্যান্য ধর্মের মধ্যে অবস্থিত আইন কানুনের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং সেগুলোর সত্যায়নকারী যেগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় আজও বর্তমান রয়েছে। আর সব কিছুর লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে এক ও অভিন্ন সে বিষয়টাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া। সব কিছুর মূলে রয়েছে মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার ধ্যান-ধারণা, সর্বোপরি এর সাথে সাথে আল্লাহর সংগে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলা।

মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু প্রয়োজন ইসলাম সে সব বাস্তব ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছে। মানুষ কিভাবে আয় রোজগার করবে এবং এ জন্যে তাদের জান-মালকে কিভাবে কাজে লাগাবে সে বিষয়েও এ অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোচনা এসেছে। এ বিষয়ে তাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বাস্তব কর্মপন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। তাদের সামগ্রিক জীবনকে পরিশীলিত করার জন্যে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ কোরবানীর প্রেরণাও সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কিছু হাসিল করার জন্যে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ রব্বুল ইযযতের পরিচালনা সর্বান্তকরণে কবুল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে কোরআনের শিক্ষা ও নবী (স.)-এর শিক্ষাকে তারা সদাসর্বদা সামনে রেখেছে। আর এ সব কিছু সম্ভব হয়েছে এ কারণেই যে তারা সর্বান্তকরণে ও সন্তুষ্ট চিত্তে, পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার যাবতীয় বিষয়কে মেনে নিয়েছে।

কেবলা পরিবর্তন ও তার পটভূমিকা

এ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা, যার মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উম্মাতে মোহাম্মাদীই হচ্ছে 'উম্মাতে ওয়াসাত' কেন্দ্রীয় উম্মাত, মধ্যমপন্থী উম্মাত এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী উম্মাত। এই উম্মাতের ব্যক্তিরা গোটা মানবমন্ডলীর কাছে সত্যের বাস্তব রূপ নিয়ে হাযির হবে এবং মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) তাদের জন্যে হবেন সত্যের সাক্ষী। উম্মাতে মোহাম্মাদী গোটা মানব মন্ডলীকে নেতৃত্ব দেবে এবং তাদের ওপর সর্বপর্যায়ে এই উম্মতই কর্তৃত্ব করবে। তারাই ব্যাখ্যা দেবে সবকিছুর। তবে এ কাজ কোনোক্রমেই সহজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন পর্বতসম অবিচলতা যাতে করে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে তারা এ কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারে এবং এ কাজ করতে গিয়ে যতো বাধা বিঘ্ন ও দুঃখ-দৈন্য আসে তা হাসিমুখে বরদাশত করতে পারে। সারা দুনিয়ার সকল মানুষকে পথ দেখানোর জন্যেই ছিলো এ মহা দায়িত্ব। এতে সর্বদাই জান-মালের ক্ষয় ক্ষতির ভয় রয়েছে। আর তার সাথে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজের প্রতিরোধের সম্ভাবনা।

তারপর আমরা দেখতে পাই কিছু কিছু ঈমানী চিন্তা চেতনার নীতিমালার বিবরণ। এই বিবরণী থেকে আমরা বুঝতে পারি সকল প্রকার নেক কাজের মূলে রয়েছে তাকওয়া, শুধু পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করার নামই তাকওয়া নয়। একথা দ্বারা ইহুদীদের যাবতীয় অন্যায় অশান্তিকর এবং বিশৃংখলাপূর্ণ কাজকে প্রতিহত করা হয়েছে, প্রতিহত করা হয়েছে তাদের সত্য গোপন করার

তৎপরতাকে। মুসলমানদের সাথে ঝগড়া সৃষ্টির প্রবণতা এবং যারা ইসলামকে সত্য জীবনব্যবস্থা হিসাবে জানতে বুঝতে পেরেছে, তাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির অভিযানকেও সঠিকভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রধান আলোচনা এসেছে কেবলা পরিবর্তন এবং এর সাথে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো সেই সম্পর্কে।

এরপর আলোচনা এসেছে বাস্তব জীবনের কাজ কর্ম ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত বন্দেগী সম্পর্কে। এ দুটি জিনিসের ওপরই মানুষের জীবনের সবকিছু নির্ভর করে। তারপর আসছে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া। সামাজিক সংহতি ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রদত্ত হয়েছে কেসাসের আইন, ওসিয়তের নির্দেশাবলী, রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশ, হারাম মাসসমূহে এবং মাসজিদে হারামে যুদ্ধের আইন কানুন, হজ্জের বিধান, মদ জুয়ার বিধান এবং যুদ্ধবন্দীর সাথে ব্যবহারের নিয়মাবলী। এইসব আইন-কানুনের প্রত্যেকটি মোমেনের আকীদা বিশ্বাস ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এমনি করে এই পারার শেষের দিকে জান ও মালের জেহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, পাওয়া যায় বনি ইসরাঈলের কেস্সা যার মধ্যে মূসা (আ.)-এর পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা এসেছে। ওই সময়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে যখন বনি ইসরাঈলের লোকজন তাদের নবীকে বলেছিলো,

‘আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন যার সাথে মিলে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।’

এই ঘটনার বর্ণনার মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং সে সব মুসলমানদের জন্যে রয়েছে জীবন্ত এক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা যারা পরবর্তীকালে রেসালাতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। পরবর্তীকালের জাতিসমূহের জন্যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যেও ওইসব ঘটনাবলীতে বহু উপকরণ পাওয়া যাবে।

আলোচ্য অধ্যায়টি দ্বিতীয়বার অধ্যয়ন করলে এবং এর সাথে পূর্ববর্তী অধ্যায়টির দিকে আর একবার নযর বুলালে আমরা সেই সংঘাতের প্রকৃতিটা বুঝতে পারি যা নিয়ে কোরআন চিন্তা ভাবনা করছে। বুঝতে পারি ওই সংগ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে যা মুসলিম সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কোরআন মজীদ পরিচালনা করে যাচ্ছে। তৎকালীন শত্রুদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার, সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ, সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে টিটকারী ও কটাক্ষপাতের মোকাবেলায় কোরআনে কারীম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করেছে, মোকাবেলা করেছে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার এবং রুদ্ধ করে দিয়েছে বিশৃংখলা ও মূর্খতার সকল প্রবেশ পথকে। এটিই মানুষের মনের মধ্যে অতি সংগোপনে বাসা বাঁধে। সঠিক চিন্তা চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্যে এ সংঘাতের প্রয়োজন ছিলো, যাতে করে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব সঠিকভাবে কায়েম হতে পারে, মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতেও তা সক্ষম হয়।

কোরআনে কারীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি মুসলিম উম্মাহ গড়ে তোলার জন্যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো দেশে মুসলিম উম্মাহকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন। আর এ গঠন প্রক্রিয়ার পথে এবং ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংগ্রামে টিকে থাকার জন্যে প্রত্যেক যামানায় এবং প্রত্যেক দেশে কোরআনে কারীম একই কর্মসূচী দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মুসলিম উম্মাহর যারা চিরদিনের শত্রু তারা পূর্বের মতোই আজও ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর রয়েছে, তাদের ষড়যন্ত্র ও চিন্তা ভাবনাকে ইসলামের বিরুদ্ধে একইভাবে তারা আজও নিয়োজিত রেখেছে এবং একই প্রকার উপায়-উপকরণ তারা আজও ব্যবহার করে

চলেছে, স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ-ভেদে হয়তোবা ওই সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহারের ধরন কিছু পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র।

এমতাবস্থায় ওইসব ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে মুসলিম সংহতির লক্ষ্যে আজ আমাদেরকেও একই প্রকার পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে ইসলামের প্রথম যুগের মতোই এক সুসংবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ গড়ে তোলা যায়। এমনকি ইসলামের সঠিক চিন্তা চেতনা-দ্বারা পরিচালনা করে আজও একটি সুষ্ঠু ও সুসভ্য জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনের পথে কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। যা অন্য কোথাও নেই, অর্থাৎ, মানব নির্মিত কোনো ব্যবস্থার মধ্যে এমন সুনিশ্চিত কোনো পথ-নির্দেশনা আছে বলে কেউ দাবী করতে পারে না।

এইভাবে কোরআনে কারীম মুসলিম উম্মাহর জীবন পরিচালনার জন্যে বরাবরই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাস্তব জীবনে চলার পথে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেছে এবং গোটা জীবনের জন্যে পূর্ণাংগ এমন এক সংবিধান দিয়েছে যার পরিধি সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত, দিয়েছে তাকে সমাজ সংগঠনের মূলনীতি, আন্তর্জাতিক আইন এবং নৈতিক ও বাস্তব জীবনের সকল বিভাগের জন্যে দিকনির্দেশনা।

এইভাবে গোটা জীবনের জন্যে পথনির্দেশক হওয়াটাই হচ্ছে কোরআনে কারীমের বিশেষ মোজেযা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রায় সবটুকু জুড়ে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি পেশ করা হয়েছে। কেবলা পরিবর্তনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো, তাকে কেন্দ্র করে ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে ভাংগন ধরানোর যে চক্রান্ত করেছিলো, তাদের অপপ্রচারের ফলে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো সেসব কিছু নিরসনের লক্ষ্যেই বক্ষমান আলোচনা।

এ বিষয়ের ওপর কোনো নির্ভুল ও অকাট্য হাদীস পাওয়া যায় না, কোরআনে কারীমের মধ্যে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ইতিহাস নেই। যে বিশেষ আয়াতগুলোতে এ বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে তা হচ্ছে একান্তভাবে কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত, অর্থাৎ বায়তুল মাকদেস থেকে মুখ ফিরিয়ে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়াকে কেন্দ্র করে। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরতের পরে, মাদানী যিন্দেগীর ষোল অথবা সতের মাস পার হওয়ার পর।

সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো দ্বারা সম্ভবত, একথা সংক্ষেপে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, নামায ফরয হওয়ার সময় থেকে মুসলমান কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়তো, যদিও একথা কোরআনে কারীমের কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। হিজরতের পরে সম্ভবত রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মুসলমানরা বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে শুরু করেন, অবশ্য এ নির্দেশ সম্পর্কে কোরআনে কারীমে কোনো উল্লেখ নেই। তারপর শেষ যে কথাটি কোরআনে মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে,

'ফেরাও তোমার মুখকে মাসজিদুল হারামের দিকে, আর যেখানেই তোমরা থাকো না কেন তোমরা সেই একই দিকেই মুখ ফেরাবে।' এর ফলে পূর্বেকার হুকুম রদ হয়ে গেলো।

যাই হোক না কেন, ইহুদী ও নাসারা নামধারী আহলে কেতাবরা মুসলমানদেরকে বায়তুল মাকদেসের দিকে (সাময়িকভাবে হলেও) মুখ করে নামায পড়াকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বনাম তাদের দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্বের দলীল হিসেবে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছিলো, যার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকাই তাদের যুক্তিযুক্ত অজুহাত বলে মনে করতো। মদীনার সর্বত্র তারা একথা

প্রচার করে রেখেছিলো যে, মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সংগী সাথীদের নামায পড়াকালীন তাদের কেবলাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, তাদের 'দ্বীনই' সঠিক 'দ্বীন', তাদের কেবলাই সঠিক কেবলা এবং মুসলমানরাই ভ্রান্ত। সুতরাং মোহাম্মাদ ও তাঁর সংগী সাথীদের উচিত তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে না বলে তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসা।

এ সময়টি আরবের মুসলমানদের জন্যে বড়ই সংকটময় ছিলো, যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের দিনগুলোতে (আইয়ামে জাহেলিয়াতে) বায়তুল হারামকেই মর্যাদাবান ঘর হিসেবে পেয়ে এসেছিলো, সেই ঘরই ছিলো তাদের কা'বা এবং তাদের কেবলা। এ সময়ে ইহুদীদের এই দলীল পেশ করা এবং গর্বভরা কথাগুলো যখন তারা শুনলো তখন এটা তাদের ভীষণ মনোকষ্ট বৃদ্ধির কারণ হয়ে পড়লো।

অপর দিকে রসূলুল্লাহ (স.) বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর রবের কাছে নীরবে ফরিয়াদ করছিলেন, কিন্তু আদবের আধিক্যের কারণে আল্লাহর কাছে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিলেন না। তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন সমাধান দিয়ে দেবেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

এরপরই, রসূল (স.)-এর হৃদয়ের গোপন কোণে যে প্রশ্নটি লুকিয়ে ছিলো তার জবাব দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন,

আমার আদেশের অপেক্ষায় তুমি যেভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে তা আমি অবশ্যই দেখতে পেয়েছি। তাই তোমার পছন্দ মতো দিককে কেবলা বানিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং (এখনই তুমি) ফেরাও তোমার মুখকে মাসজিদে হারামের দিকে। আর যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সেখানেই তোমরা সেই দিকেই মুখ ফেরাবে।'

হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হিজরতের ষোড়শ অথবা সপ্তদশ মাসে কেবলা পরিবর্তনের এ আয়াত নাযিল হয়। মুসলমানদের কানে যখন তাহ্বীলে কেবলার কথা পৌঁছুলো তখন তারা অনেকেই নামাযের মধ্যভাগে ছিলেন। আয়াতটি শোনামাত্র তারা নামাযের মধ্যেই মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং নতুন কেবলার দিকে মুখ করেই তারা নামায সমাপ্ত করেন।

ব্যস, ওই মুহূর্ত থেকেই ইহুদীদের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলো। মোহাম্মাদ (স.) এবং মুসলমানরা তাদের কেবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় তাদের আত্ম-সম্ভ্রমে বড় আঘাত লাগলো, ব্যর্থ হয়ে গেলো তাদের সেই সব যুক্তি-প্রমাণ যার ওপর ভর করে তারা তাদের বড়ত্ব প্রদর্শন করছিলো এবং মুসলমানদের মধ্যে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলো। এই নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা স্থির থাকতে পারলো না। সন্দেহে ভরা মন ও নিজেদের নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বিধাদন্দ্বপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তারা মুসলমানদের বিভিন্ন সারিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। তখন তাদের আকীদা বিশ্বাসের মূল ভিত্তিই টলটলায়মান হয়ে গেছে। তারা বলে বেড়াতে লাগলো,

'যদি কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারটা সঠিক হয় তাহলে তোমাদের পেছনের সমস্ত নামাযগুলো বাতিল হয়ে গেছে। যেহেতু ভুল কেবলা অর্থাৎ বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে তোমরা এ পর্যন্ত নামায পড়ে এসেছো। আর পূর্বেকার কেবলা এবং তৎসংশ্লিষ্ট নামায যদি ঠিকই হয়ে থাকে তাহলে এখন মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়া বাতিল এবং মাসজিদে হারাম ও কেবলা হিসেবে মিথ্যা।'

এ দুটি অবস্থার যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন, যে কোনো অবস্থায় বুঝা গেলো এ সংক্রান্ত পূর্বেকার নির্দেশ নাকচ হয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন হুকুম আহকামের পরিবর্তন হওয়া, অথবা আয়াতসমূহ বদলে যাওয়া দ্বারা বুঝায় আসলে এগুলো হচ্ছে মোহাম্মদ (স.)-এর মনগড়া কাহিনী মাত্র।

আমাদের অনেকের কাছে এই আক্রমণের ভাষাগুলো বড়ই কঠিন মনে হয়। কিছু কিছু মোসলমানদের অন্তরকেও এগুলো ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছিলো এবং বিষয় সম্পর্কে কোরআনের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি সাধারণভাবে মুসলমানদের মনকে দারুণভাবে ঝাঁকিয়ে তুলেছিলো, এই কারণে আল্লাহ তায়ালা জানালেন, 'আমি কোনো আয়াতকে নাকচ করিনি, বা ভুলেও যাইনি।'

এ বিষয়ে প্রথম পারাতে পূর্ণাংগ দুটি আলোচনা এসেছে বর্তমান আলোচনাতেও সেই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত ব্যাখ্যার মধ্যে যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে বিস্তারিত বিবরণ এখানে এসেছে এবং যে সতর্কবাণী সেখানে উচ্চারণ করা হয়েছে তাতেও এ বিষয়ের ওপর কিছু ইংগীত পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

কেবলা পরিবর্তনের রহস্য

বর্তমান আলোচনায় আমরা কেবলা পরিবর্তনের রহস্য সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই এবং নামায পড়ার জন্যে মুসলমানদের জন্যে কেনই বা একটি বিশেষ কেবলার প্রয়োজন ছিলো সে বিষয়ের ওপর কিছু আলোকপাত করতে চাই। অবশ্যই এটা সত্য কথা যে মুসলিম দলের ইতিহাসে এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং তাদের জীবনের জন্যে এটা একটি বিরাট প্রভাব বিস্তারকারী তথ্য।

কেবলা পরিবর্তনের প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে কাবা শরীফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মাসজিদে আকসার দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিষয়। এই প্রথম কেবলা পরিবর্তন ছিলো উম্মতে মোহাম্মাদীকে প্রশিক্ষণ দান করার উদ্দেশ্যে, এরশাদ হচ্ছে,

যে কেবলার উপর তোমরা এতোদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলে, আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে করে আমি জেনে নিতে পারি যে, কে তোমাদের মধ্যে রসূলের অনুসরণ করে আর কে হেদায়াতের পথকে অবজ্ঞা করে।

আরববাসী জাহেলিয়াতের যুগে বায়তুল হারাম কাবা শরীফকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতো এবং তারা এ ঘরকে তাদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গণ্য করতো। তারপর ইসলাম যখন সবার অন্তরগুলোকে একান্তভাবে আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করার জন্যে আহবান জানালো এবং অন্যান্য সব কিছুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার উপদেশ দিলো, চাইলো মানুষ একনিষ্ঠভাবে এবং সরাসরিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুক এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মত ও পথের ধ্বনি পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব বরণ করুক, ঐতিহাসিক, সংস্কৃতি গোত্রীয় সংস্কার এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের যাবতীয় দাবী থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর হাতেই নিজেকে সোপর্দ করুক, তখন তাদেরকে মাসজিদে হারাম থেকে সরিয়ে কেবলা হিসেবে বায়তুল মাকদেসকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করার জন্যে ব্যবস্থা দিলো, যাতে করে তারা মনে প্রাণে জাহেলিয়াতের শেষ চিহ্নটুকু ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারে এবং জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্কিত সকল জিনিস থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে একান্তভাবে রসূল (স.)-এর অনুগত উম্মতে পরিণত হতে পারে, আর অন্য কোনো আকর্ষণ যেন তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে না পারে।

রসূলের এ আনুগত্য হবে নিরংকুশ, সকল প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেখানে জাহেলী যুগে উত্থিত কোনো শ্লোগান, গোত্রবাদের দোহাই, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ বা ঐতিহাসিক ও বংশীয় কৌলিন্য ইত্যাদি কোনো কিছুর গুরুত্ব থাকবে না। থাকবে না অতি সংগোপনে লুকায়িত আভিজাত্যের কোনো চিহ্ন, তাদের বিবেক কোনো পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবে না।

এমতাবস্থায় মুসলমান যখন পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলো এবং রসূলের অনুসারী হয়ে যখন তারা সেই কেবলার অনুসরণ করলো যার অনুসরণ রসূল (স.) নিজে করেছিলেন। তখন ইহুদীরা এই কাজটিকে তাদের পক্ষে একটি মযবুত দলীল হিসেবে গ্রহণ করলো, আর তখনই আল্লাহ রব্বুল ইযযতের পক্ষ থেকে মাসজিদে হারামকে পুনরায় কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার ফরমান জারি হয়ে গেলো। কিন্তু এ সময়ে মুসলমানদের অন্তরগুলো একটি মহাসত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, আর তা হচ্ছে ইসলামের বন্ধন এবং রসূল (স.)-এর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, এটাই ইসলামের তাৎপর্য, এটাই ইসলামের মাধুর্য, এখানে এসেই কেবলা পরিবর্তনের সেই তাৎপর্য বুঝা যায় যা ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ওই পবিত্র ঘরটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে এ ঘরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই নাম নেয়া হবে, এখানে আল্লাহর বান্দারা এসে নিজেদেরকে মুনিবের কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করবে। তাঁর ইচ্ছাকেই নিজেদের ইচ্ছা বলে ঘোষণা দেবে। এই ঘর হবে সেই সকল মুসলিম উম্মাহর জন্যে মীরাস (উত্তরাধিকার) যারা হবে নবী ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকত হিসাবে আগত প্রিয় মোহাম্মাদ (স.)-এর সঠিক অনুসারী।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ইবরাহীম (আ.) কাতরভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেছিলেন যেন তাঁর বংশে একজন রসূল পয়দা হন, যিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রকে নবুওত দান করেছিলেন এবং সবশেষে পাঠিয়েছেন সেই রসূলকে যাঁর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিলো ইবরাহীম (আ.)-এর সেই কাতর কণ্ঠের দোয়া। এর পূর্বেকার পারাতে এ বিষয়ের ওপর বেশ কিছু আলোচনা এসেছে যে,

'স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর রব কিছু কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি সে কথাগুলোর দাবী পূরণ করে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।'

এ পর্যন্ত আলোচনা এসেছে মাসজিদে হারামের ভিত্তি স্থাপন ও তার নির্মাণ সম্পর্কে তাঁদের দুজনকে ঘিরে আশেপাশের যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো সে সম্পর্কে, আলোচনা এসেছে আহলে কেতাব ও ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তাঁর সন্তানাদি, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর কেবলা সম্পর্কে এবং তাঁর ওয়াদা ও তাঁর ওসিয়ত সম্পর্কে। এ সূরার মধ্যে ইতিমধ্যে যে আলোচনাটা এসে গেছে তা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বিরতির পর মাসজিদে আকসা থেকে মাসজিদে হারামের দিকে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত অতি সুন্দর একটি ভূমিকা। ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) যে ঘর নির্মাণ করেছিলেন তার দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্যে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এসেছিলো। তারা পিতা পুত্র যে দীর্ঘ দোয়া করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম উম্মাহ যেন ওই ঘরের উত্তরাধিকারী হয় এবং তারা যেন তাঁর বংশের মধ্য থেকেই পয়দা হয়। মাসজিদুল হারামকে ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীন এর কেন্দ্র এবং আল্লাহর সাথে করা তাঁর ওয়াদার পাত্র হিসাবে গড়ে ওঠা মুসলিম উম্মাহর জন্যে ওই ঘরকে কেবলা নির্ধারণ করাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত ব্যাপার বলে মনে হয়, কেননা এই কেবলা নির্ধারণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বের নেতৃত্বদান যেমন বোধগম্য ব্যাপার তেমনি অন্তরের মধ্যে এর যৌক্তিকতাও অনুভূত হয় যা ইতিহাস পেশ করেছে।

আল্লাহ রব্বুল ইযযত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাকবেন এবং ইবরাহীম (আ.)ও তাঁর বংশের লোকদের কাছ থেকেও অনুরূপ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তারা একইভাবে ইসরাঈল নামে পরিচিত ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে সার্বিক আনুগত্যের ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন, আর ইবরাহীম (আ.) অবশ্যই জানতেন যে, আল্লাহর উত্তরাধিকার ও মর্যাদা দানের ওয়াদা যালিমদের জন্যে ছিলো না।

আবার আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে তারা পিতাপুত্র মিলে 'বায়তুল হারামের' ভিত্তি গড়ে তুলবেন আর মুসলমান হবে তাদের মীরাস বা এই সম্পত্তির হকদার যারা আল্লাহর সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করবে। তারা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সাথে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত সম্মিলিত ওয়াদারও অধিকারী হবে। সুতরাং, এটা খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে, তারাই মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর উত্তরাধিকারী হবে এবং সেই পবিত্র ঘরকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করবে।

তারপর যখন মুসলমানরা কিছুদিনের জন্যে ইহুদী ও নাসারাদের কেবলা বায়তুল মাকদেসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করলো, বুঝতে হবে যে অবশ্যই এ কাজটির পেছনে কোনো বিশেষ তাৎপর্য ছিলো যার বিবরণ কোরআনে কারীমে এসেছে এবং এ বিষয়টির ওপর ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাহকে ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকার দান করার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা এসেই গেলো তখন আহলে কেতাব তাদেরই পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনকে মানতে অস্বীকার করে বসলো। আর সেই দ্বীনই হচ্ছে দ্বীনে ইসলাম, অথচ সেই দ্বীনের আনুগত্য করতে গিয়ে তারা যদি কেবলা পরিবর্তনের এ ঘটনাটিকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারতো তাহলে তারা মুসলমানদের সাথে ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারে অংশীদার হতে পারতো। কেবলা পরিবর্তন করে তো সেই প্রথম ঘরটিকেই কেবলা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে যাকে তাদেরও পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ করেছিলেন। তাদের অনমনীয়তার কারণেই মুসলমানদের চিন্তা চেতনা ও অনুভূতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়ে গেলো এবং তারা একাধারে দ্বীনের ওয়ারিস, কেবলার ওয়ারিস এবং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদারও ওয়ারিস হয়ে গেলো।

মুসলিম জামায়াতের গুণ

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং মোশরেকদের সাথে তাদের পার্থক্য, এ দুটি হচ্ছে মুসলিম জামায়াতের জন্যে দুটি অপরিহার্য গুণ। এ দুটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসে, পার্থক্য থাকবে কেবলা এবং এবাদাত ও সার্বিক জীবন যাপনের পদ্ধতিতে, আর এই মুসলিম জামায়াতের মধ্যে এই পার্থক্য বোধ এবং অন্যান্যদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই থাকতে হবে। তাদের চিন্তা চেতনা ও আকীদা বিশ্বাসের পার্থক্যও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কিন্তু কেবলা পৃথক হওয়া এবং আনুষ্ঠানিক এবাদাতের জিনিসগুলো যতো স্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করে ততোটা অন্য কোনো জিনিসে বুঝা যায় না। এই প্রশ্নে আনুষ্ঠানিক এবাদাতের তাৎপর্য ও মূল্য বুঝতে সহজ হয়।

কোনো ব্যক্তি যদি পুরোপুরি ও সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত মন নিয়ে এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে তাকায় এবং এমনি করে যদি মানব প্রকৃতি ও তার অনুভূতির দিকে খেয়াল করে তাহলে হয়তোবা তার সামনে এ বিষয়টি ফুটে উঠবে যে, যেখানে লোভ লালসা আছে সেখানেই রয়েছে স্বজনপ্রীতি অথবা স্বার্থের টানাপড়েনের ঘৃণ্য সংকীর্ণতা, অথবা বিভিন্নপ্রকার মূর্তিপূজার রীতি! কিন্তু, পাশাপাশি আর একপ্রকার দৃষ্টিভংগীও রয়েছে যা এই দৃষ্টিভংগী থেকে প্রশস্ততর এবং

সাধারণ মানব-প্রকৃতির উপলব্ধি থেকে আরও গভীর। এই দৃষ্টিভংগী সকল দিক দিয়েই মূল্যবান আর একটি মহাসত্যকে ফুটিয়ে তোলে।

সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রকাশ্য কিছু জিনিসের সামনে মাথা নত করার প্রবণতা অতি সংগোপনে হলেও বিরাজ করে এবং এই চেতনা তার শরীর ও অন্তরাত্মার মধ্য থেকে গড়ে ওঠে। তবে এই গোপন চেতনাবোধ তাকে সঠিক পথেই এগিয়ে নিয়ে যাবে অথবা তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রকাশ্য কোনো মূর্তির সামনে মাথা নত করলেই তার চেতনা ও উপলব্ধি শক্তি প্রশমিত হবে অথবা এতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে এটা জরুরী নয়। এইভাবেই এ বিষয়টির ব্যাখ্যা সমাপ্ত করা হয়েছে। হয় এই ব্যাখ্যাতে আশা করা যায় তার চেতনা বিকশিত হবে এবং তার মনও শান্ত হয়ে যাবে এই ব্যাখ্যাতে সে নিশ্চিন্ততা বোধ করবে ও পুরোপুরিভাবে শান্তি পাবে, তার হৃদয়ের বোঝা পুরোপুরিভাবে নেমে যাবে। প্রকাশ্য ও গোপন জিনিসের মধ্যে যে যোগসূত্র বর্তমান রয়েছে তাও সে গভীরভাবে উপলব্ধি করবে, অজানা অচেনা তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রকাশ্য বস্তু নিচয়ের যে গভীর যোগসূত্র বর্তমান রয়েছে তা উপলব্ধি করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।

এই স্বাভাবিক ভিত্তির ওপর ইসলাম তার সকল আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এগুলো শুধুমাত্র নিয়তের ওপর নির্ভর করে না– বা আত্মিকভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করলেই এগুলোর হক আদায় হয় না বরং এগুলোর জন্যে ইচ্ছার সাথে প্রয়োজন প্রকাশ্য কিছু বাস্তব কাজের। নামাযের মধ্যে রয়েছে কেয়াম (দাঁড়ানো), কেবলার দিকে মুখ করা, তাকবীর বলা, কেরাত পাঠ, রুকু, সেজদা ইত্যাদি। হজ্জের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ও নির্দিষ্ট পোশাকে এহ্‌রাম বাঁধা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া, 'সাঈ' করা, সাফা মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো, দোয়া পাঠ করা, লাব্বায়ক বলতে থাকা, কোরবানী করা, মাথার চুল ফেলা। রোযার জন্যে দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকা। এমনি করে প্রত্যেক এবাদাতের জন্যেই বাহ্যিক কিছু কাজ আছে, এর মাধ্যমে মানব সত্ত্বার প্রকাশ্য ও গোপন অস্তিত্বের মধ্যকার একটা সম্পর্ক নির্ণীত হয় এবং এর শক্তিগুলোকেও প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ তত্ত্ব ও বাস্তব কাজের সম্মিলন মানুষের ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়।

আর আল্লাহ তায়ালা একথা জানেন যে মানুষের দেহের মধ্যে লুক্কায়িত শক্তিকে প্রকাশ্য রূপ দেয়ার যে প্রাকৃতিক তাগাদা রয়েছে তাই মূলত সঠিক পথ পরিত্যাগকারীদেরকে ক্রোধান্বিত করে রেখেছে। এই শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্যে মানুষের মধ্য থেকে একটি দল নিজেদেরকে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, গাছ-পাথর, তারকারাজি, সূর্য ও চাঁদ, জীবজন্তু, পশুপাখী ও অন্যান্য সকল প্রকার বস্তুর সাহায্যে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিকেও কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। এমন সময় ইসলাম এসে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক এবাদাতের কাজগুলোকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। একাধারে আল্লাহর সত্ত্বাকে বস্তুগত কোনো কিছুর দ্বারা বিধৃত করার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে, নাকচ করে দিয়েছে তার রূপ ও আকৃতির সম্ভাব্যতাকে কোনো ধ্যান-ধারণার মধ্যে আনার বিষয়টিকে। এই কারণে কেবলার দিকে মুখ করে মুসলমান তার পুরো সত্ত্বাকে আল্লাহর দিকে রুজু করে তৃপ্তি পায়। তার অন্তর, অনুভূতি ও অংগ-প্রত্যংগকে আল্লাহমুখী করে সে ওই মহা শক্তিমানের সাথে সম্পর্কিত হতে চায় যাকে স্থানভিত্তিক চিন্তা করা যায় না, যদিও কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানকেই কেবলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অবশ্যই নামাযসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক এবাদাত করার জন্যে কোনো স্থানকে এমন কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা জরুরী যার দিকে মুখ করা যায় এবং যেখানে একত্রিত হয়ে সারা বিশ্বের

মুসলমান নিজেদেরকে একই পথের পথিক ও একই আদর্শের অনুসারী বলে ঘোষণা দিতে পারে। এইভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা দ্বারা তারা সচেতনভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের কথা দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়। এমনি করে সকল দিক থেকে তারা তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলে।

অমুসলিমদের অনুকরণ

এই কারণেই মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও আকীদার বহিপ্রকাশ স্বরূপ বাস্তব আনুগত্যপূর্ণ ও আনুষ্ঠানিক যে এবাদাতগুলো রয়েছে তা যেন অমুসলিমদের কোনো পূজা অর্চনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একইভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাদের বিভিন্ন ব্যবহারের সাথে মুসলমানদের ব্যবহারের সাদৃশ্য করাকে। এটা কোনো বিদ্বেষপ্রসূত ব্যবহার বা কাজ নয়। এ বাস্তব ব্যবহারগুলোর পেছনে অত্যন্ত গভীর কিছু তাৎপর্য রয়েছে। এবাদাতের প্রকাশ্য রীতির পেছনে রয়েছে এমন কিছু গোপন বিষয় যা এক জাতিকে আর এক জাতি থেকে পৃথক করে। পার্থক্য দেখায় এক জাতির যৌক্তিকতা ও চিন্তাধারা থেকে আর এক জাতির যৌক্তিকতা ও চিন্তাধারার মধ্যে। এমনকি ওই কাজগুলো পৃথক করে, আলাদা করে দেয় এক জাতির বিবেক বুদ্ধি থেকে আর এক জাতির বিবেক বুদ্ধিকে এবং এক জাতির নৈতিকতা থেকে আর এক জাতির নৈতিকতা পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কেও তাদের দৃষ্টিভংগীকে আলাদা করে দেয়।

এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– তিনি বলেন, নবী কারীম (স.) বলেছেন, 'ইহুদী ও নাসারারা (দাড়ি, চুল ও ইত্যাদিকে) রং করে না। অতএব তাদের থেকে তোমাদের ব্যবহারকে পৃথক করো।' (মালেক, বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

আর একটি হাদীস,

'রসূলুল্লাহ (স.) একদল মুসলমানের কাছে গেলেন তখন তারা উঠে দাঁড়ালো। তারপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, অনারব লোক (মোশরেকরা) যেমন করে কারো আগমনে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উঠে দাঁড়ায় তাদের মতো তোমরা উঠে দাঁড়িয়ো না। তারা একজন অপরজনের বড়ত্ব প্রদর্শন করে। তোমরা তাদের মতো করোনা।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অন্য হাদীসে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

'আমার সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে তোমরা সেইভাবে সীমা অতিক্রম করো না যেমন করে মারইয়াম ছেলে (ঈসা আ.)-এর সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে নাসারারা সীমা অতিক্রম করেছিলো। আমি আল্লাহর একজন গোলাম, সুতরাং আমাকে আব্দুল্লাহ (আল্লাহর গোলাম) ও তাঁর রসূল বলবে।' (বোখারী)

এইভাবে রসূল (স.) কোনো জিনিসে অথবা পোশাক-আসাকে সাদৃশ্য করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন যেন কোনো অংগভংগী অথবা ব্যবহারেও আমরা তাদের মতো না করি, এমনকি কথা ও আদব কায়দা বা শিষ্টাচার প্রদর্শনেও যেন তাদের সাথে আমাদের মিল না হয়। এর কারণ হচ্ছে এসব প্রত্যেক জিনিসের সাথে সেই গোপন অনুভূতি জড়িত রয়েছে যা বিভিন্ন জাতির ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে পৃথক করে দেয়। এমনকি পৃথক করে দেয় তাদের জীবন পদ্ধতিতে ও সাংগঠনিক জীবন যাপনে।

এর সাথে রসূলুল্লাহ (স.) আরও নিষেধ করেছেন গায়রুল্লাহর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন না করতে যা মুসলমানকে তার সেই বিশিষ্ট পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে,

যার প্রতিষ্ঠার জন্যে রসূল (স.) প্রেরিত হয়েছিলেন। নিষেধ করেছেন পৃথিবীর যে কোনো জাতির কাছে হার না মানতে, কারণ মানসিক দিক দিয়ে পরাজিত বোধ করায়, এমন দলীয় মনোভাব বা দুর্বল দল গড়ে ওঠার পথ খুলে যায় যা মনকে ভীষণ ছোট করে ফেলে এবং অন্য কোনো দলের আনুগত্য করতে প্ররোচনা দেয়, অথচ মুসলিম উম্মাহকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে গোটা মানব মন্ডলীকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

সুতরাং তাদের নিজেদের নেতৃত্বের যোগ্যতার ওপর আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যেমন তাদের আকীদা বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর গভীর প্রত্যয় বিরাজ করে। তাদেরকে নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনিই তো দিয়েছেন যিনি তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের জন্যে বাছাই করেছেন। আল্লাহ তায়ালা চান, মুসলমানরা মাথা উঁচু করে থাকবে পৃথিবীর বুকে, যেহেতু তারা মধ্যম পথ অবলম্বনকারী কেন্দ্রীয় জাতি। তাদেরকে সর্বোত্তম জাতিরূপে মানবজাতির মধ্য থেকে বের করা হয়েছে যেন তারা সারা জগতের সকল মানুষের ওপর নেতৃত্ব করতে পারে। অন্যরা কোথায় পাবে জীবন পরিচালনার সুনিশ্চিত ধ্যান-ধারণা ও নিখুঁত জীবন পদ্ধতি? কোথায় পাবে তারা নেতৃত্বের যোগ্যতা ও নির্ভুল জীবন বিধান? গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন বিধান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিতে পারেন। তিনি মুসলমানদেরকে সমগ্র জীবনের জন্যে বিধান দান করে তাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা থেকে উন্নতির শিখরে তুলেছেন।

ইসলাম মানুষকে উচুঁমানের চিন্তাশক্তি দান করেছে। দিয়েছে তাকে অত্যন্ত সুন্দর জীবন বিধান। এই কারণেই তারা গোটা মানব মন্ডলীকে এই জীবন বিধান গ্রহণ করতে আহবান জানায়। আর ইসলাম যে আদর্শের ভিত্তিতে সারা পৃথিবীতে একই মানব গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চায় এবং এ জন্যে যে উৎসাহ দেয় এমন আদর্শও অন্য কেউ দেখায় না বা গোটা মানবজাতিকে এক পতাকাতলে সমবেত করার জন্যেও কেউ এইভাবে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং, হে ভ্রান্ত মানুষ, একবার ভেবে দেখো, যিনি তোমাকে বিশ্বপ্রভু আল্লাহর একত্বকে গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানাচ্ছেন, যিনি জানাচ্ছেন ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করার জন্যে, যিনি উন্নততর জীবন বিধান গ্রহণ করতে বলছেন, যিনি অন্য যে কোনো মূল্যে বা যে কোনো জিনিসের লোভে আল্লাহর পথ ছাড়তে নিষেধ করছেন, যিনি আহবান শুভ্র-সমুজ্জ্বল জ্ঞানের আলোর মধ্য থেকে অজ্ঞান অন্ধকারের দিকে ফিরে যেতে নিষেধ করছেন, তিনি কি কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, না কখনও নয়, বরং সাময়িক ও তুচ্ছ স্বার্থের কারণে ও জেনে বুঝে, তাঁর সাথেই আজ বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে। তিনি সবার প্রতি কল্যাণ, সত্য সঠিক পথ এবং সংশোধনীর দিকেই উদাত্ত আহবান জানিয়ে চলেছেন!

আর যে মুসলিম জামায়াত এই পার্থক্য নির্ণয়কারী কেবলাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের পক্ষে নিজেদের কেবলার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, বুঝা দরকার কেন তাদের জন্যে এই কেবলাকে নির্দ্ধারিত করা হলো। কেবলা শুধু একটি বিশেষ এলাকা বা নামায পড়ার জন্যে একটি দিকই নয়। ওই স্থানটি বা ওই দিকটির দিকে মুখ করা সে তো একটি নিদর্শন, অন্যান্যদের সাথে পার্থক্য নির্ণয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ার ইংগীতবাহী এক চিহ্ন! এ পবিত্র ঘর চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লব-আনয়নকারী, ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার অনুপম মাধ্যম, বাস্তব জীবনের জন্যে বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারক, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি ইংগীতবাহী এবং মানুষের স্বভাবকে পরিবর্তনকারী।

আজকের মুসলিম উম্মাহ তর্জন গর্জনকারী নানা প্রকার ভুল মত ও পথে বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। যে সব ভুল লক্ষ্যের পথে তারা এগিয়ে চলেছে তা অন্যান্য ভুল

মতাবলম্বীদের থেকেই গৃহীত। সেই সব নানাপ্রকার ভুল জিনিসের প্রতি তারা গুরুত্ব দিয়ে চলেছে যার প্রতি অমুসলিমরা গুরুত্ব দিচ্ছে। অমুসলিমরা যে ভুলে ভরা ঝান্ডাকে বুলন্দ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, আজকের মুসলমানরাও তাদের অনুসরণে সেই মূল্যবোধের গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে, যাদেরকে অমুসলিম জাহেলরা গুরুত্ব দিচ্ছে, তারা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ওই বিশেষ চিন্তাধারার গুরুত্ব দিচ্ছে যা অন্যরা দিয়ে চলেছে, অথচ উচিত ছিলো জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের সাথে এই সকল বিষয়ে পার্থক্য রাখা এবং নিজেদের আদর্শের আলোকে এবং স্বতন্ত্র লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পৃথক পথ অবলম্বন করা সেই বিশিষ্ট পতাকাকে সমুন্নত করা যা একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ইংগীত বহন করে, তাহলেই তারা সেই "উম্মতে ওয়াসাৎ" নামের যোগ্য হতে পারতো, যার জন্যে গোটা পৃথিবীর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে তাদেকে গড়ে তোলা হয়েছিলো। তাহলেই তারা আকীদার আমানত বহন করতে পারতো এবং তার উত্তরাধিকারীও হতে পারতো।

এই আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আর এই উন্নত জীবন ব্যবস্থাই পরবর্তী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ওই আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী করেছে যা পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলো মানসম্ভ্রম ও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা। যাদেরকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো এক সময় সকল স্তরের মানুষ, তারা মুসলিম উম্মাহর জীবনে এই জীবন বিধানকে প্রয়োগ করে তাদেরকে দান করতে পেরেছিলো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জীবনের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণের শক্তি ও সঠিক বিষয়াদির প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপের মাধ্যমে তারা মুসলিমদের স্বাতন্ত্র এনে দিয়েছিলো। দিয়েছিলো তাদেরকে বিশেষ পতাকা ও পরিচয়বহ চিহ্ন, দিয়েছিলো তাদেরকে সেই বলিষ্ঠ ও সার্বিক নেতৃত্ব যা একমাত্র তাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছিলো! এইভাবেই তাদেরকে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে। ইসলামের এই জীবন পদ্ধতিই তাদেরকে মহাকালের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে। এই সুনির্দিষ্ট জীবন বিধানের অভাবে তারা দিক বিদিক দিশেহারা হয়ে অন্যান্য জাতির মতোই হয়তো ছুটোছুটি করতো। শিকার হয়ে যেতো বিভিন্ন রুচি। পোশাক-আসাক ও চালচলন ও বিভ্রান্তিকর বিভিন্ন পরিচয়ের।

কেবলা পরিবর্তন ও ইহুদীদের ভূমিকা

পুনরায় আমরা কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টির ওপর কোরআনী আয়াতসমূহের আলোকে আরও বিস্তারিত আলোচনার দিকে ফিরে আসতে চাই।

'শীঘ্রই কিছু নির্বোধ জাহেল লোকেরা বলবে কোন জিনিস তাদেরকে সেই কেবলা থেকে ফিরিয়ে নিলো যার ওপরে ওরা এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো? (ওদেরকে) বলে দাও পূর্ব পশ্চিম সবটাই তো আল্লাহর (সৃষ্টি,) সঠিক ও মযবুত পথের দিকে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে পথনির্দেশ করেন।'

কোরআনের প্রেক্ষাপট ও মদীনার ঘটনাবলীকে সামনে রাখলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে 'সুফাহা' বলতে এখানে ইহুদীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কেবলা পরিবর্তনের হুকুম এসে যাওয়ার পর তারাই তো চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিলো। তারাই তো একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছিলো, কোন জিনিস তাদেরকে সেই কেবলা থেকে ফেরালো যার ওপর তারা এতোদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলো? অর্থাৎ মাসজিদে আকসার (বায়তুল মাকদেসের) দিকে তারা এতোদিন মুখ করে নামায পড়তো, আজকে কোন কারণে তারা সেই কেবলা থেকে ফিরে গেলো?'

এ বিষয়ে বা'রা ইবনে আযেব (রা.) থেকে একটি হাদীস পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন, রসূল (স.) মদীনায় পদার্পণ করে সর্বপ্রথম তাঁর নানার বাড়ীতে ওঠেন, (অথবা বলেছেন, মামার বাড়ী

ওঠেন)। তারা ছিলেন আনসার গোত্রের লোক। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) ছয় মাস বা সাত মাস ধরে বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করেই নামায পড়েছেন। অবশ্য বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়তে তাঁর মন খুবই চাইতো। তারপর কাবা শরীফের দিকে মুখ করে তিনি প্রথম যে নামায পড়লেন তা ছিলো আসরের নামায। তাঁর সাথে একদল মুসলমানও ওই নামাযে শরীক ছিলো। তাদের মধ্যকার সাহাবী নামায শেষে মাসজিদের দিকে এলেন তখন মুসল্লীরা রুকুতে ছিলো। ওই অবস্থাতেই তিনি ঘোষণা দিলেন, 'আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে আমি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়েছি। তখন তারা সংগে সংগে ওই অবস্থা থেকেই কাবা শরীফের দিকে ফিরলো। রসূলুল্লাহ (স.) যখন বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন তখন ইহুদীদের কাছে এটা খুবই ভালো লাগতো। কিন্তু যখন সে দিক থেকে তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ ফেরালেন তখন তাদের কাছে এটা অত্যন্ত কঠিন লাগলো, আর তখনই কোরআনের আয়াত নাযিল হলো,

'অর্থাৎ ইহুদীরা বলে উঠলো, যে কেবলার ওপর তারা এতোদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার থেকে তাদেরকে কোন জিনিস ফিরিয়ে দিলো?'

আমরা এখন দেখবো, কোরআনে কারীম এই প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিয়েছে এবং ইহুদীদের আক্রমণাত্মক মনোভাবে কিছুসংখ্যক মুসলমানের কি কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যেও যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রেক্ষাপটে কোরআন কি বক্তব্য রেখেছে।

যে কথা এখানে ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাচ্ছে তা হচ্ছে,

'শীঘ্রই নাদান লোকেরা বলবে, তারা যে কেবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার থেকে কোন জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিলো?'

নীচের অধ্যায়ে যে দারস্ (পাঠ)টি দান করা হয়েছে তার মধ্যে দেখা যাবে, কেবলা পরিবর্তনের ঘোষণা দিতে গিয়ে একটি ভূমিকা এখানে পেশ করা হয়েছে এবং ওই নাদান লোকেরা কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যতে গুজব ছড়াবে এবং একে অপরকে যেসব প্রশ্ন করবে সেই কথাগুলোকে সামনে রেখেই এ আলোচনা এসেছে অথবা তারা যে অপপ্রচারগুলো চালাচ্ছে অচিরেই সেগুলোর প্রত্যাখ্যানস্বরূপ আলোচ্য কথাগুলো এসেছে। যেমন ইতিপূর্বে হাদীসে ইংগীত দেয়া হয়েছে। কি হতে যাচ্ছে সে বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্যেই এখানকার এ বিশেষ বাচনভংগী। যে পথের দিকে এখানে ইংগীত করা হয়েছে তা ভালো পথ হিসেবেই মানুষের জানা আছে এবং সে পথ কবুল করা উচিত তাও সাধারণভাবে মানুষ বুঝে। কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি ওই সকল বিরোধীদের নানাপ্রকার ভ্রান্ত পথের সামনে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ও সার্বিক দিক দিয়ে কল্যাণকর এক পথ দেখাচ্ছে। বিরোধীদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে এটাই সুন্দরতম পথ।

কোরআন মাজীদের এই আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ (স.)-কে ওদের ওই সব অপপ্রচার এবং প্রশ্নের এমন জবাব শিখিয়ে দিয়েছে যা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং সত্য বিকশিত হয়ে উঠেছে, সুগম হয়ে গিয়েছে মানুষের দৃষ্টিভংগীর সুষ্ঠু পরিবর্তনের পথ। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, পূর্ব ও পশ্চিম সবই তো আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক ও মযবুত পথে পরিচালিত করেন।'

'পূর্ব যেমন আল্লাহর পশ্চিমও তো আল্লাহর। কোনো ব্যক্তি নামায পড়ার জন্যে যে দিকেই মুখ করুক না কেন সে আল্লাহর দিকেই মুখ করে।'

বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন স্থান যা কিছু আছে সেগুলোর কোনোটারই নিজস্ব কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা দান করাতেই সেগুলো মর্যাদা পেয়েছে এবং সেগুলো বিশিষ্ট স্থানে পরিণত হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক ও মযবুত পথে পরিচালিত করেন। সুতরাং কারো জন্যে যখন তিনি কোনো দিককে নির্দিষ্ট করে দেন এবং সেটাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেন তখন সে স্থানটি প্রিয় ও পছন্দনীয় স্থানে পরিণত হয়ে যায়। আর সেই পথ গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথে চলতে থাকে।

এই ভাবে বিভিন্ন স্থান ও দিকের তাৎপর্য নির্ণীত হয়। স্থির হয়ে যায় বান্দার জন্যে হেদায়াত লাভের সেই উৎসমূল, যেখান থেকে নির্ধারণ করা হয় তার জন্যে মুখ করার দিকসমূহকে। আসলে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কোনো দিকে মুখ করা দ্বারা আল্লাহরই হুকুম পালন করা হয় এবং আল্লাহর দিকেই মুখ করা হয়।

মুসলিম জাতির পরিচয়

তারপর কোরআনে কারীম এই সৃষ্টির মধ্যকার গভীর সত্যকে উম্মতে মোহাম্মাদীর সামনে পেশ করেছে। জানিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে তার প্রধান কর্তব্য সম্পর্কে, গোটা মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তার মহান মর্যাদার কথা স্থিরভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং মানব জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের মৌলিক ভূমিকা কি হওয়া দরকার তাও তাদের বিশেষ কেবলা ও বিশেষ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার মাধ্যমে কোরআনে কারীম স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যেন তারা কোনো অবস্থাতেই নিজেদের পরওয়ারদেগারের কথা ছাড়া আর কারো কোনো কথার প্রতি কর্ণপাত না করে, যেহেতু এই কেবলার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মর্যাদাবান বানিয়েছেন, অধিষ্ঠিত করেছেন তাদেরকে বিশ্ব মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে।

মুসলিম জাতি হচ্ছে এমন একটি কেন্দ্রীয় জাতি যারা গোটা মানব জাতির কাছে এমনভাবে সত্যের সাক্ষী হিসেবে ফুটে উঠবে যে, তাদের দেখেই মানুষ সত্যের চমৎকারিত্ব বুঝতে পারবে। তারা হবে সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক। তারা মানুষের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ কায়েম করবে, তুলে ধরবে তারা সবার সামনে সত্যনীতি, জীবনের মূল্যবোধ ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি। ফলে, এহেন ব্যক্তিদের পরামর্শ ও মতামতই জনগণের কাছে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হবে। তারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি,দৃষ্টিভংগী ও নিয়মপদ্ধতিগুলো যাচাই করার পর সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করবে। জানিয়ে দেবে তারা কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। গ্রহণ করবে না তারা অন্য কোনো মানুষ থেকে নেয়া কোনো দৃষ্টিভংগী, মূল্যবোধ বা কোনো মানদন্ড।

কেননা তারাই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্যে তদারককারী এবং সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মানুষের মধ্যে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা এবং হক ও ইনসাফের সাথে বিচার ফয়সালার। আর এইভাবেই তারা সারা দুনিয়ার মানুষের মাঝে সত্যের সাক্ষীর ভূমিকা পালন করবে এবং রসূল (স.) তাদের জন্যে সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ করবেন, উম্মতের যাবতীয় কার্যকলাপ, অভ্যাস ও রীতিনীতি নির্ধারনকারী হবেন তিনিই এবং উম্মতের মধ্য থেকে আগত যে কোনো চিন্তাভাবনা বা পছন্দের সঠিকতা বিবেচনা করে তিনিই দেবেন শেষ সিদ্ধান্ত। এইটিই হচ্ছে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য এবং তার কর্তব্যও সে এইভাবে পালন করবে। তারা সর্বোত্তম উম্মতরূপে আখ্যায়িত হওয়ার সঠিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত করবে।

অবশ্যই মুসলিম উম্মাহ সকল দিক বিবেচনায় 'উম্মতে ওয়াসাত' হওয়ার যোগ্য। 'ওয়াসাত' শব্দটি 'বিসাতাত' থেকে এসেছে বলে ধরে নিলে তার অর্থ দাঁড়ায় ন্যায়নিষ্ঠা ও ভারসাম্য, অর্থাৎ তারা হবে সত্য ও ন্যায়ের নিশানবর্দার এবং সকল দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ। আর প্রচলিত শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলে তার অর্থ হয় মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী।

সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতি আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার নিরীখে 'উম্মতে ওয়াসাত' বা মধ্যম পথ অবলম্বনকারী উম্মত। আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে নেই তাদের কোনো বাড়াবাড়ি আর না তারা জড়বাদ বা বস্তুবাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে নির্মম নিষ্ঠুর। প্রকৃত মানবতার ধারক ও বাহক তারা। তারা মনে প্রাণে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি অনুভবও করে যে, সব কিছুর সাথে মানবাত্মার সম্পর্ক সুনিবীড়, কিন্তু এই অনুভূতি তাদেরকে সংসার বিরাগী বানায় না। আবার বস্তুর প্রয়োজন বাস্তব জীবনের জন্যে অপরিহার্য বলে তারা বুঝা সত্তেও তারা বস্তু-সর্বস্ব হয়ে যায় না। বস্তুর ব্যবহার তাদেরকে আল্লাহবিমুখ বা আল্লাহর হুকুম আহকাম থেকে বেপরওয়া বানায় না।

বস্তুত প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ এই দুই আকর্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, আর এইখানেই তার কৃতিত্ব ও তার চমৎকারিত্ব। তারা মানুষের বাস্তব প্রকৃতি ও তার চাহিদাকে উপেক্ষা করে না, কিন্তু সাথে সাথে তারা গভীরভাবে অনুভব করে মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব একটি জীবই নয়, বরং তার মধ্যে রয়েছে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি আত্মাও। তার অস্তিত্বের উভয় দিকই তার সামনে স্পষ্ট, আর সেই উভয়ের অধিকার আদায়ে সে সচেতন। জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের জন্যে ঝুঁকি নেয়ার সাথে সাথে সে জীবনের নিরাপত্তা ও বিপদমুক্তির খেয়ালও রাখে। লোভ-লালসায় ভরা জগতের সব কিছুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্তেও সে বস্তুবাদের মায়া জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যায় না যে, নিজ মুনিবের সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা থেকে সে সম্পূর্ণ দূর হয়ে যেতে পারে।

জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রেও উম্মতে মুসলিমাহ, উম্মতে ওয়াসাত হওয়ার অধিকারী। কোনো সময়েই সে নিজের জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে না, বরং সে নবী (স.)-এর অনুপ্রেরণায় সদা সর্বদা জ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত। দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মতো যে কোনো আহবানকারীর হাতে 'বায়াত' করে অন্ধ অনুসারী হয়ে যায় না, ছুটে বেড়ায় না কোনো আলেয়ার পেছনে বা ধাঁধার আকর্ষণে, অথবা বানরের মতো না বুঝে কারো আনুগত্যও করতে পারে না। একাধারে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে সে আকণ্ঠ পান করে, অপর দিকে মানুষের জ্ঞান গবেষণা ও তার ফলাফল থেকেও সে উপকৃত হয়। সে ন্যায়-নীতি ও সত্যের অনুসারী, সুতরাং যেখানেই সে সত্যের সন্ধান পায় সেখান থেকেই সে তার পিপাসা মিটায়। সত্য প্রাপ্তির জন্যে সে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা অবশ্যই করে।

সংগঠন ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনায়ও মুসলিম উম্মাহ উম্মাতে ওয়াসাত, কেননা সে কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির আবেগের কাছে যেমন নিজেকে সোপর্দ করে না, তেমনি মানব নির্মিত কোনো আইন আদালত বা সংগঠনের কাছে নিরংকুশভাবে আত্মসমর্পণও করে না বরং সঠিক পথে চলার ব্যাপারে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে সে সাহায্য করে এবং সঠিক পরামর্শ দানের মাধ্যমে সমাজ সংগঠনকে কল্যাণকর পথে এগিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। জনগণকে সে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে যে তারা শাসক শ্রেণীর রক্ত চক্ষুর সামনে থেকেও নিজ নিজ বিবেকের ডাকে সাড়া দেয় এবং ওহীভিত্তিক ব্যবস্থা ও মানব রচিত আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে না।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে উম্মতে মুসলিমাহ্ সুসংবদ্ধ করে। সে ব্যক্তিকে তার নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তিকে সে সমাজের কাছে বিলীন করে দেয় না। অপরদিকে ব্যক্তিকে সে এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় না যে তার কার্যকলাপ ও ব্যবহার সমাজ জীবনকে বিঘ্নিত করতে পারে বরং ব্যক্তিকে এমনভাবে সে প্রশিক্ষণ দেয় যে সে নিজ ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্ভ্রমবোধকে বজায় রেখেও সমাজের উপকারী বন্ধুতে পরিণত হয়। যে নিজেকে সদা সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে, যে ব্যক্তি জীবনকে নিয়মমাফিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলে তার পক্ষে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ও সুবিধাবাদীতে পরিণত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে আবেগ অনুভূতি ও উদ্ভাবনী শক্তি আছে তাকে সুশৃংখলভাবে কাজে লাগায়, কোনো অবস্থাতেই তার স্বাধীনতা হরণ করে না কিন্তু সাথে সাথে তার প্রতি এমন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় যে, সে সীমা লংঘন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। ফলে সে হয়ে যায় সমাজের দরদী খেদমতগার আর সমাজও হয়ে যায় তার জন্যে শুভাকাংখী। আর এ সব কিছুই সংঘটিত হয় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অবস্থিত পরিপূর্ণ ঐক্যবোধের কারণে।

পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে মুসলিমদের প্রথম অবস্থান ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিলো। সুতরাং এ কেন্দ্রস্থলের অধিবাসী হিসেবেও মুসলমানদের কেন্দ্রীয় উম্মত বলে অভিহিত করা যায়। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইসলামের ও মুসলমানদের বাসস্থানগুলো অধিকাংশ ওই কেন্দ্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ স্থানের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের সকল এলাকাতেই মুসলমানদের বাসভূমি আগেও যেমন ছিলো, আজও তেমনি আছে। এই পজিশনে থাকায় তাদের ওপর গোটা পৃথিবীর তদারকীর দায়িত্ব বর্তায়। তাদের কাছে আগত সত্যের নির্ঝরিনীতে তারা যেমন অবগাহন করেছে তেমনি এই ফোয়ারার অমিয় ধারা থেকে সারা পৃথিবীবাসী যেন পরিতৃপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করাও এই মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য। তাদের কাছে জ্ঞান ভান্ডার রয়েছে তার আলোকে তারা জীবন গড়ে ধন্য হয়। তাদের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দ্বারা সত্যের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব অপর সবার সামনে তারা ফুটিয়ে তুলবে এবং এই নৈতিকতার প্রভাবে অপরকে বাধ্য করবে এই সুশৃংখল জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে, এই ভাবেই তারা কেন্দ্রীয় উম্মত হওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। বুদ্ধিগত চিন্তাগত, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতি ও অগ্রগতির ফসল তারা বয়ে নিয়ে যাবে দেশ থেকে দেশান্তরে এবং তারাই হবে সর্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানকারী।

কালের আবর্তনে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে, সেখানেও দেখা যায় মুসলিম উম্মত জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে আঁধারের যাত্রীদের পথ দেখাচ্ছে, অর্থাৎ সর্ব যুগেই কোরআনের আলোকে মুসলমানরা মানুষকে পথ দেখিয়ে এসেছে এবং এখনও দেখাচ্ছে। মুসলমানদের এই সর্বগ্রাসী বলয় থেকে বাঁচার জন্যে জ্ঞানপাপীরা মুসলমানদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্যে সদা সর্বদা উদগ্রীব। মহাকালের বাল্যকাল সমাপ্ত হয় নবী (স.)-এর আগমন এর সাথে সাথে। উম্মাতে মুসলিমাহর আগমন কাল থেকে শুরু হয়েছে মানব জাতির যৌবনকাল। তাই উম্মাতে মুসলিমাহর দায়িত্ব এসে পড়েছে শিশুসুলভ ধ্যান ধারণা ও ধারণা অনুমান ভিত্তিক যে সব আবর্জনা সমাজে পুঞ্জীভূত হয়েছিলো সেগুলো থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার এবং তাদেরকে সত্য সঠিক পথের দিশা দিয়ে সত্যের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়ার।

মুসলমানদেরকে দেয়া উম্মাতে ওয়াসাতের এই মহান ও মর্যাদাপূর্ণ উপাধি, এর সঠিক মান রক্ষা করার ব্যাপারে আজ একটি মাত্র বাধা পরিলক্ষিত হচ্ছে, আর তা হচ্ছে, আজ সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ ও কায়েম করার কাজ থেকে সরে

দাঁড়িয়েছে এবং তার পরিবর্তে তারা মানব নির্মিত জীবনের ব্যবস্থা বা আইন কানুনকে গ্রহণ করেছে যা আল্লাহর কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মহান আল্লাহর পছন্দনীয় রংকে বাদ দিয়ে তারা নানা প্রকার রং-এ নিজেদেরকে রঞ্জিত করছে।

আল্লাহর রং এ নিজেদেরকে রঞ্জিত করার মূল কথাটি হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে। অন্য কারো আনুগত্য সেখানে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আনুগত্য হতে হবে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে।

কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে যে কেবলার অনুসরণ করা হচ্ছিলো তার পেছনে কিছু নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে ছিলো যা তোমরা বুঝতে পারোনি। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি এতোদিন যে কেবলার অনুসরণ করছিলে, আমি তার অনুসরণকে এইজন্যে নির্দিষ্ট করেছিলাম যাতে করে আমি জেনে নিতে পারি ওই সকল ব্যক্তিদেরকে, যারা আমার হুকুম পালন করা থেকে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো তাদের মধ্য থেকে কে রসূলের অনুসরণ করে।'

ওপরে বর্ণিত আয়াত থেকে আল্লাহর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ঈমানদার বলে মনযুর করে নিয়েছেন এবং তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব দান করার জন্যে তিনি যাদেরকে পছন্দ করেছেন, তিনি চান যে তারা একমাত্র তাঁরই হয়ে থাকুক। জাহেলিয়াতের যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে ও তার সকল প্রকার আকর্ষণ থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করুক। পুরাতন দিনের জাহেলিয়াতের সকল চিহ্ন ও নিদর্শন এবং তার প্রতি মনের গোপন কোণে প্রতিপালিত মোহাব্বাত বা আকর্ষণ থেকে তারা পুরোপুরিভাবে মুক্ত হয়ে যাক। জাহেলিয়াতের বিজয় পতাকাকে অতীতে যেভাবে তারা উঁচিয়ে রেখেছিলো এবং যেভাবে তার বহু নিদর্শন তাদের জীবনকে রাংগিয়ে রেখেছিলো সে সব কিছুকে ধুয়ে মুছে তারা সম্পূর্ণভাবে পাক সাফ হয়ে যাক। তাদের মন প্রাণ ও অনুভূতির মধ্যে একমাত্র আল্লাহ রসূল ও ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠুক এবং ইসলামের চিহ্নই পরিস্ফূট হয়ে উঠুক তাদের গোটা জীবনে।

৩৬০টি মূর্তি কাবা ঘরের মধ্যে থাকার কারণে সে দিকে মুখ করে নামায পড়ার ব্যাপারে যেহেতু কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিলো এজন্যে প্রথম প্রথম মুসলমানরা বায়তুল মাকদেসকে আল্লাহর নির্দেশে কেবলা বানিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই চাননি যে তাঁর এবাদাতের জন্যে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঘরটি মূর্তি পূজারীদের ঘর হিসেবে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাক। যে ঘরকে আল্লাহর ঘর হিসেবে জানার কারণে পৃথিবীর এই ঘরকেন্দ্রিক একতার সূত্রপাত করেছিলো তারা পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ুক, তাই অনতিকাল পরেই তিনি এই ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ার ঘোষণা দান করলেন। এতে নবীর আনুগত্যের প্রমাণ দিয়ে মুসলমানরা জানিয়ে দিলো যে তারা সর্বাবস্থায় নবীর আনুগত্য করছে ও করবে। এইভাবে তাদের অন্তরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো। যারা নিজ জাতি, গোত্র ও নিজেদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্থানগুলোর ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলো তারাও মনে প্রশান্তি লাভ করলো।

এটা ছিলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা জটিল মোড়। সত্য কথা বলতে কি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে শেরেকের কোনো স্থান থাকতে পারে না। জাহেলী যামানার কোনো রীতিনীতি বা নোংরা জিনিসকে কোনো অবস্থাতেই উম্মাতে মুসলিমাহ মেনে নিতে পারে না, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক। কোরআনে পাকের আয়াত,

তোমরা যে কেবলার ওপর এতোদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারন করেছিলাম যেন আমি জেনে নিতে পারি কে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় আর কে রসূলের আনুগত্য করে।'

কোনো জিনিস বাস্তবে আসার অনেক পূর্ব থেকেই আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে অবগত। কিন্তু অবশ্যই মানুষের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাগুলোকে তিনি দেখে ও জেনে নিতে চান যাতে তিনি তার হিসাব নিতে পারেন। অবশ্য, আল্লাহ তায়ালা, আর এজন্যেই অন্তরের গোপন কন্দরে লুকিয়ে থাকা কোনো জিনিসের হিসাব তিনি নেন না বা পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ না তা বাস্তব কার্যকলাপ আকারে প্রকাশ পেয়ে কারো ক্ষতি বা লোকসানের কারণ হয়।

আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যে অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনো নাপাক বাসনা, শেরেকের প্রতি আকর্ষণ বা তার কোনো চিহ্ন যদি তার কার্যকলাপ বা ব্যবহারে প্রকাশ পায় তা ঝেড়ে মুছে ফেলা এবং তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া কতো কঠিন! এ কাজ তখনই সম্ভব যখন তার অন্তর-প্রাণ ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার ওপর রহমত বর্ষিত হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'অবশ্যই এটা বড়ো কঠিন কাজ। তবে তাদের জন্যে কঠিন নয় যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দিয়েছেন।'

যে আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়াত পায় তার জন্যে কোনো জিনিসই কঠিন থাকে না বা কোনো বাঁধাই তাকে সঠিক পথে চলা থেকে বিরত রাখতে পারে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন সঠিক পথের দিশা কারো কাছে পৌঁছে যায় তখন তার অন্তর-প্রাণ জাহেলিয়াতের যাবতীয় খারাবী থেকে পাক সাফ হয়ে একমাত্র আল্লাহকেন্দ্রিক হয়ে যায় এবং যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো বার্তা পৌঁছে যায় তখন সে নির্দ্বিধায় তা অনুসরণ করতে শুরু করে। তার মুখকে আল্লাহ তায়ালা যে দিকে ঘুরিয়ে দেন সেই দিকেই সে ঘুরে যায় এবং রসূল তাকে যে দিকে নিয়ে যেতে চান সেই দিকেই সে যেতে থাকে।

কেবলা পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা পুনরায় তাদেরকে ঈমান সম্পর্কে সচেতন করছেন এবং সুন্দর সুষ্ঠুভাবে নামায কায়েমের ব্যাপারে হেদায়াত দান করছেন। বলছেন,

'আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে চান না।'

আল্লাহরই দেয়া মানুষের সীমিত শক্তি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই অবগত। কাউকে তিনি তাঁর সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্বভার দেন না। ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে তিনি সত্য সঠিকভাবে পরিচালিত করেন এবং তাদের নিয়ত সঠিক হলে সঠিক পথে চলতে তিনি তাদেরকে সাহায্যও করেন। বান্দাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত কর্মকান্ডের একটি বহিপ্রকাশ এবং তাদের সে পরীক্ষায় পাস করানো এটাও তাঁর দয়া ও স্নেহের নমুনা। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও অত্যন্ত করুণাময়।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি দয়া অনুগ্রহের এই ঘোষণা মানুষের অন্তর-প্রাণকে নিশ্চিন্ততা দান করে, সমস্যার জটিলতা ও অনাগত দিনের বিপদাশংকার বোঝা তার হালকা হয়ে যায়, দিশেহারা অবস্থা কেটে গিয়ে তার দিল হয়ে যায় শান্ত-নির্লিপ্ত এবং এক অনাবিল আস্থা তার মন মগযকে দিয়ে যায় প্রশান্তির দোলা।

কেবলাঃ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক

কেবলা উম্মতে মোহাম্মাদীর ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। বিলম্বে হলেও রসূল (স.)-এর অন্তরের বাসনা অনুযায়ী কেবলা পরিবর্তন করে পবিত্র কাবা ঘরকেই আল্লাহ তায়ালা কেবলা নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছেন এবং সাথে সাথে ঈমানদারদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইহুদীদের নানা প্রকার অপপ্রচার ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে মারাত্মক এক অসৎ উদ্দেশ্য। এই অপপ্রচার ও

ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুসলমানদের কতোটা সজাগ ও সতর্ক হতে হবে সে বিষয়েও তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী, তোমার বারবার আকাশের দিকে তাকানোর ব্যাপারটা আমি (মহান আল্লাহ) লক্ষ্য করেছি, সুতরাং অবশ্যই এমন কেবলার দিকে আমি তোমাকে ঘুরিয়ে দেবো যাকে তুমি পছন্দ করবে। অতএব, তোমার চেহারাকে তুমি মাসজিদে হারাম এর দিকে ফেরাও। আর (হে মোমেন ব্যক্তিরা) যেখানেই তোমরা থাকো না কেন তোমাদের মুখকে এ দিকেই ফিরাবে। অপরদিকে জেনে রেখো, যাদেরকে আসমানী কেতাব দেয়া হয়েছে সেই (ইহুদী) লোকেরা ভাল করেই জানে যে তাদের রব এর পক্ষ থেকে কেবলা পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্তই সঠিক।'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, আয়াতের সূচনাতে এমন বাচনভংগী ব্যবহার করা হয়েছে যার মাধ্যমে নবী (স.)-এর মনের অবস্থাটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কি চমৎকার সে কথাগুলো, 'অবশ্যই আমি লক্ষ্য করেছি আকাশপানে তোমার বারবার তাকানো।' এই বাক্যটির মাধ্যমে জানা যায় যে রসূলুল্লাহ (স.) কতো গভীরভাবে আকাংখা করছিলেন কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ লাভের জন্যে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁর মনে হতো এই বুঝি নির্দেশ এসে যাচ্ছে। কারণ এ বিষয়টি নিয়ে ইহুদীরা নানাপ্রকার কূট তর্ক করতো এবং মাঝে মাঝে সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখাতো। একই কেবলার অনুসরণ করার কারণে জনগণকে প্রতারিত করার এবং তাদের জীবন ব্যবস্থার অনুকরণে মোহাম্মাদ (স.) জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন একথা বলার তাদের যথেষ্ট সুযোগ জুটে গিয়েছিলো। এ কারণেই বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরব ভাষায় তিনি চাইতেন যে এ অবস্থার পরিবর্তন হোক। অবশ্য আদবের তীব্র অনুভূতি তাঁকে মুখ ফুটে কিছু বলা থেকে বরাবরই বিরত রেখেছে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আকাংখা অনুযায়ী কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ পাঠালেন। যে বাচন ভংগীতে এ নির্দেশ এসেছিলো তাতে নবী (স.)-এর প্রতি আল্লাহর মোহাব্বাতের গভীরতা ফুটে উঠেছে। দেখুন বলা হচ্ছে,

'ঠিক আছে, তোমার পছন্দমতো কেবলার দিকেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

এই কথার সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-এর পছন্দনীয় কেবলা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্যে এই পবিত্র ঘর স্থায়ী কেবলা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, (হে মুসলমানরা) যেখানেই তোমরা থাকো না কেন এই দিকেই মুখ ফিরাবে।'

পৃথিবীর সকল স্থান থেকে এই একই দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ পালন করা সবার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। গোটা উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার ও এককেন্দ্রিক করার জন্যে এ ছিলো এক অপরিহার্য ব্যবস্থা। বংশ, বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল বা জন্মভূমির পার্থক্য থাকা সত্তেও এই কেবলাই হয়ে গেলো মুসলমানদের ঐক্যসূত্রে বাঁধার জন্যে এক রক্ষাকবচ। এক কেতাব, এক নবী এবং এক কেতাবের অনুসারী হওয়ার সাথে সাথে এক কেবলার অনুসারী হওয়ার কারণে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণের সকল মুসলমানের জীবন লক্ষ্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার কথা সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলো। এই জীবন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো এর অনুসারীরা এক দেহ ও এক প্রাণের মতো ঐক্যবদ্ধ, এক আল্লাহর অনুগত, এক রসূলের অনুসারী এবং একই কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা উম্মাতে মোহাম্মাদীকে একতাবদ্ধ করেছেন। একই মাবূদ, একই রসূল, একই দ্বীন ও একই কেবলা হওয়ার কারণে এই ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা,

বর্ণ ও রুচির পার্থক্য থাকা সত্তেও এই ঐক্য বর্তমান। এমনকি, পৃথক পৃথক এলাকার অধিবাসী হওয়ায় পৃথক পৃথক রুচিবোধ ও মন মেযাজের পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্তেও এই কেবলা তাদেরকে এক দেহ এক প্রাণের মতো একত্রীভূত করেছে।

প্রতি বছর পৃথিবীর সকল এলাকা থেকে তাওহীদের অনুসারীরা এই ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে এই ঐক্যের প্রমাণ পেশ করে। তারা সমস্বরে বলে উঠে, লাব্বায়ক, লাব্বায়ক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, (হাযির, হাযির, হে আমাদের মালিক, আমরা সবাই তোমার দরবারে এক উম্মত হিসেবে হাযির। অপর দিকে দুনিয়ায় পশুরা ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের চারণভূমি, ঘাসপাতা ও খোয়াড়ের ভিত্তিতে।

আহলে কেতাবদের জঘন্য স্বভাবঃ

এই নতুন কেবলা সম্পর্কে আহলে কেতাবদের কি মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছিলো এবার তা দেখা যাক। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে তাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত এই কেতাবই সঠিক ও নির্ভুল। তারা ভালোভাবেই জানতো যে, মাসজিদুল হারামই আল্লাহর প্রথম ঘর যার ভিত ও দেয়াল তাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মিত। তারা একথাও জানতো যে, মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়াই সঠিক এবং এটা নিসন্দেহে আল্লাহর নির্দেশিত কাজ। কিন্তু তাদের ব্যবহার ও কার্যকলাপ ছিলো তাদের জ্ঞানের বিরোধী। তবে মুসলমানদের জন্যে তাদেরকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের পরিচালক ও সহায়ক। তিনি অবশ্যই ইহুদীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেবেন।'

এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা যা কিছু করছে সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা গাফেল নন।'

যতো যুক্তি প্রমাণই তাদের সামনে পেশ করা হোক না কেন তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়, যেহেতু তাদের কাছেও যুক্তি প্রমাণের অভাব নেই। তাদের কাছে যে জিনিসের অভাব রয়েছে তা হচ্ছে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করে সত্যকে উপলব্ধি করা, তা মেনে নেয়ার সৎ সাহস ও যোগ্যতার। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি যদি আহলে কেতাবদের কাছে সর্বপ্রকার দলীল প্রমাণও পেশ করো তবুও তারা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না। আর তোমার পক্ষেও তাদের কেবলার অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে তাদের অবস্থাও হচ্ছে এই যে তারাও (ইহুদী খৃষ্টান) কেউ কারো কেবলার অনুসরণকারী নয়। এরপর তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও যদি তুমি ওদের কামনা বাসনার অনুসরণ করো তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।'

ইহুদীরা যে বিরোধিতা করতো ও প্রতিহিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো তার কারণ তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বহু ভাল হৃদয়ের লোক আছে, যারা মনে করে যে ইহুদী খৃষ্টানদের ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকার কারণ তাদের অজ্ঞতা বা ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার অভাব, আসলে একথা ঠিক নয়, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেই ইসলাম থেকে তারা দূরে সরে রয়েছে, এটাই আসল কারণ নয়, বরং তারা সম্পূর্ণ জেনে শুনেই ইসলাম থেকে দূরে সরে রয়েছে, যেহেতু ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদের দুনিয়া জোড়া প্রাধান্য ও মোড়লীপানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এই কারণেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চিরদিন নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, আর আজও করছে। হিংসার আগুনে তারা যে জ্বলে পুড়ে মরছে তা কখনও শেষ হবার নয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ কখনও সরাসরি যুদ্ধের আকারে নেমে আসে, আর কখনও পর্দার আড়ালে থেকে তারা এই বৈরীভাব প্রদর্শন করে। তাদের এ চিরাচরিত কূটনীতি অর্থাৎ নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেও মুসলমানদেরকে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমনভাবে লেলিয়ে দেয় যে তারা নিজেরা লড়াই করে নিজেরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আর তখন প্রকারান্তরে তাদেরই উদ্দেশ্য হাসিল হয়। নিম্নের বাণীতে আল্লাহ তায়ালা কেবলা সম্পর্কে তাদের মনোভাব তুলে ধরেছেন, তাদের সামনে কেবলা পরিবর্তনের প্রয়োজন ও এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে সর্বপ্রকার যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরলেও তারা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না।

কেবলা হচ্ছে ইসলামী জনতার ঐক্যের প্রতীক। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এ হচ্ছে একটি অপরিহার্য নিদর্শন। এই কেবলাকে উপেক্ষা করার ব্যাপারে আহলে কেতাবদের যে অনমনীয় দৃষ্টিভংগী রয়েছে তাকে সামনে রেখেই আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে সম্বোধন করে বলছেন,

'আর তুমিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী হতে পারো না।'

তাদের কেবলার অনুসরণ করা তোমার কাজ হতে পারে না। এখানে নেতিবাচক পদ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা নবী (স.) কে তাঁর স্থায়ী দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর এই কথাটি দৃঢ়তার সাথে নবী (স.)-এর মধ্যে বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্যে উপরে বর্ণিত পদের ব্যবহার ছিলো বিশেষ এক বাগ্মিতাপূর্ণ বাচনভংগী।

এ কথার মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহকেও বিশেষভাবে পথনির্দেশ করা হয়েছে, তারাও তাদের রসূলের অনুসরণে অন্য কারো কেবলাকে মেনে নেবে না। অর্থাৎ রসূলের অনুসরণে তারা আল্লাহর যে পতাকাতলে সমবেত হয়েছে তা থেকে তারা কোনো সময়ে যেন দূরে সরে না যায় এবং আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা, যার একটি নিদর্শন হচ্ছে এই কেবলা, তার থেকে যেন কোনো সময়েই দূরে সরে চলে না যায়। দুনিয়ার বুকে মুসলিম উম্মাহ হিসেবে তারা যতোদিন পরিচিত হতে থাকবে ততোদিন তারা যেন অনমনীয়ভাবে এই নীতির ওপর দৃঢ় থাকে। এর ব্যতিক্রম হলে তাদের মুসলমানিত্বের দাবী নিছক মৌখিক দাবী বলেই বিবেচিত হবে।

এই প্রসংগে কোরআন মজীদ আহলে কেতাবদের কেবলা সংক্রান্ত দৃষ্টিভংগী তুলে ধরেছে। কোরআন জানিয়েছে যে, ওরা এ ব্যাপারে কোনো একটি মতের ওপরও টিকে নেই, কারণ তারা প্রবৃত্তির তাড়নে ও স্বার্থের টানাপড়েনে দ্বিধাবিভক্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তারাও পরস্পরের কেবলার অনুসারী নয়।'

আর এটাও অতি সত্য কথা যে, ইহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে, এমনকি শুধু ইহুদীদের মধ্যেও বিভিন্ন উপদল আছে এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যেও নানা প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। খৃষ্টানদের উপদলগুলোর মধ্যেও ভীষণ শত্রুতা বিরাজমান।

কেবলা পরিবর্তন প্রসংগে এই ছিলো ইহুদী খৃষ্টান ও নবী (স.)-এর দৃষ্টিভংগী। আর এ ব্যাপারে ওহীর সত্য সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পর নবী (স.)-এর পক্ষে কারো ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করা সম্ভব ছিলো না। তাই বলা হচ্ছে–

'তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও যদি তুমি ওদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে সতর্ক করতে গিয়ে যে কঠোর বাচন ভংগী ব্যবহার করেছেন, আসুন আমরা সে বিষয়টি একটু ভেবে দেখি। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাবো, কিছুক্ষণ পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে অত্যন্ত স্নেহের সাথে সম্বোধন করার পরই কঠিন

ভাষায় উচ্চারণ করেছেন এই সতর্ক বাণী।এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী (স.)-কে, তাঁর প্রদত্ত হেদায়াতের ওপর দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা এবং কোনো অবস্থায় নমনীয় না হতে দেয়া। এই কঠোরতা অবলম্বনই ছিলো তাঁর দায়িত্ব। অবশ্যই তুমি এটা না করলে যালেমদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

নবী (স.)-এর সামনে পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সরল সোজা। আমাদের সামনে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাই,

এক, আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য সঠিক জ্ঞান।

দুই, কামনা বাসনা বা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অনুসরণ।

মোমেনদের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে সঠিক জ্ঞান লাভ করার আশা করা শোভা পায় না এবং আল্লাহ প্রদত্ত সুনিশ্চিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অনুসরণ বা কারো কামনা বাসনার তাবেদারী করাও বাঞ্ছিত হতে পারে না, আল্লাহর জ্ঞান বহির্ভূত যা কিছু তাই-ই সংশয়ে ভরা, সেখানেই দেখা যায় কোনো ব্যক্তি মানুষের কু-প্রবৃত্তির বাসনা পূরণের ডাক।

অপরদিকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর হেদায়াত চিরন্তন ও চিরস্থায়ী দিক নির্দেশনা। এতদসত্তেও, আমার মনে হয়েছে যে কিছুসংখ্যক মুসলমান ইহুদীদের চক্রান্ত ও প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় এই ধরনের কঠিন সতর্কীকরণ বাণীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো।

কোরআনে কারীম কেতাবধারীদের সত্য গোপন তৎপরতার প্রতি আংগুলি নির্দেশ করে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, কোরআনের বাণী এবং রসূল (স.)-এর নির্দেশই সত্য বলে কেতাবধারীদের জানা থাকা সত্তেও তারা নিছক নিজেদের গুপ্ত ও সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যেই জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করে যাচ্ছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছিলাম তারা তাকে (মোহাম্মদ (স.)-কে) ঠিক তেমনি করে চেনে যেমন করে তারা তাদের ছেলেদেরকে চেনে, কিন্তু তাদের মধ্যকার একটি দল নিসন্দেহে জেনে বুঝেই সত্যকে গোপন করে।'

মানুষ নিজের সন্তানদের সব থেকে বেশী জানে চেনে। জানা ও চেনার জন্যে এই সম্পর্কই সব থেকে বড় উপায়। আরব জাতির ভাষায় সেই নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্যে এই উদাহরণ ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। মহানবী (স.) যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন এবং যে সত্যের মধ্যে কেবলা সম্পর্কিত নির্দেশও ছিলো অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়।

এ সম্পর্কে আহলে কেতাব সেই সন্তানদের মতোই বিশ্বাস রাখতো, তবুও তাদের মধ্যকার একটি দল সে সম্পর্কে, নিছক স্বার্থের কারণেই সন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছিলো। তাই জানানো হচ্ছে যে এ সম্পর্কে মুসলমানদের কোনো ভ্রান্ত প্রচারণায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিৎ নয় এবং চির সত্যবাদী আল আমীন রসূল তাদের কাছে যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা নিশ্চিতভাবে জানা সত্তেও সেই সত্য গোপনকারী আহলে কেতাবদের কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বা তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা কোনোভাবেই সমীচীন হতে পারে না। কেতাবধারীদের অবস্থার বর্ণনা শেষে নবী (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'এটা তোমার পাওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে আসা সত্য সঠিক বিষয়, তুমি সন্দেহবাদীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেও না।'

প্রকৃতপক্ষে, নবী (স.) তাঁর কাছে অবতীর্ণ কোনো কথার সত্যতা সম্পর্কে কোনোদিন সন্দিহান ছিলেন না। তবুও তাঁর রব যখন তাঁকে সম্বোধন করে কালামে পাকে অন্যত্র বললেন,

'আর আমার কাছ থেকে অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে তুমি কোনো সন্দেহের মধ্যে যদি থেকে থাকো তাহলে তোমার পূর্বেকার যে সকল কেতাবধারী এখনও সে কেতাব পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো' তখন তিনি বলে ছিলেন 'না, আমার বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই, আর কোনো আহলে কেতাবকে আমি কোনো বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করবো না।'

এতদসত্ত্বেও, রসূল (স.)-কে এইভাবে সম্বোধন করে, প্রকারান্তরে তাঁর অনুসারী মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব ব্যক্তি ইহুদী চক্রান্তে পতিত মুসলমানই হোক, অথবা পরবর্তীকালের ইহুদী ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের প্রভাবে পড়ে বিভ্রান্ত লোকজনই হোক।

দ্বীনের যথার্থতা প্রমাণে অমুসলিমদের সনদ

আজকের দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে এ সতর্কবাণীর বড় প্রয়োজন, আজ মুসলমানেরা নিজেদেরকে এতোদূর দেউলিয়া মনে করতে শুরু করেছে যে নিজেদের দ্বীনের যথার্থতা যাঁচাইয়ের জন্যে ইহুদী খৃষ্টান ও অনেক সময় নাস্তিকদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার আশা পোষণ করে। ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করার জন্যে আজ আমরা তাদের কাছে যাচ্ছি। ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলমানদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী কে হতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আজ আমরা তাদের বক্তব্যের দিকে তাকাচ্ছি।

এমনকি আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষুরধার লেখনী ও সুচতুর বক্তব্যের মাধ্যমে কোরআন, হাদীস ও আমাদের ইতিহাসের ওপর যে হামলা তারা চালিয়েছে সেগুলোকে আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ছি ও শুনছি এবং অনেক সময় তা গ্রহণও করছি। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্যে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা তাদের কাছেই পাঠাচ্ছি এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বিভ্রান্তিমূলক যে জ্ঞান নিয়ে তারা ফিরে আসছে তার প্রভাবে পড়ে আমরা নানা সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত হচ্ছি।

কেন আমরা ভুলে যাই যে, এই কোরআনই হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো অপরিবর্তিত কেতাব, এর উত্তরাধিকারী একমাত্র মোমেনরাই, এর ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার মোমেনদেরই। অন্য কারো ব্যাখ্যা অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যেহেতু এর বক্তব্যের সাথে তাদের হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, নেই প্রাণের কোনো সংযোগ, তারা এর বক্তব্যের সাথে মনে প্রাণে ভিন্নমুখী, এর প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকতে ও মানুষকে এর সংস্পর্শ থেকে দূরে ঠেলে দিতে তারা দিবারাত্র চিন্তা করছে। অতএব, এ কেতাব সম্পর্কিত তাদের যাবতীয় বক্তব্য ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। আহলে কেতাব তো কেতাবের অধিকারী হলেও কোরআনকে মনে প্রাণে গ্রহণ না করায় অস্বীকারকারী কাফের। আর দ্বীনে হক যা বিধৃত হয়েছে অপরিবর্তিত কেতাব কোরআনে কারীমেই। সুতরাং ওই অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা যারা মুসলমানদেরকে খুশী করে তাদের ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে সদা সর্বদা পরিকল্পনা তৈরী করে চলেছে, তাদের বক্তব্য কোনোক্রমেই শোনা অথবা গ্রহণ করা চলে না।

তাই, আমরা দেখতে পাই, কোরআনে কারীম আহলে কেতাবদের কথায় কান দিতে এবং তাদের কথার কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করতেও স্পষ্টভাবে আমাদেরকে নিষেধ করেছে। দরদী সেজে তারা মুসলমানদেরকে উপদেশ দিতে আসে এবং বিভ্রান্তিকর কথা বলে মোমেনদের ঈমানকে নড়বড়ে করা ও নবী (স.)-এর প্রতি অশ্রদ্ধাশীল করে তোলাই তাদের দিবারাতের সাধনা। আর এজন্যে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাটিকে তারা খুবই গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে, অথচ মুসলমানদের স্পষ্টভাবে জেনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক জাতির জন্যে অবশ্যই নিজস্ব কেবলা আছে যা অপরের থেকে অবশ্যই ভিন্ন। এ কেবলা নিজ অনুসারীদের সৎ কাজে প্রতিযোগিতা

করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এ পথের যাবতীয় বাধা দূর করে। আল্লাহর নির্ধারিত কেবলার অনুসারীরা যেন তাঁর কাছে জবাবদিহীর উদ্দেশ্যেই তাঁর অমোঘ বাণীর ডাকে সাড়া দেয়, যেহেতু তিনি শাস্তি অথবা পুরস্কার দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এরশাদ হচ্ছে,

'প্রত্যেক (উম্মত)-এর একটি কেবলা আছে যার দিকে সে মুখ করে। অতএব, তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকো না কেনো। সেখান থেকেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে (ধরে) নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।'

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন যেন তারা আহলে কেতাবদের ছড়ানো বিভ্রান্তিকর কথা ও বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে, গ্রহণ না করে তাদের কোনো ব্যখ্যা বিশ্লেষণকে এবং তাদের কোনো মিথ্যা রটনায় কান না দেয়। অপর দিকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে আহবান জানাচ্ছেন, তারা যেন ওই নিরর্থক কথা পরিত্যাগ করে মানুষের জন্যে কল্যাণকর কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে এবং এইসব বিষয়েই প্রতিযোগিতা করে, সাথে সাথে তাদেরকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর কাছেই অবশেষে সবাইকে ফিরে যেতে হবে, যেখানে মর্যাদা হবে সৎ ও কল্যাণকর কাজের আর সেখানে ওই ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী আহলে কেতাবদের মিথ্যা ও অপপ্রচারের কোনো গুরুত্ব থাকবে না।

কেবলা প্রসংগে আরো কিছু কথা

কোরআনে কারীম আল্লাহর পছন্দনীয় কেবলার ব্যাপারে পুনরায় তাকীদ দিতে গিয়ে কিছু নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'(নামাযের উদ্দেশ্যে) যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, মাসজিদে হারামের দিকেই মুখ ফিরাও। এটাই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সঠিক দিক। আর তোমরা যা কিছু করছো সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা গাফেল নন।'

এ আয়াতটিতে আহলে কেতাবদেরকে কিছু বলা হয়নি, বরং নবী (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে তিনি যেখানেই থাকেন না কেন এবং যেখানেই যান না কেন মাসজিদে হারামের দিকেই যেন মুখ ফেরান। জোর দিয়ে জানানো হয়েছে, এটা আল্লাহর হুকুম। আরও জোর দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের কোনো কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অনবগত নন।

এ বাক্য থেকে একথা ইংগীতে বুঝা যায় যে, কিছুসংখ্যক মুসলমানের মনের অবস্থা ওই সময়ে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা ওই সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন বোধ করেছেন।

পুনরায় আরো একবার কাবার দিকে মুখ ফেরানোর জন্যে কোরআনে কারীমে নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এ নির্দেশের মধ্যে আর একটি উদ্দেশ্যও বুঝা যায়। আর তা হচ্ছে আহ্‌লে কেতাবদের মধ্য থেকে যেসব লোক মুসলমানদেরকে বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখতো এবং নবী (স.)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থার ওপর নিজেদের ধর্মের প্রাধান্য প্রচার করে বেড়াতো এই আয়াতে সেই সকল লোকের সমস্ত যুক্তিকে খন্ডন করা হয়েছে। এইভাবে যে সকল মোশরেকের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্যে বায়তুল মাকদেসকে কেবলা বানানের ব্যাপারটি হাতিয়ার হিসেবে এসে গিয়েছিলো। আলোচ্য আয়াতে মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করার নির্দেশে তাও নস্যাৎ হয়ে গেলো, দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

'যেখান থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে মাসজিদে হারামের দিকেই মুখ ফিরাবে, আর তোমরা তোমাদের মুখকে সেই দিকেই ফিরাবে যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করার জন্যে

মানুষের কাছে কোনো যুক্তি না থাকে। তবে যারা যালেম ও হঠকারী তাদের কথা ভিন্ন। (তারা তো শত্রুতার উদ্দেশ্যেই শত্রুতা করে, সুতরাং কোনো যুক্তি-প্রমাণের ধারই তারা ধারে না)। তাদের মুখ বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। তারা জিদের বশবর্তী হয়ে নানাপ্রকার বাড়াবাড়ি করতে থাকে।'

তাদেরকে শুধরানো বা জোর করে সুপথে আনার দায়িত্ব মুসলমানদের নয়, তাদেরকে ভয় করার কোনো প্রয়োজনও মুসলমানদের নেই। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'অতএব তোমরা ওদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।'

ওরা ইচ্ছা করলেই তোমাদেরকে বশীভূত করতে পারবে না। কোনো জিনিসের জন্যেই তাদের কাছে তোমরা ঠেকা নও বা তোমাদের কোনো জিনিস তাদের হাতে বন্ধক (হিসেবেও) নেই যে তারা তা বাজেয়াপ্ত করে দিতে পারবে। তাদেরকে কোনো বিষয়েই তোমরা গুরুত্ব দিয়ো না, তাহলে সত্য পথ থেকে তোমরা দূরে সরে যাবে। একমাত্র আমাকেই ভয় করো। তোমাদের ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিষয় আমারই হাতে। এইভাবে যালেমদের সকল তৎপরতাকে মূল্যহীন ঘোষণা করার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের নেয়ামতের কথা জানাচ্ছেন এবং আশার বাণী শুনিয়ে বলছেন যে মুসলমানরা যদি তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাদেরকে তিনি নিজের নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে দান করবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যাতে করে আমার নেয়ামত তোমাদের ওপর আমি পূর্ণ করে দেই এবং তাহলেই হয়তো তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।'

মুসলমানদের উজ্জীবীত করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে এই স্মরণিকা। শোনানো হয়েছে তাদেরকে আশার বাণী যাতে হতাশার আবর্জনা ঝেড়ে মুছে ফেলে তারা সামনে অগ্রসর হতে পারে এবং আল্লাহর মহান অনুগ্রহ লাভ করার পর তাদেরকে আরও দেয়া হয়েছে অধিকতর অনুগ্রহ দানের ইংগীত। যে নেয়ামতের আশ্বাস তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো তা তাদের সামনেই বিদ্যমান, নিজেদের অন্তরের গভীরে তা তারা অনুভব করছিলো, দেখছিলো যে নেয়ামতের চিহ্ন তাদের জীবনের সন্ধান পাচ্ছিলো সে নেয়ামতের দৃশ্য নিজেদের ভূখন্ডে, সমাজ জীবনে, প্রতিটি অবস্থানক্ষেত্রে এবং পৃথিবীর সর্বত্র।

কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলো তারা তো ছিলো সেই সকল ব্যক্তি যারা নবী (স.)-এর পূর্বে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো এবং অসৎ ও নোংরা জীবন যাপন করছিলো। তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা রহম করেছেন তারা ঈমানের সমুজ্জ্বল বাতির আভায় উদ্দীপিত হয়েছে এবং আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ও মাগফেরাত লাভে ধন্য হয়েছে অন্তরের গভীরে অনুভব করেছে তারা তাঁর নেয়ামতের মধুর স্পর্শ।

ঈমানের সুদৃঢ় রশিতে আবদ্ধ আজকের এই মোমেন দল, অজ্ঞানের অমানিশায় যাদের জীবন ছিলো মুহ্যমান, যারা যুগের পর যুগ পরস্পরের সাথে ছিলো যুদ্ধে লিপ্ত, যারা অতি সামান্য স্বার্থের কারণে হয়ে উঠতো পরস্পরের ওপর মারমুখী তারাই ঈমানের মধুর স্পর্শে এবং রসূল (স.)-এর সাহচর্যে এসে সোনার মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তারা শক্তি ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ করেনি, যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর অনুগত বানানোর লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিলো তাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা। এই মহত্ব ও মহানত্ব ছিলো এমন এক অপরূপ নেয়ামত যা তারা তাদের অন্তরের গভীরে অনুভব করতো।

তারা ছিলো সেইসব লোক যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে পতিত নিকৃষ্টতম সমাজে বাস করতো। তাদের ধ্যান-ধারণা ছিলো জঘন্য ও সংকীর্ণ এবং তাদের মূল্যবোধ ছিলো অত্যন্ত ঘৃণ্য। এহেন অধপতিত মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ফিরে পেলো জীবনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী, তাদের আকীদা বিশ্বাস হয়ে গেলো সুস্পষ্ট এবং ফিরে এলো তারা পবিত্র ও উন্নত মানবকল্যাণমুখী সমাজে। গড়ে উঠলো তাদের জীবনের নতুন মূল্যবোধ এবং জেগে উঠলো তাদের মধ্যে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের সঠিক ও নিখুঁত মাপকাঠি। ইসলাম গ্রহণ করার পর হিংস্র গোত্রসমূহ ইসলাম-রূপ নেয়ামতের স্বাদ সেইভাবে উপলব্ধি করলো যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা উপলব্ধি করেছিলো। যখন তাদের কাছে নাযিল হলো আল্লাহর মহান বাণী,

'যেহেতু আমি চাই আমার নেয়ামতকে তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে।'

তখন তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠলো একথা ভেবে যে, আল্লাহর নেয়ামত বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে তাদের জীবনকে অচিরেই আপ্লুত করবে। তাই আশায় ভরে উঠলো তাদের মন মগয।

নতুন কেবলা সম্পর্কে নির্দেশের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কয়েকবার এবং প্রতিবারের নির্দেশে কিছু নতুন তাৎপর্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। রসূল (স.)-এর বারবার আকাশের দিকে তাকানো এবং তাঁর নীরব প্রার্থনার জবাবে আসে প্রথম বারের নির্দেশ। তাঁর আকাংখা ও তার জবাবে আল্লাহর নির্দেশ যে যথার্থ তা নিরূপণ করতে গিয়ে এসেছে দ্বিতীয়বারের নির্দেশ। আর তৃতীয়বারের নির্দেশ এসেছে পরিপূর্ণভাবে মানুষকে বুঝানোর জন্যে যে এই নির্দেশই সঠিক, এর বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার চালিয়েছে তাদের ব্যর্থ চেষ্টা তাদের বুদ্ধিহীনতা ও হঠকারী মনোভাবের প্রমাণ পেশ করেছে।

এই একই প্রকারের নির্দেশের পুনরুক্তিতে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে তৎকালীন ইসলামী সমাজের যে অবস্থা তখন বিরাজ করছিলো তাতে এই পুনরুক্তি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বাস্তবিকই প্রয়োজন ছিলো। কুচক্রী এক দল লোকের অপ্রচারের ফলে কিছুসংখ্যক লোকের ওপর এর প্রভাব পড়া ও তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণেই তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াতটি এই পর্যায়ে নাযিল হয়েছিলো। ভবিষ্যতেও অনুরূপ পর্যায়ের উদ্ভব হলে উক্ত আয়াতটি ওই পরিস্থিতিতে সমভাবে প্রজোয্য হবে, কারণ সত্যকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে বাতিল ব্যবস্থা সদা সর্বদা খড়গহস্ত। সত্য-মিথ্যার এ সংঘর্ষ চিরন্তন।

নবুওত প্রসংগ

নবুওতে মোহাম্মাদী যে মুসলমানদের জন্যে সব থেকে বড় নেয়ামত এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সেই রসূল যাঁর জন্যে কাবা ঘরের নির্মাতা ও মোতাওয়াল্লী এবং নবী (স.)-এর পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) খাসভাবে দোয়া করেছিলেন। এখানে তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে সেই কথাটিকে আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রকাশ করেছেন,

'যেমন করে আমি পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল, যে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় (তার আলোকে) তোমাদেরকে কলুষতামুক্ত করে এবং শেখায় তোমাদেরকে মহান কেতাব আলকোরআন ও নানাপ্রকার বুদ্ধিমত্তার কথা আরও শেখায় তোমাদেরকে এমন জ্ঞানের কথা যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।'

এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে, উপরের আয়াতটিতে ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যবহার করা দোয়ার শব্দগুলোই যেন ব্যবহার করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে ইবরাহীম (আ.)-এর মোনাজাতে অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি পিতাপুত্র মিলে কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে মোনাজাত করতে গিয়ে অনুরূপ শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করেছিলেন। ইবরাহীম (আ.) তাঁর দোয়ায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর কাছে আকুতি পেশ করেছিলেন, যেন তাঁদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ করা হয় যিনি তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, সে কেতাব থেকে তাদেরকে তিনি শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত করবেন।

ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়ার অবিকল কথাগুলোই এখানে তিনি সম্ভবত এজন্যে পেশ করেছিলেন যেন অনাগত দিনের মুসলমানরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে তাদের মধ্যেই মোহাম্মাদ (স.)-এর আবির্ভাব এবং তাদের মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন অবশ্যই ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার প্রত্যক্ষ ফল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আর একটি কথার ইংগীতও এখানে পাওয়া যায় যে কেবলা সংক্রান্ত বিষয়টি ইসলামের অনুসারীদের কাছে কোনো নতুন ও অভিনব বিষয় নয়, এ ঘর হচ্ছে আরববাসী সবারই এবং কেতাবধারী অন্য সবারও পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর হাতে নির্মিত।

সুতরাং এ কেবলা সাময়িক নয়। এ কেবলা তাদের সবার পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা ছিলো এবং মুসলমানদের মনে রাখা দরকার যে তাদের ওপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে নেয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেছেন তা হচ্ছে সেই নেয়ামত যার অংগীকার তিনি করেছিলেন তাঁর ঐকান্তিক বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে।

মুসলমানদের নিজ কেবলার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আল্লাহর নির্দেশ ও অন্যান্য সকল জাতি থেকে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য থাকা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়া এদু'টি নেয়ামত তাদেরকে দেয়া অন্যান্য নেয়ামতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলেও দুটি স্থান যেন সবার উপরে। অবশ্য, নিশ্চিত একথা সত্য যে এগুলোর পূর্বে তাদের মধ্য থেকেই মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে পাঠিয়ে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা গৌরবান্বিত করেছেন এবং তা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এরশাদ হচ্ছে,

'এইভাবেই আমি (মহান আল্লাহ) পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল, যে তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো পড়ে শুনায় আর তোমাদেরকে কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র করার কাজ করে এবং শেখায় তোমাদেরকে আল কেতাব (কোরআনে কারীম) ও বিজ্ঞানময় কথা, আরও শেখায় তোমাদেরকে এমন জ্ঞান যা তোমরা (আগে) জানতে না।'

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তৎকালীন আরবের মুসলমানদেরকে জানাতে চেয়েছেন যে তাদের নিজেদের স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তিকে শেষ নবী ও রসূল মনোনীত করে প্রকারান্তরে তাদেরকেও তিনি সম্মানিত করেছেন। অবশ্যই তাদের জন্যে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহও বটে। রেসালাত-রূপ মহান নেয়ামত তাদের মধ্যে রাখা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসূল তাদের মধ্য থেকে হওয়া অবশ্যই সব থেকে বড় নেয়ামত।

অথচ, তাঁর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা জানতো যে শেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমন আসন্ন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করতো যে তিনি অবশ্যই তাদের, থেকেই আসবেন। তাই গর্ব ভরে তারা বলতো যে তাঁর ওসিলায় তারা মদীনা তথা-আরববাসীর ওপর বিজয়ী হবে, কিন্তু তারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যিম্মাদারী সঠিকভাবে পালন না করায় ওই নেয়ামত থেকে মাহরুম হয়ে গেলো।

এরশাদ হচ্ছে, 'সে আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনায়' অর্থাৎ (আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন) রসূল যা কিছু শুনাচ্ছে তা তাঁর নিজের কথা নয়, তা আল্লাহর আয়াত, অতএব তা সর্বোচ্চ ও মহা সত্য।

এ বাক্যটিতে একটি বিশেষ ইংগীতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব জানাচ্ছেন (যা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি) আর তা হচ্ছে, রসূল (স.)-এর জবানীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে নিজেই সম্বোধন করেছেন, তাই তো রসূল (স.) তাঁর কথাগুলোকেই (অবিকল তাঁরই ভাষায়) তাঁর বান্দাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এই কথারই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি পড়ে শুনান তাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলোকে।

এ আয়াতটির উপরে গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলে অন্তরাত্মায় কম্পন ধরে যায়। কারা সেইসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন, কোন সে ভাগ্যবান জাতি বা জনপদ যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা নিজে বাক্য বিনিময় করেছেন, পেশ করেছেন সরাসরিভাবে তাদের কাছে নিজের মধুর কথাগুলো। কতো উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সেই ব্যক্তিবর্গ যাদের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথাগুলোর ওপর চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছেন। কিইবা তাদের অস্তিত্ব ছিলো যদি তিনি তাদের কাছে এ কালাম না পাঠাতেন এবং এর ওসিলায় তাদের ওপর তাঁর দয়া অনুগ্রহের ধারা বৃষ্টির মতো না ঝরাতেন।

প্রকৃত সত্য তো এটাই যে, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ রব্বুল ইযযত বাবা আদমের মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়ে গোটা মানব মন্ডলীকে ধন্য হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, রেখে দিয়েছেন সেই সম্ভাবনার দ্বার চিরদিনের জন্যে উন্মুক্ত যাতে করে আল্লাহর আকাংখী মানুষেরা তাঁর এই মহাদানের অধিকারী হতে পারে, ধন্য হতে পারে তারা রহমানুর রহীমের করুণারাশির ঝর্ণাধারাতে। ইসলাম কি চায়, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আসছে আল্লাহর মহিমান্বিত বাণী,

'আর সে তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, অপবিত্রতা, খারাবী ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে।'

অবশ্য অবশ্যই একথা সত্য যে আল্লাহর মেহেরবানী না থাকলে কারো পক্ষেই, এই পাপ পঙ্কিল সমাজে শয়তানের সাথে দিবানিশি সংগ্রাম করে পাক পবিত্র থাকা সম্ভব হতো না, দূরে থাকতে পারতো না কেউ কু-প্রবৃত্তির হাতছানি থেকে। কতো আদর করে, কতো মেহেরবানী করে তিনি তাঁর আগ্রহী বান্দাদেরকে তাঁর প্রেরিত রসূলের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছেন, রক্ষা করেছেন তাদেরকে অন্যায় অপকর্ম থেকে, পরিচ্ছন্ন রেখেছেন তাদেরকে যুলুম অবিচার থেকে, মুক্ত রেখেছেন তাদেরকে শেরেক বেদয়াতের আবর্জনা ও হঠকারিতার চিন্তাধারা থেকে, প্রদমিত করেছেন তাদের লোভ লালসা ও অশালীন ভাবের আবেগকে এবং উদ্ধার করেছেন তাদেরকে নানা প্রকার ক্লেদাক্ত সামাজিক ব্যধি থেকে।

একবার তাকিয়ে দেখুন ওই ইসলামের গন্ডীর বাহিরের ওই সমাজ ও সামাজিক অবস্থার দিকে, কি নিদারুণ জ্বালায় তারা জর্জরিত প্রাচীন ও বর্তমান পৃথিবীর আনাচে কানাচে, আল্লাহর রসূলের বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে, লাগাম ছেড়ে লোভ লালসার ও বিকৃত আবেগের পাঁকে পড়ে কী বিষাক্ত হয়েছে তাদের জীবন। যাদেরকে বানিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত তারা অত্যাচার অনাচারে হীন থেকে হীনতর নীচ থেকে নীচুতর ও হিংস্র থেকে হিংস্র পশু থেকেও নীচু স্তরে নিজের মর্যাদাকে নামিয়ে দিয়েছে। গোটা মানব জাতির জন্যে তারা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ঈমান থেকে মাহরূম হয়ে যায় যে হতভাগারা তাদের নীচুতার কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না, এহেন কাজ নেই যে তারা করতে পারে না।

ইসলাম মানব জাতিকে সূদ, ঘুষ, অবৈধ লেনদেন, প্রতারণা, ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র রাখে। সমাজ জীবনের জন্যে এগুলো এমন জঘন্য ব্যাধি যা তাদের আত্মা ও অনুভূতিকে সংকীর্ণতার জালে ফাঁসিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, ইসলাম মানুষের জীবনকে অন্যায় অত্যাচার, বিদ্রোহ ও সর্বপ্রকার হঠকারিতা থেকে পবিত্র রাখে, এবং সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলাম মানুষকে সেইসব সংকীর্ণতা ও নোংরামী থেকে রক্ষা করে যার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে আছে আল্লাহবিমুখ সব শ্রেণীর লোক। চেয়ে দেখুন, একবার উন্নতির দাবীদার তথা জাহেলিয়াতের ধ্বজাদারীদের দিকে যারা ইসলামের সমুজ্জল বাতি থেকে দূরে সরে গেছে । এরশাদ হচ্ছে,

'এবং শিক্ষা দেয় সে তোমাদেরকে কেতাব ও বিজ্ঞানময় কথা।'

ইতিপূর্বে বর্ণিত 'আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে' দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, কেতাব শিক্ষা দানের কাজের মধ্যে আয়াতসমূহ তেলাওয়াত, শুধু অন্তর্ভুক্তই নয়, তাই হবে সবার আগে।

কারণ আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের প্রথম কথাই হচ্ছে 'তিনি তেলাওয়াত করে তাদেরকে শোনান। 'আল কেতাব' বলতে সম্পূর্ণ কেতাব আল কোরআনকেই বুঝানো হয়েছে এবং এ কেতাবের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এটাই হচ্ছে হেকমত এবং এই কেতাব শিক্ষার যে ফল পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় হেকমত প্রাপ্তি। এই হেকমত প্রাপ্তির ফলে অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জিত হয়, এর দ্বারা সব কিছুকে নিজের সঠিক স্থানে স্থাপন করার যোগ্যতা গড়ে ওঠে এবং সকল উপদেশের লক্ষ্য অর্জিত হয়। যাদেরকে রসূল (স.) নিজ হাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাদের মধ্যেই এই হেকমতের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে,

'এবং এ কোরআন শেখায় তোমাদেরকে সেইসব জিনিস যা তোমরা জানতে না।'

অর্থাৎ মুসলিম সমাজ কোরআনের আলোকে সামগ্রিকভাবে এমন বহু কিছু শিখেছে যা তারা ইতিপূর্বে জানতো না। মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম মরু-আরবের সেই অজ্ঞানান্ধকার থেকে তুলে কোরআনের জ্ঞান সমৃদ্ধ পথে নিয়ে এসেছিলো যার মধ্যে তারা বহু শতাব্দী ধরে ধুঁকে ধুঁকে মরছিলো। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে তাদের কারো মধ্যে কিছু জ্ঞানর্চচা ছিলো, কিন্তু প্রধানত মরুভূমির অভ্যন্তরে অথবা পাহাড়ের পাদদেশে তারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতো। এহেন সমাজ থেকে তুলে এনে ইসলাম তাদেরকে এমন সুসভ্য জাতিতে পরিণত করলো যারা জ্ঞান-গরিমায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিমত্তা ও উন্নতমানের সর্বপ্রকার গুণাবলীতে সুসমৃদ্ধ বলে অচিরেই সারা জগতে পরিচিত হলো এবং তারা সারাজগতের নেতৃত্ব ও শিক্ষার গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত হলো।

তাদের নেতৃত্ব ছিলো সর্ব প্রকার জ্ঞান সমৃদ্ধ, দূর দৃষ্টিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, এই কোরআনই ছিলো তাদের জ্ঞানের সর্বপ্রধান উৎস। কোরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা ও রসূল (স.)-এর যেন্দেগী ছিলো তাদের জ্ঞান হাসিলের দ্বিতীয় উৎস। আর মাসজিদে নববী ছিলো সেই বিশ্ব বিদ্যালয় যেখানে দিবারাত্র কোরআন পাঠ, কোরআন চর্চা ও কোরআনের মাধ্যমে উৎসারিত নবী (স.)-এর বাস্তব জীবনের কর্মধারা অনুশীলন করা হতো। যেখান থেকে দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতার সনদপত্র বিতরণ করা হতো। এই মহা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই তো সারা পৃথিবীতে গোটা মানব জাতির ওপর পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এতো নিপুণ ও ইনসাফপূর্ণ ছিলো তাদের নেতৃত্ব যার নযির পৃথিবীর ইতিহাসে না কখনও ছিলো আর না ভবিষ্যতে আবার কখনও হবে।

যেহেতু জ্ঞানের সেই মূল উৎস কোরআনে কারীম আজও অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান এবং কোরআনের ব্যাখ্যা সুন্নতে রসূল সহীহ হাদীসসমূহে সংরক্ষিত, সুতরাং আজও আগ্রহী ও উৎসর্গিত একদল কর্মী যদি নবী (স.)-এর পরিচালিত কর্মীদের মতো আদর্শবান হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করতে পারে এবং সঠিক নেতৃত্ব দান করার মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তাহলে সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে হলেও আজও অতীতের সেই স্বর্ণযুগের সাক্ষাত মানুষ পেতে পারে। এসব কিছুর জন্যে প্রধান শর্ত হচ্ছে মানুষকে সরাসরি সেই মূল উৎস, কোরআনের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং কোরআন অধ্যয়ন ও তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বত্র সেই আদর্শ কায়েমে ব্রতী হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে স্মরণ করেন

পরিশেষে আল্লাহর মেহেরবানী লাভের জন্যে তিনি বান্দাদের আর একটি জরুরী কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আর তা হচ্ছে সব কিছুর মালিক আল্লাহর প্রতি সদা সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে অপরকেও আহবান জানানো এবং তাদেরকে সতর্ক করা যেন কোনো সময় তারা কৃতঘ্ন না হয়ে যায়। তাহলেই তিনি তাঁর মেহেরবানী সহ তাদেরকে স্মরণ করবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো এবং আমার শোকর গোযারি করো আর খবরদার আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'

দেখুন, কতো মহান আমাদের মালিক এবং কতো দরদ-ভরা তাঁর অনুগ্রহের ডাক। এই ক্ষুদ্র ও নশ্বর পৃথিবীর বুকে ক্ষণস্থায়ী জীবন যাপনকালে মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন, বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালাও তাঁর সুবিশাল জগতের অনন্ত অসীম কালে তাদেরকে স্মরণ করতে থাকবেন তিনি যেমন সীমাহীন, তেমনি তাঁর স্মরণ রাখার ওয়াদাও কোনো সীমার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। চিন্তা করে দেখুন, এই নশ্বর পৃথিবীর বুকে স্বল্পকালীন সময়ের স্মরণের বিনিময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কতো সুমধুর এই ওয়াদা। কতো বেশী ভালোবাসেন তিনি তাঁর বান্দাদেরকে, কতো উদার কতো ব্যাপক, কতো বিস্তৃত, কতো হৃদয়গ্রাহী তাঁর এ সুমহান বাণী।

'অতএব, তোমরা আমায় স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।'

এ কথা দ্বারা তাঁর ওয়াদার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

এরূপ দয়া অনুগ্রহ দান করা একমাত্র মহামহিমাময় আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব, যেহেতু তাঁর দানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার বা তাকে সীমিত করার মতো কেউ নেই, নেই তার কাছ থেকে হিসাব নেয়ার মতো কোনো ব্যক্তি। তিনিই অপার অনুগ্রহকারী ও দানকারী। সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়,

'যে ব্যক্তি আমাকে তার নিজ মনের মধ্যে আমিও স্মরণ করি তাকে নিজ মনে স্মরণ করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে কোনো জনসমাবেশে স্মরণ করে । আমিও তাকে এমন সমাবেশে স্মরণ করি যা ওই সমাবেশ থেকে উত্তম।' (বোখারী)

অপর আর একটি হাদীসের ভাষায় জানা যায়,

'আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি স্মরণ করো আমাকে তোমার মনের মধ্যে, আমিও স্মরণ করবো তোমাকে নিজ মনের মধ্যে, আর যদি তুমি কোনো জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমিও তোমাকে স্মরণ করবো আমার ফেরেশতাদের এক বিপুল সমাবেশে, অথবা নবী (স.) বলেছেন, (স্মরণ করবো তোমাদেরকে এমন একটি সমাবেশে যা ওদের সমাবেশ থেকে অনেক ভাল। আর যদি তুমি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসো আমি তোমার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। তুমি যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসো– আমি

তোমার দিকে এক বাহু এগিয়ে যাই, তুমি যদি আমার দিকে হেটে আসো আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাই'। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী।)

বান্দার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ওয়াদা যে কতো বড় মেহেরবানী তা প্রকাশের মতো কোনো ভাষা নেই। একমাত্র সেজদায় পড়ে যাওয়া ছাড়া বান্দার পক্ষ থেকে শোকর গোযারির আর কোনো উত্তম উপায় নেই।

শুধু মুখের কথা দ্বারাই আল্লাহর স্মরণ হয় না, প্রকৃতপক্ষে স্মরণের কাজ হচ্ছে অন্তরের। অন্তরের মধ্যে স্মরণ হলেই মুখে তা উচ্চারিত হয় আর তখন তা যেকের বলে মানুষ বুঝতে পারে। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে কথাটা এইভাবে বলা যায় যে আল্লাহর যেকের (স্মরণ) যখন মনের মধ্যে জাগে তখন তাঁর সত্ত্বা, তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও তাঁর ইচ্ছা কার্যকরী করার সীমাহীন ইখতিয়ার সম্পর্কে মনের মধ্যে এক ব্যাপক ধারণা সৃষ্টি হয়, আর এর ফলেই তাঁর প্রতি ভয় ও ভক্তিতে মাথা নুয়ে পড়ে, মনে পড়ে তাঁর হুকুম যথাযথভাবে পালন না করা সত্তেও বান্দার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহের কথা, যার ফলে কৃতজ্ঞতায় মন ঝুঁকে পড়ায় সে তৎক্ষণাৎ তাঁর দরবারে মিনতি জানায়। আর তখন কৃতজ্ঞতা ভরা অন্তর নিয়েই মানুষ খুশীমনে তাঁর আনুগত্য করতে থাকে।

আল্লাহর শোকরের সঠিক ধারনা

এরশাদ হচ্ছে–

'এবং আমার শোকর আদায় করো, নাফরমানী করো না।"

এ পর্যায়ে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, অকৃতজ্ঞ হলে, আল্লাহর শোক্‌র আদায়ে অবহেলা বা উদাসীনতা প্রকাশ করলে তার পরিণতি কতো ভয়ংকর হতে পারে তাও এ আয়াতে জানানো হয়েছে এবং সে অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার কাছে এতোটুকু চান যে সে প্রথমে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করুক এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করুক এবং পরিশেষে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার দেহমন ঝুঁকে পড়ুক, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন, মুখের প্রতিটি কথা এবং অন্তরের প্রতিটি খেয়াল দ্বারা সে আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করার প্রমাণ পেশ করুক।

অপরদিকে তাঁকে ভুলে থাকা ও তাঁর প্রতি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করার নামই হচ্ছে কুফুর, যা মানুষকে ধ্বংসের অতল তলে ডুবিয়ে দেয়। কেবলা হচ্ছে সারা জগতের মুসলমানদের জন্যে এমন একটি কেন্দ্র বিন্দু যেখানে পৌছে বান্দার অন্তর আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ে, দেশ-বিদেশ হতে কাবা ঘরে আগত বিপুল মানবধারা পাগল পারা হয়ে সম্মিলিতভাবে তাদের আনুগত্য, ভক্তি, আকুতি প্রকাশ করে । ফলে, মালিকের সাথে বান্দার এমন এক সরাসরি যোগসূত্র কায়েম হয়ে যায় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে, অপর কেউ কস্মিনকালেও তার ছোঁয়াচ পায় না, ছোঁয়াচ পাওয়া সম্ভবও নয়।

অনুরূপভাবে বর্তমান এ আলোচনার সাথে ইহুদী চক্রান্তের আলোচনাও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইহুদী চক্র তথা বিরুদ্ধবাদীদের সার্বিক তৎপরতার লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের পুনরায় কুফুরী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া– যাতে লেজ কাটা জন্তুগুলো সব এক সমান হয়ে যায়, যে মহান নেয়ামতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভুষিত করেছেন, তাদের কামনা ছিলো, তার থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাক, কেননা আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঈমানের নেয়ামত।

এই ঈমানের নেয়ামতই তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে পরিচিত করেছে, মানবেতিহাসে দিয়েছে তাদেরকে বিশিষ্ট মর্যাদা, তাওহীদের বন্ধনে আবদ্ধ করে পরিণত করেছে তাদেরকে এক সুসংগঠিত জনপদ হিসেবে, সুযোগ দিয়েছে তাদেরকে পথ-হারা মানুষকে আলোর দিকে নিয়ে আসার এবং প্রেরণা যুগিয়েছে পৃথিবীকে অজ্ঞানান্ধকারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের শুভ্র প্রদীপ জ্বালতে। এই ঈমানের কোমল স্পর্শ দুর্দম্য ও অসভ্য মরুচারীদেরকে দিয়েছে সুসভ্য ও আলোকজ্জ্বল জীবনের সন্ধান, মানুষকে দিয়েছে অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, এরই সংস্পর্শে এসে মানুষে মানুষে রেষারেষি ভুলে গিয়ে হয়েছে তারা পরস্পরের প্রতি মহা দরদী। এই সুমহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে পারলেই সিদ্ধ হতো কুচক্রীদের সকল হীন উদ্দেশ্য। আর তাই, এই লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিলো তাদের সকল অভিযান।

তারা চেয়েছিলো সত্যের এই নিশানবাহী কফেলা ভুলে যাক সত্যের এই পয়গাম বিস্তারে তাদের দায়িত্ব, ফিরে যাক বিশ্ব আবার স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের নিষ্ঠুর হাতে। তাই ঈমানের সেই সম্মোহনী শক্তিকে উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে বারংবার মুসলমানদেরকে তাগীদ দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে তাদেরকে যে, ঈমানী যেন্দেগী ছাড়া কারো কাছে নেই এমন কোনো জীবন দর্শন যার আলোকে গোটা পৃথিবীবাসীকে শান্তির সন্ধান দেয়া যেতে পারে, শতধা বিভক্ত ও কলহ-রত মানব মন্ডলীকে একত্রিত করা যেতে পারে। নেই ঈমানী চরিত্র ছাড়া এমন কোনো চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব যা দিতে পারে বিশ্ব মানুষকে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা, নেই ঈমানী জীবন ধারা ছাড়া এমন কোনো (মানব রচিত) জীবন ব্যবস্থা যা দিতে পারে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঈমানী পথ বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটা মৌখিক দাবী সর্বস্ব কোনো বাক্যসমষ্টি বা কথা নয়, এ হচ্ছে বিশ্ব নেতা মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণে গড়ে তোলা পূর্ণ ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে বঞ্চিত মানুষ ফিরে পাবে তাদের হৃত অধিকার, মযলুমের আর্ত চিৎকার যেখানে দিকে দিকে গুমরে ফিরবে না, যেখানে মজুর মালিকের লেন-দেন কারো জন্যে কোনো কষ্টের কারণ হবে না এবং সর্বোপরি তারা প্রত্যেকে আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী হবে। এহেন সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতিটি কাজই হবে আল্লাহর যেকেরের প্রতিভূ। যারা এই যেকের বিস্মৃত, তারা যারাই হোক না কেন বা যে নামেই হোক না কেন তাদের ধ্বংস অনিবার্য, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মনে রাখবেন না, যমীনে তাদের কথা কেউ স্মরণ রাখলেও তা হবে সাময়িক এবং তাদের সেই স্মরণ আকাশের কারো কাছেই কোনো মূল্য পাবে না।

অতীতে মুসলমান আল্লাহকে স্মরণ রেখেছিলো, আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে স্মরণে রেখেছিলেন। উন্নত রেখেছিলেন সকল মানুষের মধ্যে তাদের আলোচনাকে। তৎকালীন পৃথিবীর সর্বত্র তাদের মান ইযযত ছিলো অমলিন দুশমনদের শত অপচেষ্টাও তাদের অস্তিত্ব বিলীন করতে পারেনি, কিন্তু যখন থেকে তারা আল্লাহকে, তার কালামকে, তাদেরকে প্রদত্ত মহান দায়িত্বকে ভুলে যেতে বসলো তখন আল্লাহ তায়ালাও (যেন) তাদেরকে ভুলে গেলেন। ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বুকে তাদের স্থান নীরব নিথর হয়ে যেতে লাগলো। নিষ্ফল হতে থাকলো তাদের প্রচেষ্টাসমূহ, আর পরিশেষে ইসলাম বিরোধীদের হীন চক্রান্তের শিকার হয়ে তারা তাদের জীবন লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেললো। সরাসরি কোরআন হাদীসের সাথে সম্পর্ক মুক্ত হয়ে জড়িয়ে পড়লো তারা ফেকহী (মতভেদপূর্ণ) মাস্‌লা মাসায়েলের জটিল বাক বিতন্ডায়।

আর এর ফলে, পৃথিবীর সর্বত্র সেই সে আলোর দিশারী মুসলিম জাতি আজ দ্বিধাবিভক্ত। তারা আজ ব্যক্তি স্বার্থ, গোত্রীয় স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থে লিপ্ত ও শক্তিহীন। তবুও! আজও, আজও আশার আলো একেবারে নিভে যায়নি, মুছে যায়নি ধরিত্রীর বুক থেকে মহান আল্লাহর বাণীর বারতা, সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ আজও রয়েছে উন্মুক্ত। দেখুন আজ ও আল্লাহ তায়ালা উদাত্ত কণ্ঠে আমাদের ডেকে বলছেন, (হে আমার ভ্রান্ত বান্দারা, ফিরে এসো আমার কাছে, আমার কালামের কাছে, 'স্মরণ করো আমাকে (সরাসরি আমাকেই) আমিও স্মরণ করবো তোমাদের। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার সমূহ নেয়ামতের। খবরদার (আমার নেয়ামতসমূহকে ভুলে গিয়ে) তোমরা কুফুরী করো না।

আরো কিছু প্রাসংগিক আলোচনা

কেবলা সম্পর্কে চূড়ান্ত কথার পর এবং উম্মতে মুসলিমাহ্‌কে স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মর্যাদাবান বলে ঘোষণা দেয়ার পর সর্বপ্রথম উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে মধ্যপন্থী উম্মাত হিসেবে এবং গোটা মানব জাতির জন্যে 'সত্যের সাক্ষীর মহান ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাদের সবর (অবিচলতা) ও নামাযের সাহায্য নিতে হবে। এই মহান দায়িত্ব পালনার্থে তাদের অবশ্যই কিছু কোরবানী (ত্যাগ) স্বীকার করতে হবে।

এ কাজ করতে গিয়ে অবশ্যই আসবে কিছু বিপদ, মুসিবত, ক্ষুধা দারিদ্র, আর্থিক সংকট, ফল-ফসল ও জান মালের ক্ষয়ক্ষতি। সুতরাং, এগুলো পর্যায়ক্রমে বা সামগ্রিকভাবে তোমাদের যখন স্পর্শ করবে তখন তোমরা বিচলিত হয়ো না, মুষড়ে পড়ো না, পিছপা হয়ে যেয়ো না তোমাদের জীবন লক্ষ্য হতে এবং যখন যে অবস্থাই আসুক না কেন তার মোকাবেলার জন্যে সদা সর্বদা প্রস্তুত থেকো। সদা আল্লাহর সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে রেখো এবং নিজেদের একতাকে অন্য কোনো প্রশ্নে নষ্ট হতে দিয়ো না। আর আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সর্বদা খেয়াল রাখবে, কিসে আল্লাহ খুশী, আর কিসে তিনি নাখোশ। জেনে রেখো এ বিষয়ে সঠিক বুঝও অনুভূতিই প্রকারান্তরে আল্লাহর দেয়া এক মহা পুরস্কার। তাই এরশাদ হচ্ছে,

ধৈর্য ও নামায দ্বারা আল্লাহর সাহায্য কামনা

'হে ঈমানদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবর (বা অবিচলতা) নামায দ্বারা। নিশ্চয়ই, তিনি সবরকারী ব্যক্তিদের সাথে আছেন।'

কোরআনে কারীমে সবর এর (অবিচলতার) উল্লেখ এসেছে বহু স্থানে, কারণ আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যে দুনিয়ায় স্বার্থের হানাহানিতে ও স্বভাবজাত বিভিন্ন ঝোঁকপ্রবণতা বা মানবসুলভ দুর্বলতায় ধৈর্য ও অবিচলতার প্রয়োজন সর্বাধিক। অনুরূপভাবে, বিপদ মুসিবতের সময় বা কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর দ্বীন এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ধৈর্য বা অবিচলিত থাকার অত্যধিক প্রয়োজন, কেননা এ উভয়বিধ কাজের সময় বাধা বিঘ্ন ও সংকট অল্পবিস্তর আসবেই। কখনও এজন্যে আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, আবার কখনও জীবনের ঝুঁকিও এসে যাবে। তাছাড়া স্বাভাবিক পরিস্থিতিও একাজ ধৈর্য ও সহনশীলতা দাবী করে, যেহেতু একটি জীবন ব্যবস্থা সমাজে শেকড় গেড়ে রয়েছে, তাকে সমূলে উৎপাটিত করে আর একটি সমাজ ব্যবস্থার ভিত গাঁড়তে গেলে পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত শেকড়গুলো তুলে ফেলা খুব চাট্টিখানি কথা নয়।

এতে প্রয়োজন পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, কষ্টকর কাজে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লেগে থাকা এবং একত্রিত হয়ে কাজ করার মানসিকতা। বাধা বিঘ্নের মোকাবেলায় যুক্তি প্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তার (হেকমতের) ব্যবহার, আক্রমণ প্রতিহত করার মানবিক, শারীরিক ও অন্যান্য বস্তুগত যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও

সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতাও একাধারে ও পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন। এ সামগ্রিক সংগ্রামে প্রথম প্রয়োজন নিজের নফসকে প্রস্তুত করা যেহেতু নফস তো 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' এর প্রবক্তা, দীর্ঘসূত্রী কোনো অগ্রযাত্রা বা পাওনার বিরোধী। এর পর পর্যায়ক্রমে আসে পরিবার, পরিবেশ, পরিজন এর পক্ষ থেকে নানাপ্রকার দাবী।

সুতরাং, আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের হক আদায় করতে গেলে অনেকে তার হক নিয়ে হাযির হয়। এসব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে, সঠিক সিদ্ধান্ত ও সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে প্রয়োজন প্রজ্ঞা, মানসিক দৃঢ়তা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ তিতীক্ষা বরদাশত করার মতো সর্বপ্রকার যোগ্যতা। সুতরাং সব কিছুর মোকাবেলায় বিচলিত না হয়ে নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে অগ্রসর হওয়ার নামই হচ্ছে সবর, কিন্তু সত্য মিথ্যার সংগ্রামের যখন দীর্ঘসূত্রতা হয় তখন সবর এর বাঁধ ভেংগে যেতে চায়। আল্লাহর দ্বীন-এর ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার কঠিন কাজ করতে গিয়ে যখন আশপাশ থেকে কোনো সাহায্য না আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় অথবা এই বন্ধুর পথ পরিক্রমায় পথের পাথেয় ফুরিয়ে আসতে চায়, তখন স্নায়ুর ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। সে অবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াককুল ও সবর-এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে সব থেকে বেশী, আর তা অর্জিত হয় নামাযের মাধ্যমে। তাই সবর এর পর নামাযের উল্লেখ এসেছে।

নামায এমন একটি কাজ যা আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি যোগাযোগ ঘটায় এবং সবর এর জন্যে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এ উৎস কখনও শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা শেষ হবার নয়। যতোবারই বিচলিত ভাব আসে ততোবারই বান্দা আল্লাহর দরবারে হাযিরা দিয়ে নতুন করে প্রেরণা হাসিল করে, সংগ্রহ করে সেই পাথেয় যা কখনও নিঃশেষ হয় না। তাই যতোবারই বান্দা নামাযে দাঁড়ায় ততোবারই তার ধৈর্যের বাঁধন মযবুত হওয়া সে অনুভব করে। ধৈর্য স্থৈর্য ছাড়াও নামাযের মাধ্যমে মোমেন বান্দা অন্তরের প্রফুল্লতা, মানসিক শান্তি, দৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহর সন্তোষ অনুভব করে।

নশ্বর এই পৃথিবীর দুর্বল মানুষ যখন তার সীমিত শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলতে বসে তখন সে অনুভব করে অবিনশ্বর ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে হাত পাতার প্রয়োজন। তাই যতোবারই সে দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা অনুভব করে ততোবারই আল্লাহর কাছে নামাযের মাধ্যমে ধর্ণা দেয় ও নতুন প্রেরণা লাভের জন্যে তাঁর কাছেই আকুল আবেদন জানায়। হাত পাতার প্রয়োজন সব থেকে বেশী দেখা দেয় তখন, যখন সত্য ন্যায়ের পথের পথিকদেরকে আল্লাহর দুশমনদের প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতার মোকাবেলায় নামতে হয়।

এ সাহায্যের প্রয়োজন তখন তিব্রভাবে অনুভূত হয় যখন লোভ লালসা ও স্বার্থের হাতছানির টানাপড়েনে সত্যের রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে অনুভূত হতে থাকে, যখন খোদাদ্রোহীদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা তার জন্যে দুঃসাধ্য পর্বত উত্তরণের শামিল মনে হয়, যখন সে দেখতে পায় তার সীমিত জীবনে সত্যের দীর্ঘ পথের দুঃসহ পথ পরিক্রমা, যখন সে দেখতে পায় মৃত্যু সন্নিকটে অথচ মনযিল বহুদূর, যখন সে দেখে তার জীবন সায়াহ্ন সমাগত আর লক্ষ্য অর্জন সুদূর পরাহত, যখন মিথ্যা ও পাপাচারের বিজয় ডংকা গুরু গম্ভীর ভাবে সে বাজতে দেখে আর দেখে সত্যের ক্ষীণ আলো যেন নিভু নিভু প্রায়।

এমনই সুকঠিন অবস্থায় বান্দাকে হতাশ না হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাচ্ছেন 'হে আমার বান্দা সব্‌র এর রশি মযবুত করে ধরে সঁপে দাও তুমি আমার কাছে তোমার জীবনকে। ঢলে পড়ো আমার দরবারে সেজদাতে। সকল কঠিন অবস্থার সামাল দেয়া সেতো আমারই দায়িত্ব।'

এই সেই নামায যার নমুনা পাওয়া যায় আল্লাহর সিংহ হজরত আলী কাররামাল্লাহুর আত্ম নিবেদনে যখন তাঁর পা থেকে মাংস শুদ্ধ তীর বের করে নেয়া সত্তেও অম্লান বদনে তিনি থেকেছেন সেজদাবনত। এই নামাযেই নশ্বর মানুষ ও অবিনশ্বর আল্লাহর সাথে যোগসূত্র কায়েম হয়। এই নামায এক অফুরন্ত নির্ঝরিনী যার উৎসমূল চিরসিক্ত ও চির প্রবাহমান। এ নামায সেই মহান ভান্ডারের চাবি যার দৌলত কোনোদিন নিঃশেষ হবার নয়। এর সীমাহীন বরকতে মানুষ লাভ করে অশেষ প্রাচুর্য ও পূর্ণত্ব।

এই নামাযের মাধ্যমেই বান্দা সীমাবদ্ধ জগতের সীমা পেরিয়ে সীমাহীন উর্ধজগতের সীমানায় পা রাখতে সক্ষম হয়, এ যেন চৈত্রের দুপুরের প্রচন্ড উত্তাপে সুশীতল বায়ুর মৃদু মন্দ দোলা, এ যেন তৃষিত ও হতাশপ্রেমিকের কাছে প্রিয়তমর পক্ষ থেকে অমেয় আশার বাণী! তাই দেখা যায় যে, কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর বেলালের প্রতি আহবান, 'হে বেলাল, নামাযের মাধ্যমে আমাকে শান্তি দাও'। আরও দেখা যায়, যে কোনো কঠিন বিষয় হাযির হলে তিনি রুজু করতেন নামাযের দিকে এবং গভীরভাবে নিজেকে সঁপে দিতেন আল্লাহর কাছে সেজদাবনতভাবে।

গোটা ইসলামী ব্যবস্থাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে বান্দার আনুগত্য প্রকাশের ব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত আনুগত্য প্রকাশের এই নিয়মতান্ত্রিক বিধান মোমেনের জীবনে এনে দেয় তার চলার পথের সুমহান পাথেয়, তার রূহের প্রশান্তি, তার অন্তরকে উজ্জীবীত রাখার স্বচ্ছ সমুজ্জল বাতি। প্রতিটি কঠিন দায়িত্ব পালন কালে নামায তাকে দান করে সঞ্জীবনী সুধা, যার ফলে সে অনুভব করে চরম কঠোরতার মধ্যেও পরম আনন্দ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবীকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্ব দিতে যখন মনস্থ করলেন তখন তাঁকে সস্নেহে ডাক দিয়ে বললেন,

'হে প্রিয় বান্দা আমার, রাতের বেলায় ওঠো এবং দাঁড়াও নামাযের জন্যে রাত্রিতে, তবে কিছু সময় বাদে রাতের অর্ধেক নামাযে কাটাও অথবা আরও কিছু কম সময়ে নামাযে রত থাকো অথবা অর্ধেকের কিছু বেশী সময় নাও নামাযের জন্যে এবং পড়ো কোরআন থেমে থেমে ও স্পষ্টভাবে। নিশ্চয়ই, আমি খুব শীঘ্রই তোমার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা নাযিল করবো।'

এই রাত্রিকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠা এবং ধীরে সুস্থে কোরআনে কারীমের সাফ সাফ তেলাওয়াত ছিলো সেই ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ কথার বোঝা বহন করার জন্যে এক কঠিন প্রস্তুতি যা অতি শীঘ্র তিনি তাঁর কাছে পাঠাবেন বলে আগেভাগেই জানিয়ে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা এক নিগূঢ় সত্য কথা যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত গুরুদায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই লাভ করা যায়, আর সে যোগ্যতা হাসিল করার জন্যে সেই সময়েই তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন যখন সুসুপ্ত রজনীর কোমল পরশে গভীর নিদ্রায় মগ্ন অন্যান্য সব মানুষেরা।

এ সময়ের নামায কোনো সাধারণ নামায নয়, এ হলো পরম প্রিয়ের দরবারে হাযির হয়ে নিঃশেষে নিজেকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে তাঁর সস্নেহ পরশ অনুভব করা। এ এমন এক পরশ যা বিমুগ্ধ হৃদয়ে এনে দেয় এমন এক প্রশান্তি যা তাকে আবেগাপ্লুত করে, তার অনুভূতিকে দান করে অভূতপূর্ব এক আনন্দ যার ছোঁয়াচ থেমে যাক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক এ যেন সে চাইতে পারে না। তাই তারই কারণে মহা প্রেমময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এ কথা বলে, 'না সারা রাত জেগো না, তোমার শরীরেরও কিছু হক আমি দিয়েছি। সে হক আদায় করাও তোমার দায়িত্ব।

অতএব, কিছু সময় তুমি বাকি রাখো নিদ্রার জন্যে। এতে বুঝা যাচ্ছে নবী (স.) রাতের নামাযে যে মজা পেতেন। তাঁকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে শক্তি পেতেন, তা তাঁকে নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চাইতো না। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে কঠিন সংগ্রামের দুঃসহ ও কষ্টকর সময়ে নামাযের জন্যে আদেশ করেছেন। 'সবর ও সালাতের' দিকে আকৃষ্ট করার পরপরই আল্লাহ তায়ালা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবর এখতিয়ারকারীদের সাথে আছেন।' আল্লাহ তায়ালা সাথে আছেন বলতে বুঝায় অবশ্যই তিনি তাদের সাহায্যে রত আছেন, তাদেরকে দৃঢ়তা দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে শক্তি যুগিয়ে চলেছেন, আর রয়েছে তারা তাঁর একান্ত বাহু বন্ধনে। আরও বুঝা যায় যে সত্যের সংগ্রামে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তিনি কখনও তাদেরকে নিঃসংগ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না এবং যে কোনো সময় তাদের পথের সম্বল শেষ হয়ে গেলে সংগে সংগে তিনি তা যোগান দেবেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন সুদীর্ঘ হওয়া সত্তেও তিনি অবশ্যই তাদের সংকল্পে নিত্য নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে থাকবেন। দেখুন, কতো স্নেহের সাথে আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শুরুতে তাদেরকে ডাক দিয়েছেন।

সবর এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায় তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি পেশ করা হলো,

'খাব্বাব ইবনে আরিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের কঠিন অবস্থা রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে পেশ করে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্যে কি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্যে কি আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না?'

তিনি তখন একটি খেজুরের ছিলকার বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। বললেন, দেখো তোমাদের পূর্বে এমন অবস্থাও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে ধরে এনে গর্ত খোঁড়া হয়েছে এবং তার মধ্যে তাকে গেড়ে দিয়ে তার মাথার উপরে করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে । কখনও এমনও হয়েছে যে লোহার চিরনী দিয়ে কাউকে এমনভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে তার হাড় থেকে মাংস আলাদা হয়ে গেছে ,তা সত্তেও তারা ঈমান ত্যাগ করেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে পূর্ণত্ব দান করবেনই এবং সত্য এই জীবন ব্যবস্থাকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন, এমন কি কোনো ঘোড়সওয়ার বা উষ্টারোহী সান্আ থেকে হাদরামউৎ পর্যন্ত (একাকী) ভ্রমন করবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তার আর কাউকে ভয় করা লাগবে না। অবশ্য মেষপালের ওপর নেকড়ে বাঘের হামলার সম্ভাবনা থাকবেই, কিন্তু তোমরা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ছো।'

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন, আমি যেন রসূল (স.)-এর দিকে তাকিয়ে আছি আর তিনি একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করছেন। ঘটনাটি এ রকম যে, এক ব্যক্তিকে তার স্বগোত্রীয় লোকেরা মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, আর সে বলছে, হে আমার রব, আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আসলে তারা তো সঠিক কথা জানে না তারা অবুঝ। (বোখারী, মুসলিম।)

ইয়্যাহ্ইয়া ইবনে অসসাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন যে, তিনি নবী (স.)-এর একজন প্রবীণ সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'ওই মুসলিম ব্যক্তি, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করে, সে ওই ব্যক্তি থেকে ভালো যে মানুষের সাথে মিশেও না এবং মানুষের দেয়া কষ্টকে সহ্যও করে না।

শহীদের মর্যাদা

মুসলিম উম্মাহ যখন আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে আল্লাহর পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছিলো এবং বিরোধীদের তৎপরতার মোকাবেলায় দৃঢ় থেকে ইসলামের বিজয় পতাকাকে উড্ডীন করতে সংকল্প গ্রহণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলো সেই সময়ে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরী মনে করলেন। প্রতিষ্ঠিত বাতিল সমাজ ব্যবস্থাকে ভেংগে চুরমার করে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে গিয়ে যে সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যে ত্যাগ তাদের স্বীকার করতে হয়েছে তা বরদাশত করার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, এ মহান কাজে যাদের জীবন কোরবান হবে তাদেরকে দান করবেন তিনি শাহাদাতের মর্যাদা, আর যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে রসূল (স.)-এর কাছে সংগী (গাজী) রূপে কবুল করে তাদেরকে রসূল (স.)-এর সাথে বেহেশতে স্থান দান করবেন। এটাই তাদের জন্যে মহা পুরস্কার এবং তাদের ত্যাগ তিতীক্ষার সঠিক মূল্যায়ন। তাই আল্লাহর মহান বাণী আমাদের সবাইকে তার মেহেরবানীর ঘোষণা শুনায়,

'তাদের মতো বলো না যারা নিহত হয় আল্লাহর পথে, বরং তারাই সঠিক অর্থে জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।'

যারা আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার সংগ্রামে যোগদান করে জীবন পাত করে তাদের আল্লাহ তায়ালা মৃত বলতে নিজেই মানা করছেন, অর্থাৎ মৃতদের যেমন অচিরেই মানুষ ভুলে যায়, সাধারণ মৃতদের যেমন হিসাব নিকাশ হওয়ার ব্যবস্থা আছে, জান্নাত জাহান্নাম উভয়ের সম্ভাবনা আছে, তাদের কবরের মধ্যে কষ্টের আশংকা থাকে, আল্লাহর ঘোষণায় শহীদ ওইসব কিছুর উর্ধে। তারা জীবিত আল্লাহর কাছে, মানুষের অন্তরে, কবরের মাঝে এবং জান্নাতের সুষমায়। শুধু তাই নয়, যে মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাদের রক্ত ঝরে সেই রক্তের স্মৃতি ওই মতাদর্শকে সঞ্জীবীত করতে থাকে যুগ যুগ ধরে। তাদের উত্তরসুরীরা তাদের থেকে প্রেরণা লাভ করে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এজন্যে আল্লাহর ভাষায় যেমন তাদেরকে মৃত বলা জায়েয নয়, তেমনি সাধারণ মানুষও তাদেরকে মৃত বলতে বা মনে করতে রাযি নয়। সর্বোতভাবেই শহীদরা চির অমর।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন এজন্যে সকল বিবেচনায় তারা অমর, তারা শহীদ, তারা আল্লাহর প্রিয়, তারা জান্নাতের অধিকারী, তারা মানুষের মনোজগতেও চির অমলীন। আল্লাহর ঘোষণা,

'বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা বোঝো না'

একথায় তাদের জীবিত থাকার রহস্য আমরা যা বুঝি এবং আমাদের যে বুঝ অনুসারে কাউকে জীবিত বা কাউকে মৃত বলি সেই সকল বুঝশক্তির অনেক অনেক উর্ধে আল্লাহর পথে নিহত সেই ব্যক্তিরা বিচরণ করে। অতএব, আমাদের বিবেচনায় জীবিত যারা তাদের অনেক অনেক উর্ধের জীবিত তারা।

মৃতদের গোসল দেয়া হয়। শহীদরা যেহেতু মৃত নয়, এজন্যে তাদের গোসল দেয়ার বিধান নেই। আল্লাহ তায়ালা চান তাঁর পথের বীর মোজাহেদরা তাদের রক্তের অলংকার নিয়ে তাঁর দরবারে হাযির হোক, হাযির হোক তারা মহান সম্রাটের দরবারে অবিকল সেই পোশাকে, সেই চেহারায়, সেই রক্তাক্ত দেহে। মৃতদেহকে পবিত্র করার জন্যে গোসলের ব্যবস্থা। শহীদের রক্ত অপবিত্র নয় বিধায় তাদের দেহ ও দেহাবরণ সবই পবিত্র। অতএব, কবরস্থ হওয়া সত্তেও তাদের সব কিছু সহ তারা জীবিত, তারা চির পবিত্র।

কী চমৎকার তাৎপর্যপূর্ণ একথা, একবার খেয়াল করে দেখুন, যেহেতু তারা জীবিত, এজন্যে তাদের শাহাদাত তাদের পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্দবের কাছে তেমন দুঃসহ মনে হয় না, বরং তারাও যেন শহীদের গর্বে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত বোধ করে। বরং আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সম্ভবত এটাই ঠিক যে শহীদদের পরিবার পরিজনও শহীদের সাথে শাহাদাতের মর্যাদায় শরীকদার। তাই মুষড়ে পড়ে না তারা। ভয়ভীতির পরিবর্তে পূর্বাপেক্ষা আরও নির্ভীক হয়ে যায় তারা। শহীদদের পুরস্কার সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে প্রথম এই কথাটা যখন মনে আসে যে তাদের বিশ্বজগতের মালিক চিরঞ্জীব বলে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে চিরদিনের জন্যে পবিত্রতার মর্যাদা দান করেছেন, তখন আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এটাইতো হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এর পরে আসছে হাদীসে বর্ণিত তাদের আল্লাহর মেহমান ও মর্যাদাবান হওয়ার ঘোষণা,

'শহীদদের রূহগুলোর অবস্থান ক্ষেত্র হচ্ছে সবুজ পাখীর পাকস্থলী। এ পাখীগুলো জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়ায়, তারপর তারা আশ্রয় নেয় আরশের নীচে ঝুলন্ত কাঁচের ফানুসসমূহে। এ সময় তোমার রব আগমন করেন তাদের কাছে এবং জিজ্ঞাসা করেন, কী চাও তোমরা?

তারা বলে, আর কোন জিনিস আমরা চাইবো? তুমি তো আমাদেরকে সেইসব জিনিস দিয়েছো যা তুমি বিশ্ব-জগতের মধ্যে তোমার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দাওনি।

এরপরও তিনি পুনরায় অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করবেন। যখন ওরা (শহীদরা) দেখবে যে কিছু না চাইলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়ছেনই না তখন তারা বলবে,

'আমরা চাই যে তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে আবার ফিরিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে আমরা আবার তোমার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হই।'

শাহাদাতের যে মর্যাদা তারা দেখবে তারই কারণে এ আকাংখা জানাবে। তখন মহান আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'আমি চূড়ান্তভাবে স্থির করে ফেলেছি যে সেখানে আর কেউ ফিরে যাবে না।'

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ায় আসা ও দুনিয়ার জীবনের লভ্য বস্তুর আকাংখা শহীদের চাইতে বেশী অন্য কারো হবে না। একবার শুধু নয়, দশ বার চাইবে দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হতে। যে মর্যাদা শহীদদের জন্যে জান্নাতে তারা দেখতে পাবে তারই কারণে তারা তাদের এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে। (মালিক, বোখারী, মুসলিম)

অমর এ শহীদ কারা, যারা আল্লাহর কাছে এতো মর্যাদার অধিকারী? যারা শুধু আল্লাহর পথে লড়াই বা সংগ্রাম করতে করতে নিহত হয়েছে।

'আল্লাহর পথে' বলতে 'আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে' নিয়োজিত থেকে যারা জীবন দিয়েছে তাদের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে, যেহেতু এ দ্বীন, সমগ্র মানুষের সারা জীবনের ব্যবস্থা, আল্লাহরই রচিত এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু মূসা আশয়ারী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে, কেউ করে গোত্রীয় মর্যাদার খাতিরে আর কেউ যুদ্ধ করে মানুষকে দেখানোর জন্যে। এদের মধ্যে কার কাজটি আল্লাহর পথে যুদ্ধ বলে গণ্য হবে?

রসূল (স.) বললেন, যে যুদ্ধ করে আল্লাহর কথাকে সমুন্নত রাখার জন্যে সেই-ই আল্লাহর পথে আছে (অর্থাৎ তার যুদ্ধই আল্লাহর পথে হচ্ছে বলে গ্রহণ করা হবে।) (মালেক, বোখারী ও মুসলিম)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে এই আশায় যে সে দুনিয়ার কিছু উপায় উপকরণ লাভ করবে তার অবস্থা কী হবে? । রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তার জন্যে কোনো প্রতিদান নেই। তিন বার তিনি একই কথা বললেন এবং প্রতি বারেই বললেন, কোনো প্রতিদান তার জন্যে নেই। (আবু দাউদ)

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তির জন্যে যামিন হয়ে যান যে আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।' আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন একমাত্র আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যই তাকে ঘর থেকে বের করে, আমার ওপর ঈমান এবং আমার রসূলের প্রতি আস্থাই তাকে জেহাদে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, তখন আমার দায়িত্ব হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে দাখিল করানোর অথবা যে বাসস্থান থেকে সে বেরিয়েছিলো সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সে উচিত প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হবে অথবা গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল পাবে।' কসম সেই সত্ত্বার যাঁর হাতে মোহাম্মাদের জীবন, যখন কোনো ব্যক্তি শাহাদাতপ্রাপ্ত হবে সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তা নিয়েই হাযির হবে, তার চেহারা ছবি ও ক্ষতবিক্ষত দেহাবয়ব অবিকল সেই দিনের মতো হবে যে দিন সে শহীদ হয়েছিলো। রক্তের রংই হবে তার রং এবং তার খুশবু হবে মৃগ নাভীর খুশবুর মতো উন্নতমানের। আর কসম সেই মহান সত্ত্বার যাঁর হাতে মোহাম্মাদের জীবন, যদি আমি মুসলমানদের জন্যে কঠিন (সংকটপূর্ণ) মনে না করতাম তাহলে মহান আল্লাহর পথে পরিচালিত কোনো যুদ্ধ থেকেই আমি দূরে থাকতাম না কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, সবার জন্যে যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি আমি যোগাড় করে দিতে পারছি না, আর ওরাও নিজেরা আমার সাথে সবাই যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারছে না, অথচ আমার থেকে দূরে পেছনে পড়ে থাকাও তাদের জন্যে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সেই মহান সত্তার কসম খেয়ে আমি বলছি যার হাতে মোহাম্মাদ এর জীবন নিবদ্ধ, আমার অবশ্যই ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাই এবং আবারও যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাই, পুনরায় আবারও যুদ্ধ করি এবং শহীদ হয়ে যাই। (মালেক, বোখারী ও মুসলিম)।

একবারের ঘটনা, ওহুদের ময়দানে যুদ্ধরত এক ইরানী যুবক নিজের ইরানী হওয়া এবং উন্নত বংশ উদ্ভূত হওয়ার কথা উল্লেখ করে গৌরব প্রদর্শন করছিলো। রসূলুল্লাহ (স.) জ্ঞাতসারেই ঘটনাটি অপছন্দ করলেন এবং বললেন, 'কেন তুমি বলছো না আমি একজন আনসার যুবক।'

ঘটনাটি নিম্নোক্ত হাদীসে জানা যায়,

'আবু ওকবাহর পুত্র আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন। উক্ত ব্যক্তি আবু ওকবাহ ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত একজন মুক্ত দাস। তিনি বর্ণনা করছেন, আমি নবী (স.)-এর সাথে ওহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলাম, এ সময়ে মোশরেকদের একজনকে আঘাত হেনে বলি 'নাও এই আঘাত, জেনে রাখো আমি একজন ফারসী যুবক।' এ কথাটি শুনে রসূল (স.) আমার দিকে তাকালেন, বললেন 'কেন তুমি বললে না, আমি একজন আনসারী যুবক। শোনো, কোনো জাতির বোনের ছেলে যে, সে তাদেরই একজন, আর কোনো জাতির মুক্ত দাস যে, সেও তাদেরই লোক বলে গণ্য।' (আবু দাউদ)

দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নবী (স.)-কে সাহায্য করার গৌরবই প্রকৃত গৌরব, এ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কোনো গৌরব করা চলে না এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিজয় ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনো ধ্বনি (ওফমথটভ) তোলা যাবে না, অন্য কোনো কিছুর বিজয়সূচক ধ্বনি তোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, যেহেতু যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর। অতএব তাঁর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্বের শ্লোগানই আল্লাহর প্রিয়, এর নামই জেহাদ। একমাত্র এরূপ যুদ্ধে যোগদান করে নিহত হলেই সে শহীদ। আর এই শহীদরাই হবেন অমর জীবনের অধিকারী।

ঈমানের পরীক্ষা

কোরআনে কারীম ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে যাবতীয় বিপদ মুসিবত ও দুঃখ দুর্দশার মোকাবেলা করার জন্যেও প্রস্তুত করে এবং এসব বিপদ মুসিবতের তাৎপর্যও জানায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়ভীতি দিয়ে। কিছু ক্ষুধা বা আর্থিক সংকট দিয়ে আবার কখনও মাল, জান, ফল ও ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে। এমতাবস্থায় সুসংবাদ দাও ওই সকল ধৈর্যধারণকারীদেরকে যারা সর্বাবস্থায় অবিচল থাকে, ওদের ওপর যখন বিপদ মুসিবত এসে পড়ে তখন ওরা বলে ওঠে, নিশ্চয়ই আমরা একমাত্র আল্লাহর জন্যে এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তির ঈমানকে পরখ করার কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। বিপদ মুসিবত দিয়েই এসব পরীক্ষা করা হয় এবং এইভাবেই আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকার জন্যে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এটাও অতি সত্য কথা, যে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কঠিন দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা যাঁচাইয়ের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর খেলাফত দানের ওয়াদা দিয়েছেন।

এ পরীক্ষা আসবেই আসবে, কখনও এককভাবে, আবার কখনও সম্মিলিতভাবে, এইভাবে পরীক্ষা করাই আল্লাহর নিয়ম। এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও ত্যাগ-কোরবানীর জযবা যাচাই করেই তাদের দায়িত্ব দেন। তিনি পরখ করে নিতে চান যে আকীদা বিশ্বাসকে তারা গ্রহণ করেছে, যার দিকে তারা বিশ্ব মানবকে আহবান জানাচ্ছে তার প্রতি তাদের নিষ্ঠা দরদ কতোটা এবং তার জন্যে কতোটা কষ্ট করতে তারা প্রস্তুত।

সুতরাং, এটা বলাই বাহুল্য যে এসব পরীক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। অলস ও দুর্বল বা ঠুনকো বিশ্বাসের লোকেরা কষ্ট স্বীকার করতে রাযী হয়না। কষ্ট দেখলেই তারা পিছিয়ে যায় এবং সহজেই তারা ভেংগে পড়ে। সুতরাং তাদের দ্বারা বড় কোনো যিম্মাদারী সামলানো সম্ভব নয়। যারা যতো বেশী নিজ উদ্দেশ্যের পথে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে ততোবেশী মযবুত ও যোগ্য।

ঈমানের পথে যতো বেশী ত্যাগ স্বীকার করা হয় ততো বেশী তার কাছে ঈমান প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠে। অন্যরাও যখন ঈমানদারদের ত্যাগ তিতীক্ষা প্রত্যক্ষ করে তখন তাদের মধ্যেও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জাগে। ঈমানের যে স্বাদ পেয়ে ঈমানদাররা যাবতীয় দুঃখকষ্ট বরদাশত করতে পেরেছে, সেই স্বাদ গ্রহণ করার জন্যে তারাও তখন এগিয়ে আসে। ফলে, ঈমানদারদের প্রতি যুলুম নির্যাতন প্রকারান্তরে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হয়ে যায়। আর তখনই দেখা যায় দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করছে।

আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী আদর্শের ধারক বাহকদের ঈমানকে মযবুত বানানোর জন্যে পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। যত বেশী ঈমানদারদের ওপর বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট আসে ততোই তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো শাণিত হয়ে ওঠে এবং তাদের অন্তরের জানালাগুলো খুলে যায়। বিপদ আপদের যে কোনো ধাক্কাই তার চোখের পর্দা সরিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে অন্তরের মরিচা অপসারিত হতে থাকে। তাই প্রতি পরীক্ষার পরিবেশেই মোমেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারগত সৌন্দর্য এবং তার দৃষ্টিভংগীর স্বচ্ছতা বিকশিত হয়ে তাকে সাধারণভাবে অনুকরণীয় করে তোলে।

এসব বিষয়ের তুলনায় আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান কথা হচ্ছে, সকল ব্যাপারেই আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, অর্থাৎ যখন ঈমানের পথে দৃঢ় থাকার কারণে মোমেনের যেন্দেগীতে একের পর এক বিপদ আপদের ঝড় তুফান আসতেই থাকে চতুর্দিকের সাহায্য সহযোগিতা লাভের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে মোমেন আল্লাহর স্মরণার্থী হয় এবং নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর কাছে সোপর্দ করে তাঁরই কাছে আশ্রয় চায়। এই সময়ই আল্লাহর সাথে সরাসরি তার যোগসূত্র কায়েম হয়ে যায়। আর তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার ডাকে সাড়া দেন এবং তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। এটাই হচ্ছে ঈমানী জীবন যাপন কালে যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার সঠিক এবং সবচেয়ে বড় তাৎপর্য। দেখুন আল্লাহর আশ্বাসবাণী,

'আর সুসংবাদ দাও এ সকল অবিচল লোকদেরকে যারা বিপদ মুসিবত আসলে বলে ওঠে, আমরা তো একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

অর্থাৎ আমরা যখন আল্লাহরই মালিকানাধীন তখন তিনি, তাঁর জিনিস যেভাবে চান সেই ভাবেই ব্যবহার করবেন এতে আমাদের বলারই বা কি আছে, আর আপত্তি করারই বা কি সুযোগ আছে! এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে অনুগত বান্দা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, তার সমস্ত অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে সে বলে যে, আয় আল্লাহ 'আমি এবং আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার দান, অতএব, এসব কিছুই যদি তোমার পথে খরচ হয়ে যায় আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আমাকে তোমার কাছে তো ফিরে যেতে হবে, নিশ্চয়ই আমি সেখানে তোমার মেহেরবানী লাভে ধন্য হবো। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলেই মোমেনের এই মনোভাব সৃষ্টি হয়।

এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ বাণী শুনিয়েছেন, ওরাই হবে সেই সব মানুষ যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা করুণা ও রহমতের মধ্যে রয়েছে এবং তারাই হচ্ছে সঠিক পথপ্রাপ্ত।

এরা হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যাদের ওপর আল্লাহর খাস মেহেরবানীর দৃষ্টি পড়ে, তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করে, নবীদের পজিশনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার পরোক্ষ ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন, যেহেতু যে 'সালাত' নবীদের জন্যে নির্ধারিত তারই মধ্যে তিনি এই সবর এখতিয়ারকারী ব্যক্তিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন বলে এ আয়াতে ঘোষণা এসেছে।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা নবী মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি দরূদ পাঠান। তাঁর জন্যে দোয়া করেন, হে ঈমানদাররা তাঁর প্রতি তোমরাও দরূদ ও সালাম পাঠাও।'

এবারে আসুন ইসলামী কাফেলার যাবতীয় প্রস্তুতি, ত্যাগ কোরবানী, দুঃখ দুর্দশা, বিপদ মুসিবত ও জান মালের ক্ষয়-ক্ষতি এবং শাহাদাত-লাভ এর যে কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে তার শেষ অংশের ওপর আমরা কিছু চিন্তাভাবনা করি।

আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও ত্যাগ কোরবানী এবং শাহাদাতের বিনিময় দান করবেন একটি মহামূল্যবান জিনিস দ্বারা। তা হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী। এর পরই তাদের সম্পর্কে সার্টিফিকেট আসছে, 'তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত' খেয়াল করুন, এখানে আল্লাহ তায়ালা কোনো সাহায্য দানের ওয়াদা করেননি, বিজয়, প্রভাব প্রতিপত্তি বা মালে গনীমৎ (যুদ্ধে পাওয়া সম্পদ) এগুলো কোনোটারই ওয়াদা করলেন না।

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে এক বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে নিযুক্ত করেছেন, প্রস্তুত করেছেন এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যে যা তাদের কাছে নিজেদের জীবন থেকেও প্রিয়। তাই, তারা সকল কিছুর উপরে ওই আদর্শের জন্যে নিজেদের সবকিছু, এমনকি জীবনটা পর্যন্ত কোরবানী করে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। এহেন ব্যক্তিদের সব কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালা সেই মেহেরবানী দান করবেন যা নবীদেরই জন্যে নির্দিষ্ট।

তাদের তিনি বড় বড় ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবেন, যার কারণে সাধারণত তাদের মন্দ প্রভাব অপরের ওপর পড়তে পারে। তাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে নিজেদের বাঞ্ছিত কাজে লেগে থাকা, আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করা এবং যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় সবর করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তই হবে তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই হচ্ছে সেই সুমিষ্ট ফল যার জন্যে একজন মোমেন প্রতি মুহূর্তে লালায়িত থাকে। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ইসলামী আন্দোলনের সেই মূল লক্ষ্যকে হাসিল করার জন্যে আসে যার জন্যে নবী রসূলরা ও মোমেনীনে সালেহীন নেক বান্দারাও আত্মনিবেদিত ছিলেন।

এপথে মোমেন যে ত্যাগ কোরবানী স্বীকার করে, জান মালের যে ক্ষতি বরদাশত করে এবং যে শাহাদাত লাভের আকাঙ্খা রাখে তার সর্বোত্তম পুরস্কারই হচ্ছে আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ। এ প্রতিদান যে পাল্লায় থাকবে তা থাকবে বখশিষেপূর্ণ অন্য যে কোনো পাল্লা থেকে ভারী।

এই হচ্ছে ইসলামী জনতার জন্যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরখ করে নেন ওই সকল ব্যক্তিকে যারা ইসলামকে বিজয়ীরূপে দেখার আকাংখা রাখে। যারা একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের কাজ করতে বদ্ধপরিকর।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৫৮. অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় (করার এরাদা) করে, তার জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই; (কেননা) যদি কোনো ব্যক্তি (অন্তরের) নিষ্ঠার সাথে কোনো ভালো কাজ করে তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে), নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী। ১৫৯. মানুষের জন্যে যেসব (বিধান) আমি আমার কেতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তারপর যারা আমার নাযিল করা (সেসব) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও পরিষ্কার পথনির্দেশ গোপন করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, অভিশাপ বর্ষণ করে অন্যান্য অভিশাপকারীরাও, ১৬০. তবে যারা (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, খোলাখুলিভাবে তারা (সেসব সত্য) কথা প্রকাশ করবে (যা এতোদিন আহলে কেতাবরা গোপন করে আসছিলো), এরাই হবে সেসব লোক যাদের ওপর আমি দয়াপরবশ হবো, আমি পরম ক্ষমাকারী, দয়ালু। ১৬১. যারা কুফরী করেছে এবং এই কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাদের অভিশাপ, (সর্বোপরি) অভিশাপ সমগ্র মানবকুলের, ১৬২. (এই অভিশপ্ত অবস্থা নিয়েই) এরা সেখানে চিরদিন থাকবে, শাস্তির মাত্রা এদের ওপর থেকে (বিন্দুমাত্রও) কম করা হবে না, তাদের কোনো রকম অবকাশও দেয়া হবে না। ১৬৩. তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি মেহেরবান।

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص
وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا
يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا وَّأَنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

রুকু ২০

১৬৪. নিসন্দেহে আসমান যমীনের সৃষ্টির মাঝে, রাত দিনের এই আবর্তনের মাঝে, সাগরে ভাসমান জাহাজসমূহে– যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, (এর সব কয়টিতে) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন মজুদ রয়েছে, (আরো রয়েছে) আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে (বৃষ্টি আকারে) যা কিছু নাযিল করেন (সেই বৃষ্টির) পানির মাঝে, ভূমির নির্জীব হওয়ার পর তিনি এ পানি দ্বারা তাতে নতুন জীবন দান করেন, অতপর এই ভূখন্ডে সব ধরনের প্রাণীর তিনি আবির্ভাব ঘটান, অবশ্যই বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সে মেঘমালা– যা আসমান যমীনের মাঝে বশীভূত করে রাখা হয়েছে, তার মাঝে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। ১৬৫. মানুষদের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তাদের ভালোবাসা উচিত; আর যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসবে; যারা (আল্লাহর আনুগত্য না করে) বাড়াবাড়ি করছে তারা যদি আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে এরা বুঝতে পারতো), আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। ১৬৬. (সেদিন) ভয়াবহ শাস্তি দেখে (হতভাগ্য) লোকেরা (দুনিয়ায়) যাদের তারা মেনে চলতো, তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে (বলবে, আমরা তো এদের চিনিই না), এদের উভয়ের মধ্যকার (ভংগুর) সব সম্পর্ক সেদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط

كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ

تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا

يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৬৭. এ (হতাশাগ্রস্ত) অনুসারীরা সেদিন বলবে, আবার যদি একবার আমাদের জন্যে (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার (সুযোগ) থাকতো, তাহলে আজ যেমনি করে (তারা) আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমরা (সেখানে গিয়ে) তাদের সাথে (যাবতীয়) সম্পর্কচ্ছেদ করে আসতাম, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকান্ডগুলো তাদের সামনে একরাশ (লজ্জা ও) আক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরবেন; তাদের জন্যে যে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে, এরা (কখনো সেই) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

রুকু ২১

১৬৮. হে মানুষ, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা খাও এবং (হালাল হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। ১৬৯. (শয়তানের কাজ হচ্ছে,) সে তোমাদের (সব সময়) পাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালার নামে তোমরা এমন সব কথা বলতে শুরু করো যা সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না। ১৭০. তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সে পথেরই অনুসরণ করবো যে পথের ওপর আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি; তাদের বাপ-দাদারা যদি (এ ব্যাপারে) কোনো জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় নাও দিয়ে থাকে, কিংবা তারা যদি হেদায়াত নাও পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? ১৭১. এভাবে যারা (হেদায়াত) অস্বীকার করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন (জন্তুর মতো), যে (তার পালের আরেকটি জন্তুকে) যখন ডাক দেয়, তখন (পেছনের সেই জন্তুটি তার) চীৎকার ও কান্নার আওয়ায ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না; (মূলত) এরা (কানেও) শোনে না, (কথাও) বলতে পারে না, (চোখেও) দেখে না, (এ কারণে হেদায়াতের কথাও) এরা বুঝে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি (নিসংকোচে) তা তোমরা খাও এবং (এ নেয়ামতের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো, (অবশ্য) যদি তোমরা (হালাল হারামের ব্যাপারে) একান্তভাবে শুধু তাঁরই দাসত্ব করো। ১৭৩. অবশ্যই তিনি মৃত (জন্তুর গোশত), সব ধরনের রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম (ঘোষণা) করেছেন এবং (এমন সব জন্তুও হারাম করছেন) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, তবে (সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যাকে (এজন্যে) বাধ্য করা হয়েছে, যদি সে ব্যক্তি এমন হয় যে, সে (আল্লাহর আইনের) সীমালংঘনকারী হয় না, অথবা (যেটুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশী ভোগ করে) অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না, তাহলে (এই অপারগতার সময়ে হারাম খেলে) তার ওপর কোনো গুনাহ নেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, তিনি অনেক মেহেরবান। ১৭৪. (এ সত্ত্বেও) যারা আল্লাহর নাযিল করা (তাঁর) কেতাবের অংশবিশেষ গোপন করে রাখে এবং সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়, তারা এটা দিয়ে যা হাসিল করে এবং যা দিয়ে তারা নিজেদের পেট ভর্তি করে রাখে তা (মূলত) আগুন ছাড়া আর কিছুই নয়, (শেষ বিচারের দিনে) আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের (সেদিন) পবিত্রও করবেন না, ভয়াবহ আযাব এদের জন্যেই নির্দিষ্ট। ১৭৫. এরা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীর পথ কিনে নিয়েছে, ক্ষমার বদলে তারা আযাব (বেছে) নিয়েছে, এরা ধৈর্যের সাথে (ধীরে ধীরে) জাহান্নামের আগুনের ওপর গিয়ে পড়েছে। ১৭৬. এটা এই জন্যে, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্যে আগে থেকেই সত্য (দ্বীন) সহকারে কেতাব নাযিল করে দিয়েছেন; যারা এই কেতাবে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى
الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

রুকু ২২

১৭৭. তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, এতে কিন্তু কোনোই কল্যাণ নিহিত নেই, আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কেতাবের ওপর, (কেতাবের বাহক) নবী রসূলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া মাল সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথিক মোসাফেরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষদের (কয়েদ ও দাসত্বের) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দারিদ্র বিমোচনের জন্যে) যাকাত আদায় করবে– (তাছাড়াও রয়েছে সেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহভীরু মানুষ।

তাফসীর
আয়াত–১৫৮–১৭৭

আলোচ্য আয়াতগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে যথার্থভাবে সেই ভিত্তিগুলো বর্ণনা করা যার ওপর ইসলামের মৌলিক চিন্তাভাবনাগুলো গড়ে উঠেছে। প্রসংগক্রমে এ পর্যায়ে আলোচনা এসেছে সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রন সম্পর্কে, জেনে শুনে সত্যকে গোপন করা সম্পর্কে, সত্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মিথ্যা রটনা এবং সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি সম্পর্কে। আরও আলোচনা এসেছে মদীনার ইহুদীদের সম্পর্কে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অব্যাহত গতিতে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে চলেছিলো।

কিন্তু এখানে সাধারণ যে বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ইহুদী ছাড়াও অন্যান্য বিরোধীদের কথাও এসেছে। এর সাথে মুসলমানদেরকে ওই সকল বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে যেগুলোর কারণে ইসলামী জীবন যাপন কালে যে কোনো মুহূর্তে তাদের পদস্খলন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এই কারণেই আমরা এ পর্যায়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ (দৌড়ানো) করার দৃশ্য দেখতে পাই, যেহেতু জাহেলিয়াতের যামানায় প্রচলিত পদ্ধতির সাথে এর কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়ার সাথে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জের সাথেও প্রাচীন পদ্ধতির যথেষ্ট মিল ছিলো।

এর পরই বর্ণিত হয়েছে ওইসব আহলে কেতাবদের অবস্থা সম্পর্কে যারা সত্য সমাগত হওয়ার পর এবং আল্লাহর নাযিলকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হেদায়াতের কথা এসে যাওয়ার পর এবং কুক্ষিগত সার্থের কারণে সেগুলোকে গোপন করে চলেছিলো। তাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করার সাথে সাথে, তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করার আশ্বাসবাণীও শুনানো হয়েছে এবং অবাধ্যতায় যারা অনমনীয় তাদেরকে জানানো হয়েছে কঠিন শাস্তির কথা।

এরপর আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সৃষ্টিলোকের ওইসব নিদর্শনের প্রতি, যেগুলো এই মহা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে এবং যেসব অজুহাতে মোশরেকরা আল্লাহর সাথে আজ কারো অংশীদারিত্ব আছে বলে মনে করে, সেগুলোকে খন্ডন করা হয়েছে। এপর্যায়ে কেয়ামতের একটি ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, কেমন করে কুফুর এর অনুসারীরা পরস্পরের সাথে যাবতীয় সম্পর্কের সব কথা সেদিন অস্বীকার করবে। এ সময় তারা দোযখের আযাব সরাসরি দেখবে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্যে নিষ্ফল আফসোস করতে থাকবে।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ইহুদীরা খাবারের হারাম হালাল বিধান সম্পর্কে নানাপ্রকার কূটতর্ক করছিলো, অথচ ইসলামের বিধানের মতোই হালাল হারাম বিধান তাওরাতেও রয়েছে, কিন্তু তারা সেসব তথ্য গোপন করে রেখেছিলো। কোরআনে কারীম চায় গোটা মানব জাতি হালাল খাদ্য ব্যবহার করে উপকৃত হোক এবং হারাম জিনিসের অপকারিতা থেকে বেঁচে যাক। সতর্ক হয়ে যাক তারা শয়তানের প্ররোচিত যাবতীয় হারাম ব্যবহার ও পাপকাজসমূহ থেকে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে হারাম দ্রব্যাদির নাম উল্লেখ করে সেগুলোর নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং একথাও জানিয়েছেন যে, ইহুদীরা ওই সকল দ্রব্যের নিষিদ্ধতা, তাদের কেতাবের মাধ্যমে, জানা সত্তেও পুরোপুরি অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছিলো। তাই তাদের কঠোর সমালোচনা করে বলা হচ্ছে যে, তারা নিছক পার্থিব সাময়িক স্বার্থের কারণে সত্যকে গোপন করে চলেছে। এর ফলে তাদেরকে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আজ যেভাবে তারা আল্লাহর বাণীকে উপেক্ষা করছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ওইভাবে উপেক্ষা করবেন। সেদিন আল্লাহর অভিশাপ এবং অপমান হবে তাদের ভাগ্য লিখন।

পরিশেষে 'বিররুন' (নেকী বা সৎকর্ম) এর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনায় ঈমান ও সৎ কাজের ভিত্তিগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ঈমানী চিন্তাধারার মধ্যে অবস্থিত ভুল ভ্রান্তিগুলো সবার নযরে ধরা পড়েছে। বলা হচ্ছে 'বিররুন' বা নেকীর কাজ শুধু পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করাকেই বুঝায় না বরং 'বিররুন' বলতে চিন্তা-চেতনায় ও কাজ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলাকে বুঝায়।

ইতিপূর্বেকার আলোচনার সাথে এ বর্ণনার বেশ সংগতি দেখা যায়, এর কারণ এই বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটি কোরআনী আয়াত যুদ্ধাবস্থা কেন্দ্রিক। এই যুদ্ধাবস্থা দু'ধরনের চিত্রকে সামনে উপস্থাপন করে। এক, জাহেলী যুগে গড়ে ওঠা মানুষের ভুল চিন্তা চেতনাকে সংশোধনের জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। দুই, বাস্তব ময়দানে ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অপপ্রচারের মোকাবেলায় দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা এবং বিজয়ের লক্ষ্যে বাস্তব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

আলোচ্য পাঠের লক্ষ্য হচ্ছে, যে নীতিমালার ওপর সঠিক ঈমানী চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠেছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা। এই সাথে মদীনার সেই সকল ইহুদীদের মোকাবেলা করার পদ্ধতি

আলোচিত হয়েছে যারা সত্যকে মিথ্যার দ্বারা ঢেকে ফেলার নিরন্তর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো এবং সত্যের মর্যাদা সঠিকভাবে জানা সত্তেও সত্যকে গোপন করতে সর্বপ্রকার চেষ্টা বহাল রেখেছিলো। মুসলমান সমাজে অস্থিরতা ও পেরেশানী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তারা অহরাত্রি গোপন ষড়যন্ত্রে মেতেছিলো। আলোচনার যে ভংগী এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে এই বিরোধিতা শুধু ইহুদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো মনে হয় না। মনে হয় ইসলাম বিরোধী সকল পর্যায়ের মানুষের কথা এখানে এসেছে যারা ইসলামের দাওয়াতকে ঠেকানোর জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলো এবং মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে নানাপ্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে চলেছিলো।

এই প্রসংগেই সাফা ও মারওয়াহ (পাহাড়দ্বয়ের) তওয়াফ সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা দেখতে পাচ্ছি। এই তওয়াফের ব্যাপারে অনেকের কাছে এ কাজটিকে জাহেলী যামানার রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ মনে হচ্ছিলো, আর ইতিমধ্যে কেবলা পরিবর্তনের যে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিলো এবং মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়ার কারণে যে অপপ্রচার শুরু হয়েছিলো তার কারণে উদ্ভূত সমস্যার সাথে মিশে এ সমস্যাটা বেশ জটিল হয়ে পড়েছিলো। আর এ ঘরে এসে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনকে কেন্দ্র করেও অপপ্রচার তুংগে উঠেছিলো।

এই কারণেই নিম্নলিখিত আলোচনায় আহ্‌লে কেতাবদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে ,যারা তাদের কাছে অবতীর্ণ স্পষ্ট বর্ণনা ও পথের দিশা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণগুলোকে গোপন করে চলেছিলো। শুধু তাই নয়, তারা মুসলমানদেরকে নিষ্ঠুর আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দুতে পরিণত করেছিলো। অবশ্য আলোচনার মধ্যে তাওবাকারীদের জন্যে ক্ষমার দ্বার সদা-সর্বদা অবারিত রাখার কথা বলা হয়েছে, এ আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্যে সকল দিক থেকে লা'নত (অভিশাপ) এবং চিরস্থায়ী কঠিন আযাব রয়েছে।

এরপর এসেছে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে আলোচনা, তার সাথে এসেছে সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনসমূহের ওপর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কিছু কথা। আরও এসেছে ওই সকল লোকদের পর্যালোচনা যারা অন্য কাউকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে। তারপর পেশ করা হয়েছে কেয়ামতের দৃশ্যের বিবরণ। সেখানে যারা প্রবেশ করবে এবং যারা সে দৃশ্য দেখবে তারা একে অপর থেকে পৃথক থাকার কথা বলতে থাকবে এবং তারা যে, আযাবের দৃশ্য দেখতে থাকবে সে দৃশ্যের বিবরণও পেশ করা হয়েছে।

এ প্রসংগে হালাল ও হারাম খাদ্য বস্তু ও পানীয় সম্পর্কিত ইহুদীদের তর্ক-বিতর্কের কথাও জানানো হয়েছে, অথচ সে সকল বস্তু সম্পর্কে কোরআনে কারীম পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে এবং হালাল হারাম সংক্রান্ত সে সব বিবরণ তাদের কাছে অবস্থিত তাওরাতে বর্তমান রয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে তারা গোপন করে রেখেছে। সমগ্র মানবমন্ডলীর ভোগ ব্যবহারের জন্যে আল্লাহ তায়ালা হালাল বলে ঘোষণা করেছেন যে বস্তুকে সেইগুলো গ্রহণ করার দাওয়াতই তো কোরআনে কারীম পেশ করেছে এবং ওই ভয়ানক শয়তান থেকে দূরে থাকার জন্যে সতর্ক করেছে। যে সদা-সর্বদা মানুষকে অন্যায় ও অপকর্ম করার জন্যে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু আহ্‌লে কেতাবরা সেগুলোকে গোপন করে রেখে তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে। এজন্যে এ প্রসংগে বিশেষভাবে মোমেনদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন সকল হারাম খাদ্য বস্তুগুলোকে ভোগ ব্যবহার বর্জন করে এবং যাবতীয় হারাম নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে ত্যাগ করে। এ নির্দেশগুলো আসার সাথে সাথে ইহুদীরা এতো সব বাছ-বিচার করে চলা সম্ভব নয় বলে বাক-বিতন্ডা শুরু করে দিয়েছিলো।

অথচ তারা ভালো করেই জানে যে, সেগুলো সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং সে নিষেধাজ্ঞা আমোঘ, যার ওপর মন্তব্য করার আধিকার কোনো ব্যক্তির নেই, থাকতেও পারেনা।

এরপর কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে ওই সকল ব্যক্তির যারা আল্লাহর কেতাবে নাযিলকৃত হুকুম আহকামকে গোপন করে এবং অতি অল্প মূল্যে (দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী স্বার্থে) বিক্রয় করে দেয়, তাদেরকে তীব্রভাবে ধমকানো হয়েছে ।

এই পাঠ এর পরিসমাপ্তিতে 'বির' বা নেকী-র-তাৎপর্য সম্পর্কে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে ঈমান ও সেই সাথে সৎ কাজের নামই হচ্ছে 'বির' বা নেকী। এই 'বির'-এর চেতনা দ্বারা ঈমানী ধ্যান ধারণার পরিশুদ্ধি আসে। বাহ্যিক কিছু অনুষ্ঠানই 'বির' নয়, এবং পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করলেই নেকী বা 'বির' অর্জিত হয় না বরং তা হয়ে থাকে যুক্তি-বুদ্ধির সাথে বুঝে সুঝে মানুষের জন্যে কল্যাণকর (ভালো) কাজ করা এবং এই ভাবেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। আশা করা যায় এই আলোচনার মাধ্যমে কেবলা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিলো তার অবসান হবে এবং এ প্রশ্নের বিষয়টি সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীভূত হবে।

এইভাবে আমরা কেবলা পরিবর্তনের বিষয়ের ওপর উদ্ভূত পরিস্থিতিটা বুঝতে পারি। আসলে ধ্যান-ধারণার পরিশুদ্ধিকল্পে সংঘাত গড়ে উঠেছে উভয় পক্ষের অন্তরের মধ্যে এবং এ বিষয়ের সুষ্ঠ জবাব আসা প্রয়োজন ছিলো, যাতে মানুষের ধ্যান-ধারণার অস্বচ্ছতা দূরীভূত হয় এবং তারা সঠিকভাবে কেবলার মূল্যায়ন করে এ প্রসংগে মুসলমানদের চির শত্রুদের ষড়যন্ত্র তাদের নীচুতা এবং মুসলমানদেরকে হেয় করার জন্যে তাদের পেরেশানীকে তুলে ধরা হয়েছে।

সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন

এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় করে তাদের জন্যে এই উভয় পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো কোনো দোষের কাজ নয়, যদি কোনো ব্যক্তি অন্তরের নিষ্ঠার সাথে কোনো ভালো কাজ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার খবর রাখেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি তার বিনিময় প্রদান করেন।'

উপরোক্ত আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে সব থেকে যুক্তিসংগত এবং গ্রহণযোগ্য হাদীস হচ্ছে ওই হাদীসটি, যা একেবারে গোড়ার দিকের মোহাজের ও আনসারদের লোকেরা অনুমোদন করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ,

কিছু সংখ্যক মুসলমান হজ্জ ও ওমরাহ্ করার সময় সাফা এবং মারওয়াহ্ পাহাড় দুটির তওয়াফ করাকে আপত্তিকর মনে করলো, কারণ ইসলাম পূর্ব যুগে লোকেরা ওই দুটি পাহাড়ের মাঝে 'সাঈ' করতো অর্থাৎ (দৌড়াতো), আর ওই দুটি পাহাড়ের একটির উপরে 'আসাফ' নামক মূর্তি এবং অন্যটির ওপর 'নায়েলা'র মূর্তি রক্ষিত ছিলো। সুতরাং, জাহেলী যুগের লোকদের মতো ওই দুই পাহাড়ের তওয়াফ করাকে মুসলমানরা পছন্দ করতো না।

বোখারীর হাদীসে বলা হয়েছে,

আসিম ইবনে সুলাইমান বলছেন, আমি আনামকে সাফা ও মারওয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা এটাকে জাহেলিয়াতের কাজ মনে করতাম। তারপর ইসলামের

আগমন ঘটলে এগুলোর তওয়াফ করা থেকে আমরা বিরত রইলাম। কাজেই মহান আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন, ('ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়াইরিল্ লাহ্।') শা'বী বলেন, আসাফ্ মুর্তিটি সাফা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিলো এবং মারওয়াহ্ পাহাড়ের ওপর ছিলো নাইলাহ্। তখনকার মানুষ এদের সামনে মাথা নত করে পূজা করতো। ইসলামের আগমনে মুসলমানরা এ কাজকে অসুবিধাজনক মনে করলো, তারপর এই আয়াতটি নাযিল হয়।

উপরে বর্ণিত হাদীসটি থেকে আলোচ্য আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার দিন তারিখ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে, এটা বুঝা যায় যে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পরই এ আয়াতটি এসেছে। এর সাথে আরও জানা যায় যে, এ সময়ে মক্কা নগরী মুসলমানদের জন্যে দারুল হরব (যুদ্ধ ক্ষেত্র তুল্য বা) শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তারপরও ওই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো ব্যক্তির হজ্জ ও ওমরাহ্ করার সুযোগ হয়তো হয়ে থাকবে এবং সেই কারণে সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফ করাকে হয়তো তারা খারাপ মনে করছিলো। এই খারাপ মনে করাটা, রসূল (স.)-এর দীর্ঘদিনের শিক্ষা দানের ফসল ছিলো এবং তাদের অন্তরের মধ্যে ঈমানী যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছিলো তার কারণেই জাহেলিয়াতের যামানায় প্রচলিত কার্যকলাপ ও রীতিনীতির প্রতি তাদের ঘৃণাবোধ জন্ম নিয়েছিলো। প্রতি ব্যাপারেই তারা জাহেলিয়াতের আমলের সব কিছু সম্পর্কে চিন্তা করতো। এগুলো ইসলাম বিরোধী নয়তো? এগুলোতে আল্লাহ তায়ালা নাখোশ হবেন না তো? অনেক ব্যাপারেই তাদের মনে এসব প্রশ্ন জাগতো।

ইসলামের এই নতুন দাওয়াত তাদের অন্তর-প্রাণকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে তুলেছিলো এবং এই ইসলামী চেতনার মধ্যে গভীরভাবে তারা নিজেদেরকে নিবেদন করেছিলো, যার ফলে তাদের মনোজগতে সৃষ্টি হয়েছিলো মহাবিপ্লব এবং পুরোপুরিভাবে তাদের বিবেক জেগে উঠেছিলো, যার কারণে জাহেলী যুগে কৃতকর্মসমূহের দিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো। তারা গভীরভাবে অনুভব করতো যে, তাদের বর্তমান জীবন অতীত জীবনের অধ্যায়গুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে দিকে আর ফিরে তাকানো যেতে পারে না। বাস্তবেও আর কেউ সে জীবনে ফিরে যায়নি। যে জীবন তারা ছেড়ে এসেছে তার সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট এবং নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিলো যে সে জীবন ছিলো পুঁতিগন্ধ এক ঘৃণ্য অধ্যায় যার দিকে ফিরে তাকানোও আর সম্ভব নয়।

জাতির জীবনের এই শেষ পর্যায়ের ওপর যারা দৃষ্টিপাত করে তারা গভীরভাবে অনুভব করে যে, অন্তরের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে আকীদা বিশ্বাসের প্রভাব পড়ে। জীবনের জন্যে গড়ে ওঠা চিন্তা চেতনার মধ্যে মানুষের আকীদা এক সার্বিক এবং বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনে। তাই দেখা যায় রসূলুল্লাহ (স.) যেন তাদের অন্তর প্রাণকে এমনভাবে বশীভূত করে ফেলেছেন যে তাদের গোটা অস্তিত্বের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে, যেন বিশ্বাসের এই প্রভাব প্রবলভাবে তাদেরকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তাদের জীবনের যাবতীয় কদর্যতাকে ঝেড়ে মুছে ফেলেছে এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ইসলাম তাদের দেহ মনের সমগ্র অণু-পরমাণুগুলোকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছে। যেমন বিদ্যুৎ স্পর্শে সমগ্র দেহের অণু-পরমাণুগুলো পূর্বের অবস্থা হারিয়ে এক নতুন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই হচ্ছে ইসলাম, যা জাহেলী যামানার জীবন থেকে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করে এবং জাহেলী যামানার সমস্ত অকল্যাণকর অভ্যাস ও ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে, মানুষের জীবনকে

নতুনভাবে ঢেলে সাজায়। জাহেলী যামানায় গড়ে ওঠা প্রত্যেকটি চিন্তা চেতনা ও ব্যবহারকে পরিহার করে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে ইসলাম সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এর ফলে, মোমেন ব্যক্তির অন্তর প্রাণ নবাগত চিন্তাধারার যাবতীয় দাবী পূরণের জন্যে একনিষ্ঠ হয়ে যায়। মুসলিম জামায়াতের লোকদের অন্তরে যখন ইসলামী চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন অতীতের কোন কোন কাজ ও অভ্যাসকে গ্রহণ করা সম্ভব, সে বিষয়ে চিন্তা করে এবং তারা শুধু এমন সব কাজই করে যাতে করে মানুষের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ব্যাহত না হয়। সব কিছুকে ইসলামের নীতি-নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত রেখে অতীতের অভ্যাসগুলো থেকেও জীবনের জন্যে কিছু সংযোজন করা যায়। কাজেই মুসলমান যখন কোনো কাজ বা ব্যবহার করে তখন সে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবেই তা করে, অতীত জাহেলিয়াতের বাঁধন ছেঁড়া মানুষ হিসেবে সে কোনো কাজ করে না। তার চিন্তা-চেতনা ভরপুর থাকে ইসলামের মূল মন্ত্রে।

এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি সুন্দর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই উপরে বর্ণিত আয়াতের মধ্যে। যেখানে কোরআনের বক্তব্য শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে, 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শগুলোর মধ্য থেকে একটি।'

অবশ্যই সাফা ও মারওয়া নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত– একথা জানার সাথে সাথে যখন মানুষ তওয়াফ করে তখন সে গভীরভাবে অনুভব করে যে, সে আল্লাহর প্রতীকী কাজগুলোর একটি আদায় করছে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো বা তাওয়াফ করা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার উদ্দেশ্য। (যেহেতু এই কাজ পুণ্যবতী নারী হাজেরার পানির জন্যে দৌড়াদৌড়ি এবং পরিশেষে আল্লাহর রহমতে পানি প্রাপ্তির ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়)। এই তওয়াফ এর সাথে জাহেলী যুগে দুই পাহাড়ের ওপর স্থাপিত মূর্তির উদ্দেশ্যে তওয়াফের কোনো সম্পর্ক নেই। এই তওয়াফের উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন– জাহেলী যুগের আসাফ বা নায়েলা বা অন্য কোনো মূর্তির সাথে নয়।

এই কারণেই বর্তমানের এই তাওয়াফে কোনো অসুবিধা বা কোনো গুনাহ্ নেই। ওই সময়ের কাজ আর বর্তমান সময়ের কাজ এক নয়। তখনকার উদ্দেশ্য এবং এখনকার উদ্দেশ্যও এক নয়। ওই সময়ে কোনো দিকে মুখ করা বর্তমান যামানায় কোনো দিকে মুখ করার ফলও এক নয়। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'অতএব, যে ব্যক্তি কাবাঘরে হজ্জ করবে অথবা ওমরা করবে তার জন্যে এগুলোর তাওয়াফ করায় কোনো অসুবিধা নেই।'

জাহেলী যুগে আরবরা হজ্জের যেসব অনুষ্ঠান পালন করতো তাদের অধিকাংশগুলোকে ইসলাম বহাল রেখেছে এবং যেগুলো মূর্তিপূজার সাথে জড়িত ছিলো অথবা যে সকল অনুষ্ঠান কুসংস্কার বিজড়িত ছিলো সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কিন্তু যেসব অনুষ্ঠানকে বহাল রাখা হয়েছে সেগুলোকে ইসলামের নতুন চিন্তাধারার সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওইগুলো ইবরাহীম (আ.)-এর চালু করা অনুষ্ঠান যা তিনি তাঁর বলা এবং শেখানো পদ্ধতিতে চালু করেছিলেন (সূরার মধ্যে হজ্জ এর ফরয হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা যখন আসবে তখন এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করবো ইন্শাআল্লাহ)। হজ্জ ও ওমরাহ্র অনুষ্ঠান প্রায় একই প্রকারের, পার্থক্য শুধু এই যে ওমরাহ্তে আরাফাতের প্রান্তরে অবস্থান করার অনুষ্ঠানটি নেই কিন্তু হজ্জ ও ওমরাহর মধ্যে সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাওয়াফ করা সমভাবে জরুরী।

স্বতস্ফূর্তভাবে যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে তার কাজের প্রশংসা করে আয়াতটির পরিসমাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'স্বেচ্ছায় ও নিজ খুশীতে যে কোনো ভাল করবে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তার কাজের সঠিক মূল্যায়নকারী হয়ে যাবেন।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই কথার ধরণে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাওয়াফ করা ভালো বা নেক কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ইংগীত দ্বারা তওয়াফকারীদের মন থেকে যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দকে দূরীভূত করা হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তাদের অন্তরে পবিত্রতার এক অনুভূতি দান করা হয়েছে। এই কাজটিকে ভাল কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মনকে করা হয়েছে প্রশান্ত। আরও জানানো হয়েছে যে, অন্যান্য ভাল কাজের জন্যে যেমন পুরস্কার দেয়া হবে এ কাজের জন্যেও তাদেরকে অনুরূপ পুরস্কার দেয়া হবে, কেননা তিনি তো ভালো করেই জানেন মানুষের অন্তরে কী ইচ্ছা জাগে এবং কোন উপলব্ধি নিয়ে সে কী কাজ করে।

অবশ্য ওই ওহীর মাধ্যমে আগত ব্যাখ্যা সম্পর্কে আসুন আমরা কিছুক্ষণের জন্যে একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখি। আল্লাহর বাণীর এই যে অংশটুকু অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মূল্যায়নকারী, কদরদানকারী এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য বুঝা যায় যে, ওই কাজটিতে আল্লাহ তায়ালা বড়ই খুশী এবং ওই কাজের জন্যে তিনি বহু সওয়াবও দেবেন। তবে, 'শাকিরুন' শব্দের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি পুরোপুরি কৃতজ্ঞ এই বলে একটি ক্ষীন অর্থ বুঝা যায়। আসলে এই শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হবেন। এতো সন্তুষ্ট হবেন তিনি যেন বান্দার ভালো কাজের দরুণ তার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। এতে আন্দাজ করা উচিৎ যে বান্দা যে নেয়ামত নিশিদিন ভোগ করে চলেছে তাতে তার কতোখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ এবং কিভাবে তাঁর হুকুম পালন করে তাঁর প্রশংসা করা প্রয়োজন। এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশভংগীর এক প্রকৃষ্ঠ ছবি যা অনুভূতিকে সজাগ কোমল ও সুন্দর করে তোলে।

সত্য গোপনকারীদের ভয়াবহ পরিনতি

সাফা ও মারওয়াহ্ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা পেশ করার পর কোরআনে কারীম এই প্রসংগে ওই সকল ব্যক্তির কঠোর সমালোচনা করেছে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত স্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ যুক্তিপূর্ণ কথা ও হেদায়াতের কথাগুলোকে গোপন করে রেখেছে। তারা হচ্ছে সেই ইহুদী সম্প্রদায়, যাদের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে এই সূরার মধ্যে দান করা হয়েছে। একথাও জানানো হয়েছে যে মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং কাবা ঘরের হজ্জ ফরয করার প্রসংগে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও অবিরাম ষড়যন্ত্র বরাবরই চলতে থেকেছে। এরশাদ হচ্ছে,

যারা আমার নাযিল করা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও পরিষ্কার পথনির্দেশকে গোপন করে, ...(আমার সাথে কুফুরীর) সেই ভয়াবহ শাস্তির মাত্রা এদের জন্যে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। (আমার দন্ডাজ্ঞা বাস্তবায়নে) তাদের ওপর কোনো রকম বিলম্ব করা হবে না।

আহলে কেতাবরা তাদের কাছে বিদ্যমান কেতাব থেকে মোহাম্মাদ (স.)-এর রেসালাত যে যথার্থ তা ভালো করেই জানতো, আর যে নির্দেশগুলো তিনি তাদেরকে দিচ্ছিলেন তা যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হয়েছে তাও তারা উপলব্ধি করতো। এতদ্সত্তেও সেই কথাগুলোকেই তারা গোপন করছিলো যা তাদের কাছে রক্ষিত কেতাবে আল্লাহ তায়ালা

পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। ওই সকল সত্য গোপনকারী এবং তাদের অনুরূপ সত্য বিরোধী লোক সকল যামানাতেই আছে ও থাকবে। বিবিধ কারণেই তারা আল্লাহর প্রেরিত সত্যকে গোপন করে। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে তাদের গোপন করার অপচেষ্টা মানুষ দেখতে পায়। তারা দেখে, কেতাবের অধিকারী ওইসব ব্যক্তি, জেনে বুঝে কেমন করে সত্য প্রকাশের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতো এবং গোপন করে রাখতো ওইসব কথাকে যা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদিও তারা গভীরভাবে সে কথাগুলো বিশ্বাস করতো।

তারা আল্লাহর কেতাবের মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন নিদর্শনকে মানতো না, প্রকাশও করতো না, বরং নীরব থাকতো ও সত্যকে গোপন করতো। যাতে এই আয়াত (নিদর্শনগুলো) থেকে যে সত্য ফুটে ওঠে সেগুলো থেকে মানুষের দৃষ্টি ফিরে যায়, যেন মানুষের শ্রবণে ও অনুভূতি থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যায় ওই সকল তথ্য। আর এসব কিছু করতো তারা নিছক পার্থিব স্বার্থ লাভ করার উদ্দেশ্যে। এই বিষয়টি এখন আমরা বহু যায়গায় দেখছি, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন ইসলামের বহু সত্যকে গোপন করে দেয়া বা সত্য প্রতিষ্ঠার পথকে বাধাগ্রস্ত করা। এদের সম্পর্কে রব্বুল আলামীন এর ঘোষণা,

'তারা হচ্ছে সেই সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা লা'নৎ বর্ষণ করছেন এবং অন্যান্য অভিশাপ দানকারীরাও অভিশাপ দিচ্ছে।'

তাদের অবস্থা হচ্ছে এই– যেন তারা একটি অভিশপ্ত স্থানে পৌঁছে গেছে এবং সর্বদিক থেকে তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়ে চলেছে। আল্লাহর অভিশাপের পাশাপাশি সকল কিছু থেকে অভিশাপ এসে যেন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে।

লা'নৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভীষণ ক্রোধের সাথে কাউকে তিরস্কার করা। ওরা এমন সৃষ্টি যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সর্বক্ষণ লা'নৎ পাঠাচ্ছেন এবং তাঁর রহমত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্বচরাচরের অন্যান্য সকল সৃষ্টিও ওই অভিশপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সকল দিক থেকেই লা'নৎ বর্ষণ করে চলেছে। এই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সদাসর্বদা তাদের প্রতি লানৎ বর্ষিত হয়ে চলেছে।

এই অবিরাম লা'নৎ বর্ষণ ধারা থেকে তারাই রেহাই পেতে পারে, যারা তাওবা করেছে এবং সংশোধন করে নিয়েছে নিজেদেরকে এবং সত্য প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে, তাদের তাওবা আমি কবুল করবো এবং আমিই তাওবা কবুলকারী মেহেরবান।'

কোরআনে কারীম এইসব লোকের মুক্তির জন্যে একটি শুভ্র সমুজ্জল পথ খুলে দিয়েছে, আর সে পথ হচ্ছে তাওবার পথ (সর্বান্তকরণে মন্দ পথ পরিহার করে সত্যকে মযবুত করে ধারণ করার পথ)। এই পথ খোলার সাথে সাথে হৃদয় মনে আশার মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং অনুতপ্ত হৃদয়গুলোকে মহা দয়াময়ের মোহাব্বাতের 'নূর'-এর প্রস্রবনের দিকে এগিয়ে দেয়। তখন তারা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশামুক্ত হয়ে আশার আলোয় বুক বাঁধে। তাঁর ক্ষমা থেকে নৈরাশ্যও দূরীভূত হয়। অতএব, যে কোনো প্রার্থী ও আকাংখী ব্যক্তি চাইলে ফিরে আসুক ওই মহা নিরাপত্তাময় আশ্রয়কেন্দ্রে পূর্ণ সদিচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে।

আর সঠিক তাওবার লক্ষণ হচ্ছে মানুষের কাজের মধ্যে সংশোধন আসা, কথা যুক্তিপূর্ণ ও স্পষ্ট হওয়া, তার মুখ থেকে সত্যের ঘোষণা বেরিয়ে আসা, সত্যকে হৃদয়-মন দিয়ে মেনে নেয়া এবং সত্যের দাবী অনুযায়ী বাস্তব কাজ করা। তাওবা করার ফলে মানুষের মধ্যে যখন এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তখনই সে আল্লাহর রহমতের হকদার হয় এবং তার তাওবা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তাই এই পর্যায়ে এসে তিনি বলছেন,

'আমিই তো একমাত্র তাওবা কবুলকারী, মহা দয়াময়। আর অবশ্যই তিনি সব থেকে সত্যভাষী।'

অপরদিকে যারা অন্যায় ও অসত্যের ওপর জিদ করে টিকে থাকে এবং ভুল স্বীকার করে তাওবা করে না, এমনকি অবশেষে তাদের সকল সময় ও সুযোগ হারিয়ে যায় এবং ভাল হওয়ারও যখন আর কোনো পথ থাকে না, তখন তারাই হয়ে যায় সেইসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর কঠিন গযব নাযিল হবে যার বর্ণনা ইতিপূর্বে এসে গেছে, যার বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিম্নোক্ত আয়াতেও করা হয়েছে,

'যারা (এই ধরনের) কুফুরী করেছে এবং ওই কুফুরী করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তারাই হচ্ছে সেইসব লোক যাদের ওপর আল্লাহর লা'নৎ ফেরেশতাদের লা'নৎ এবং সমগ্র মানব মন্ডলীর সকলের লা'নৎ অবধারিত। এই লা'নতের মধ্যেই তারা চিরদিন থাকবে। এই অভিশাপের সাথে থাকবে কঠিন আযাব, যা কোনো সময় কম করা হবে না এবং তাদেরকে ওই আযাব থেকে বের হয়ে আসারও কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।'

তাদের এই কঠিন দুরাবস্থার কারণ এছাড়া আর কিছু নয় যে তারা নিজেরাই সকল সুযোগ আসার পথগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে, যেগুলো অবশ্যই এক পর্যায় পর্যন্ত তাদের জন্যে খোলা ছিলো, আজ তাদের সকল সুযোগ হারিয়ে গেছে, এমন কোনো সময় তাদের হাতে আজ আর নেই যার সদ্ব্যবহার করে তারা ওই আযাব থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কি করে তারা রেহাই পাবে? তারা সত্যকে গোপন করার জন্যে, আচ্ছন্ন করে রাখার এবং ভুলের মধ্যে টিকে থাকার জন্যেই তো বদ্ধপরিকর ছিলো। এই জন্যেই আল্লাহর ঘোষণা,

'তারাই সেই সব ব্যক্তি যাদের ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের লা'নৎ (নির্ধারিত)। এ এমন এক অভিশাপ যার থেকে বাঁচার বা যার কষ্ট শেষ হওয়ার কোনো উপায় নেই।'

এ প্রসংগে 'লা'নৎ'-এর উল্লেখ ব্যতীত আযাবের অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়নি, বরং এ লা'নৎকেই আযাব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা কিছুতেই তাদের ওপর কম করা হবে না বলে উল্লেখ হয়েছে। ওই আযাবের সময়ও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি বা কোনো সময় একটু ঢিল দেয়া হবে বলেও কোনো আভাস দেয়া হয়নি, বরং কথার ভংগীতে বুঝা যায় যে, এ আযাব হবে সকল আযাবের বড়। এ হবে তিরস্কারের, আগুনে নিক্ষেপ করার ও চরম দুখ কষ্টের ঘৃণ্য শাস্তি। এ অবস্থায় তাদের জন্যে কোনো দরদী এগিয়ে আসবে না, এ আযাবের দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারে এমন কোনো চোখও তখন বর্তমান থাকবে না, আর থাকবে না এমন কোনো জিহবা যা একটু সহানুভূতির কথা উচ্চারণ করবে। তারা হবে নিন্দিত ধিকৃত মানুষের অন্তর-মনে ধিকৃত, বিতাড়িত এবং মহান প্রতিপালকের কাছে সকল দিক থেকে পরিত্যক্ত। এরা পৃথিবীবাসীর কাছে হবে চরম ঘৃণা ও ধিক্কারের যোগ্য। তেমনি উর্ধাকাশের সকল সৃষ্টির কাছেও সমানভাবে নিন্দিত। এই-ই হচ্ছে তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক ও অপমানকর শাস্তি।

বিশ্বলোকে তাওহীদের নির্মল ছায়া

এরপর আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে মহান তাওহীদের মূলনীতির ভিত্তিতে ঈমানী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টির সেইসব দৃশ্যকে পেশ করা হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই। তারপর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কোরআনে কারীম সেইসব লোকের সমালোচনা করছে যারা অন্য কাউকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে। কোরআন

মজীদ তাদের সেই সময়কার মর্মন্তুদ ছবি তুলে ধরেছে যখন তারা স্বচক্ষে কেয়ামতের আযাব প্রত্যক্ষ করবে। ওই কঠিন অবস্থায় একে অপরের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক মুক্তির ঘোষণা দেবে কিন্তু এতে তাদের কোনো লাভ হবে না, তখন তাদের আফসোস করাতেও কোনো ফায়দা হবে না এবং দোযখের আগুন থেকেও তাদেরকে কোনো জিনিস বের করে আনতে পারবে না। এ প্রসংগে এরশাদ হচ্ছে,

তোমার আল্লাহ তো এক ও একক সত্ত্বা। এই আসমান যমীন ও বিশ্বভুবনে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো 'মাবুদ' নেই। তিনি দয়ালু, তিনি অনেক মেহেরবান। ......

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকান্ডগুলোকে তাদের সামনে একরাশ লজ্জা ও দুঃখের প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরবেন। (এর অনিবার্য পরিণাম হিসেবে তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে, কোনো অবস্থায়ই) এরা (আর সেই স্থায়ী নিবাস) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

আল্লাহর একত্বই হচ্ছে সেই প্রধান নীতি যার ওপর ঈমানের ধ্যান ধারণা দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালা যে চির বর্তমান এবং তাঁর ক্ষমতা সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। মতভেদ রয়েছে শুধু তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলী নিয়ে এবং সৃষ্টির সাথে কোন কোন বিষয়ে এবং কিভাবে তাঁর সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে সেইগুলোকে কেন্দ্র করে, কিন্তু কেউই তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। বিশ্বপ্রকৃতির কোনো কিছু থেকেও তার এই সত্যকে অপ্রমাণ করার মতো কোনো কিছু পাওয়া যায় না। আর সেই সত্যই তো চরম ও পরম সত্য। তবে পরিশেষে আজকের এই আধুনিক যুগে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকারকারী একটি দল পয়দা হয়ে গেলো, যারা সৃষ্টির মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করে বসলো। কিন্তু এ এমন বিরল একটি বিষবৃক্ষ যার ভিত্তিমূল পৃথিবীর কোনো স্থানেই দৃঢ়ভাবে ও স্থায়ী ভাবে শেকড় গাড়তে পারেনি। ইতিমধ্যেই এ হীন মতবাদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে, আর অচিরেই তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথে। ইতিমধ্যেই ওই মারাত্মক ভুল মতবাদের প্রতি মানুষের যে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়েছে তাতে সেদিন সুদূর নয়, যখন সকল স্তরের জনগণ এ পরগাছা মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করে মহাকালের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে এবং ওই মতবাদের প্রবক্তাদের আশ্রয় নেয়ার মতো এক ইঞ্চি যমীনও পৃথিবীর বুকে থাকবে না।

তাই, কোরআনে কারীমের বর্ণনা পদ্ধতিতে সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কিত আলোচনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁর জরুরী গুণাবলীকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং সেই চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। তারপর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে নৈতিক চরিত্রের সকল মূলনীতি ও সাংগঠনিক যাবতীয় শৃংখলা যা ওই মূল চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত এবং যার প্রধান কথাই হচ্ছে এ কথা প্রকাশ করা যে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সেই একক সত্ত্বার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের উপাস্য (সব ক্ষমতার মালিক) একমাত্র একজনই, তিনি ছাড়া চূড়ান্ত ও সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই। তিনি মহা দয়াময়, মহা করুণাময়।'

আল্লাহর একত্বের চেতনাবোধ বিভিন্ন কায়দা ও বিভিন্নভাবে এই কথাটাই বলতে চায় যে, যেমন করে সমগ্র সৃষ্টি নির্দ্বিধায় ও চূড়ান্তভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে তেমনি করেই তাঁর আনুগত্য করতে হবে এবং অন্যান্য সৃষ্টি যেভাবে আনুগত্যপূর্ণ মন নিয়ে ব্যবহার করে ও বাস্তব

কাজ করে, মানুষকেও সেইভাবে করতে হবে। সবাই যেমন তাঁর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে জীবন যাপন করে তেমনি করেই আল্লাহর আইন কানুনের অনুসরণ করতে হবে সমগ্র জীবনে। অন্যান্যদের মতোই একমাত্র আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। নীতি নৈতিকতা ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এই তাওহীদেরই মূলনীতির ভিত্তিতে।

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে এখন আমরা দেখতে পাবো কোরআনে কারীমের মূল লক্ষ্য মুসলিম উম্মাহকে ওই মহান ভূমিকায় তাদের যথাযথ অবদান রাখার জন্যে প্রস্তুত করা। তাই, এই সত্য কথাটির বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মক্কী সূরাগুলোতে। এই লক্ষ্যেই কোরআনে কারীম সত্যের শেকড়গুলোকে গভীরভাবে প্রোথিত করেছে এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে যার ফলে মানুষের অনুভূতি শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির কাছে এ সত্য যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি গোটা মানবজাতির যাবতীয় বিষয়কে পরিচালনার জন্যে এ সত্য ব্যবস্থা দায়িত্ব নিয়েছে। এ সত্যের বারবার উল্লেখের অন্য কারণ হচ্ছে যে, এরই ভিত্তিতে কোরআনে কারীম চায় মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করতে এবং তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে। তারপর আল্লাহর প্রধান দুটি গুণের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে– 'আর রাহমান ও আর রাহীম।' তাঁর এই দুই মহান নামের মধ্যে সেইসব দয়া মায়া মমতা বিধৃত হয়েছে যা স্থায়ী ও গভীর এবং যার পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে গোটা সৃষ্টিকুল জুড়ে।

আর এই গোটা বিশ্ব-জাহানই তাঁর একত্ব ও রহমত এর সাক্ষী। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে রাত ও দিনের বিবর্তনে সমুদ্রগামী সেইসব জাহাজে যার থেকে মানুষ লাভবান হয় এবং আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, যার দ্বারা মৃত যমীনকে পুনরায় তিনি জীবন্ত করেছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে সকল প্রকার জীব জন্তুকে, বায়ু-প্রবাহের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চলমান মেঘমালায় (আল্লাহকে বুঝার মতো) অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে সেই জনগোষ্ঠীর জন্যে যারা তাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।'

মানুষের উপলব্ধি শক্তি ও অনুভূতি নিচয়কে সতর্ক করার জন্যে অবলম্বিত বর্ণনার এই পদ্ধতি চোখ ও হৃদয়ের কাছে সৃষ্টির রহস্য রাজি উদঘাটনের জন্যে যথেষ্ট, এসব রহস্য আমাদের হৃদয় মনে ও অনুভূতিতে পুরোপুরি ও সঠিকভাবে ধরা পড়ে না যেহেতু সদা সর্বদা আমরা এগুলো দেখছি। তবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে এগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো যে এসব কিছুর মাধ্যমে কোরআনে কারীম আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তি-ক্ষমতার চিহ্নগুলো আমাদের দৃষ্টির সামনে ফুটিয়ে তুলছে, আমাদের অনুভূতিকে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকিয়ে তুলছে, জীবন্ত করছে মুর্দা হৃদয়কে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখি সাধারণভাবে, এরপর যতো দেখি ততোই বেশী এসব কিছুর গুপ্ত রহস্য আমাদের কাছে ধরা পড়তে, থাকে। তবে অনেক চোখ এমনও আছে যেগুলো প্রথম দৃষ্টিপাতে যে চমক পায় এবং ভীতি ও বিহবলতায় যেভাবে উদাস হয়ে যায়, ক্রমেই সে চমক হারিয়ে ফেলে।

ওই যে দেখা যায় আকাশমন্ডলি ও পৃথিবী, বুদ্ধির অগম্য একটির সাথে অপরটির দূরত্ব, শূন্যলোকে বিচরণরত বিশালকায় গ্রহরাজি দিগন্ত বলয়ে বিস্তৃত ওই নীল আসমানের কিনারাগুলো এবং অজানা অচেনা আরও বহু রহস্যভরা নক্ষত্রমন্ডলী যা নিজ নিজ কক্ষপথে শূন্যলোকে অবিরাম গতিতে আবর্তন করে চলেছে এগুলোর দিকে যখন গভীরভাবে তাকাই তখন আমাদের মাথা ঘুরে যায়। এইসব গুপ্ত রহস্য যখন মনের কোনে উঁকি দিতে থাকে, তখন হঠাৎ করে অজানা একটি চাদর এসে যেন আড়াল করে দেয় সব কিছু। এই যে রহস্যে ভরা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী, এদের

পারস্পরিক দূরত্ব অনুমান করতে না পারলেও এগুলোর বিশালত্ব অনুধাবন না করলেও এবং এগুলোর মধ্যে অবস্থিত গুপ্ত রহস্য ভান্ডার উদঘাটন করতে না পারলেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে এগুলো সম্পর্কে তখন কিছু জ্ঞান দেন, যখন তারা এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে, গবেষণা করে এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করে অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টা সাধনা অনেক অজানা রহস্য জানতে তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য করে।

রাত ও দিনের বিবর্তন– এর অর্থ হচ্ছে আঁধারের পেছনে আলোর আগমন, আলো ও আঁধারের পারস্পরিক আগমন ও নির্গমন অর্থাৎ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, এগুলোর দিকে তাকালে চেতনার মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়, বহু হৃদয় হয় উদ্বেলিত এবং কতোজনের সামনে প্রকাশিত হয় আশ্চর্যজনক অনেক রহস্য। তারপর এসব কিছুর ভয়ভীতি ধীরে ধীরে কম হয়ে যায় যখন মানুষ বারবার এসব দৃশ্য দেখতে থাকে, তবে মোমেনের অন্তর এসব দৃশ্য থেকে ক্রমান্বয়ে আরও নতুন নতুন তথ্য পায়, সব কিছু আল্লাহকে স্মরণ করতে তাকে বেশী বেশী সাহায্য করে এবং প্রতি বারেই সে নতুন কিছু সৃষ্টির সন্ধান পায়।

'সাগরের বুকে যেসব জাহাজ চলাচল করে, যার থেকে মানুষ অনেক লাভবান হয়'। এই আয়াতের ওপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে আমি যে জিনিসটি বুঝতে পেরেছি তা যেন অবিকল আমি বাস্তবে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করছি। আমার নযরে পড়ে মহাসাগরের বুকে আমরা যখন জাহাজে করে পাড়ি জমাই তখন সেই নৌযানটিকে এ বিশাল সাগরের তুলনায় একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিন্দুসম মনে হয়। আমরা দেখি ওই মহাসাগর আমাদেরকে তার বুকে কেমন করে ধারণ করে এবং কেমন করে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যায়। ওই জাহাজে করে পাড়ি জমানোর সময় আমি দেখি আমাদের চতুর্দিকে পর্বতসম উত্তাল তরংগ এবং ওই গভীর নীল বারিধির বুক চিরে যখন আমাদের নৌযান এক দেশ থেকে আর এক দেশে বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে এগিয়ে যায় তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগতে থাকে কোন সে শক্তি, কে সে মহা দয়াময় যিনি আমাদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌছে দেন? সে তো একমাত্র মহান আল্লাহরই শক্তি এবং তিনি তো সেই মহা করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিরাপদে মনযিলে মকসুদে পৌছে দেন। এটা আল্লাহর অমোঘ বিধানের একটি অংশ যে এই গভীর ও ভয়াবহ সাগরের উন্মত্ত তরংগের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ওই ক্ষুদ্র নৌযানে করে পৌছে দেন তার অভিষ্ট লক্ষ্যে।

আর আকাশ থেকে আল্লাহ তায়ালা যে পানি বর্ষণ করেছেন, পৃথিবী মরে যাওয়ার পর তাকে আবার যেন্দা করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে সকল প্রকার জীবজন্তু (এ সবের মধ্যে) এবং বায়ুর পরিবর্তন ও আসমান জমীনের মাঝে চলমান মেঘমালার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে। এসব কিছুই চোখকে খুলে দেয়ার মতো অত্যাশ্চর্য দৃশ্য, এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে মানুষ অবশ্যই চিন্তা করতে বাধ্য হবে। কেননা এই সকল দৃশ্যের দিকে খোলা হৃদয় নিয়ে চিন্তা করার জন্যে এবং উন্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্যাবলী দেখার জন্যে মোমেনকে তিনি আহবান জানিয়েছেন।

অতএব কোনো ব্যক্তি যখন গভীর দৃষ্টি দিয়ে ওইসব দৃশ্য অবলোকন করে তখন আল্লাহর কুদরত ও রহমত দেখে তার সমগ্র সত্ত্বা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। বৃষ্টির পানি পাওয়ার সাথে সাথে শুকনা নির্জীব যমীন সজীব হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অবস্থিত জীবাংকুরগুলোকে যেন্দা করে দেয়, বের করে দেয় অণুসম সেই বীজ কোমল অংকুর যা অত্যন্ত নাজুক আকারে বেরিয়ে এসে ক্রমান্বয়ে শক্তি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে পরিণত হয় বিরাট মহীরূহ। এখন বলুন, কোত্থেকে তারা পায় এ জীবন? হাঁ, এ জীবন ছিলো বীজ, দানা ও আঁটির মধ্যে গুপ্ত ও সুপ্ত অবস্থায়।

কিন্তু আবারও প্রশ্ন জাগবে বীজ ও আঁটির মধ্যে এ প্রাণ এলো কোত্থেকে? এর মূলে কার হাত কাজ করছে? কোন সে উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে এই প্রাণ প্রবাহ? প্রকৃতির বুকে সবখানে যেন লেখা রয়েছে এ প্রশ্নরাশি– যা এড়িয়ে চলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অস্বীকারকারী মোশরেক ও নাস্তিকরা জানে যে এসব প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্বীকার না করে কোনো গতি নেই, এজন্যে তারা এসব প্রশ্ন ভুলে থাকার জন্যে সাধ্যমত ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুর জীবন দান করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই একথা ভুলিয়ে দেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবুও কাফেররা এ সত্য থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাখার জন্যে সৃষ্টির শুরু থেকে সর্বকালে যথাসম্ভব চেষ্টা করে এসেছে। তারা বলতে চায় সর্ব-ক্ষমতার মালিক একজনকে মানতেই হবে এর কোনো প্রয়োজন নেই।

রুশ পন্ডিতগণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, তারা জীবন সৃষ্টির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু তাদের দেশেই অবশেষে তারা তাদের সব থেকে অপ্রিয় সত্য কথাটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে জীবন দান বা জীবন-সৃষ্টি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা তারা এই জন্যে বলতে বাধ্য হয়েছে যেহেতু তাদের মধ্যকার সব থেকে বড় বিজ্ঞানী এ সত্যটি মেনে নিয়েছে। এর আগে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ডারউইনও এ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেছে।

তারপর একবার তাকিয়ে দেখুন বায়ু-প্রবাহের দিকে যা দিক পরিবর্তন করতে করতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং তার ওপর ভর করে মেঘমালা আকাশের শূন্যতায় বলাকার ঝাঁকের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে এ মেঘমালা যেন বন্দী হয়ে আছে। সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন তার অনুগত হয়ে নিরন্তর মেঘমালার নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এ বিচরণ বায়ু প্রবাহের ও মেঘ গঠনের কারণসমূহ নির্ণয় করতে গিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়।

এ কারণগুলো কেন সৃষ্টি হলো এ প্রশ্নও সেখানে গভীর তাৎপর্য বহন করে। বিশ্বজগতের ভারসাম্যপূর্ণ সৃষ্টি, তার গঠন প্রকৃতি এবং একটির সাথে আর একটির গভীর সংযোগ এ সব কিছু মিলেই সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তার ক্রমবিকাশ হচ্ছে। এই জীবন সঞ্চারের সহায়ক হিসেবেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি ও মাটি। এ সব কিছুর মধ্যে যে সব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সবদিক দিয়ে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা করে চলেছে তা গুনতে গেলে হাজারের সংখ্যা অতিক্রম করে যাবে। এদের কোনো একটির অনুপাতের মধ্যেও যদি সামান্যতম ব্যতিক্রম এসে যায় বা পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে গোটা মহাবিশ্ব তছনছ হয়ে যাবে। এসব কিছুর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে যে সত্যটি ভেসে উঠবে তা হচ্ছে এর সব কিছুই মহা শক্তিমান আল্লাহর মেহেরবানী ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চলেছে, যার ফলশ্রুতিতে সব কিছুর অস্তিত্ব টিকে আছে ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে সবকিছু এগিয়ে চলেছে।

'অবশ্যই ওই (সমুদ্রগামী নৌযান চলাচলের) বিষয়ের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই জাতির জন্যে যারা তাদের বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে।'

হাঁ, মানুষ যদি তার বুদ্ধি দ্বারা কোনো জিনিসের প্রতি বেওকুফের মতো না তাকায় বরং সকল উদাসীনতা পরিত্যাগ করে নিজ বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর প্রতি নবতর উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে আসে, সব কিছুর দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকায়, ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত অন্তর দিয়ে বুঝতে চায় সকল রহস্য, পৃথিবীর প্রথম পদার্পণকারীর চমক নিয়ে যদি উপলব্ধি করতে চায়

সব কিছুকে– তাহলে তার চোখ প্রতিটি আলোকচ্ছটাকে লুফে নেবে, বিশাল প্রকৃতির বক্ষে উত্থিত শব্দধ্বনিকে তার কান সংগে সংগে ধরে ফেলবে, উপলব্ধি করবে তার অনুভূতি শক্তি প্রতিটি জিনিসের সঞ্চালনকে এবং এই সকল বস্তুনিচয়ের বিস্ময়কর গূঢ় রহস্য উন্মুখ অন্তর ও হৃদয়গুলোকে ভাবের আবেগে মুগ্ধ করে ফেলবে, আনন্দের আবেগে অবিরতভাবে প্রকম্পিত হতে থাকবে দেহমন।

সত্য সঠিক ঈমান এই সব কাজ অবশ্যই করে থাকে। সত্যের এই বিকাশ রহস্যের এই অনুভূতি মুঠো মুঠো সৌন্দর্য, সব কিছুর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও পরিপূর্ণতার এই গভীর অনুভূতি এবং পৃথিবীর বুকে জীবনের নিরন্তর পদচারণা মহাবিশ্বের প্রদর্শনী গৃহে আল্লাহর শিল্প নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

রহস্য ভরা পৃথিবীর বুকে এত সুষমা বর্তমান থাকা সত্তেও এমন অনেক জ্যোতিহীন চোখ আছে যা এসব দেখতে পায় না, বহু ব্যক্তি এমন আছে যাদের ভোঁতা হৃদয়সমূহ এগুলো হৃদয়ংগম করতে পারে না, যার কারণে তারা বিশ্বজাহানে অবস্থিত আল্লাহর একত্ব ঘোষণাকারী নিদর্শনগুলো দেখা থেকে বঞ্চিত থাকে। আসলে চোখ থাকতেও তারা অন্ধ এবং বুঝ শক্তি থাকতেও তারা বিবেকহীন, এজন্যেই তারা তৌহীদের পথ এড়িয়ে চলে।

আজকের নেতারা সেদিন কতো অসহায়!

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে অন্যান্য অনেককে আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞান করে এবং তাদেরকে সেইভাবেই ভালবাসে যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসা দরকার।

এই কোরআনের মধ্যে পূজ্য জিনিস হিসেবে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় সেগুলো ছিলো পাথর গাছ অথবা তারকারাজি ও গ্রহ উপগ্রহসমূহ, অথবা ফেরেশতা এবং শয়তান। প্রত্যেক জাহেলী যুগে মোশরেকরা আল্লাহর শরীক হিসেবে যাদেরকে গ্রহণ করেছিলো তারা ছিলো হয়তো কিছু পদার্থ অথবা কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্ব অথবা কিছু নিদর্শন অথবা কিছুসংখ্যক কল্পিত শক্তি। এগুলো সবই ছিলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শেরেক। যখন এদেরকে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নামের সাথে মোহাব্বাত ভরা হৃদয় নিয়ে স্মরণ করে অথবা এদের সামনে মাথা নত করা হয় তখন তা স্পষ্ট শেরেকে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন, যখন কারো অন্তর থেকে আল্লাহর মোহাব্বাত দূরীভূত হয়ে ওইসব গায়রুল্লাহর জন্যে এমন মোহাব্বাত পয়দা হয়ে যায়, যা একমাত্র আল্লাহরই পাওনা ছিলো তখন সে অবস্থাটা কতটা মারাত্মক এবং কত ভয়াবহ হবে?

মোমেনরা আল্লাহকে যেভাবে মোহাব্বাত করে সেভাবে আর কাউকে ভালবাসতে পারে না, নিজেদেরকেও নয়, অন্য কাউকেও নয়। কোনো ব্যক্তি বা শক্তি বা কোনো নিদর্শন অথবা পৃথিবীর সাধারণ দৃষ্টিভংগী অনুসারে কোনো মূল্যবোধ সম্পন্ন জিনিস, যার প্রতি মানুষ পাগলপ্রায় হয়ে ছুটে বেড়ায় তাদের কোনো গুরুত্বই একজন মোমেনের অন্তরে থাকতে পারে না।

হাঁ অবশ্যই আল্লাহর মোহাব্বাতে তারা সব থেকে মযবুত। যতো প্রকার মোহাব্বাত হতে পারে এবং যে ভাবেই মোহাব্বাতের পরিমাপ করা হোক না কেন সর্ব বিবেচনায় আল্লাহকে তারা চূড়ান্তভাবে মোহাব্বাত করে, সে মোহাব্বাত শর্তহীন অন্য যা কিছুর মোহাব্বাত মানুষ কল্পনা করতে পারে সব কিছু থেকে বেশী আল্লাহর মোহাব্বাত থাকতে হবে তবেই তো সে মোমেন। এ মোহাব্বাত তুলনাহীন, অন্য কারো সাথে এর পরিমাপ করা যাবে না। আল্লাহর সাথে মোমেনের সম্পর্ককে মোহাব্বাতের প্রতিশব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

বড় চমৎকার এ অর্থ, প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতাকে 'মোহাব্বাত' শব্দ দ্বারা বুঝানোই সঠিক। অতএব, প্রকৃত মোমেন ও আল্লাহর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা অবশ্যই মোহাব্বাতের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আন্তরিক বন্ধনের সম্পর্ক। এ হচ্ছে আত্মিক আকর্ষণ, ভালবাসা ও নৈকট্যের সম্পর্ক, গভীর ভালবাসার আবেগে স্বতস্ফূর্ত পরস্পরকে লাভ করার এক আকুল আকুতি গড়ে তোলে এ সম্পর্ক। তাই এরশাদ হচ্ছে,

ওই সময়ে যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, অনুসরণ যারা করেছে, তাদের থেকে সম্পর্ক মুক্তির কথা ঘোষণা দেবে। তখন তাদের যাবতীয় বন্ধন কেটে যাবে। আর অনুসারীরা সেদিন বলবে। হায়, আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো তাহলে আমরাও ওদের সাথে তেমনি করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন করে ওরা আমাদের সাথে আজ সম্পর্ক ছিন্ন করছে। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজগুলোকে তাদের আফসোসের বিষয় হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু (আফসোস) সেদিন আগুন থেকে কিছুতেই তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

ওরাই তো হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য অনেককে অংশীদার গন্য করেছে। এরা সত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কাজ করে যুলম করেছে, ফলে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ওপরই অত্যাচার করেছে। হায়, একবার যদি সেই অবস্থাটা তারা দেখার চেষ্টা করতো যখন তারা এক আল্লাহর সামনে অপেক্ষারত থাকবে! যদি তারা সেই আযাবের দিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকাতো, যা যালেমদের জন্যে অপেক্ষা করছে! আহ যদি তারা দেখতো সেই দৃশ্য, তাহলে অবশ্যই তারা দেখতে পেতো যে, 'শক্তি সবটুকুই আল্লাহর হাতে।' সুতরাং তাঁর অংশীদারও কেউ নেই বা সমকক্ষও নেই কেউ।

'এবং আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তি-দানকারী।'

অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করেছিলো তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করার দৃশ্য যদি (পূর্বাহ্নে) তারা দেখতো এবং আগত শাস্তিও যদি তারা অবলোকন করতে পারতো, তাহলে আজকে বন্ধুত্বের যে বন্ধনে তারা পরস্পরকে বেঁধে রেখেছে তা অবশ্যই ছিন্ন হয়ে যেতো, তাদের সমস্ত সম্পর্ক ও সহযোগিতা এবং অনুসারী ও যাদের অনুসরণ করা হচ্ছে সবাই তারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। আর অনুসারীরা দুনিয়াতে যাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব মেনে চলতো তার থেকেও তারা বিরত হয়ে যেতো। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে ব্যস্ত থাকবে, অন্য কারো কথা আদৌ মনে থাকবে না। এক আল্লাহরই উপাসনা করা যে প্রয়োজন তার যথার্থতা ও তাৎপর্য সেদিন তাদের সাথে ফুটে উঠবে। আর অসৎ নেতৃত্ব, তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সেদিন আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে, শাস্তির দৃশ্য দেখে সকল শক্তি দর্পীদের শক্তির ফানুস ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। যারা ওইসব মিথ্যুকদের অনুসরণ করতো তারা বলবে,

'যদি আমাদের আর একটিবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো তাহলে আমরাও তাদেরকে তেমনি করে পরিত্যাগ করতাম যেমন করে তারা আমাদেরকে (আজ) পরিত্যাগ করছে।'

সেদিন ওইসব প্রতারিত জনগণ পথভ্রষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইবে। তারা আকাংখা করবে, যদি তাদের সাথে অতীতের উত্তম সম্পর্ক ফিরিয়ে নিতে পারতো। আহা, পৃথিবীতে যদি তাদের আর একবার ফিরে যেতে দেয়া হতো তাহলে তারা ওইসব অক্ষম ও দুর্বল নেতাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিতো যারা প্রকৃতপক্ষে অক্ষম ও অসহায়। পার্থিব জীবনে এই বলে ওরা তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে যে, যে কোনো শাস্তি থেকে ওরা তাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে, কিন্তু হায়, আজ আযাব যখন হাযির, তখন তারা সকল সম্পর্কের কথা অস্বীকার করলো!

এ এক করুণ দৃশ্য কেউ সম্পর্ক না থাকার কথা বলছে, কেউ ফিরে যাওয়ার আকাংখা পেশ করছে, আবার দেখা যাচ্ছে অনুসারী ও যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে বিতর্কের ঝড়, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। তারপর নেমে আসছে উভয় পক্ষের ওপর বেদনাদায়ক শাস্তি। দেখুন এরশাদ হচ্ছে–

এমনি করেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে তুলে ধরবেন যে, তারা শুধু আফসোসই আফসোস করতে থাকবে।

হালাল হারাম ও কোরআনের নীতিমালা

এরপর কোরআন মজীদ মানুষকে জীবনের পবিত্র জিনিসগুলো ভোগ ব্যবহার করার আহ্বান জানাচ্ছে এবং যাবতীয় মন্দ জিনিস থেকে দূরে থাকতে ও শয়তানের অনুসরণ থেকে দূরে থাকার জন্যে সতর্ক করছে, কারণ শয়তান তাদেরকে বরাবর মন্দ ও ক্ষতিকর জিনিসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। হালাল হারামের পার্থক্য না করে যথেচ্ছা ব্যবহার করার জন্যে তাদেরকে ওরা অনবরত প্ররোচনা দিয়ে চলেছে, এইভাবে সে মানুষের সরাসরি আল্লাহর না-ফরমানি করাতে চায়।

কোরআন তাদেরকে আরও সতর্ক করছে যে শয়তান চায় তারা যেন আল্লাহর পথনির্দেশনা থেকে বেপরোয়া হয়ে যায় এবং অন্ধভাবে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে বিশ্বাস করুক যারা কিছু বুঝে না বা কিছু শুনে না এমন কাউকে তারা তাদের কর্ম নির্বাহ করার জন্যে ও সাহায্যের জন্যে ডাকুক এবং তা তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করুক। এইভাবে আলোচ্য আয়াতের বিষয়ের সাথে পূর্বের আয়াতে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর সকল হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলো থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো তোমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ ও নির্লজ্জ কাজ করার জন্যে প্ররোচনা দেয় এবং তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যেন তোমরা এমন কথা উচ্চারণ করো যেগুলো তোমরা জানো না।'

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো তখন ওরা বলে, না না, বরং আমরা তো আমাদের বাপ দাদাদের থেকে যে সব জিনিস পেয়েছি তার অনুসরণ করবো। তাদের প্রতি প্রশ্ন যদি তারা কোনো কিছু না বুঝে এবং সঠিক পথ-বহির্ভূত কাজ করে তবুও কি ওরা তাদের অনুসরণ করবে?

আর কাফেরদের উদাহরণ হচ্ছে সেই প্রাণীর মতো যে শুধু অর্থবিহীন কিছু শব্দ করতে থাকে, যে ডাকের আওয়ায ও আহবানটুকুই শুধু শুনে। আসলে তারা কান থাকতেও বধির, জিহবা থাকতেও মূক এবং চোখ থাকতেও অন্ধ। তারা প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝে না।'

পেছনে বর্ণিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা একাই সর্বময় কর্তা ও সর্বশক্তিমান আর যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানায় তারা এ অপরাধজনক কাজের বদলা স্বরূপ যে শাস্তি পাওয়া উচিত তা অবশ্যই পাবে। এরপর তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর বান্দার রেযেক (জীবন সামগ্রী) দানকারীও একমাত্র তিনিই এবং তিনিই হালাল-হারাম নির্ধারণকারী।

আল্লাহর একত্ববাদের এটা একটা অপরিহার্য অংগ, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে এসে গেয়েছে। সুতরাং, সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই তার রেযেকের ব্যবস্থা করবেন, হালাল-হারামও তিনি ঠিক করে দেবেন শরীয়তের আকীদা বিশ্বাসগুলোর সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

এ পর্যায়ে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যা কিছু ভালো জিনিস সৃষ্টি করেছেন সবই মানুষের জন্যে হালাল করেছেন, শুধুমাত্র সেইগুলো বাদে যেগুলো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কি কারণে হারাম বা হালাল করা হয়েছে তাও জানানো হয়েছে। তাঁর নির্দেশও জানানো হয়েছে যে, এসব বিষয়ে কেউ যেন শয়তানের অনুসরণ না করে কারণ সে তাদের স্পষ্ট দুশমন। সে কখনও তাদেরকে ভাল জিনিসের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে না।

চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে সদা-সর্বদা খারাপ কাজের দিকে এগিয়ে দেয়াই তার কাজ। এজন্যে, হালাল-হারাম তার নিজের পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হওয়া দরকার বলে সে বুঝায়, এ ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কি আছে না আছে তার পরওয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে তারা ইহুদীদের অনুসরণে বাস্তব কাজে নিজেদের সিদ্ধান্তকেই আল্লাহর শরীয়ত মনে করে, মক্কার কোরায়শরাও এই দাবীই করতো। এরশাদ হচ্ছে,

'হে মানুষেরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র জিনিস যা কিছু আছে তার থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো অন্যায় ও লজ্জাকর কাজের জন্যে তোমাদেরকে উস্কানী দেয় এবং চায় যে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে সেই সব কথা বলো যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না।'

পৃথিবীর বৈধ ও হালাল দ্রব্যাদি সম্পর্কে এই চূড়ান্ত নির্দেশ। তবে খুব সামান্য কিছু বিষয় সম্পর্কেই কোরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিজগত ও মানব প্রকৃতির দাবী পূরণ করার ব্যাপারে ইসলামে কতো বেশী প্রশস্ততা রয়েছে। অতএব, বুঝা গেলো আল্লাহ তায়ালা যা কিছু পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের জন্যে আর তাই বিশেষ কিছু জিনিস ছাড়া বাকি সকল জিনিসই মানুষের জন্যে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যেন তারা কোনো ব্যাপারেই ভারসাম্য না হারায় এবং মধ্যপন্থা ত্যাগ না করে। সাধারণভাবে জীবনের সকল পবিত্র জিনিসের ভোগ ব্যবহারের স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং প্রকৃতির চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে তাদের কোনো সংকোচ, সংকীর্ণতা অথবা মনকে কঠিন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে শুধু এইটুকু চান যে তারা জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভোগ ব্যবহার সম্পর্কে একমাত্র তাঁরই হালাল-হারাম বিধান মেনে চলুক, যে শয়তান তার প্রকাশ্য দুশমন কখনও যেন তার ধোঁকায় পড়ে কোনো অন্যায় ও অবৈধ কাজে সে জড়িত না হয়ে পড়ে, কারণ সে কোনো অবস্থাতেই মানুষের কল্যাণ চায় না। তার যত কিছু নির্দেশ বা উস্কানী, তা সবই মানুষের অমংগল অন্যায় ও নির্লজ্জ কাজের জন্যে হয়ে থাকে। শয়তানের আর একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ বিরোধী বানানো এবং তাঁর সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা ছড়ানো, যদিও এসব বিষয়ে সে কারো মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়ী বিশ্বাস পয়দা করতে পারেনা।

পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ

এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো তখন ওরা বলে, বরং আমরা তো আমাদের বাপ দাদাদের পক্ষ থেকে যা পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো।'

এই আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হয়তো ওইসব মোশরেক যাদের সম্পর্কে কোরআনে বারবার কথা এসেছে। যাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান জানানো হয়েছে,

তাদের প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি ও অভ্যাসগুলোকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে এবং জাহেলী যুগে তাদের পিতা-পিতামহদের অনুসরণে সকল বাতিল আচার অনুষ্ঠান ছাড়তে বলা হয়েছে, অথবা তারা হচ্ছে তখনকার ওই সকল ইহুদী যারা নিজেদের বাপ দাদাদের আমল থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন রীতিনীতির ওপর অটল থেকেছে এবং নবাগত এই সত্য 'দ্বীন'কে কোনো ভাবেই গ্রহণ করতে রাযি হয়নি। ওদের মধ্যে যাদের সম্পর্কেই বলা হোক না কেন আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে) শক্তি ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করতে নিষেধ করা এবং যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেকের বিরুদ্ধে কারো অন্ধ অনুকরণ করতে মানা করা। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা যে অন্ধভাবে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করবে তাতে কি তারা একটুও খেয়াল করবে না যে, তাদের বাপ-দাদারা না বুঝে কিছু করেছে কি না বা সঠিক পথে চলেছে কি না।'

ব্যাপারটা কি এমন ছিলো না যে বাপ-দাদাদের আমল থেকে প্রাপ্ত রীতিনীতির অনুসরণে তারা হঠকারিতার সাথে কাজ করছিলো। সুতরাং এটা কী আশ্চর্য ধরনের অন্ধ অনুসরণ ও স্থবিরতা। আসলে এটা তো হচ্ছে ওইসব গৃহপালিত পশুর অবস্থা যারা চীৎকার করতেই থাকে, কিন্তু তাদেরকে যা বলা হয় তার কিছুই তারা বুঝে না। তাদের রাখালরা চীৎকার করে কোনো নির্দেশ যখন তাদেরকে দেয় তখন তারা শুধু সেই আওয়াযটাই শুনে। কি বলা হচ্ছে তা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারেনা। সত্য কথা বলতে কি ওইসব হঠকারী ব্যক্তি ওই পশুগুলো থেকেও বেশী গোমরাহ্। চতুস্পদ জন্তুগুলো তো অন্তত দেখে শোনে এবং চীৎকারও করে কিন্তু ওই মোশরেকরা কানেও শুনে না, কথাও বলতে পারে না এবং চোখেও (সত্যের আলো) দেখে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কাফেরদের উদাহরণ হচ্ছে ওই জানোয়ারের মতো যা শুধু অর্থহীন শব্দই করতে জানে, সে ডাকের আওয়ায শোনে কিন্তু অর্থ বুঝে না। (আর ওই কাফেররা) বধির, বোবা ও অন্ধ, যারা কিছুই বুঝে না।

তারা বধির, মূক ও অন্ধ যদিও তাদের কান, জিহবা ও চোখ আছে। তারা সত্যের আলো থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারে না এবং কোনো পথও তারা পায় না, তাদের অবস্থা হচ্ছে যেন তারা সেই কাজই বুঝে না যে জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ জন্যেই তা পালন করতে পারে না। এই কারণেই তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাদের কান নেই, নেই জিহবা ও চোখ।'

একথাগুলো হচ্ছে তাদের ঘৃণাব্যাঞ্জক চরম উক্তি, যেহেতু তারা তাদের চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে পংগু করে রেখেছে। তারা তাদের জানা বুঝা ও হেদায়াত গ্রহণের পথকেও করে দিয়েছে রুদ্ধ। তারা আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়তের আইন-কানুনের ব্যাপারে আজেবাজে চিন্তা করছে এবং অন্যদের কাছ থেকে তাদের জীবনের চলার পথ গ্রহণ করছে যা মানবরূপে তাদেরকে যে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো সেই পদমর্যাদার খেলাফ।

হালাল হারাম প্রসংগে আরো কিছু কথা

এবার, বিশেষ করে মোমেনদেরকে লক্ষ্য করে কিছু কথা বলা হচ্ছে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সেই সকল বস্তু জায়েয বলে ঘোষণা দিচ্ছেন যা পবিত্র এবং তাদের মনোযোগকে নিয়ামতদাতার প্রতি শোকরগোযারি করার জন্যে আকর্ষণ করছেন। তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন ওই সকল জিনিস সম্পর্কে যেগুলোকে তিনি তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন আর সেগুলো হচ্ছে হালাল জিনিস বহির্ভূত অপবিত্র জিনিস। এরা হচ্ছে ওইসব ইহুদী যারা তাদের কেতাবের মধ্যে উল্লেখিত হালাল হারাম বিধানকে উপেক্ষা করে মনগড়া ব্যবস্থা মতে চলে।

'হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (খাওয়া দাওয়া ও পানাহারের ব্যাপারে) আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি তা তোমরা (নিশংকোচে ও নির্দ্বিধায়) খাও, এবং (আমার দানসমূহ ভোগ করার সময়) আমারই শোকর আদায় করো। যদি তোমরা (নিজেদের বাপ দাদাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে) একান্তভাবে আল্লাহকেই নিজেদের সর্বময় মাবুদ বলে বিশ্বাস করো।'

তিনি অবশ্যই মৃতজন্তুর গোস্ত, সব ধরনের রক্ত ও শূকরের গোস্তকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এমন সব জন্তুর গোস্তকেও হারাম করা হয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই কিংবা উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে নেহায়েত বিপদগ্রস্ত। যদি সে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর আইন ভংগ করার ধৃষ্ঠতা কিংবা সাহস না করে অথবা যে কতোটুকু হলে বিপদ ও ঠেকা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার চাইতে বেশী ভোগ না করে, তাহলে এই অপারগতার সময়ে 'হারাম' খেলে তার গুনাহ হবে না। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা বড়ই ক্ষমাশীল। মানুষ কষ্টের জীবন যাপন করুক এটা তার কাম্য নয়। কারণ তিনি অনেক মেহেরবান।

হালাল হারাম সম্পর্কিত এসব বিধান মজুদ থাকা সত্ত্বেও যে সব ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা-তার কেতাবের অংশ বিশেষকে গোপন রাখে এবং ক্ষেত্র বিশেষ সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের মূল্যে আল্লাহর এসব আদেশ নিষেধকে বিসর্জন দেয়। (আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে তারা যে বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করে। এ হচ্ছে জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি, যা দিয়ে তারা নিজেদের পেট ভর্তি করে রাখে। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না। তিনি তাদের পাপের পংকীলতা থেকে উদ্ধার করে পবিত্রও করে দেবেন না। ভয়াবহ আযাব এদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

এদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, হেদায়াতের আলোকবর্তিকার বদলে গোমরাহীর (অন্ধকার) পথ কিনে নিয়েছে। এবং সঠিক পথে চললে আল্লাহর যে অনুগ্রহ পাওয়ার কথা সে ক্ষমার বদলে (খোদাদ্রোহিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম) কঠোর আযাবের পথ বেছে নিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, এরা ধৈর্য ও সবরের সাথে (ধীরে ধীরে) ধৃষ্টতা ও অহংকার নিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা তো মানব জাতির জন্যে এই নির্ভুল হেদায়াত সহকারে তাঁর কেতাব নাযিল করেছেন। অতপর তার কেতাবে প্রদত্ত হেদায়াতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একপর্যায়ে যারা মতবিরোধে লিপ্ত হলো, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।

দেখুন, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সেই মহামূল্যবান গুণের কথা উল্লেখ করে ডাক দিচ্ছেন যা তাদের পরস্পরকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদেরকে শরীয়তের বিধানগুলোও ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যার থেকে হালাল হারাম বিধান তারা জেনে নিতে পারে। তাদেরকে প্রদত্ত ভোগ্যবস্তুগুলোও স্মরণ করিয়ে নিশ্চিতভাবে তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র রেযেকদানকারী। তাদেরকে তিনি যেসব ভোগ্যবস্তু দিয়েছেন সেগুলোর পবিত্র (নির্দোষ) জিনিসগুলোকে তিনি তাদের জন্যে বৈধ করে দিয়েছেন।

তারপর তাদেরকে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পাক পবিত্র (শরীর, মন ও মানবীয় চরিত্রের বিকাশ সাধনকারী) জিনিসগুলো গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেননি। যা কিছু নিষেধ করেছেন সে শুধু এই কারণে যে সেগুলো অপবিত্র। নিজের কোনো ইচ্ছা পূরণের বা তাদের জীবনকে সংকটাপন্ন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো জিনিস অবৈধ বানাননি। তিনিই তো সৃষ্টির শুরু

থেকে তাদের জন্যে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার প্রকৃতির বুকে দান করেছেন এবং চেয়েছেন যে তারা, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্যের লক্ষ্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক।

সাথে সাথে একথাও তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শোকরগোযারি করা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য এবাদাত। এর মাধ্যমে যে আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে তাতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ওপর খুশী হয়ে যান। এসব কথা একটিমাত্র আয়াতে বর্ণিত অতি অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়েছে। দেখুন বলা হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা আমি (মহান আল্লাহ) যে পবিত্র রেযেক তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা খাও এবং তাঁর শোকরগোযারি করো যদি তোমরা সত্য সত্যই তাঁর আনুগত্য করে চলেছো বলে মনে করো।'

এর পরেই স্পষ্ট করে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন খাবারের মধ্যকার নিষিদ্ধ জিনিসগুলো সম্পর্কে একথা জানাতে গিয়ে তিনি 'ইন্নামা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা কোনো কিছুর সীমা নির্ধারণ করার জন্যেই ব্যবহৃত থাকে। এরশাদ হচ্ছে–

'অবশ্য অবশ্যই তিনি হারাম করেছেন তোমাদের জন্যে মৃত জীবজন্তু, পশু পাখী, রক্ত এবং শূকরের গোস্ত, আর সেইসব প্রাণী যাদেরকে গায়রুল্লাহর নামে হত্যা করা হয়েছে।'

কোনো সুস্থ মন মগয মৃত প্রাণীর গোস্ত খেতে কিছুতেই চাইতে পারে না, রক্ত পানও অনুরূপভাবে পরিত্যাজ্য। কোরআনে কারীম ও তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাত কেতাবে মৃত প্রাণী ও রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বহুকাল পরে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে যে এগুলো মানব দেহের জন্যে ক্ষতিকর। কারণ রোগ জীবাণু ও ক্ষতিকর উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে এগুলো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমরা জানি না, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের অত্যাধুনিক গবেষণালব্ধ মতামতই চূড়ান্ত, না ওই জিনিসগুলোর আরও অনেক অনেক ক্ষতিকর জিনিস পরবর্তীকালে জানা যাবে যার কারণে ওইগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এখন শূকরের গোশত সম্পর্কে কিছু সংখ্যক উগ্রমস্তিষ্ক লোক বিতর্ক তুলেছে যে নিষিদ্ধ হচ্ছে বন্য শূকর, গৃহপালিত শূকর নয়, অথচ যে কোনো সুস্থ প্রকৃতির মানুষ, সুরুচিসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি মনে করে শূকর একটি ঘৃণ্য প্রাণী। এর সাথে এটাও বাস্তব সত্য যে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে আল্লাহ তায়ালা শূকরের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগবেষণায় অতি সাম্প্রতিককালে ধরা পড়েছে যে, শূকরের গোশত, তার রক্ত ও নাড়িভুড়ির মধ্যে একপ্রকার মারাত্মক ফিতা ক্রিমি ও তার অসংখ্য ডিম বিদ্যমান থাকে যা মানুষের জন্যে ধ্বংসাত্মক।

কিন্তু, এখন এক দল লোক বলছে যে আধুনিক রান্নার পদ্ধতিতে যে উন্নতি হয়েছে সেই প্রক্রিয়ায় ওইগুলো রান্না করলে ওইসব ক্রিমি ও তার ডিম আর ক্ষতিকর থাকে না, তাপমাত্রার একপর্যায়ে এসে ওইগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কথা বলার সময় একটি কথা তারা ভুলে যায়, যে ক্ষতিকর যে একটি জিনিস এতকাল পরে তাদের জ্ঞান গবেষণায় ধরা পড়েছে তা দূর করার জন্যে না হয় তারা একটি পদ্ধতি বের করলো, কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে আরও যে অনেক ক্ষতিকর উপাদান আবিষ্কৃত হবে তা তারা কি করে অস্বীকার করবে?

অতএব, হাজার হাজার বছর পূর্বে আগত শরীয়তের বিধানের ওপর নির্ভর করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না! সেই বিধানের উপরেই কি আমাদের ভাল মন্দের ফয়সালার দায়িত্ব দিতে পারি না, সেই বিধান যেগুলোকে হারাম করেছে সেগুলোকে হারাম বলে জানবো আর যেগুলোকে হালাল বলেছে সেগুলোকে হালাল বলে গ্রহণ করবো, যেহেতু সে বিধান এসেছে মহাবিজ্ঞানময় এবং সর্বকালের সর্ব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত যে মহাজ্ঞানী তাঁর পক্ষ থেকে।

এখন আলোচনা আসছে ওই সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া সম্পর্কে যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সেগুলো খাওয়াও হারাম। আপাত দৃষ্টিতে হারাম হওয়ার কোনো কারণ তো বুঝা যায় না। কিন্তু অবশ্যই এটা বুঝা যায় যে, অন্য কারণে না হলেও মনস্তাত্তিক কারণেই একাজ দোষণীয়, কারণ গায়রুল্লাহর নামে যবাই করা প্রাণী ভক্ষণে শেরেকের অপরাধ হয়, যেহেতু যে প্রাণ দিতে পারে না তার নাম উচ্চারণ করার অর্থ তার ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া এতে অন্তর কলুষিত হয়ে যায়, আত্মার পবিত্রতা নষ্ট হয়, বিবেকের ঐকান্তিকতা বিঘ্নিত হয় এবং এককেন্দ্রিকতা খতম হয়ে যায়।

যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের প্রতি ক্ষমতা আরোপ করার অর্থ অপবিত্র বা অন্যায় কোনো জিনিসকে স্বীকার করে নেয়া, এর ফলে পূর্বে শেরেক বেদ্য়াতের যে সয়লাব চলেছিলো তার সাথে এর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয় এবং সর্বোপরি কথা হচ্ছে একাজ মোমেনের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। আর ইসলাম চেয়েছে নিরংকুশভাবে লা-শরীক আল্লাহর দিকে মানুষের মন সন্নিবেশিত থাকুক।

তারপর আসছে হালাল ও হারামের মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনা যা পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর একত্ববাদের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং হালাল হারামের বিধান সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম মানার মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র বর্তমান রয়েছে, যেমন বিশ্বাসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত অন্যান্য সকল শরয়ী বিধান।

এই সাথে এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলাম মানুষের অনন্যোপায় অবস্থার দিকেও খেয়াল রেখেছে, যার কারণে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিষিদ্ধ জিনিস সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৈধ করেছে। এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে, তবে, কেউ যদি, ইসলাম বিরোধী না হয়ে অথবা ইসলাম পরিত্যাগকারী না হয়ে, নিছক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর কোনো কিছু খেতে বাধ্য হয় তো ওই মজবুরী বা অসুবিধা দূর হতে যতোটুকু প্রয়োজন, ততোটুকুই গ্রহণ করতে পারে। এই সীমা ঠিক রেখে যে ব্যক্তি চলবে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান।

যদিও এখানে বর্ণিত কতিপয় নিষিদ্ধ বস্তুর ভোগ ব্যবহারের সীমারেখা বিশেষ অবস্থায়, অতিক্রম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই মূলনীতির ভিত্তিতে অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু, (যার বর্ণনা এখানে সরাসরি আসেনি) সেগুলোও স্থান কাল পাত্র ভেদে গ্রহণ করার বৈধতা জানা যায়। ওই বিশেষ প্রয়োজনগুলোর মধ্যে রয়েছে, জীবন রক্ষার প্রয়োজন, অর্থাৎ জীবনাশংকা দেখা দিতো যার অভাবে, সেই অভাব পূরণ করার মতো নিষিদ্ধ জিনিস ভোগ ব্যবহার অনুমিত, এর বেশী নয়।

এখন, ফকীহদের মধ্যে এই 'প্রয়োজন' অর্থাৎ 'মজবুরী' বা অনন্যোপায়তা) সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে কি কেয়াস (নিজ নিজ ধারণাশক্তি) প্রয়োগ করতে হবে, না এ ব্যাপারে কোরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে কিছু বলে দেয়া হয়েছে? অথবা কতোটা পরিমাণ ব্যবহার করা যাবে তা নির্দিষ্ট রয়েছে কি যাতে ওই মজবুরী দূর হতে পারে? ওই পরিমাণ কি জীবন রক্ষার প্রয়োজনে

নিম্নতম অংশ না পূর্ণভাবে খাওয়া বা পান করা বুঝায়? আমরা এই ফিকহী বিতর্কে না গিয়ে কোরআনে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তার ছায়াতলে থাকাটাকেই যথেষ্ট মনে করবো।

কোরআনে বর্ণিত হালাল-হারামের বস্তুগুলো সম্পর্কে ইহুদীরা বহু বিতর্কের ঝড় তুলেছে, কারণস্বরূপ বুঝা যায় যে, ইহুদীদের জন্যেই বিশেষ করে কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছিলো যার বর্ণনা অন্য আর একটি সূরার মধ্যে এভাবে এসেছে,

'যারা ইহুদী হয়ে গেছে তাদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখওয়ালা (পশুপাখী) এবং গরু ও ছাগলের চর্বি হারাম করে দিয়েছি, তবে এগুলোর পিঠের অথবা অন্ত্রের অথবা অস্থি সংলগ্ন চর্বি খাওয়ায় কোনো দোষ নেই।'

সত্য গোপনকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের জন্যে উপরে বর্ণিত এইসব জিনিস হালাল করা হয়েছে। ইহুদীরা সম্ভবত, এসব জিনিসগুলোকে কেন্দ্র করেই ঝগড়া করেছিলো যে কেন মুসলমানদের জন্যে এগুলো হালাল হলো। অবশ্য, এ বর্ণনাও এসেছে যে, ওই বস্তুগুলো যেমন কোরআনের মধ্যে তাদের জন্যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এমনি তাওরাতেও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ হয়েছে। তবুও তারা বিতর্ক তুলেছে, এর কারণ বুঝা যায় যে, সদা সর্বদা কোরআনের যথার্থতার ও আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওহীর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো।

এই কারণেই এখানে আমরা দেখতে পাই, যারা আল্লাহর নাযিল করা কেতাবের বর্ণনাকে গোপন করে রেখেছিলো, তাদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে,

'নিশ্চয়ই যারা গোপন করে কেতাবের সেই অংশ যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন এবং তা অল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয় তারাই হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে, তারা তাদের পেটের মধ্যে একমাত্র আগুনকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ারা তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

তারাই হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহীকে খরীদ করে নিয়েছে এবং মাগফেরাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে আযাবকে। তখন কোন সে জিনিস থাকবে যা তাদেরকে আগুনের মধ্যে ধৈর্য ধরে থাকতে বাধ্য করবে। তাদের ওই পরিণতি এইজন্যে হবে যে, (যে কেতাবকে তারা অস্বীকার করেছিলো) তাকে আল্লাহ তায়ালা সত্য বহনকারী হিসেবে নাযিল করেছিলেন। আর যারা এই কেতাবের মধ্যে অবতীর্ণ কথাগুলোর ব্যাপারে মতভেদ করেছে তারা বিরোধিতার দরুণ সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।'

আল্লাহর নাযিল করা কেতাব যারা লুকিয়ে রেখেছিলো বলে এখানে উল্লেখিত হয়েছে, প্রথমত, তারা হচ্ছে আহ্‌লে কেতাবই। কিন্তু কোরআনের বর্ণনা ধারাতে সকল ধর্মের সেই সকল লোকও এই আয়াতের আওতায় আসে যারা জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করে এবং বিক্রি করে দেয় সত্যকে অতি অল্প মূল্যে। এই অল্প মূল্যের দ্বারা হয়তো বলতে চাওয়া হয়েছে সেই বিশেষ উপস্থিত লাভের কথা যা সত্যের বিরোধিতা করলে তারা পাওয়ার আশা রাখে এবং সেই বিশেষ সুযোগ সুবিধা যা সত্য বিরোধিতার কারণে পাবে বলে মনে করে অথবা গোটা দুনিয়ার জীবন পুরোটাই অল্প মূল্য। সমগ্র দুনিয়া হলেও তা আল্লাহর সন্তোষ ও আখেরাতের ফায়দা হারানোর ক্ষতি থেকে অনেক কম মূল্যবান।

আর খাদ্য বলতে কোরআনে কারীম হারাম হালাল সকল খাদ্যকেই বুঝিয়েছে। ওইগুলো সম্পর্কে কোরআন বলছে– 'সত্যের বিরোধিতা করার কারণে যে পয়সা তারা পায় তার দ্বারা প্রাপ্ত খাদ্য তাদের পেটের মধ্যে আগুনই ভরে দেয়।'

প্রাসংগিক বর্ণনার সাথে একথাটি পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সত্য গোপন করার ফলে আর্থিক যে লাভ পায় সেই লাভের পয়সা দিয়ে যা কিছু খরিদ করে খায় তা কেয়ামতের দিন তাদের পেটের মধ্যে আগুনে পরিণত হয়ে যাবে, মনে হবে যেন তারা আগুন খেয়ে নিয়েছে। আর এটাই প্রকৃত সত্য কথা, যখন কেয়ামতের দিন তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের সর্বাংগে শুধু আগুনই আগুন ছড়িয়ে পড়বে ঠিক যেমন পোশাক মানুষকে বেষ্টন করে রাখে, সেই সময় আগুনই হবে তাদের খাদ্য বা পোশাক।

তাদের সত্য গোপনের কারনে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি চরম অবহেলা ও ঘৃণা প্রদর্শন করবেন এবং হীনতা ও অপমান হবে তাদের ভাগ্য লিখন। একথাটিই কোরআনে কারীমে এ ভাবে পেশ করা হয়েছে– 'কেয়ামাতের দিন (ঘৃণাভরে) আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথাই বলবেন না এবং তাদেরকে দোষমুক্তও করবেন না।'

আয়াতে উল্লেখিত কথা না বলার অবস্থাটি যেন মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধিশক্তির কাছে ঘৃণার প্রতিমূর্তি হিসেবে ফুটে উঠেছে। দেখুন কত করুণ সে অবস্থা– কোনো কথা নেই, তাদের প্রতি কারো কোনো খেয়াল নেই, দোষমুক্তির ঘোষণাও নেই, আর নেই কোনো ক্ষমার কথা, বরং 'আছে তাদের জন্যে মহা শাস্তি।'

অন্য আর একভাবে তাদের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে,

'ওরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা খরীদ করে নিয়েছে গোমরাহীকে হেদায়াতের মূল্য দিয়ে এবং ক্ষমার মূল্যে কিনে নিয়েছে আযাবকে।'

এ যেন এমন এক লোকসান যার মূল্য হলো হেদায়াত এবং পণ্য হলো গোমরাহী, মাগফেরাত ক্ষমা দিচ্ছে, পাচ্ছে শাস্তি। এর থেকে বড় লোকসান আর কী হতে পারে এবং ওই ব্যক্তি থেকে বড় হতভাগাই বা আর কে হবে! অতি নিকৃষ্ট এ ব্যবসা এবং অত্যন্ত কষ্টকর এই বিনিময় গ্রহণ করা। কিন্তু এইটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য এবং হতভাগাদের বাস্তব অবস্থা হবে এটাই। এমতাবস্থায় কোন্ জিনিস আগুনের মধ্যে তাদেরকে সবর করাবে।'

হায় হায়, কত দীর্ঘকাল ধরে তাদেরকে সেই আগুনের মধ্যে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে! এ আগুন তো তারা নিজেদের জন্যে নিজেরাই বেছে নিয়েছে, তারা নিজেরাই সেই দিকে ধাবিত হয়েছে।

সুতরাং, হায় আফসোস আগুনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান তাদেরকে চরমভাবে ধ্বংস করে ছাড়বে।

কিন্তু এটা অবশ্যই অতি সত্য কথা, তাদের নিকৃষ্ট অপরাধের কারণে এটাই হবে তাদের উচিত পাওনা, আর সে অপরাধ হচ্ছে গোপন করা আল্লাহর সেই কেতাবকে যা মানুষকে জানানোর জন্যেই তিনি তাদের কাছে নাযিল করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন এই কেতাবে উপস্থাপিত সত্যকে তারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবে, তিনি চেয়েছিলেন এই কেতাবে উপস্থাপিত ব্যবস্থাকেই তারা তাদের জীবনের যাবতীয় কাজের নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করবে, বানাবে এ

কেতাবকে তাদের পথপ্রদর্শক। যে এ কেতাবকে গোপন করলো সে তো নিজে এর ওপর আমল করা থেকে থেমে গেলো। অথচ এ কেতাব তো এসেছিলো কি ভাবে তারা কাজ করবে তা শেখাতে।

'হাঁ, ওই কেতাবকে তো আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন সত্যবাহী গ্রন্থ হিসেবে।'

এখন যে ব্যক্তি এই কেতাবের দিকে মনোনিবেশ সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে রুজু করবে সে অবশ্যই সত্য সঠিক হেদায়েতের ওপর অবস্থান করবে। প্রকৃত সত্যের সাথে হবে তার মেলামেশা ও সকল কাজ এবং সৃষ্টির সকল সত্যানুসারীদের সাথে হবে তার যোগাযোগ। যে সৃষ্টির স্বভাব প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে প্রকৃতপক্ষে সেই হবে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান।

'আর যারা ওই কেতাবের মধ্যে কোনো মতভেদ করে অর্থাৎ ওই কেতাবে উপস্থাপিত কোনো নির্দেশের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করবে তারা অবশ্যই এই বিরোধিতার কারণে সত্য থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়বে'

এই দূরত্ব সত্যের সাথে, এই দূরত্ব বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের সাথে, এ বিরোধিতা ও মতবিরোধের কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেবে এবং তাদের স্ববিরোধিতাই করা হবে। প্রকৃতপক্ষে ওই আহলে কেতাবদের তখন এই অবস্থাই ছিলো এবং বরাবর এমনই থাকবে। আর যারা তাদের নিজেদের কেতাবের সাথে বিরোধিতা করবে তারাই তাদের সাথে যোগ দেবে। তবে সবাই একযোগে আসবে না, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে তারা– এ অবস্থা তাদের হবেই, কেননা এটা আল্লাহর ওয়াদা যার কারণে তিনি যুগ যুগান্তর ধরে, দেশে দেশে তাদেরকে বিভিন্ন দল উপদলে পরিণত করে রাখবেন। বাস্তবে আমরা পৃথিবীর সর্বত্র, যেখানে মানব বসতি আছে, সবখানেই এ অবস্থা প্রত্যক্ষও করছি।

আনুষ্ঠানিক এবাদাত সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী

পরিশেষে একটি মাত্র আয়াতে সত্য সঠিক ঈমানী চেতনার নিয়মপদ্ধতি পেশ করা হয়েছে, রূপরেখা আঁকা হয়েছে প্রকৃত ঈমানের আলোকে গঠিত জীবনের যাবতীয় আচরণের। তারপর সত্যবাদী ও আল্লাহভীরু সত্যানুসারীদের গুণও চিহ্নিত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করাতেই নেকী নয়, বরং নেকী হবে তার যে ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর শেষ দিনের ওপর, ফেরেশতাদের, কেতাব ও নবীদের ওপর এবং যে তারই মোহাব্বাতে অর্থ সম্পদ দান করবে নিকটাত্মীয়দেরকে, এতীমদেরকে, সর্বহারাদেরকে মুসাফিরদেরকে, হাত পেতে যারা অভাব জানায় তাদেরকে এবং খরচ করবে বন্দীমুক্তির কাজে (দাস দাসী প্রথা চালু থাকলে তাদেরকে মুক্ত করার কাজে, কিন্তু বর্তমানে দাসত্ব প্রথা রহিত হওয়ায় বন্দী মুক্তির কাজে ব্যয় করালে ওই নেকী দান করা হবে)। আর নেকী হবে সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করলে, যাকাত দান করলে এবং চুক্তি করার পর তা সঠিকভাবে পূরণকারী যারা তাদেরকেও নেকী দান করা হবে, আরও নেকী দান করা হবে তাদেরকে যারা ক্ষুধা দারিদ্র্য ও দুর্দিনে ধৈর্য্য ধারণ করে ওই সকল ব্যক্তিই হচ্ছে তারা যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্য বলেছে এবং তারাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে 'মোত্তাকী।'

বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যে এই বিবৃতি ও কেবলা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে তোলপাড় শুরু হয়েছিলো এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা এসে গেছে। এখন ওই বিষয়টি সহ অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহ সম্পর্কে ইহুদীরা যেসব বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো সেই প্রসংগেই এখানে প্রধানত আলোচনা আসছে। আসলে এইসব আনুষ্ঠানিক এবাদাতের প্রসংগ নিয়েই অধিকাংশ সময় তারা তর্ক বিতর্কে ব্যস্ত থাকতো।

কেবলা পরিবর্তনের ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহের উদ্দেশ্য এই নয় যে মানুষ শুধু পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়বে, মুখ করবে বায়তুল মাকদেস বা মাসজিদুল হারামের দিকে, 'বির' বা নেকীর উদ্দেশ্যও এটা আসলে নয়, সমস্ত কল্যাণকর কাজই হচ্ছে 'বির'। প্রকাশ্য যে আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলো করা হয় সেগুলো 'বির' তখন হবে যখন মানুষের জীবনের বিভিন্ন কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণকামিতার নমুনা পাওয়া যাবে, নতুবা ওই অনুষ্ঠানগুলোই একমাত্র 'বির' বা নেকী নয়। শুধু ধ্যান ধারণা, চেতনা কাজ ও ব্যবহার নেকী নয়।

সেই চেতনা যার দ্বারা ব্যক্তি মানুষের এবং দলের বিবেক প্রভাবিত হয়। সেই কাজ যার প্রভাবে ব্যক্তি বা দলের কাজ কল্যাণকর হয়ে যায় তাই হচ্ছে 'বির' বা নেকী। এই প্রকৃত ও গভীর সত্য ছাড়া শুধুমাত্র পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরালেই কোনো ফায়দা হবে না, এই গুণগুলো ছাড়া এদিকে মুখ করে কেবলা করা হোক বা ওদিকে মুখ করে কেবলা করা হোক সবই সমান। নামাযে ডান দিকে সালাম দেয়া হোক বা বাম দিকে সালাম দেয়া হোক, আনুষ্ঠানিক এবাদাত করতে গিয়ে মানুষ প্রকাশ্য এই যে ইসলামের প্রতীকী কাজগুলো করে, বাস্তব কাজ ছাড়া আল্লাহর কাছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বরং বির্ হবে তার যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করেছে, ফেরশতা, কেতাব (কোরআন) ও নবীদেরকে বিশ্বাস করেছে।'

এইসব বিশ্বাসের সমষ্টিই কল্যাণ বলে বিবেচিত হয়েছে। এখন চিন্তা করুন যে ওই গুণগুলো কিভাবে আল্লাহর বিচার দন্ডে এত মূল্যবান হয়ে গেলো? আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচার দিবস, ফেরেশতা, কেতাব ও নবীদের ওপর ঈমানই এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু যাকে ঘিরে মানুষের গোটা জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে, তাকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করে, তাকে নানাপ্রকার শক্তি যোগায়, তার মূল্যায়ন করে।

একমাত্র আল্লাহর এবাদাত বা দাসত্ব কবুল করে নেয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সকল দাসত্ব ও মানসিক গোলামী থেকে সে নাজাত লাভ করে। সকল দাসত্ব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের নিগড়ে নিজেকে আবদ্ধ করার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা এতটা উন্নীত হয় যে সে এক আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে অন্যান্য সকল মানুষের কাতারে নিজেকে সবার সমান বোধ করতে পারে এবং এরপর সকল দিক দিয়ে সব কিছুর উপরে নিজেকে স্থান করার মহান উচ্চাশা পোষণ করতে পারে।

শুধু তাই নয় এই ঈমানী চেতনাই তার জীবনে সকল দিক থেকে শৃংখলা আনে। তার দিশেহারা অবস্থাকে পরিবর্তন করে তাকে এই ঈমানই মযবুত ইচ্ছা শক্তি ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা এবং বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে গুছিয়ে এক কেন্দ্রীক করে দেয়। সুতরাং, ঈমানী চেতনা বা এক আল্লাহর ওপর ঈমান ব্যতীত মানুষের কোনো দৃঢ় ইচ্ছা এবং স্থায়ী লক্ষ্য স্থির হতে পারে না। চিনতে পারে না সে তার উন্নতির লক্ষ্য বিন্দুকে, যার চতুর্দিকে মানুষ সেইভাবে সমবেত হতে পারে পারস্পরিক সম্মান ও সমতার ভিত্তিতে যেভাবে গোটা সৃষ্টির অস্তিত্ব পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে টিকে আছে।

লক্ষ্য করে দেখুন গোটা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সামগ্রিক আনুগত্য থাকার দরুন তাদের সম্পর্কের পারস্পরিক বন্ধনের এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ইচ্ছার মধ্যে কেমন ঐক্য ও ভারসাম্য বিদ্যমান।

শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস অর্থ হচ্ছে প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সুবিচারক হওয়ার প্রতি দৃঢ় আস্থা। একথা সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীতে কখনোই

জীবন কল্যাণময় হতে পারে না যদি সুবিচার কায়েম না থাকে অবশ্যই একথা সত্য যে, যে কোনো ভাল কাজ করলে তার প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে না পেলেও আখেরাতে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ও গায়বের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের একটি অংগ। এই বিশ্বাসটিই পশুর জীবন ও মানুষের জীবন যাপনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। একটি পশু যেটুকু তার ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে সেটুকু সে বিশ্বাস করে, কিন্তু মানুষ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিসের বাইরের অনেক বিষয় বিশ্বাস করে বলেই তার জীবন হয় নিয়ন্ত্রিত। আবার কেতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান অর্থ রেসালাতের প্রতি ঈমান অর্থাৎ সকল নবী রসূলদের প্রতি ঈমান। এই ঈমানের অর্থ দাঁড়ায় গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব এক অখন্ড সত্য।

তেমনি যাঁর আনুগত্য করা জরুরী সবার জন্যে তিনিও এক এবং তাদের সবার চলার পথও মাত্র একটিই, যার মাধ্যমে সবার সার্বিক কল্যাণ সম্ভব। আল্লাহ রব্বুল ইযযত-প্রদত্ত তাদের সবার জন্যে একই জীবন বিধান বা দ্বীন। আর এই কারণেই মোমেনের অনুভূতির মধ্যে এই মূলবোধ বিরাজ করে যে রসূলদের আনীত যাবতীয় পয়গামের উত্তরাধিকার সকল মানব মন্ডল সমানভাবে।

এবারে দেখা যাক আল্লাহর মোহাব্বাতে এবং তাঁর কাছে সম্মান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মেসকীন, মোসাফের, প্রার্থী ও দাস বা বন্দীদের জন্যে খরচ করার গুরুত্ব ও মূল্য কতটা!

এই গুরুত্বের প্রথম যে জিনিসটি বুঝা সহজ তা হচ্ছে, লোভ লালসা সংকীর্ণতা, দুর্বলতা ও ঝোঁকপ্রবণতা থেকে সে তখনই মুক্তি পায় যখন সে উপরে বর্ণিত ব্যক্তিদের জন্যে খরচ করার মন গড়ে তুলতে পারে। এর দ্বারা তার রূহ (অন্তরাত্মা) সেই মালের আকর্ষণ ও মোহাব্বাত থেকে মুক্তি লাভ করে যা তার হাতকে খরচ করা থেকে সঙ্কুচিত করে রাখে, বিরত রাখে তাকে বদান্যতা প্রদর্শনে এবং তার আত্মার স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

এই খরচ করার স্পৃহা তার আত্মার মধ্যে মালের মোহাব্বাতকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার চেতনার মধ্যে শক্তি যোগায়, যার ফলে অর্থ সম্পদের প্রতি মায়া মোহাব্বাতের মতোই তার মধ্যে এক অপরূপ আবেগ সৃষ্টি করে মানব কল্যাণের জন্যে উদার হস্ত হতে। এতে, কতোটুকু দান করলে রেহাই পাওয়া যাবে যে কোনো তুচ্ছ জিনিস দিয়ে দায় পরিশোধ করা যায় এই সংকীর্ণ অনুভূতির উর্ধে উঠে সম্পদের দাসত্ব থেকে সে নিষ্কৃতি লাভ করে।

আসলে সম্পদের প্রতি এই অন্ধ মোহই তো মানুষকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। তার সম্মানিত মাথাকে অবনমিত ও অপদস্থ করে। এই খরচ করার প্রবণতা তাকে সেই লালসার মায়াজাল থেকে উদ্ধার করে যা মানুষকে বেইযযত করে। শিক্ষা ও জীবনবোধ বিবেচনায় এই খরচ করাই হচ্ছে সেই মহা মানবতা ও মহানুভবতা, যা মানুষকে নানা প্রকার শয়তানী প্ররোচনা, লোভ লালসা ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের ব্যাপক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উন্মুক্ত পরিসরে প্রবেশ করার পূর্বেই মহান চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে। এ শিক্ষা থেকে নিশ্চিতভাবে একথাটি জানা যায় যে প্রবৃত্তির দাসত্বই মানুষকে মানুষের গোলাম বানিয়ে দেয়।

প্রবৃত্তির এই স্বাধীনতার মূলে মানুষের বল্গাহারা স্বেচ্ছাচার কাজ করে। অবশ্য, এই স্বাধীনতা তাকে সমাজে নেতৃত্বের আসনেও বসায়। তারপর সমগ্র মানব মন্ডলীর মধ্যে এই স্বাধীনতাই তাকে মহান একটা মর্যাদা দান করে। আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক করে চলার মনোভাব মানুষের

মনকে উদার ও মহানুভব বানায়। দান করে তাকে পারিবারিক জীবনে সৌন্দর্য ও সম্মান, মযবুত করে আত্মীয়তার বন্ধন। একে অপরকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখার মনোভাবই দলীয় সংহতির মূল বীজ, যার থেকে দানশীলতা ও পারস্পরিক সদ্ভাব সৃষ্টি হয়।

দলীয় জীবনে ছোট বড়র মধ্যে আদব রক্ষা করে চলা এবং একে অপরের প্রয়োজনে সহযোগিতা করার মানসিকতা এতীমদের জন্যে রক্ষা কবচে পরিণত হয়। শক্তিমান ও দুর্বল সকলের মধ্যেই ওই মনোভাব এক মাধুর্য সৃষ্টি করে। আর এই অনুভূতিই পিতৃমাতৃহীন অসহায় এতীমদের দরদ-মোহাব্বাত নিয়ে প্রতিপালন করা ও তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এই সব মহৎ গুণ তাকে উচ্ছৃংখলতা থেকে বাঁচায় এবং সমাজ জীবনে ওই সকল লোক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত রাখে যারা কোনো ভাল ব্যবহার করে না বা সুবিবেচনা করেও চলে না।

এই নেক খাসলাতটি ওই সর্বহারাদের প্রতি দরদী বানায় যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর মতো অর্থ সম্পদের অধিকারী নয় অথচ সব কিছু হারিয়েও তারা কোনোক্রমেই নিজেদের দুরাবস্থা প্রকাশ করে না, এমনকি মুখকেও মলিন হতে দেয়না। মানুষের এই খরচ করার ইচ্ছা তার মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগায়, উন্নতমানের গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ও দলীয় জীবনে একে অপরের প্রতি দরদ মোহাব্বাতের সাথে খেয়াল রাখার প্রেরণা যোগায়। তারা সারা পৃথিবীকেই নিজেদের দেশ মনে করে যার কারণে কোনো ব্যক্তিকে অবহেলা করে না।

এই মহাপরিবারের কোনো একজন সদস্যও বরবাদ হয়ে যাবে এটা যেন তারা বরদাশত করতে পারেনা। মানুষের এই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও খরচ করার ব্যাপারে উদারতা তাকে সেই মোসাফেরের অভিভাবক বানায় যে নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে বিদেশে নিজের পুঁজিপাট্টা ও অর্থ সম্পদ হারিয়ে ফেলে, যে নিজের আপনজনদের থেকে দূরে চলে আসার কারণে করুণার পাত্রে পরিণত হয়। যে সকল অর্থ সম্পদ হারিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার সহায় সম্বল খুঁজে পায় না।

এমনই অসহায় মানুষের প্রতি ওই স্বাধীন ও উদার প্রকৃতির মানুষ পরম আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করে সারা পৃথিবীকে আপন দেশ জ্ঞানে সে এই সর্বস্বহারা ব্যক্তিকে নিজ পরিবারের মানুষ বানিয়ে ফেলে, তাকে নিজ ধন সম্পদে অংশীদার বানিয়ে নেয়, তাকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে, তার ঘর দুয়ার ও বাসস্থানের অভাব পূরণ করে দেয়। যে হাত পেতে চায় এমন প্রার্থীর অভাবে এই স্বাধীন দানশীল মানুষটি হয় উদার হস্ত এবং ওই ব্যক্তিকে যাতে আর চাইতে না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণে সে যত্নবান হয়।

যেহেতু কারো প্রার্থী হওয়াটা ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম ওই ব্যক্তির হাত পাতাকে পছন্দ করে না যার দিন গুজরানের কিছু না কিছু সংস্থান আছে, অথবা কাজ করার মতো শক্তি আছে এবং কর্মসংস্থানও আছে। দ্বীন ইসলাম মানুষকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী বানিয়েছে এবং কোনো মানুষের কাছে হাত পাতার মতো ন্যাক্কারজনক স্বভাবকে প্রতিরোধ করেছে। তাকে অল্পে তুষ্ট থাকার ও কারো কাছে প্রয়োজন পেশ না করার শিক্ষা দিয়েছে। তবে যে সর্বহারা হয়ে পড়েছে অথবা কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে তার জন্যে স্বতন্ত্র কথা।

'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'- আল্লাহর পথে ব্যয় করার মানসিকতা দাস ও বন্দী মুক্তির জন্যে মানুষকে উদার বানায় ওই সকল দাস বা বন্দী যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে আজ

বিপদগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে মুক্ত করার জন্যেও এই মোমেন ব্যক্তি খরচ করে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে খরচ করার শিক্ষাকে দুস্থ মানবতার মুক্তি সাধনে কাজে লাগায়। দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হারালো এবং মানবতার মূল শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো তার প্রতি মোমেন দিল হয় উদ্বেলিত। মহান ও মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা এর এই নির্দেশটি পালন করতে গিয়ে মোমেন কখনও দাস দাসীকে খরীদ করে আযাদ করে দেয়, কখনও বা তাকে এমন অংক দান করে যার দ্বারা ওই অসহায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তা দিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারে।

যে মুহূর্তে অধীনস্থ কোনো ব্যক্তি মুক্তি প্রার্থী হয়ে আবেদন জানায় সেই সময় থেকেই সে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং তখন থেকেই ইসলাম তাকে অর্থ সংগ্রহের জন্যে সময় দিতে বা স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করার সুযোগ দিতে তার মুনিবকে নির্দেশ দেয়, এমনকি এই অর্থের অধিকারী করার জন্যে তাকে যাকাত পর্যন্ত দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ইসলামী সমাজে যাকাত আদায়ের খাতগুলোর অন্যতম খাত– এই দাস মুক্তির ব্যবস্থা হিসেবে মুক্তি প্রার্থীকে যাকাত দিয়ে মুক্তি লাভে সাহায্য করা মোমেনের কর্তব্য। যাকাত ছাড়া অন্যান্য ঐচ্ছিক দান থেকেও মুক্তি প্রার্থীকে সাহায্য করার তাকীদ করা হয়েছে মোমেনদেরকে, যেন দাসত্বের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে কোনো মানুষ আবার আত্মমর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে।

এবারে প্রশ্ন 'ইকামতে সালাত' দ্বারা কী কাজ হয়? সমাজ জীবনেও বা ইকামতে সালাত এর কি প্রভাব পড়ে বা কোন নেকী হাসিল হয়? ইকামতে সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠা বলতে শুধুমাত্র পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ানো বুঝায় না, বরং এর দ্বারা সার্বিকভাবে বান্দার মনোযোগকে তার রব এর দিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়, একাজ প্রকাশ্য ও গোপন, শারীরিক, বুদ্ধিগত এবং আত্মিকভাবে সংঘটিত হয়। মনে রাখা দরকার, নামায মানব জীবনের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনে। কাজেই এটা শুধু শারীরিক কিছু নড়াচড়া অথবা আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে একমাত্র আধ্যাত্মিক কোনো প্রক্রিয়া নয়।

ইসলাম মানুষের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যে তার আত্মিক উন্নতির প্রয়োজনকে স্বীকার করে। মানুষের মধ্যে নিহিত এইসব শক্তির মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিরোধ আছে বলে ইসলাম মনে করে না। আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন ইসলাম কখনও চায়না, কারণ আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে এই শারীরিক বা ষড়রিপুকে দমন করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই শরীর দিয়েই তো আনুগত্যের প্রধান কাজগুলো সংঘটিত হয়। নামায এই তিনটি শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটায় এবং সম্মিলিতভাবে সকল বান্দাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগী করে।

শারীরিক দিক দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে কেয়াম, রুকু ও সেজদা করতে হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে তাকে কোরআনের কিছু অংশ পড়তে হয়, ধ্যানে মশগুল হতে হয়, অর্থ বুঝার জন্যে চিন্তা ভাবনা করতে হয় এবং আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে আত্মসমর্পিত মন নিয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হতে হয়। এসব কাজ পৃথকভাবে নয়, সবগুলো একসাথেই করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে নামাযের প্রতিষ্ঠা মানুষের বাস্তব জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী তুলে ধরে এবং তার দৃষ্টিভংগীকে বাস্তবায়িত করতে চায়। নামাযের প্রতি রাকায়াতে এবং প্রত্যেক ওয়াক্তেই এই চেষ্টা চলতে থাকে।

পরবর্তী প্রশ্ন, যাকাত দানের ফায়দা কি? ইসলামের এ অবশ্য পালনীয় বিধানটি ইসলামী সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে দরিদ্রদের প্রতি কর্তব্য করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এজন্যে যাকাত দানের যোগ্যতা হিসেবে 'সাহেবে মাল' বা নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন ওই নির্ধারিত ধন সম্পদের অধিকারী হয় এবং একটি বছর ধরে সেই সম্পদের মালিকানা তার হাতে থাকে তখনই তার ওপর যাকাত ফরয হয়।

এই যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর মোহাব্বাতে দান খয়রাতের (ঐচ্ছিক ছদকার) কথা বলার পর। কারণ আল্লাহর মোহাব্বাতে ছদকা খয়রাত করা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। সুতরাং ওই ঐচ্ছিক দান, যাকাত এর বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না। আর যাকাত দিলে যে সামাজিক জীবনে ঐচ্ছিক দানের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় তাও নয়।

যেহেতু যাকাত ফরয এবং সদকা খয়রাত মোস্তাহাব বা সওয়াবের কাজ। 'বির' বা নেকী পরিপূর্ণতা লাভ করে না এই উভয় প্রকার দান ছাড়া। এই দুই ধরনের দানই ইসলামের মূল্যবান সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে খরচ করতে বলার পর কোরআন পৃথকভাবে যাকাতের কথা বলেনি, বরং যাকাত অবশ্যই দেয় (ফরয) এ কথা বলায় 'ইন্‌ফাক ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করার প্রয়োজন বা গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়নি। আবার দান খয়রাত করলেই যে যাকাত আদায় হয়ে যাবে তাও নয়।

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুরুত্ব কতটা? এর জবাবে বলতে হয়, এ হচ্ছে ইসলামী জীবন পদ্ধতির এক অপরিহার্য অংগ, যার ব্যাপারে ইসলাম তাগীদ দিয়েছে এবং কোরআনে কারীমের বহুস্থানে তার উল্লেখ করেছে। ঈমানের একটি লক্ষণ বলেও একে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটা মানবতার ও বদান্যতা বা এহসানেরও লক্ষণ। ব্যক্তি জীবন দলীয় জীবন, সামষ্টিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের পরস্পর আস্থা ও সৌহার্দ সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে লেন দেন ও আদান প্রদান ও চুক্তি বিনিময়ের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সমধিক। আর, আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি রক্ষা দ্বারা এ কাজ শুরু হয়।

এ গুনটির অভাবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটি ভয় এবং সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করতে থাকে। এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিলে কোনো ওয়াদা মযবুত হয় না। কারো কোনো কথায় কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না, কোনো মানুষকে বিশ্বাসও করা যায় না। বন্ধু বান্ধব এবং অন্যদের সাথে সামগ্রিকভাবে সকল ওয়াদা পূরণ ও চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে, এভাবে মানবেতিহাসের কোনো অধ্যায়ে অন্য কেউ দেয়নি এবং ইসলামের গন্ডীর বাইরে অন্য কোনো সমাজে অন্য কেউই এইভাবে চুক্তি ও ওয়াদা রক্ষা করে না। ইসলাম ছাড়া মানব নির্মিত অন্য কোনো সমাজ ব্যবস্থায় এজন্যে বিশেষভাবে কোনো পথনির্দেশও করা হয় না।

এরপর আসছে 'সবর'-এর আলোচনা। মানব সভ্যতার জন্যে এরই বা গুরুত্ব কতোটুক? সুখে দুখে, সংকট সমস্যায় ও দুঃখ দৈন্যের মধ্যে সবর করাতে কী লাভ?

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব পরিবারের মধ্যে মানবতাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সবর হচ্ছে মানুষের এক কঠিন প্রশিক্ষণ এবং সকল অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার এক নিরলস প্রচেষ্টা, যাতে করে মানুষ যে কোনো প্রকার বিপদ আপদের ঝাপটায়

মুষড়ে না পড়ে বা উত্তেজিত হয়ে কোনো অঘটন না ঘটায় অথবা কোনো প্রতিকূল অবস্থায় ভারসাম্য না হারিয়ে ফেলে, অথবা কোনো সংকট সমস্যা ও জটীল পরিস্থিতিতে মানুষ ঘাবড়ে না যায়।

জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্যে, জীবনের প্রতিটি প্রতিকূল অবস্থায় অবিচল থাকা ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে আর জীবনের মরু মরীচিকায় সঠিক গতিপথ নির্ণয়ের জন্যে এ গুণটি সব থেকে বড় হাতিয়ার। এ হাতিয়ার যার কোষে আছে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি সংকটের সাথে রেখে দিয়েছেন অনেক আসানী (সহজ অবস্থা)। সবরই আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও তার ওপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করার জন্যে এবং তাঁর রহমত পাওয়ার ব্যাপারে সব থেকে বড় উপায়। আর যে জাতিকে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যে পয়দা করা হয়েছে, তৈরী করা হয়েছে তাকে পৃথিবীতে সংশোধনী ব্যবস্থা ও ইনসাফ কায়েম করার জন্যে তার প্রতি পদক্ষেপে আসবে বিরোধিতা, আসবে নানা প্রকার সংকট সমস্যা, মোকাবেলা করতে হবে তাকে বহু কঠিন অবস্থার।

সে অবস্থায় তাকে কঠোর মনোবল নিয়ে এবং পর্বতসম অবিচলতা নিয়ে দৃঢ় থাকতে হবে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে। সবর করতে হবে তাকে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অভাব অভিযোগের। বিপদ সাগর পাড়ি দেয়ার জন্যে অসুখ বিসুখ ও বিভিন্ন প্রকারের দুর্বলতা, সম্পদের কমতি ও ক্ষয়ক্ষতি, কঠিন জীবন সংগ্রাম ও বিপদের ঘনঘটায় আবদ্ধ হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার অবস্থায় এ সকল অবস্থাতে তাকে দৃঢ়তার সাথে হাল ধরে থাকতে হবে , তবেই উম্মুক্ত হবে তার সামনে সাফল্যের সিংহদ্বার, দৃঢ়তা, আত্ম-বিশ্বাস, পূর্ণ নিশ্চিন্ততা এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা থাকলে তার ভাগ্যাকাশে উদিত হবে সৌভাগ্যের শুভ্র সমুজ্জ্বল পূর্ণ চাঁদ। তার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার ও সুবিচারপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ পরিয়ে দেবে তার মাথায় বিশ্ব-নেতৃত্বের মহান তাজ।

কোরআনে পাকের আয়াতে সুখে-দুঃখে, সংকট সমস্যায় ও যুদ্ধ বিগ্রহের অবস্থায় আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসবে যে মহান গুণটির কারণে তা হচ্ছে সবর এবং তার অধিকারীদেরকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'আস্ সোয়াবিরীন'– ধৈর্যধারণকারী। আয়াতের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে সবরকারীদের জন্যে সাহায্যের ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে যে গুণগুলো উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো কার্যকর হওয়ার জন্যে সবর অপরিহার্য। এর অভাবে অন্যান্য গুণাবলী ফিকে হয়ে যায়। এইজন্যে শেষোক্ত এই গুণটিকে বিশেষিত করা হয়েছে অন্যান্য সকল গুণের ওপর।

এই গুণটি অন্য সমস্ত গুণাবলির নির্যাস এবং 'নেকীর' পাল্লায় সব থেকে বেশী ভারী। এই গুণটির বৈশিষ্ট্যের কারণে এর অধিকারী সবার উপরে মর্যাদাবান হয়ে যায় এবং এইজন্যে আল্লাহর ওপর ঈমান, ফেরেশতা, কেতাব ও নবীকুলের ওপর বিশ্বাস, আল্লাহর মোহাব্বাতে সম্পদ দান, নামায কায়েম, যাকাত দান, ওয়াদা পূরণ এ সব কিছুর গুণের অধিকারীদের উপরে সবরকারীদেরকে মহা মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহর রক্ষিত দাঁড়িপাল্লায়ও এই গুণটির শ্রেষ্ঠত্ব স্থিরিকৃত হয়েরয়েছে যা সবার নযরে একদিন ভেসে উঠবেই।(৩)

এমনি করে একটি আয়াতে আকীদা বিশ্বাসের মূলনীতিগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং এগুলোর ধারক ও বাহকদের ওপর যে সীমাহীন জান মালের তকলীফ আসবে সে বিষয়ের বর্ণনা এসেছে। বলা হয়েছে যে এসব গুণ একই উৎস থেকে নির্গত এবং একই মালার ফুল যার একটির

(৩) এই আয়াতগুলোর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে সূরা আল বাক্বারা ১৫৩-১৫৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

সাথে আর একটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং এ মালা কখনও ছিঁড়বার নয়। এই গুণ মালার একটিই হচ্ছে 'বির' নেকী বা সদ্‌গুণ। অন্য নামে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় এগুণটি সকল গুণের সমষ্টি অথবা বলা যেতে পারে এই গুণই হচ্ছে ঈমান। যেমন কোনো কোনো হাদীসে এই ধরনের বর্ণনা এসেছে। আর প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও ইসলামী জীবন পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে এই ঈমান। এই ঈমান ব্যতীত ইসলামের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

এইসব গুণের বর্ণনা শেষে এগুলোর অধিকারীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'তারাই হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যারা সত্য বলেছে, আর তারাই হচ্ছে মোত্তাকী' — আল্লাহ ভীরু। তারাই হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যারা ইসলামী জীবন যাপন করার ব্যাপারে তাদের রব-এর সাথে করা ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের ঈমান ও আকীদার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং বাস্তব জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের ঈমান আকীদার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

তারাই হচ্ছে সেইসব মোত্তাকী (আল্লাহ ভীরু) ব্যক্তি যারা আল্লাহকে ভয় করে (অন্তরে তার ভয় রেখে জীবন যাপন করে) এবং তাঁর সাথে মযবুতভাবে সম্পর্ক রাখে, তারা পূর্ণ মোহাব্বাত ভরা দিল নিয়ে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে জীবনের সকল কর্তব্য পালন করে।

আসুন, এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের উচ্চ মর্যাদা গড়ে তোলার জন্যে যেসব উন্নতমানের শিক্ষা দান করেছেন, সেগুলো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি ও বুঝার চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা চান মানুষ জীবনের সুমহান ও সুদৃঢ় পথে চলুক, যে পথে নেই কোনো অস্পষ্টতা, নেই সাফল্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ, যে পথের পুরোটাই যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক, কিন্তু যেমন কিছু লোক এ পথের নিকটবর্তী হতে চায় সুমহান উচ্চ আশা নিয়ে, আবার কিছু মানুষ এমনও আছে যারা উপস্থিত ও তড়িৎ উন্নতির উদগ্র বাসনায় এ পথ পরিহার করে চলতে চায়। আর এর জন্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে গড়ে তোলে মানুষে মানুষে দুশমনী এবং অপরকেও লিপ্ত করে। কোনো যুক্তির ধার তারা ধারে না, বা কারো হস্তক্ষেপ অথবা সহযোগিতা কামনা করে না। তাদের জন্যে দুঃখের সাথে আমাদের সহযোগিতার হাতকে ফিরিয়ে নিচ্ছি এবং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, বলছি যা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হায় আফসোস মানুষের জন্যে, পথহারা আল্লাহর হতভাগা ওই বান্দাদের জন্যে!

কিন্তু যখন আল্লাহর রহমত কামনায় ওই মানুষদের অবস্থার ওপর পুনরায় চিন্তা করি তখন আমাদের আফসোসের অবসান ঘটে, যখন আল্লাহপ্রদত্ত সত্য সঠিক ও অপরিবর্তনীয় পথের বাস্তবতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাদের দিকে তাকাই তখন আদিগন্ত বলয়ে দেখতে পাই শুভ্র সমুজ্জল এক আশার আলো। তখন আমাদের মনে হয়, দীর্ঘ দিন দুঃখ কষ্ট ও নানাপ্রকার ভোগান্তির পর অচিরেই মানব জাতির দুঃখের অবসান ঘটবে এবং এগিয়ে আসবে তারা আল্লাহপ্রদত্ত এ মহান পথের দিকে, এগিয়ে আসবে তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শান্ত ও সুশীতল নূরে প্লাবিত ওই দিগ্বলয়ের দিকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ
فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَلَكُمْ فِى
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا
حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۰﴾ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ
عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ
جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾

১৭৮. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে নরহত্যার 'কেসাস' (তথা প্রতিশোধের নীতি) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে (এবং তা এই, মৃত) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি (দন্ডাজ্ঞা পাবে), দাসের বদলে (পাবে) দাস, নারীর বদলে নারীর ওপর (দন্ড প্রযোজ্য হবে), অবশ্য যে হত্যাকারীকে (-যাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের লোকেরা কিংবা) তার ভাইর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, তার ক্ষেত্রে কোনো ন্যায়ানুগ পন্থা অনুসরণ (করে তা সম্পন্ন) করতে হবে, এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস (করার উপায়)ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র; যদি কেউ এরপরও বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তার জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। ১৭৯. হে বিবেকবান লোকেরা, (আল্লাহর নির্ধারিত) এই 'কেসাস'-এর মাঝেই (সত্যিকার অর্থে) তোমাদের (সমাজ ও জাতির) 'জীবন' (নিহিত) রয়েছে, আশা করা যায় (অতপর) তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে। ১৮০. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমাদের জন্যে এই আদেশ জারি করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের মাঝে কোনো লোকের মৃত্যু এসে হাযির হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, (তাহলে) ন্যায়ানুগ পন্থায় (তা বন্টনের কাজে) তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে ওসিয়তের ব্যবস্থা রয়েছে, এটা পরহেযগার লোকদের ওপর (একান্ত) করণীয়। ১৮১. যারা তার (এই) ওসিয়ত শুনে নেয়ার পর (নিজেদের স্বার্থে) তা পাল্টে নিলো (তাদের জানা উচিত); এটা বদলানোর অপরাধের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শোনেন এবং সব কিছুই তাঁর জানা। ১৮২. (অবশ্য) কারো যদি অসিয়তকারীর কাছ থেকে (এ ধরনের) আশংকা থাকে যে, (সে পক্ষপাতিত্ব করে) কারো প্রতি অবিচার করে গেছে, কিংবা (কারো সাথে এর ফলে) না-ইনসাফী করা হয়েছে, তাহলে (যদি সদিচ্ছা নিয়ে) মূল বিষয়টির সংশোধন করে দেয়, এতে তার কোনো দোষ হবে না; আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ
الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

রুকু ২৩

১৮৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা (এর মাধ্যমে আল্লাহকে) ভয় করতে পারো; ১৮৪. (রোযা ফরয করা হয়েছে) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্যে; (তারপরও) কেউ যদি সে (দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে; (এরপরও) যাদের ওপর (রোযা) একান্ত কষ্টকর হবে, তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফেদিয়া থাকবে (এবং তা) হচ্ছে একজন গরীব ব্যক্তিকে (তৃপ্তিভরে) খাবার দেয়া; অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী দিয়ে) ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে এ (অতিরিক্ত) কাজ তার জন্যে হবে একান্ত কল্যাণকর; তবে (এ সময়) তোমরা যদি রোযা রাখতে পারো তাই তোমাদের জন্যে ভালো; তোমরা যদি রোযার উপকারিতা সম্পর্কে জানতে (যে, এতে কি পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে!) ১৮৫. রোযার মাস (এমন একটি মাস)– যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, আর এই কোরআন (হচ্ছে) মানব জাতির জন্যে পথের দিশা, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন, (মানুষদের জন্যে হক বাতিলের) পার্থক্যকারী, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এতে রোযা রাখবে; (তবে) যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, সে পরবর্তী (কোনো সময়ে) গুনে গুনে সেই পরিমাণ দিন পূরণ করে নেবে; (এ সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (জীবন) আসান করে দিতে চান, আল্লাহ তায়ালা কখনোই তোমাদের (জীবন) কঠোর করে দিতে চান না। আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যেন গুনে গুনে (রোযার) সংখ্যাগুলো পূরণ করতে পারো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে জীবন যাপনের) যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ

الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ

إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৬. (হে নবী,) আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে তুমি বলে দিয়ো), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং (সম্পূর্ণভাবে) আমার ওপরই ঈমান আনা, আশা করা যায় এতে করে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। ১৮৭. রোযার (মাসের) রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যৌন মিলনের জন্যে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে; (কারণ, তোমাদের) নারীরা যেমনি তোমাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ, ঠিক) তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক (সমতুল্য); আল্লাহ তায়ালা এটা জানেন, (রোযার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে) তোমরা (নানা ধরনের) আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিলে, তাই তিনি (তোমাদের ওপর থেকে কড়াকড়ি শিথিল করে) তোমাদের ওপর দয়া করলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন, এখন তোমরা চাইলে তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে যা (বিধি বিধান কিংবা সন্তান সন্তুতি) লিখে রেখেছেন তা সন্ধান করো। (রোযার সময় পানাহারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে), তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়, অতপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করে নাও, (তবে) মাসজিদে যখন তোমরা এতেকাফ অবস্থায় থাকবে তখন নারী সম্ভোগ থেকে বিরত থেকো; এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখা, অতএব তোমরা কখনো এর কাছেও যেয়ো না; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর যাবতীয় নিদর্শন মানুষদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে তারা (এ আলোকে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে পারে।

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে আত্মসাত করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্যে এর একাংশ বিচারকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করো না।

তাফসীর

আয়াত ১৭৮—১৮৮

আলোচ্য অধ্যায়ে মুসলিম জাতির সমাজ সংগঠন সম্পর্কে অত্যন্ত জরুরী কিছু তথ্য এসেছে যা তৎকালীন মদীনার প্রাথমিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতায় গড়ে উঠেছিলো। একইভাবে, সে সময় বাধ্যতামূলক কিছু আনুষ্ঠানিক এবাদাতও যে চালু হয়েছিলো তারও কিছু বিবরণ এ অধ্যায়টিতে আমরা দেখতে পাবো। এই দুই ধরনের অবস্থার বিবরণ এসেছে পাশাপাশি সূরাটির একই অধ্যায়ে। এখানে আমরা আরও দেখবো যে সমাজ সংগঠন ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতের মধ্যে রয়েছে সুদৃঢ় ও অত্যন্ত গভীর এক যোগসূত্র, আর তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় ভীতি অন্তরে পোষণ করে জীবনের সব বিষয়ে বাছবিচার করে চলার মনোভাব, যাকে এক কথায় তাকওয়া বলে আমরা বুঝি। দেখবো, সেখানে একইভাবে সমাজ সংগঠনের কার্যাবলী ও তৎপরতার আলোচনা এবং আনুষ্ঠানিক এবাদাতের পাশাপাশি বারবার তাকওয়ার উল্লেখ, সেখানে আরও দেখবো, নেকী (বা ভাল কাজ) সম্পর্কিত আয়াতের পরপরই উল্লেখিত বিধানগুলোর আলোচনা।

এই দারসের পূর্বেকার দরসের শেষ পর্যায়ে নেকী সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে এসেছে একাধারে ঈমানের মূলনীতিসমূহের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং এর বাস্তব কাজের বিবরণ।

বর্তমান আলোচনায় হত্যাকারীদের শাস্তির বিধান এবং তা প্রয়োগের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আরও এসেছে মৃত্যু-পথ যাত্রীর ওসীয়ত সম্পর্কিত কথা। তারপর এসেছে রোযা ফরয হওয়ার বিধান ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ, যেমন দোয়া ও এতেকাফের (রোযার শেষ দশদিনের(ন্যূনতম ২৪ ঘন্টা) নির্দিষ্ট এবাদতের উদ্দেশ্যে) শিক্ষা সম্বলিত কথা। সবশেষে রয়েছে রোযার শেষ দিকের কয়েকটি দিন। ধন সম্পদ সম্পর্কিত মামলা মোকদ্দমার বিধান।

হত্যা-সংক্রান্ত শাস্তির বিধানের পর পরই পুনরায় ইংগীতে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, আর তোমাদের জন্যে রয়েছে হত্যাজনিত অপরাধের অনুরূপ শাস্তি, যাতে করে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) পোষণ করে বাছবিচার করে চলতে পারো।'

ওসীয়ত সম্পর্কিত আয়াতের পর পুনরায় একইভাবে তাকওয়ার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

যখন কেউ মৃত্যুর মুখোমুখী হবে তখন তার কর্তব্য হবে, 'যদি কিছু ধন সম্পদ সে রেখে যায়, তাহলে যেন সে তা অবশ্যই পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে সুন্দরভাবে ও জানা পদ্ধতিতে বন্টনের ওসীয়ত করে যায়। এটা আল্লাহভীরু (মোত্তাকী) দের জন্যে কর্তব্য (ওয়াজেব)।'(১)

এর পরে আসছে রোযার আয়াতের পর পর পুনরায় তাকওয়ার কথা। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর রোযা তেমনিভাবে ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তা ফরয ছিলো, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো আল্লাহর ভয়ে বাছবিচার করে জীবন যাপন করতে পারো।'

এর পর দেখা যায়, রোযার পর এ সম্পর্কিত আয়াতের শেষে এতেকাফের আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে,

'এগুলোই আল্লাহপ্রদত্ত সীমারেখা। অতএব, ওইগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে তাঁর আয়াতগুলো বর্ণনা করছেন যেন তারা মোত্তাকী হতে পারে (আল্লাহর ভয়ে বাছবিচার করে চলতে পারে)।'

তাকওয়ার ব্যাখ্যা এবং নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে দরসের শেষ নাগাদ আরও কিছু কথা অবশ্যই আসতে থাকবে, আসবে অনুভূতি রাজ্যের কিছু অস্থিরতা এবং আল্লাহ সম্পর্কে অন্তরের মধ্যে কিছু বোধ-উপলব্ধি দেখুন সামনে পরপর কি কথাগুলো আসছে,

'(রমযান মাসে বিভিন্ন অবস্থায় রোযা কাযা করার অনুমতি দানের কারণ হিসেবে কিছু কথা বলার পর বলা হচ্ছে) যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করতে পারো এবং তোমাদের আনুগত্য প্রকাশের পথ সহজ করে দেয়ার ফলে তোমরা তাঁর বড়ত্ব যাহির করতে পারো। আর তাঁর যাবতীয় নেয়ামত ভোগ করায় তোমরা তাঁর শোকরগোযারি করতে পারো। (এতসব নেয়ামত তোমরা লাভ করেছো), অতএব, ওদের কর্তব্য আমার ডাকে সাড়া দেয়া ও আমার সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা, তাহলেই আশা করা যায় তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শ্রবণকারী ও সম্যক জ্ঞাত।'

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী ও মেহেরবান।'

কদাচিৎ মানুষ 'দ্বীন'-এর তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করে। এ 'দ্বীন' হচ্ছে এমন এক জীবনব্যবস্থা যার বিকল্প নেই। এ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যে সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো সবই সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে। এর নীতিমালা আল্লাহর রসূল (স.) কর্তৃক নির্ধারিত। এর উপাসনা বা আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলো আনুগত্য প্রকাশক। এসব কিছু ঈমান আকীদার উৎসমূল থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং এইসব সদগুণ ওই ধ্যান-ধারণা থেকে নির্গত হয়েছে যা পরিপুষ্ট হয়েছে ঈমানী আকীদা দ্বারা। আর সব কিছু এক আল্লাহর রশির সাথে আবদ্ধ। সকল কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে

(১) সূরায় নেসার ১১-১২ নং আয়াতে মীরাস এর আইন নাজেল হওয়ার পূর্বে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে মৃত্যু পথ যাত্রীর প্রতি সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজন সবার জন্যে নিজ বুঝ মতো ওসীয়তের নির্দেশ ছিলো যাতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ওয়ারিশদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ না লাগে। পরবর্তীতে মীরাসের আইন এসে গেলে তাদের ওসীয়তের পদ্ধতি রহিত হয়ে গেলো যাদের হক মীরাসের আইনে নিদ্ধারিত করা হয়েছিলো। কিন্তু বাকি আত্মীয় স্বজনের জন্যে মোমেনদের ওপর এ হক রয়ে গেলো। হাদীস শরীফে উল্লেখিত এই ওসীয়তের পরিমান নির্দ্ধারিত হয়েছে উদ্ধে তিন ভাগের এক ভাগ। মোমেনের ওপর হক বলাতে এটা ওয়াজিব বলে জানা যায়। অতএব সূরায় 'নেসা-তে বর্ণিত মীরাসের আইনে যাদের অংশ নির্দ্ধারিত রয়েছে তার বাইরে আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী অথবা জনসেবামূলক কাজের জন্যে, যেখানে মৃত্যুপথযাত্রীর খুশী- ওসীয়ত করা ওয়াজিব।

একটি মাত্র উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আর তা হচ্ছে এবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও পরিপূর্ণ আনুগত্য।

এ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং রেযেক দান করছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্ব রূপ রাজ্যে প্রতিনিধিত্বের সম্মান দিয়েছেন। তবে, এ খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব কিছু শর্ত সাপেক্ষে– তা হচ্ছে তারা একমাত্র আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার ওপর আস্থা পোষণ করবে এবং একমাত্র তাঁর দিকেই আনুগত্যভরা হৃদয় নিয়ে ঝুঁকে থাকবে। গ্রহণ করবে তারা তাদের চিন্তা ভাবনাকে তাদের নিয়ম শৃংখলা ও আইন কানুনগুলোকে একমাত্র তাঁরই কাছ থেকে।

ইসলামে হত্যাকারীর জন্যে শাস্তির বিধান

এ দারসের মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ের ওপর আলোচনা এসেছে, প্রধানত সেগুলো শাস্তি বিধান সম্পর্কিত। এসেছে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বার্তা যা মানুষকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখার জন্যে সুন্দরতম ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, নিহত ব্যক্তিদের খুনীদেরকে শাস্তি দান করাকে তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক (ফরয) করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিধান হচ্ছে, যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে খুন করে তাহলে ওই স্বাধীন খুনী ব্যক্তিকে জানের বদলা জান স্বরূপ হত্যা করতে হবে। এমনিভাবে কোনো দাস নিহত দাসের পরিবর্তে এবং কোনো নারী খুনী হলে নিহত নারীর বদলে তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। আর জেনে রেখো, হে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা তোমাদের জন্যে এই শাস্তি বিধানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে জীবন (এর নিরাপত্তা) রয়েছে (এ বিধান মেনে চললেই) আশা করা যায় তোমরা আল্লাহভীরু জীবন যাপন করতে পারবে (আল্লাহর ভয়ে তাঁর আইন কানুন মানার মাধ্যমে বাছবিচার করে চলতে পারবে)।'

দেখুন, এখানে ঈমানদারদেরকে ডেকে বলা হয়েছে। ঈমানদার তারাই যারা বিশ্বাস করে যে একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবেই। অবশ্যই তারা এ বিশ্বাস রূপ গুণটির অধিকারী, এর সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তি বিধান যে চূড়ান্ত এবং সর্বাংগীন সুন্দর তাও অবশ্যই তারা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে যে মহান সেই আল্লাহ তায়ালাই এ কথা জানিয়েছেন যে নিহত ব্যক্তির খুনীদেরকে শাস্তি দানের বিধান পালন করা তাদের জন্যে ফরয এ বিষয়ক প্রথম আয়াতেই এ নির্দেশের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে এই শাস্তি বিধানের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এর তাৎপর্য বুঝার ব্যাপারে মানুষের বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও গবেষণাকে কাজে লাগানোর জন্যে এই আয়াতের মাধ্যমে প্রেরণা জাগানো হয়েছে। একইভাবে জাগানো হয়েছে তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ ভীতির চেতনা। আর তা হচ্ছে, যে এলাকায় হত্যাকারীদের অনুরূপ শাস্তি দান করা হবে সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা গড়ে উঠবে।

আর এই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ইসলামী বিধান, যা মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গিয়েছেন। এ বিধান অনুসারে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করার দরুন স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে।

মুক্তিপণের সীমা পরিসীমা

তারপর আসছে ইসলামের সম্মোহনী ও মানবতাবোধ জাগরণকারী উদারতা ও মহানুভবতার প্রেরণাদায়ক ক্ষমা করার প্রচ্ছন্ন ইংগিত। এরশাদ হচ্ছে,

'কেউ যদি তার (মোমেন) ভাইয়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করে তখন তার কর্তব্য হবে প্রচলিত ও সর্বজন বিদিত নিয়ম অনুসারে সুন্দরভাবে মুক্তিপণ আদায় করা।'

এই ক্ষমাপ্রাপ্তি নিশ্চিন্ত করা যাবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস বা অভিভাবকদের মুক্তিপণ গ্রহণ করতে রাযি হওয়ার মাধ্যমে, অর্থাৎ জানের বদলে কিছু আর্থিক জরিমানা গ্রহণ করতে তারা সম্মত হলেই এ ক্ষমা পাওয়া সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে রক্তের দাবীদার নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যখন মুক্তিপণ নিতে স্বেচ্ছায় স্বীকার হবে তখনই তার কাছে উক্ত খুনী ব্যক্তি আরযু পেশ করবে যেন প্রচলিত পদ্ধতি মোতাবেক সন্তুষ্টির সাথে এবং মোহাব্বাতের সাথে তার মুক্তিপণ বিবেচনা করা হয়।

এইভাবে যে মুক্তিপণ নির্ধারিত হবে তা যেন নির্দিষ্ট সময়ে এবং সঠিকভাবে আদায় করা হয়। এটা ওই খুনী ব্যক্তি বা তার অভিভাবকদের ওপর ওয়াজেব। এর দ্বারা মন মগয ও অন্তরগুলোর সংশোধনীর পথ খুলবে এবং মানুষের মনে আপনজন হারানোর যে ক্ষত তা ধীরে ধীরে পূরণ হয়ে যাবে। যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ বিনষ্ট না হওয়ার এটাই হচ্ছে চমৎকার ব্যবস্থা।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ও 'দিয়াৎ' বা মুক্তিপণের সুযোগ ও প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দান করে মোমেনদের প্রতি অপূর্ব এহসান করেছেন। এর মধ্যে অপরাধকে হালকা করে দেখেও দয়া প্রদর্শন করার প্রেরণা রয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যে, বনি ইসরাঈল জাতির জন্যে এই ক্ষমার বিধান তাওরাতে বৈধ ছিলো না। এটা একমাত্র উম্মতে মোহাম্মাদীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণযোগ্য শর্তসাপেক্ষে ক্ষমার ব্যবস্থা, যাতে করে অনেক মানুষের জীবন রক্ষা পায়। এরপর দেখুন মহান আল্লাহর বাণী,

'এই ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ নিয়ে যে হতভাগা সীমা অতিক্রম করবে (পুনরায় অনুরূপ অপরাধ করবে) তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

আখেরাতে যে আযাবের ওয়াদা করা হয়েছে তা তো আসবেই, তার পূর্বে দুনিয়াতেও তাকে হত্যা করা হবে একথা সুনিশ্চিত অর্থাৎ পুনরায় তার জন্যে আর কোনো ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। কারণ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে আপোষরফা গৃহীত হয়েছে তা ভংগ করা মানেই হলো সীমালংঘন করা। তাই এই ধরনের অপরাধীদের ক্ষমা করে সাধারণ মানুষের জীবন শংকিত করে তোলা ইসলাম আদৌ সমীচীন মনে করে না।

এর পরও 'দিয়ত' নিয়ে যে অভিভাবক রক্তের দাবী ছেড়ে দিতে রাযী হয়েছিলো তাকে আর ক্ষমা করতে অনুরোধ করা কখনও সম্ভব নয়, বরং এ পর্যায়ে এসে তার জন্যে ক্ষমা করা জায়েযও নয়। এই পরিস্থিতিতে তাকে শাস্তি নিতেই হবে এবং তাকে তার যুলুমের সাজা দিতেই হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি ইসলামের দিগ্বলয়সমূহ কত প্রশস্ত। ইসলামের আইন বিধিবদ্ধ করার সময় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে দোষারোপের যে প্রবণতা আছে, আছে ঝগড়া ফাসাদের ঝোঁক, এগুলো খেয়াল রাখা হয়েছে। ইসলাম বিবেচনা করেছে রক্তের বদলা গ্রহণ করার প্রকৃতিগত দাবীকে এবং এজন্যে ইসলাম হত্যাকারীর জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষের মর্যাদাকে খতম করে দিয়ে তার ওপর যুলুম করবে তার জন্যে ইনসাফের দাবী হচ্ছে শাস্তির ব্যবস্থা করা।

কারণ শাস্তি দানের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে প্রজ্জলিত ক্রোধাগ্নি নেভানোর যৌক্তিকতা ইসলাম স্বীকার করে, যেহেতু ন্যায় বিচারই অন্তরের ক্রোধ প্রশমিত করার উপায়। অপরদিকে এই শাস্তির বিধানই দুষ্কৃতকারীকে তার বারংবার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করাকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু একই সাথে ইসলাম চায় ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভালবাসাবাসি সৃষ্টি হোক, তাই, এজন্যে সে পথও উন্মুক্ত রেখে ইসলাম তার সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

কেসাস বা শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলার পর আহবান জানানো হয়েছে ক্ষমা প্রদর্শন করতে। আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার কামনায় কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নয়, দাবীদারের জন্যে এটা ঐচ্ছিক ব্যাপার। এখানে মানুষের প্রকৃতগত চাহিদাকে উপেক্ষা করে এমন কোনো বোঝা তার ওপর চাপানো হয়নি যা বহন করতে সে অক্ষম।

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে এসেছে যে, এ আয়াত 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে অবতীর্ণ সূরায়ে মায়েদার একটি আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াত মানসূখ হয়ে যায়। সাধারণ মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে,

'আমি, তাদের ওপর যে বিধান মানাকে ফরয করেছিলাম তা হচ্ছে, জানের বদলে জান।'

ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াত উল্লেখ করেছেন,

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের ওপর কেসাস ফরয করা হয়েছে।'

তিনি এই আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা.) এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে 'আল হুররু বিল হুররি' (নিহত স্বাধীন ব্যক্তির হত্যার শাস্তিস্বরূপ কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা) এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো আরবের দুটি গোত্র সম্পর্কে, যারা ইসলামের আগমনের কিছু পূর্বে জাহেলি যামানায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে বহু লোক হতাহত হয়, সে যুদ্ধে বহু দাস ও নারীও নিহত হয়। তারপর উভয় গোত্রই পরস্পর প্রতিশোধ গ্রহণ করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে। তখন, এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে সংখ্যা ও সম্পদে বেশী থাকার কারণে তারা প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে তাদের দাসের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের কোনো স্বাধীন ব্যক্তি এবং তাদের কোনো নারীর পরিবর্তে প্রতিপক্ষের কোনো পুরুষকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা কোনো সমঝোতায় রাযি হবে না। তাদের প্রসংগেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতটি পরবর্তীকালে অবতীর্ণ সুরায়ে মায়েদার এই আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

আমাদের কাছে অবশ্য মনে হয়েছে এখানে বর্ণিত আয়াতটির প্রসংগ এবং সূরায়ে মায়েদায় বর্ণিত আয়াতের প্রসংগ এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রসংগে আয়াত দুটির প্রয়োগ ক্ষেত্রও ভিন্ন। সূরায়ে মায়েদার আয়াতটি প্রজোয্য ওই ক্ষেত্রে যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করে, অথবা কিছুসংখ্যক ব্যক্তি অপর কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে খুন করে, সেখানে যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয় তাহলে জানের বদলে জান নেয়ার নীতি বহাল হবে।

কিন্তু এখানে যে আয়াতের প্রসংগে আলোচনা চলছিলো তাতে বুঝা যাচ্ছিলো যে ওই আয়াতটি সামষ্টিক হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে প্রজোয্য, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে ইসলাম পূর্ব যুগে জাহেলিয়াতের যামানায় দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে বহু লোক হতাহত হয় যেখানে কৃতদাসদের ওপর ক্রীতদাসরা হামলা করে, এক কাবীলা আর এক কাবীলার ওপর এবং এক দল আর এক দলের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। যেখানে ক্রীতদাস, স্বাধীন ও নারী সব ধরনের লোক নিহত হয়।

তারপর যখন কেসাসের বিধান দেয়া হলো তখন এক গোত্রের স্বাধীন অপর গোত্রের স্বাধীন ব্যক্তির, এক গোত্রের দাস অপর গোত্রের দাস-এর এবং এক গোত্রের নারী অপর গোত্রের নারীর ওপর প্রতিশোধ বা কেসাস নেয়া সাব্যস্ত হলো। ওই অবস্থায় এ ছাড়া উপায়ই বা কি হতে পারে যেখানে সব ধরনের লোক মিশ্রিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এ চিন্তা সঠিক হলে পরবর্তী আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের মানসূখ হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না বা এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীলও মনে হয় না।

কেসাস সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি

হত্যা প্রতিরোধে কেসাসের বাস্তবতা

তারপর কেসাস-এর ফরয হওয়া সম্পর্কিত কথা এবং এর তাৎপর্য ও শেষ লক্ষ্য পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে,

'আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্যে কেসাস বা শাস্তি বিধান- এর মধ্যেই রয়েছে জীবন।'

'হে বুদ্ধিমানরা, হয়তো তোমরা এর থেকে আল্লাহর ভয়ে বাছবিচার করে চলার শিক্ষা নিতে পারবে।'

আসলে আয়াতে বর্ণিত কেসাস দ্বারা প্রকৃত পক্ষে প্রতিশোধ নেয়া হয়, তা নয়, বা এটা প্রজ্জলিত প্রতিশোধ স্পৃহা নির্বাপক কোনো বিধানও নয়, বরং এটা তার থেকে অনেক উন্নত ও উচুঁ পর্যায়ের এক পদক্ষেপ, যার দ্বারা নিরাপত্তা বিধান হয়। বহু জীবনের জন্যে এবং বহু জীবন সংরক্ষণের জন্যেই ওই বিধান, বরং আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় একাজটি নিজেই যেন এক জীবন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া। তারপর এ বিষয়টি বুঝার জন্যে এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে এবং এই কেসাস ফরয হওয়ার তাৎপর্য বুঝার জন্যে আহবান জানানো হয়েছে। আহবান জানানো হয়েছে অন্তরসমূহকে উজ্জীবিত করা এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি সঞ্চার করার জন্যে।

'কেসাস এর মধ্যেই জীবন' কথাটা এইভাবে বুঝা যায়। যখন কোনো ব্যক্তি শুরুতেই বুঝতে পারে যে সে কাউকে হত্যা করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে এবং এই শাস্তির দৃষ্টান্ত তার সামনে থাকায় সে নিশ্চিত থাকে যে অবশ্যই কোনোভাবে সে রেহাই পাবে না, তখন হত্যাকান্ড ঘটানো থেকে তার হাত আপনা থেকেই থেমে যাবে। এইভাবেই 'কেসাস-এর মধ্যেই জীবন' কথাটা সত্যে পরিণত হয়।

যে কোনো ব্যক্তি নিজের জীবনাশংকা সামনে দেখতে পেয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে বাধ্য হবে এবং হত্যার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাবে। তারপর হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করায় তার দ্বারা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের অন্তরে প্রজ্জলিত জিঘাংসার আংগুন নিভে যাবে এবং বাস্তবে উভয় পক্ষ শান্তির দিকে এগিয়ে যাবে। তৎকালীন আরব কবীলাগুলোর মধ্যে যুদ্ধের দাবানল একবার ছড়িয়ে পড়লে তা সহজে নিভতো না, এমনকি থেমে থেমে হলেও কোনো কোনো যুদ্ধ চল্লিশ বছর পর্যন্ত চলতে থেকেছে, যেমন 'বাসূস' এর যুদ্ধ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে চলেছিলো বলে জানা যায়।

অবশ্য, আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক একটি যুদ্ধ গোত্রীয় দ্বন্দ্বের কারণে শুরু হয়ে প্রতিহিংসার কসাইখানায় পরিণত হচ্ছে এবং সেখানে রক্তঝরা চলছেই চলছে।

'জীবনের' সাধারণ অর্থেও বুঝা যায় যে কেসাসের মধ্যেই জীবন, প্রকৃত পক্ষে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অর্থ একজনকেই হত্যা করা নয় বরং সমগ্র মানবমন্ডলীকে হত্যা করা বুঝায় (যদি

শাস্তি না দেয়া হয় ও এর ফলে হত্যা প্রবণতা চলতে থাকে এবং আরও অনেক হত্যার দরজা খুলে যায়। সুতরাং, কোনো দুষ্কৃতকারীর হাতকে হত্যা থেকে নিবৃত করার অর্থ গোটা মানবমন্ডলীকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করা। হত্যাকান্ডের এই থেমে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের জীবন। এটা কোনো এক ব্যক্তির জীবন রক্ষাই নয়, নয় এটা কোনো পরিবার বা দলের জীবন রক্ষা, বরং এটা বিশ্বজোড়া মানব পরিবারেরই জীবন রক্ষা।

এরপর জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম এই শাস্তি দানের বিধান চালু করে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর যে জিনিসটি প্রবর্তন করেছে তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতিটি বিধানের মধ্যে যে গভীর প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা বুঝার জন্যে প্রয়োজন মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করা এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি পয়দা করা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যাতে করে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) হাসিল করতে পারো বা আল্লাহর ভয়ে বাছবিচার করে জীবন যাপন করতে পারো।'

ওসীয়তের বিধান

এরপর আসছে মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ। এ বিষয়ের সাথে কেসাস সম্পর্কিত আয়াত ও পরিবেশের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখা যায়। দেখুন আল্লাহর বাণী,

'তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলে, যদি কিছু ধন সম্পদ সে ছেড়ে যায়, তাহলে তার উচিত সে যেন সুবিদিত পন্থায় ওসীয়ত করে যায় পিতামাতার জন্যে এবং আত্মীয়স্বজনের জন্যে। মোত্তাকী (আল্লাহ ভীরু) লোকদের জন্যে এটা 'হক' (দেনা)। তাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য এ কাজটি করা। তারপর, এ নির্দেশকে কোনো ব্যক্তি শোনার পরও যদি এর মধ্যে কোনো রদবদল করে (এ নির্দেশ পালন না করে অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে) তো যারা এ কাজ করবে তাদের পাপের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শুননেওয়ালা, সবকিছু জানেন। তবে কেউ যদি ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্বের ভয় করে অথবা অপরাধজনক কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আশংকা করার কারণে তাদের মধ্যে সংশোধনী কোনো পদক্ষেপ নেয় বা মীমাংসা করে দেয় তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী, মেহেরবান।'

মীরাসের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে কোনো মৃত্যুপথযাত্রী কিছু সম্পদ ছেড়ে গেলে আত্মীয়স্বজন সবার জন্যে ওসীয়ত করা তার জন্যে একটি ফরয কাজ ছিলো। আরবীতে 'খায়র' বলতে ধনসম্পদ বুঝায়। তবে কতোটা ধনসম্পদ থাকলে ওসীয়ত করতে হবে এ বিষয় কিছু মতভেদ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

সাধারণভাবে সম্পদ বলতে যা বুঝায় তার ওপরই এই হুকুমটি কার্যকর হবে। তবুও ইসলামী আইনবিদদের কেউ কেউ বলেছেন, ষাট দীনার থেকে কম কোনো অংকের সম্পদের ওপর 'খায়র' শব্দটি প্রজোয্য নয়, কেউ বলেছেন 'আশি' কেউ বলেছেন চারশত, আর এক হাজার দীনারের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। আর যুগে যুগে ও দেশে দেশে সময় ও স্থানের পার্থক্যের সাথে এ অংকের পরিবর্তন যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশ্য, ওসিয়তের আয়াত নাযিল হওয়ার অনতিকাল পরই মীরাসের আইন এসে গেলো। সেখানে ওয়ারিসদের প্রত্যেকের জন্যে অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হলো, পিতামাতাকে সর্বাবস্থাতেই ওয়ারিস করে ঘোষণা করা হলো। এ কারণে তাদের জন্যে ওসীয়ত করার আর কোনো প্রয়োজন রইলো না যেহেতু ওয়ারিসরা ওসীয়তের হকদার নন।

এ বিষয়ে রসূল (স.)-এর ভাষ্যে জানা যায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন, অতএব ওয়ারিস (যার হিসসা বা হক নির্দিষ্ট আছে) তার জন্যে আর ওসয়িতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, (যেহেতু তাদের জন্যে কোনো অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, এই জন্যে) তাদের জন্যে প্রথম অবতীর্ণ ওই আয়াতের হুকুম কার্যকর রয়ে গেছে। অর্থাৎ মীরাসের আইনে যাদের কোনো অংশ উল্লেখিত হয়নি তাদের জন্যে ওসীয়ত করাটা আজও ওয়াজেব রয়ে গেছে। কোনো কোনো সাহাবা ও তাবেঈর মতও এটাই, এই কারণে আমরা এই মতটি গ্রহণ করেছি।

এখন ওয়ারিস ছাড়া অন্যদের জন্যে ওসীয়তকে ওয়াজেব করার মধ্যে কী হেকমত বা তাৎপর্য আছে তা চিন্তা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই এ ব্যবস্থার কারণে আত্মীয়স্বজনের সাথে নৈকট্যের সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা অভাবনীয় আরও অনেক কল্যাণ সধিত হয়।

একথা তো সবার কাছেই স্পষ্ট যে তাদের জন্যে ওসীয়তের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে ওয়ারিসরা (যাদের অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে) তাদেরকে কিছুই দেবে না এবং অভাবগ্রস্ত ওইসব আত্মীয়স্বজনের পথে এই ওয়ারিসরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আসলে পারিবারিক জীবনে মাধুর্য আনয়নের ব্যাপারে এবং পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে এ পদ্ধতি একটি অনবদ্য ব্যবস্থা। এই কারণে নেকী ও তাকওয়া প্রকাশক ব্যবস্থা হিসেবে একে অভিহিত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে—

'সুবিদিত বা প্রচলিত পন্থায় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা মোত্তাকীদের জন্যে কর্তব্য।'

সুতরাং, ওয়ারিসরা যেন এ বিষয়ে (না দিতে চেয়ে) কোনো যুলুম না করে, আর ওয়ারিসদের গন্ডীর বাইরের লোকেরা যেন একেবারে অবহেলিত না হয়ে যায়। এ বিষয়ে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) এবং মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবশ্যই যেন অবলম্বন করা হয়। এর ফলে সমাজে নেকীর (কল্যাণের) ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং মানুষে মানুষে দরদ ও মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এর সাথে, আরো বলতে হয় যে শরীয়ত এ বিষয়টিকে অস্পষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেয়নি বরং ওসীয়তের পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছে। রসূল (স.)-এর কর্মধারা থেকে জানা যায় তিন ভাগের এক ভাগের (উর্ধে) যেন ওসিয়ত করা না হয় তবে চারভাগের এক ভাগ দেয়াটাই ভালো, যাতে ওয়ারিসরাও তাদের ন্যায্য পাওনা পেতে পারে এবং এই দেয়ার ব্যাপারে কোনো সংকট বোধ না করে। এভাবেই শরীয়তের বিধান ও তাকওয়ার দাবী মানা তাদের জন্যে সহজ হবে। এই-ই হচ্ছে ইসলামের সমাজ সংগঠনের অতি চমৎকার এক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের বুনিয়াদ রেখেছে এবং শান্তিপূর্ণ জীবনকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একথা সবার অবশ্যই বুঝতে হবে যে কোনো (ওয়ারিস) ব্যক্তি এ ব্যবস্থার কথা শোনা ও জানার পর ওসীয়তকারীর মৃত্যুর পর যদি এ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনে তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। এতে পরিবর্তন আনার অধিকার কারো নেই। এর দ্বারা ওসীয়তকারী দায় মুক্ত থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওসীয়ত শোনার পরও এ নিয়মকে যারাই বদলাবে অবশ্য অবশ্যই তাদের ওপর এই পরিবর্তনের গুনাহ এসে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন এবং শোনেন। মৃত ব্যক্তির কার্যকলাপ তো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দেখেছেন যে সে নিজ কর্তব্য পালন করে গিয়েছে, এজন্যে তার মৃত্যুর পর অন্যরা যা কিছু করবে সে ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করা হবে না। যারা এ

আইন বদলে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করেছে তাদের কার্যকলাপও আল্লাহ তায়ালা দেখেছেন। অতএব এই পরিবর্তন করার জন্যে অবশ্যই তিনি তাদের পাকড়াও করবেন।'

তবে একটি মাত্র অবস্থায় ওসীয়তকারীর ওসীয়ত ওই ব্যক্তির জন্যে বদলানো জায়েয আছে, যে জানতে পারে যে, ওসীয়তকারী কারও পক্ষপাতিত্ব করে গেছে, অথবা কোনো ওয়ারিসের হক নষ্ট করে গেছে। একমাত্র সেই অবস্থাতে ওসীয়ত কার্যকর যারা করবে, তারা হক ও ইনসাফ মতো, অর্থাৎ ওসীয়তের নিয়ম অনুসারে, কোনো পরিবর্তন করলে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'তবে কোনো ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে যদি পক্ষপাতিত্ব অথবা কোনো অপরাধজনক পদক্ষেপ নেয়ার আশংকা কেউ করে এবং তাদের মধ্যে সংশোধন করে দেয়, সে অবস্থায় তার কোনো গুনাহ্ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার আধার, মেহেরবান।'

এই ব্যক্তি এবং ওই ব্যক্তি উভয়ের বিষয়টি আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার ওপর নির্ভর করে এবং সকল অবস্থাতেই তা আল্লাহর বিবেচনার অধীন, কারণ সকল কিছু আল্লাহর সাথে বিজড়িত হওয়ার মাধ্যমেই চূড়ান্ত ন্যায়বিচার ও ইনসাফ বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই ইতিপূর্বে হত্যাকারীকে শাস্তি দানের আলোচ্য বিষয়ের সাথে ওসীয়তের এই আইনটি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আর একটি ইসলামী সমাজে সব কিছুর পেছনে ঈমানী চেতনা যে সমভাবে ক্রিয়াশীল তা বুঝতে আর বাকি থাকে না।

রোযার শিক্ষা ও তাৎপর্য

যে কারণে উম্মতে মোহাম্মাদীর ওপর আল্লাহর পথে জেহাদ করা ফরয করা হয়েছে, সেই একই কারণে তাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। এই রোযা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ এক ব্যবস্থা, যাতে করে আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানবমন্ডলীর ওপর মোমেনদের নেতৃত্ব কায়েম হয়ে যায়। রোযা রাখার মাধ্যমে মোমেন ব্যক্তি সত্যের সাক্ষ্য দান করার দায়িত্ব পালন করে। রোযা মানুষের দৃঢ় ইচ্ছা ও মযবুত সংকল্পের বহিপ্রকাশ। এর দ্বারা তার রবের সাথে তার আনুগত্যের বন্ধন স্থাপিত হয় এবং আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

রোযার মাধ্যমে মানুষ তার দৈহিক প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং দৈহিক সকল চাহিদার ওপর নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তার দেহ ও মেযাজের চাহিদাগুলোকে প্রদমিত রাখার জন্যে এই যে কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার তা অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর রেযামন্দি ও তাঁর কাছেই প্রতিদান হাসিল করার উদ্দেশ্য থাকাতেই সম্ভব হয়। দুঃসহ বেদনা ভরা এবং বাধা বিঘ্ন ও শত্রুতার জাল বিছানো ইসলামের যে কঠিন পথ, আল্লাহর সেই পথে চলার জন্যে এবং সে পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকার জন্যে যে দৃঢ় মনোবল, ত্যাগ তিতীক্ষা ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন সেগুলো গড়ে তোলার লক্ষ্যে রোযা এক বিশেষ প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই মানুষ তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা যৌন আকর্ষণসহ অন্যান্য ইন্দ্রীয় লিপ্সা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। নিয়ন্ত্রিত করতে পারে সে নিজেকে হাজারো প্রকারের দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে, যা মানুষের মধ্যে এক প্রবল ও অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করে।

এই সংযম সাধনার কল্যাণকারিতা, কিছু সময় পার হওয়ার পরই অনুভূত হয় এবং শারীরিক রোগ মুক্তি ও সুস্থতা আকারে তা প্রকাশ পায়।

যদিও রোযা রাখার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম পালন ও বান্দার প্রতি তাঁর দেয়া দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার সাথে সাথে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিভিন্ন ফায়দাও মানুষ হাসিল করে, তবুও আমি মনে করি রোযার যে বিশেষ গুণ এবং আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জানাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে তার দায়িত্ব পালন করা এবং পরকালীন যেন্দেগীর পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্যে তাকে প্রস্তুত করা। এতদসত্তেও, একথা আমি মোটেই অস্বীকার করবো না যে মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার নিরীখে বাস্তব এমন ফায়দাও রোযার মাধ্যমে আসে যা অন্য কিছু থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ রব্বুল ইযযত যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো নিছক আখেরাতের জীবনের জন্যে নয় বরং প্রতিটি নির্দেশের পেছনে বান্দার পার্থিব জীবনের বহুমুখী উপকারিতা নিহিত। কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মুক্ত হলে ওই অনুষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যাবে না, যেহেতু মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ তাই যখন সে এবাদাতগুলোর মূল উদ্দেশ্য অনুভব করে এবং সেগুলোর বাস্তব ফায়দা বুঝতে চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার জন্যে তাঁর জ্ঞান ভান্ডারের দুয়ার অবারিত করে দেন আর তখনই সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত অনুভব করে এবং একই সাথে রোযার মধ্যে দুনিয়াবী বিভিন্ন উপকারও বুঝতে পারে। এ বিষয়ে লক্ষ্য করুণ আল্লাহর চিরন্তন অমিয় বাণী,

'হে ঈমানদাররা, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর (রোযা) ফরয করা হয়েছিলো, যাতে করে তোমরা তাকওয়া লাভ করতে পারো (আল্লাহর ভয়ে বাছবিচার করে জীবন যাপন করতে পারো)। এই রোযা নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্যে, তবে কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে তাহলে ওই কয়েক দিনের জন্যে অন্য সময়ে সমপরিমাণ রোযা রেখে পূরণ করে দেবে। আর রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্তেও যদি কেউ না রাখতে চায় তাহলে প্রতি রোযার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে একজন করে মিসকীন খাইয়ে দেবে। তবে স্বতস্ফূর্তভাবে যে ভাল কাজ করবে সে ভাল কাজ তার জন্যে উপকারী বলে প্রমাণিত হবে। অবশ্য, রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা এর উপকারীতা বুঝতে তাহলে অবশ্যই রোযা রাখতে।'

প্রথম বছরে রোযা ফরয হওয়া সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। এ সময় রোযা রাখা না-রাখার এখতিয়ার দেয়া হয়, অর্থাৎ ফিদ্ইয়া দিলে না রাখার অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তী বছরে সকল মুসলমানের ওপর রমযান মাসের পুরো একমাস রোযা ফরয হয়ে যাওয়ার কারণে পূর্বেকার ওই রেয়ায়েত বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু অসুস্থ অথবা মোসাফেরের জন্যে ওই রেয়ায়েত পূর্ববৎ বহাল থাকে। দেখুন পরবর্তী আয়াত,

'রমযান মাস, যার মধ্যে কোরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে। এ কেতাব গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত (পথ প্রদর্শক) এবং হেদায়াতের কথাগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী, আর (সত্য ও মিথ্যার মাঝে) পার্থক্য সৃষ্টিকারীও বটে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মাসের সাথে সাক্ষাত লাভ করবে সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। তবে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা সফরে থাকলে সে ওই সময়ে রোযা না রাখতে পারা দিনগুলোর জন্যে অন্য সময়ে রোযা রেখে পূরণ করে দেবে।

আল্লাহ তায়ালা সব কিছুকে তোমাদের জন্যে সহজ করে দিতে চান। তিনি কোনো কঠোরতাই তোমাদের জন্যে চান না। (তোমাদেরকে এই রেয়ায়েত দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি চান) তোমরা (সুস্থ শরীরে) রোযার সুনির্দিষ্ট দিনগুলোতে পুরোপুরি রোযা রাখো। (আরও তিনি

চান তোমাদের আনুগত্য ভরা অন্তর নিয়ে) আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রকাশ করো। যেহেতু তিনি তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথে পরিচালনা করতে চান (এবং তিনি আরও চান যে তোমাদের প্রতি সকল সময়ে তাঁর এহসানের কারণে) তোমরা যেন তাঁর শোকরগোযারি করতে পারো।'

অবশ্যই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা জানেন যে বান্দাকে কোনো নির্দেশ দিলে তা পালন করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন আছে এবং তার মধ্যে ভাবের আবেগও সৃষ্টি করা দরকার, যাতে করে সে আনন্দচিত্তে সেই নির্দেশ পালন করতে পারে। তাই দেখা যায় রোযা সম্পর্কিত নির্দেশের মধ্যে রোযার বহুবিধ উপকারিতা ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, যাতে বান্দা প্রশান্ত মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে এ বিধান পালন করতে পারে।

আরও দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা অতি আদরের সাথে মোমেন বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে (হে মোমেনরা বলে সম্বোধন করে) রোযা রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাদেরকে রোযার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তারপরই জানাচ্ছেন যে পূর্ববর্তী প্রতি যামানার মোমেনদের ওপরও একইভাবে রোযা ফরয করা হয়েছিলো। আরও জানাচ্ছেন যে রোযার প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর ভয়ভীতি অন্তরে জাগিয়ে তোলার প্রশিক্ষণ লাভ, মনের পরিচ্ছন্নতা অর্জন, মোহাব্বাতের গভীর আবেগ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলা যার ফলে সে জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে বাছ বিচার করে চলতে পারে।

পুনরায় দেখুন আল্লাহর আহবান–

'হে ঈমানদাররা, ফরয করা হয়েছে রোযা তোমাদের ওপর, যেমন করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে, যাতে করে তোমরা তাকওয়া হাসিল করতে পারো (আল্লাহর ভয়ে বাছ বিচার করে চলতে পারো)।'

আর এইভাবেই রোযার যে মহান উদ্দেশ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তা হচ্ছে 'তাকওয়া' অর্জন আর এই তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) হৃদয়পটে জাগ্রত হওয়ার কারণে সে হৃদয় এই কঠিন ফরয আদায় করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই ফরয কাজটি আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সে রাযী হয়ে যায়।

অপরদিকে, এই তাকওয়াই গুনাহর কাজ করে রোযা নষ্ট করা থেকে রোযাদারদের অন্তরসমূহকে পাহারা দিয়ে রাখে। এমনকি রোযাদারের অন্তরের মধ্যে উদিত সকল কুধারণাগুলোকে দূর করে। যাদেরকে কোরআন সম্বোধন করেছে (তারা মোমেন) আল্লাহর কাছে তাকওয়ার মর্যাদা কতো বেশী তা তারা ভাল করেই জানে, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় এই তাকওয়ার ওজনই ভারী। এই তাকওয়া অর্জনই রোযার আসল উদ্দেশ্য যার দিকে তাদের আত্মা ধাবিত হয়। আত্মার এই উৎকর্ষ সাধনের উপায়গুলোর মধ্যে রোযা একটি এবং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে অন্যতম পথ। এই তাকওয়াকেই অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে কোরআনে কারীম তুলে ধরে বলে দিচ্ছেন যে ওই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে রোযা। এরশাদ হচ্ছে ,

'যাতে করে তোমরা ভয় করে চলতে পারো।'

অসুস্থ ও সফরকালীন সময়ে রোযার বিধান

এরপর জানানো হচ্ছে যে রোযা নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্যে মাত্র, সারা জীবনই রোযা রাখতে হবে বা বারো মাসই কষ্ট করতে হবে তা নয়। আর অসুস্থ হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এবং মোসাফেরের জন্যে গৃহে না ফেরা পর্যন্ত রোযা বন্ধ রেখে (না রেখে) পরে কাযা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এই রেয়ায়েতের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তারা পরে রোযা করে নিতে পারে এবং রোযা পূরণ করা তাদের জন্যে সহজ হয়।

'নির্দিষ্ট কিছু দিনে (তারা রোযা রাখবে) তারপর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা সফরে থাকলে অন্য সময়ে ওই সংখ্যা পূরণ করে দেবে।'

কোরআনের আয়াতে রোগ ব্যাধি ও সফরের সময়ে রোযা কাযা করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই অনুমতি কোনো শর্তসাপেক্ষ নয় বা বিশেষ কোনো রোগ ব্যাধির উল্লেখ করে এই নির্দেশের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়নি। অথবা সফরের জন্যেও বলে দেয়া হয়নি যে, সে সফর কেমন হবে। যে কোনো রোগ বা যে কোনো সফর, যাতে রোযা রাখা তার জন্যে দুরূহ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রের জন্যেই এই অনুমতি।

কোরআনের এই আয়াতটি সত্যিকারে বুঝার জন্যে এই সাধারণ অর্থ নেয়াই উত্তম এবং বান্দাকে অসুবিধা ও কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যেও আয়াতের এই অর্থই নিকটতর। এখানে লক্ষ্যযোগ্য, রোগ ব্যাধির কষ্ট এবং সফরের কষ্টই আসল কারণ হিসেবে কোরআনে উল্লেখিত হয়নি, বরং শুধু অসুস্থতা ও সফর-এর কথা বলেই আয়াত থেমে গেছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মানুষ আসানী পায় এবং তার কোনো কষ্ট না হয়। কেন যে আল্লাহ তায়ালা সাধারণভাবে রোগ ও সফরের কথা বললেন কোরআনের বর্ণনায় আল্লাহর হেকমত যে কি তা পুরোপুরি এবং সঠিকভাবে আমরা বুঝিও না বা জানিও না।

অবশ্যই এই ভাবে রোগ ব্যাধি ও সফরের কথা বলার মধ্যে এমন কিছু বিবেচনার ব্যাপার আছে যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং বান্দা তা জানে না। আল্লাহর হুকুমের মধ্যকার বিশেষ তাৎপর্য তিনি নিজে না জানালে আমাদের পক্ষে তা জানা বা বুঝার কোনো উপায় নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা কোরআনের আয়াতে প্রাপ্ত সকল নির্দেশই পালন করে যাবো এবং তার তাৎপর্য না বুঝলেও তা পালন করতে কোনোপ্রকার দ্বিধাবোধ করবো না। নিশ্চিত এই বর্ণনাধারা ও বাচনভংগীর মধ্যে বেশ কিছু রহস্য বা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে, যার সবটুকুই আমাদের বুঝতে হবে এটা কোনো জরুরী নয়।

এতে অবশ্য কিছু কথা বাকি থেকে যায়, অর্থাৎ যারা সুযোগের সন্ধানে থাকে তারা সুযোগ পেলেই ছোটো খাটো অজুহাত দেখিয়ে পিছটান দেবে এবং অতি সামান্য কারণে ফরয কাজগুলো করা থেকে দূরে সরে যাবে। তাই ফকীহরা কড়াকড়ি ও শর্তারোপের প্রয়োজন বোধ করেছেন। কিন্তু আমার মতে, কোরআনে প্রদত্ত সুযোগের ওপর কোনো মানুষের তরফ থেকে শর্তারোপ করা ঠিক নয়।

দ্বীন ইসলাম এবাদাতসমূহের প্রশ্নে মানুষকে শেকলে বেঁধে রাখতে চায় না। ইসলাম চায় মানুষকে তাকওয়ার শেকলে আবদ্ধ করতে। আর এবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া-সৃষ্টি যাতে করে আল্লাহর ভয়েই মানুষ জীবনের সব কাজ করতে পারে এবং সব ব্যাপারেই বাছবিচার করে চলে সে এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই দেখা গেছে, যে সকল মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত ফরয কাজগুলো থেকে গা বাঁচাতে চেয়েছে এবং তাঁর দেয়া সুযোগের অপব্যবহার করেছে তাদের কোনো কল্যাণ হয়নি যেহেতু ফরয কাজগুলো আদায়ের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য তারা বুঝতে পারেনি।

এই 'দ্বীন' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা, এটা মানুষের তৈরী কোনো ব্যবস্থা নয়। এই দ্বীনের পূর্ণত্ব কিভাবে আসবে তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল করে জানেন। সুযোগ দানের মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা বাস্তবায়িত হবে, না কড়াকড়ি করা লাগবে এটা তো তাঁর ব্যাপার। এমন অনেক ব্যাপার আছে যেখানে সুযোগ দান করাটাই উত্তম ও উপযুক্ত। যে উদ্দেশ্যে ওই হুকুম তা সুযোগ

সুবিধা দান করা ছাড়া কিছুতেই বাস্তবায়িত বা ফলপ্রসূ হতে পারে না। অবশ্য নির্দেশ দানের কথার মধ্যে নির্দেশের শব্দগুলো ওইভাবেই যদি থাকে তবেই এই সুযোগ দান। সুতরাং এ বিষয়ে দেখুন রসূল (স.)-এর প্রিয় বাণী, মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত সুযোগ যেন অবশ্যই গ্রহণ করে।

তাই, কোনো যুগে মানুষের মধ্যে কোনো বিকৃতি এসে গেলে কড়াকড়ির সাথে হুকুম আহকাম প্রয়োগ করলেই যে তা সংশোধন হয়ে যাবে তা নয়, বরং তা সংশোধনের সঠিক উপায় হচ্ছে প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে শোধরানো। তাদের মনকে ওই সংশোধনী গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত করতে হবে এবং তাদের আত্মার মধ্যে তাকওয়ার অনুভূতিকে সঠিকভাবে জাগ্রত করতে হবে। তবে এটা সত্য যে মানুষের মধ্যে একবার বিকৃতি এসে গেলে বাস্তব লেনদেনের নির্দেশকে কঠোর করতে হবে, কারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এইটিই হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থা এবং সংশোধনীর উপায় উপকরণ হিসেবে এইটিই উপযুক্ত প্রক্রিয়া।

এবারে একটু খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারবো যে মানুষের মধ্যে এবাদাতের যে চেতনা বিরাজ করে তা সকল ক্ষেত্রে এক নয়। সেখানে প্রধান কথা হলো গোলাম ও মুনিবের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ইসলাম মানুষকে পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কিত যে সব নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো দ্বারা তাদের মধ্যে তিনি সংশোধনী প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন এবং তার সাথে এই এবাদাতের সরাসরি কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না, যদিও মানুষের জীবনের জন্যে এইসব নির্দেশ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকাশ থাকে যে এবাদাতসমূহের কোনোটাই উপকারী বলে বুঝা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় পয়দা না হয়। আর সঠিকভাবে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি কারো মধ্যে এসে গেলে সে আর দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করবে না এবং আল্লাহর থেকে এবং তাঁর সন্তোষজনক কাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে কোনো সুযোগ তালাশ করবে না।

একমাত্র তখনই সে সুযোগ নেবে যখন তার মন আশ্বস্ত হবে যে ওই সুযোগ নেয়াতেই আল্লাহ তায়ালা খুশী, সেই সুযোগ গ্রহণ করাটাই আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় এবং সে অনুভব করবে যে, যে অবস্থার দিকে সে এগিয়ে যেতে চায় সেই অবস্থা (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি) এই সুযোগ গ্রহণের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। সাধারণ ভাবে যে কোনো এবাদাতের ব্যাপারেই অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করলে অথবা রেয়ায়েত (সুবিধা) দানকে কোরআনে উল্লেখিত আল্লাহর হুকুমের বাইরে যদি সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা অনেকের জন্যেই কষ্টকর হয়ে যাবে এবং পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে এই কড়াকড়ি উপকারী বলে প্রমাণিত হবে না।

কাজেই, সর্বাবস্থায় উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে 'দ্বীন'কে আমরা অবিকল সেইভাবে এবং সেইরূপেই গ্রহণ করবো যে রূপে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, কেননা তিনিই তো আমাদের থেকে অনেক অনেক বেশী ভাল জানেন এবং অনেক বেশী সুন্দরভাবে সব কিছুর ফয়সালা দান করার ক্ষমতা রাখেন। তিনিই ভাল জানেন কোন্ কারণে এবং কোথায় কখন রেয়ায়েত(সুযোগ সুবিধা) দিতে হবে এবং এর মধ্যে কি কি আশু উপকার এবং দূরবর্তী উপকার নিহিত রয়েছে। আর সকল ক্ষেত্র এবং সকল অবস্থার জন্যেই এইটিই সকল কথার সার কথা।

এখন সফর সম্পর্কিত বিভিন্ন অবস্থার যে কথাগুলো হাদীসে রসূলে এসেছে সেগুলোর কোনো কোনোটি আমরা প্রমাণ করে দেখতে চাই। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটিতে রোযা না রাখতে বলা হয়েছে, আবার কোনো কোনো হাদীসে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়নি।

সব হাদীসগুলো পাশাপাশি রেখে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, যারা রসূল (স.)-এর সময়ে অথবা তাঁর যামানার কাছাকাছি ছিলেন তারা যা বুঝেছিলেন তাইই সঠিক এবং এই কারণেই পরবর্তীকালে ফেকহ শাস্ত্রের প্রবক্তারা যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। প্রাচীন ও প্রধান সেই সকল সাহাবা ও তাবেঈদের বুঝই আমাদের বাস্তব জীবনের জন্যে বেশী উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আমাদের অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান আকীদা বিশ্বাসের সাথে তাঁদের ব্যাখ্যাই বেশী সংগতিপূর্ণ বলে বুঝা গেছে। দেখুন কী চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে সেই হাদীসগুলো,

১. জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বিজয়ের বছর, রমযান মাসে মক্কা অভিযানে বের হলেন। তিনি ও তাঁর সংগী লোকেরা সবাই 'কোরায়াল গামীম' নামক স্থানে পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখা অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু ওইস্থানে পৌছে তিনি এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি পেয়ালাটি এমনভাবে তুলে ধরলেন যে লোকেরা সবাই দেখতে পেলো, তারপর তিনি সে পেয়ালা থেকে পান করলেন। পরে তাঁকে বলা হলো, কিছুসংখ্যক লোক রোযা ভাংগেনি। একথা শুনে তিনি বললেন, ওরা বিরুদ্ধাচরণকারী, ওরা বিরুদ্ধাচরণকারী। (মুসলিম, তিরমিযী)।

২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (স.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযাদার ছিলো আর কেউ কেউ ছিলো বেরোযাদার। প্রচন্ড সে গরমের দিনে আমরা এক স্থানে অবস্থান করার জন্যে নেমে পড়লাম। আমাদের মধ্যে যাদের কাছে চাদর ছিলো তারা বেশী ছায়াতে ছিলো, আমাদের আরও কিছুসংখ্যক লোক নিজ নিজ হাত দ্বারা রোদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলো। রোযাদার ব্যক্তিরা ক্লান্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং বে-রোযাদাররা উঠে তাঁবু খাটালো ও আরোহন করার জীব জন্তুগুলোকে পানি পান করালো। তখন নবী (স.) বললেন, আজ ভোজদারেরা পুরস্কার নিয়ে নিলো। (বোখারী মুসলিম ও নাসাঈ)

৩. জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) এক সফরে ছিলেন। এসময় তিনি লক্ষ্য করলেন এক ব্যক্তির কাছে লোকেরা জড়ো হয়েছে এবং তাকে ছায়া দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ওর? তারা বললো, লোকটি রোযাদার। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সফরে রোযা রাখা কোনো নেকী নয় (ইমাম মালেক বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, এবং নাসাঈ)।

৪. আমর ইবনে উমাইয়া আদ্ দামারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফর থেকে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবা উমাইয়া, তুমি নাশতা না আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি যে রোযা আছি। তিনি বললেন, 'তাহলে মোসাফের সম্পর্কে শরয়ী বিধান বলছি শোনো। আল্লাহ তায়ালা মোসাফের থেকে রোযার বোঝা ও অর্ধেক নামায নামিয়ে দিয়েছেন।' (নাসাঈ)

৫. বনী আব্দিল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক এর এক ব্যক্তি যার নাম আনাস ইবনে মালিক, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোসাফেরের কাঁধ থেকে নামাযের বোঝা অর্ধেক নামিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে রোযা ভাংগার অনুমতি দিয়েছেন। আর দুধ-দানকারী মহিলা ও গর্ভবতী নারীর জন্যেও রোযা কাযা করার সুযোগ দিয়েছেন, যদি তাদের ভয় হয় রোযা রাখলে তাদের বাচ্চাদের কষ্ট হবে (সিহাহ্ সেত্তার সকল হাদীসে বর্ণিত)

৬. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (স.)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে রোযাদার ও ভোজদার উভয় শ্রেণীর মানুষ ছিলো। কিন্তু রোযাদাররা ভোজদারদেরকে এবং ভোজদাররা রোযাদারদেরকে, কেউ কাউকে দোষারোপ করেনি। (ইমাম মালেক, বোখারী, মুসলিম ও আবুদাউদ)।

৭. আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্‌র আস্‌লামীর পুত্র হামযাহ্ রসূল (স.)-কে সফরের সময় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন (তিনি বেশী বেশী রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন)। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, (এই সফরের সময়) চাইলে রোযা রাখো, চাইলে রোযা ভাংগো (এটা তোমার খুশী) (ইমাম মালেক, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি এবং নাসাঈ।)

৮. আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রমযান মাসে অত্যন্ত কঠিন গরমের দিনে সফরে বেরুলাম। এমনকি গরমের চোটে আমাদের কেউ কেউ মাথায় হাত রেখে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করছিলো। আর সে সময় একমাত্র রসূল (স.) ব্যতীত এবং ইবনু রওয়াহা ব্যতীত আর কেউ রোযা ছিলো না (বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)।

৯. মোহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, রমযান মাসে আনাস ইবনে মালেকের কাছে আমি এলাম, তখন উনি সফরে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁর সওয়ারীকে রওয়ানা হওয়ার প্রয়োজনীয় সাজ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিলো এবং তিনি নিজে সফরের পোশাকও পরে নিয়েছিলেন, এ সময়ে তিনি খাবার আনতে বললেন এবং খাবার দিলে তিনি খেয়ে নিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটাই কি রসূল (স.)-এর সুন্নত? তিনি বললেন, হাঁ তার পর সওয়ারীতে চড়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। (তিরমিযী)।

১০. ওবায়েদ ইবনি যোবায়র বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) র সাহাবী আবু বসরাতুল গিফারী (রা.) এর সাথে রমযান মাসে ফুসতাত থেকে এক জাহাজে করে রওয়ানা হলাম। জাহাজ ছাড়ার পর তাকে নাশতা দেয়া হলে তিনি বললেন, কাছে এসো। আমি বললাম, আপনি কি আবাসিক এলাকা দেখতে পাচ্ছেন না? তিনি বললেন তুমি কি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নত পরিত্যাগ করতে চাচ্ছ? এ কথার পর তিনিও খেলেন আমিও খেলাম। (আবু দাউদ)।

১১. মাসসূর আল কালাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাহিয়া ইবনে খালীফা কালবী (রা.) দামেশকের এক গ্রাম থেকে এতটা দূরত্বের সফরে রওয়ানা হলেন যতটা ফুসতাত থেকে আকাবা পর্যন্ত ছিলো এবং এই দূরত্ব ছিলো তিন মাইল। তারপর তিনি রোযা ভাংলেন এবং আরও অনেক মানুষ রোযা ভেংগে ফেললো, আবার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রোযা ভাংতে পছন্দ করলো না। তারপর নিজের বসতিতে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম আজ আমি এমন কিছু দেখেছি যা দেখবো বলে আশা করিনি। একদল লোক রসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবাদের সুন্নত থেকে সরে দাঁড়ালো। আয় আল্লাহ, আমার জান কবয করে আপনার কাছে আমাকে নিয়ে যান।'

এ হাদীসগুলো সামগ্রিকভাবে একথারই ইংগীত বহন করে যে সফরের মধ্যে রোযা ভাংগার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তা গ্রহণ করাই শ্রেয়। এগুলোর মধ্যে কষ্ট হলে ভাংতে হবে, নচেৎ নয় এমন কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি, যেমন শেষের দুটি হাদীসে বিশেষভাবে, রোযা না রাখাই উত্তম বলে বুঝা গেছে। অষ্টম হাদীসে কষ্টের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা যে রোযা রেখেছিলেন তাতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিশেষ এবাদাত এর প্রকাশ ঘটেছে। যেমন সউম-এ বেসাল একমাত্র রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্যে খাস্ ছিলো। এতে একবার খেয়ে পর পর বহু দিন তিনি রোযা রেখেছেন।

এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে আমার রব খাওয়ান এবং পান করান (বোখারী মুসলিম) প্রথম হাদীসটিতে প্রমাণিত হয় যে রসূল (স.) রোযা ভেংগেছেন। আবার যারা রোযা ভাংগেনি তাদের সম্পর্কে 'উলাইকাল উসাতু উলাইকাল উসাতু' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ওরাই অবাধ্য ওরাই অবাধ্য।

এ হাদীসটি মক্কা বিজয়ের বছরে শেষের দিককার হাদীস এবং এ হাদীসটি দ্বারা পছন্দনীয় কাজ কোনটি তা অধিক গুরুত্ব সহকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ সব হাদীস থেকে সামগ্রিকভাবে যে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স.) পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে পথনির্দেশ করতেন এবং বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখেই প্রয়োজন মতো যেটা সহজতর সেটাই করতে বলতেন। প্রথম বছরের হাদীসগুলোতে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে এতে বুঝা গেলো যে কোনো একটি কথার ওপর তিনি স্থবির হয়ে থাকেননি।

তিনি উম্মতের অভিভাবক হিসেবে বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখেই তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তবে, সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে সর্বশেষ কথা যা উপরের হাদীসগুলো থেকে জানা যায় তা হচ্ছে রোযা না রাখাই উত্তম। বাস্তবিক কোনো সমস্যা বা কষ্ট আছে কিনা এ বিষয়ে কোনো শর্তই আরোপ করা হয়নি। রোগ ব্যাধি সম্পর্কে অবশ্য ফকীহদের মতামত ছাড়া হাদীস থেকে আমি নিজে কিছু পাইনি। তবে এটা স্পষ্ট যে, যে কোনো রোগের ব্যাপারে এ সুযোগ গ্রহণকে সাধারণভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কোন প্রকারের রোগ, কতো কঠিন ব্যাধি এবং কতটুকু অসুখ এ সব কিছুর বাধ্যবাধকতা পেশ করা হয়নি। রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাবে আশংকা আছে এ শর্তও দেয়া হয়নি। কথা শুধু এতটুকু আছে যে প্রতিটি রোযার জন্যে অন্য সময়ে একটি করে রোযা রাখতে হবে এবং অধিকাংশ মত এইটারই পক্ষে যে রোযা পূরণ ধারাবাহিক ভাবেই করতে হবে তা জরুরী নয়।

এই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্য আমার এ নয় যে, আমি ফেকাহবিদদের সাথে বিরোধিতা করবো বা তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়বো, বরং আমি চেয়েছি প্রতীকী এবাদাতসমূহের ব্যাপারে একটা নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, আর এসব এবাদাতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগরুক হোক মূলত এটাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

এই অবস্থাই এবাদাতকারীর ব্যবহারকে মযবুত করে এবং এই সচেতনতার ওপরই তার বিবেককে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ প্রধানত নির্ভর করে, তখন সে আল্লাহর আনুগত্য সুন্দরভাবে করতে পারে এবং তার জীবনের সকল ব্যবহারগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এ হচ্ছে একটি দিক, অন্য যে দিকটি এই সচেতনতার ফলে গড়ে ওঠে তা হচ্ছে, আল্লাহর বাঞ্ছিত ও কাংখিত সকল কাজগুলো করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, আনুগত্য ও তাকওয়ার হক আদায় হয় এবং সর্বোতভাবে ফরয ওয়াজেব ও মোবাহ কাজগুলো পালন করা সম্ভব হয়।

এইভাবে পূর্ণাংগ সেই আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা কোরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আর এইভাবে প্রশান্ত মনে নিশ্চিন্ততা প্রজ্ঞা, পূর্ণ চেতনা ও আল্লাহভীতি সহ আল্লাহর দিকে বান্দা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আসুন, এবার আমরা সেই বর্ণনাধারার দিকে ফিরে যাই যার আলোচনা কালামে পাকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর, যারা রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও না রাখতে চায় তাহলে প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মেসকীনকে খাওয়াবে। তবে যে ব্যক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে কোনো সৎকাজ করবে সেটা অবশ্যই তার জন্যে কল্যাণকর হবে। আর রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে ভালো। এর উপকারীতা জানলে তোমরা অবশ্যই রাখতে।'

রোযার হুকুম প্রথম যখন নাযিল হয় তখন মুসলমানদের কাছে রোযা রাখা বড়ই কষ্টকর মনে হয়েছিলো। দ্বিতীয় হিজরীর শুরুতে জেহাদ ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই রোযা ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যেও রেয়ায়েত ম ুর করেছিলেন যারা রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কষ্টবোধ করছিলো। সে জন্যে প্রতিটি রোযা ভংগের ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে একজন মেসকীনকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো।

তারপর, কষ্ট করে রোযা রাখার জন্যে মুসলমানদের অন্তরে রোযার প্রতি মোহাব্বাত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং রোযা রাখতে তাদেরকে এই বলে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফরয না হওয়া সত্ত্বেও যে নিজের ইচ্ছায় রোযা রাখবে সে অবশ্যই সমূহ কল্যাণের অধিকারী হবে। আর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজনকে খাওয়ানোর হুকুম হওয়া সত্ত্বেও রমযান মাসের প্রাপ্তি রোযার বদলে যদি দুজন, তিনজন অথবা ততোধিক মেসকীনকে কেউ সওয়াবের নিয়তে খাওয়ায় সেটা অবশ্যই তার জন্যে অধিক কল্যাণকর হবে। আর কেউ যদি ফিদইয়া দিয়ে রোযা ভংগের সুযোগ না নিয়ে আনুগত্য বোধে রোযা রাখে সেটা হবে আরও ভালো।

এইজন্যেই উচ্চারিত হয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি নেকীর কাজ নিজ খুশী ও ইচ্ছা অনুযায়ী করবে সেটা অবশ্যই তার জন্যে ভালো। একথার মধ্যে, যে 'নেকীর কাজ' বলা হয়েছে তা সাধারণভাবে সকল প্রকার নেকীর কাজের জন্যে প্রজোয্য। পৃথক পৃথক ভাবে মেসকীন খাওয়ানোর কথা এবং পরবর্তীতে রোযা রাখা ভালো এ কথা বলায় এগুলোর অতিরিক্ত কোনো নেকী অর্থে আয়াতের এই অংশটি ব্যবহৃত হয়েছে, এরপর কষ্ট করে রোযা রাখার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এখানে সফর এবং অসুখ বিসুখের উল্লেখ হয়নি। এরশাদ হচ্ছে,

রোযার কিছু প্রাসংগিক মাসয়ালা

'আর রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে উত্তম মনে করতে, যদি এর উপকারীতা জানতে।'

এমতাবস্থায় রোযার মধ্যেই কল্যাণ একথা বলে আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চাইছেন যে মানুষের 'রোযা-রাখার মাধ্যমে ইচ্ছা শক্তির ট্রেনিং হয়ে যাক, তারা একটু কষ্ট সহিষ্ণুতার শক্তি অর্জন করুক এবং আরামে আল্লাহর হুকুম পালন করার চাইতে একটু কষ্টকর কাজ করে তাঁর হুকুম পালন করাকে প্রাধান্য দিক। এসব কিছু ইসলামী যেন্দেগীর জন্যে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং হিসেবে মনে করা যেতে পারে, যেমন আমরা স্বাস্থ্য-রক্ষার ক্ষেত্রে রোযার বিশেষ ভূমিকা দেখতে চাই, অবশ্য এটা সেই ব্যক্তির জন্যে যে প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়নি। এমনিতে রোযা রাখলে কিছু কষ্ট তো হবেই সেটা কোনো ব্যাপার নয় এবং তাকে কোনো রোগ ব্যাধি মনে করা ঠিক হবে না।

সর্বাবস্থায় একথাগুলোকে পরবর্তীকালে যে রুখসৎ বা প্রদত্ত রেয়ায়েতকে বাতিল করা হবে তার ভূমিকা হিসেবেই উচ্চারণ করা হয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে তাদের থেকে রেয়ায়েত (সুযোগ) তুলে নেয়া হবে যারা মোসাফের নয়, মুকীম এবং অসুস্থ নয়, সুস্থ শরীরের অধিকারী, পরবর্তীতে এ আলোচনা আসছে। তবে অত্যন্ত বৃদ্ধদের জন্যে মেসকীন খাওয়ানোর এই রেয়ায়েত কিন্তু বাকি রয়ে গেলো, যারা রোযা রাখতে গিয়ে ভীষণ কষ্ট পায় এবং কাযা করার শক্তিও রাখে না বা কাযা করতে পারবে বলে আশা করা যায় না।

এ বিষয়ে ইমাম মালেক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে তাঁর কাছে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) সম্পর্কে একটি খবর পৌঁছেছে যে, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে গিয়েছিলেন, যার কারণে তিনি ফিদিয়া দিতেন।

আর একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতটি নাযিল হলো এবং পরবর্তীতে এই আয়াতের কার্যকারিতাকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হলো। কিন্তু থুরথুরে বুড়ো মানুষদের জন্যে সমভাবেই তা বহাল রয়ে গেলো। বৃদ্ধ ব্যক্তি পুরুষ বা নারী চাইলে রোযা ভাংবেন এবং প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন করে মেসকীনকে খাইয়ে দেবেন।

এখানে আর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি আসছে, তাতে বলা হচ্ছে, ইবনে আবী লায়লা থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রমযান মাসে আত্বাহিয়ার কাছে গিয়ে দেখি তিনি খাওয়া দাওয়া করছেন। (আমার মনে কৌতুহলের উদ্রেক হয়েছে বলে বুঝতে পেরে) তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতটি নাযিল হলে পর (রোযা সম্পর্কিত) পূর্ববর্তী আয়াত মনসুখ (নাকচ) হয়ে গেলো। তবে আয়াতটি সমভাবে বহাল রয়ে গেলো সেই দুর্বল বৃদ্ধের জন্যে যিনি মৃতপ্রায়। তিনি চাইলে রোযা ভাংবেন এবং প্রতিটি রোযার জন্যে একজন মেসকীনকে খাওয়াবেন। তবে গৃহবাসী (মুকীম) এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্যে ওই আয়াতের কার্যকারিতা মনসূখ (মওকুফ) হয়ে গেলো এবং এটা এক প্রামাণ্য সত্য।'

এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের মধ্যকার যে কোনো ব্যক্তি এই মাসের সাক্ষাত পাবে সে যেন রোযা রাখে'। সুস্থ ও মুকীম যে কোনো ব্যক্তির অন্তরে রমযান মাসের রোযার মোহাব্বাত দান করা হয়েছে, কারণ ওই মাসটি এমন মোবারক মাস যার মধ্যে কোরআন নাযিল হয়েছে।

একথার অর্থ হয়তো এই হবে যে এ মাসেই কোরআন নাযিল হতে শুরু করেছে অথবা ওই মাসের মধ্যেই কোরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াত নাযিল হয়েছে। আর কোরআন হচ্ছে এই চিরস্থায়ী মুসলিম উম্মাহর (জন্যে বরাদ্দকৃত) কেতাব, যার মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালা অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে এসেছেন। তারপর তাকে লালন পালন করে উন্নতির বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের ভয়ভীতিতে ভরা জীবনকে দিয়েছেন নিরাপত্তা।

পৃথিবীর বহুস্থানে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দান করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দিয়েছেন তাদের এমন এক পজিশন যে এ জাতিকে বাদ দিয়ে আজ পৃথিবীতে কেউ চলতে পারে না বা এ জাতিকে একেবারে উপক্ষো করার উপায় কারো নেই। যদিও এমন অবস্থা পূর্বে কখনও আসেনি। পৃথিবীর এতটা উপায় উপাদান এবং অঞ্চল আজ এই জাতির দখলে যে সে এলাকাগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো জাতিই টিকে থাকতে পারে না এবং পৃথিবীতে অথবা আকাশের কোনো স্থানে জমে থাকতে পারবে না। সুতরাং কোরআনে কারীমের এই যে অবদান তার শোকরিয়া আদায় করতে গিয়েও যদি এই রমযান মাসের রোযাগুলো রাখা হয় তাহলেও সে শোকরিয়ার হক আদায় হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'রমযান মাস সেই পবিত্র মাস যার মধ্যে কোরআন নাযিল হয়েছে, এ কেতাব গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে পথ প্রদর্শক এবং স্পষ্টভাবে হেদায়াতের কথাগুলো বর্ণনাকারী আর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। অতএব, যে কেউ অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে ওই নির্দিষ্ট দিনগুলোর রোযা অন্য সময়ে পূরণ করে দেবে।'

এই আয়াতটি দ্বারা সুস্থ ও মুকীম (গৃহবাসী) ব্যক্তির জন্যে যে রেয়ায়েত পূর্বে ছিলো তা নাকচ হয়ে গেলো। একমাত্র বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ব্যক্তির জন্যে ওই 'রেয়ায়েতের' সুবিধা এখনও রয়ে গেছে। এর বিবরণ ইতিমধ্যে পেশ করা হয়েছে।

এখন যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি এ মাসে উপস্থিত (বেঁচে) থাকবে মোসাফের ব্যতীত, অথবা তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে (তার জন্যে এ হুকুম)। যে ব্যক্তি অন্য কোনো বিশ্বস্ত সূত্রে চাঁদ দেখার খবর পেয়েছে তাকেও সরাসরি চাঁদ দর্শনকারীর মতো রোযা রাখতে হবে। আর যেহেতু এই আয়াত সাধারণভাবে সবার জন্যেই নির্দেশ দানকারী এজন্যে পুনরায় অসুস্থ এবং সফরে থাকা ব্যক্তির জন্যে আয়াতের শেষাংশের মধ্যে) রেয়ায়েতের কথা জানান। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কেউ অসুস্থ থাকলে অথবা সফরে থাকলে অন্য সময়ে সে রোযা-না-রাখা নির্দিষ্ট দিনগুলোর রোযা পূরণ করে দেবে।'

একটি সহজ সরল জীবন ব্যবস্থা

এই ফরয কাজটি আদায় করার ব্যাপারে তৃতীয় উদ্দীপক কথা আসছে এবং নির্দেশ দান ও সুযোগ দান উভয় অবস্থার যে বিবরণ এসেছে তার মধ্যেও আল্লাহর রহমতের কথা একইভাবে ঘোষিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদের জন্যে সহজ অবস্থা এবং তিনি কখনো কোনো কঠোরতা তোমাদের জন্যে চান না।'

দ্বীন-ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সকল বিধান দেয়া হয়েছে সেগুলোর সব কয়টিতেই এই মহান মূলনীতি বিরাজমান। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্যে সব কিছু সহজ করে দিতে চান, কোনো কঠোরতাই তিনি চান না।

একথা স্মরণ রেখে যখন কেউ আল্লাহর হুকুম পালন করে তখন তার মন সজীবতায় ভরে যায়, জীবনের সকল কাজেই সে দেখতে পায় আল্লাহর হুকুম পালন করা কত সহজ ও সুন্দর। প্রত্যেক মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) ব্যক্তি তাঁর হুকুম পালন করতে গিয়ে নিজ মনের মধ্যে এমন সহিষ্ণুতার ট্রেনিং পায় যে সে কোনো কিছুতেই আর কষ্ট বা জটিলতা অনুভব করে না।

রোযা রাখার কারণে কষ্ট সহ্য করার যে প্রশিক্ষণ সে পায় তার ফলে আল্লাহর সকল বিধান সকল ফরয কাজ সহ অন্যান্য সমস্ত কাজ পরিপূর্ণ নিপুণতার সাথে আদায় করা তার কাছে এমন সহজ অনুভূত হয়। যেন মনে হয়, পানির শ্রোতের মতো সব কিছু সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ধীর গতিতে গাছের বৃদ্ধির মতো নিশ্চিন্ত মনে ও পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা এবং তৃপ্তির সাথে সব কিছু সম্পন্ন হচ্ছে। সাথে সাথে তার চেতনার মধ্যে আল্লাহর রহমত এবং মোমেনদের জন্যে তিনি যে সর্বদা সহজ অবস্থা এবং কোনো অবস্থাতেই কঠোরতা চান না একথা সদা সর্বদা জাগরুক থাকে।

আর মোসাফের ও অসুস্থ ব্যক্তির রোযা পূরণের জন্যে অন্য যে কোনো সময় মঞ্জুর করা হয়েছে যাতে করে রমযান মাসে রোযা না রাখতে পারা নির্দিষ্ট দিনগুলোর কাযা রোযা অন্য সময়ে ওই কষ্টে পড়া লোকগুলো রাখতে পারে। এভাবে পূরণ করে দিলে তাদের প্রতিদান দেয়াতে কিছুমাত্র কম করা হবে না বা তাদের প্রতিদান বাতিলও করে দেয়া হবে না। এরশাদ হচ্ছে–

'যাতে করে (সফরের সংকট ও রোগ-ব্যাধির কষ্টে ভেংগে না পড়ে) নির্দিষ্ট রোযাগুলো পূরণ করতে পারে।'

আর এইভাবে রোযা রাখার সুযোগ লাভ এমন একটি নেয়ামত যার কারণে আল্লাহর শোকরগোযারি করা এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

'আর যাতে করে (কাযা করার সুযোগ লাভ করার কারণে) তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারো এবং তাঁর কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।'

আসলে এই অবশ্য পালনীয় কাজটির বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা একটি মহান উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা চান, তিনি তাদের জন্যে হেদায়াতের পথ প্রাপ্তি প্রাণবন্ত ও সহজ হয়ে থাক। তিনি চান, হেদায়াতের আলো দিয়ে তাদের জীবন সমস্যা সমাধানের পথকে তিনি যে কতো সহজ করে দিয়েছেন মানুষ তার মূল্য সঠিকভাবে বুঝুক। সংকট সমস্যা যখন রোগ ব্যাধি আকারে আসে এবং সফরের ক্লেশ যখন মানুষকে কাতর করে ফেলতে চায় তখন রোযা কাযা করার সুযোগ পেয়ে মানুষ যথার্থভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, যা অন্য কোনো সময় বুঝা সম্ভব নয়।

সাধারণভাবে গুনাহের কাজে মানুষ যখন লিপ্ত হয়ে যায় তখন তাদের চিন্তাশক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে তার অংগ প্রত্যংগকে সক্রিয় হয়ে ওঠা থেকে আর সে সামলাতে পারে না। রোযার মাসে আল্লাহর ভয়েই সে গুনাহের কাজ সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং অংগ প্রতংগকে মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনকে এমন গভীরভাবে রোযাদার অনুভব করে যেন সে নিজের হাত দ্বারা তা স্পর্শ করে দেখতে পাচ্ছে।

তার গভীর অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে দেন, আর তখন সে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের গান গাইতে থাকে এবং সর্বত্র তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সাথে সাথে নেয়ামত লাভ করায় রোযাদারদের অন্তর প্রাণ কৃতজ্ঞতাভারে নুয়ে পড়ে। এর ফলে সার্বিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। রোযার আলোচনার একেবারে শেষে এই কথাটাই বলা হয়েছে,

'যেন তোমরা তাঁর ভয়ে বাছবিচার করে চলতে পারো।'

আপাত দৃষ্টিতে রোযার এই বিধানটি শরীর ও মনের ওপর ভারী ও কষ্টকর মনে হলেও এরই মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বহু নেয়ামত এবং এর মাধ্যমেই তার রহমতের বহিপ্রকাশ ঘটে। এই বিধানের মাধ্যমেই সত্যিকারে দাসত্বপূর্ণ জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ লাভ করা যায় এবং যে মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্যে তাকে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। নিশ্চিত একথা সত্য যে, রোযা এমন এক ভূমিকা যার দ্বারা 'তাকওয়া'র প্রহরার কাজ হয়। এই বিধানের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা এর তদারকর স্বীকৃতি এবং বিবেকের কাছে জবাবদিহিতার মনোভাব ফুটে ওঠে।

মাবুদের দরবারে বান্দার দোয়া

রোযার সময়সীমা, রোযা রাখাকালীন কি কি জিনিস ব্যবহার করা যায়, আর কোন কোন জিনিস নিষিদ্ধ সে সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা অন্তরের গভীরে এবং মনের গোপন কন্দরে অতি আশ্চর্য এক জিনিস দেখতে পাই। প্রিয়তম আল্লাহর কষ্টকর এই হুকুম পালনের সময় আমরা তাঁর মধুর পরশ পাই, তাঁর রহমত যেন মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার প্রতিদান যেন হাতে নাতে এবং সাথে সাথে পেয়ে যাই। এই বিনিময় প্রাপ্তির অনুভূতি আমরা পাই তাঁর নৈকট্য লাভের চেতনায় এবং দোয়া কবুলের মাধ্যমে। তাঁর মেহেরবানীর নির্ঝরিণী নির্গত হচ্ছে যে শব্দ সমষ্টি থেকে তা যেন এক স্বচ্ছ সমুজ্জল স্নেহ মমতার দরিয়া। এরশাদ হচ্ছে,

'আর (হে রসূল) আমার বান্দা যখন তোমার কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন (তাদেরে তুমি বলে দাও) অবশ্যই আমি তাদের অতি কাছে তারা যখন আমাকে ডাকে তখনই আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়, আমার ওপর যেন দৃঢ় ঈমান (পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা) রাখে, তাহলেই আশা করা যায় তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।'

'তখন অবশ্যই আমি তাদের খুব কাছে, সাড়া দেই আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায়।' কী সুন্দর কথা! কী গভীর মায়াময় ও আবেগপূর্ণ কথা! কতো চমৎকার স্নেহপূর্ণ বচন আর কি মোহাব্বাতের আমেজমাখা ভাষা। আল্লাহর কাছ থেকে এই প্রীতি ভাষণ লাভ করার পর কোথায় থাকে রোযার কষ্ট ক্লেশ! কোথায় থাকে তাঁর নৈকট্য ও মোহাব্বাতের ছায়াতলে অন্যান্য তাকলীফ!

দেখুন মূল আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে যে কথাগুলো এসেছে তার প্রতিটি শব্দে ঝংকৃত হয়েছে ওই একই প্রিয় এবং মধুমাখা বচন! আবারও দেখুন,

'আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন তাদের তুমি বলে দাও, আমি তাদের সন্নিকটে, প্রার্থনাকারীর ডাকে আমি তখনই সাড়া দেই যখনই সে আমাকে ডাকে।'

এখানে খেয়াল করার বিষয়, বান্দাদের গতি তাঁরই দিকে এবং সরাসরি তাঁর তরফ থেকে ওদের দিকে তাঁর অমিয় মধুর জবাব আমি 'সন্নিকটে' এভাবে বলেননি যে, ওদের বলো-আমি কাছে, শুধুমাত্র বান্দার জিজ্ঞাসা করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাড়া আসেনি, মহান রব্বুল আলামীন নিজেই বান্দার 'কাছে এসে যাওয়ার' কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি একথাও বলেননি -আমি বান্দার ডাক শুনি বরং তিনি ডাকের দ্রুত জবাব দিতে গিয়ে বলছেন- 'যখনই সে আমাকে ডাকে তখনই তার ডাকে আমি সাড়া দেই।'

এ এক চমৎকার আয়াত। এ আয়াতটি মোমেনের অন্তরে আল্লাহর মায়াময় ডাকের অমিয় সুধা নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে তাকে কানায় কানায় ভরে দেয়, এনে দেয় এক দারুণ আবেগময় মোহাব্বাত, বয়ে আনে আল্লাহর প্রশস্ত রেযামন্দি, আনে বিশ্বাস ও নিশ্চিত আস্থা। এই অবস্থায় প্রত্যেক মোমেন আল্লাহর সন্তোষ প্রাপ্ত জীবন লাভ করে, তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয় এবং এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল পেয়ে যায়।

আর প্রিয়তমের এই মধুর ভালবাসার ছায়াতলে, তাঁর এই মোহাব্বাতপূর্ণ সান্নিধ্যে এবং এই সঞ্জীবনী সাড়া দান করার পর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের আহবান জানাচ্ছেন তারাও যেন তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখে। তাহলেই হয়তো এই সাড়া দান তাদেরকে সৌভাগ্যের পথে, হেদায়াতের পথে এবং সর্বপ্রকার সংশোধনীর পথে এগিয়ে নেবে। এরশাদ হচ্ছে,

সুতরাং, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে তাহলেই হয়তো তারা সঠিক পথ পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়ে যাবে।

অতএব, আল্লাহর ডাকে সাড়া দান ও তাঁর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখার শেষ পরিণতি হচ্ছে তাদের নিজেদের সার্বিক সাফল্য ও কল্যাণ, আর সে সাফল্য আসবে সৌভাগ্য অর্জন, হেদায়াত লাভ এবং কলুষতা মুক্ত ও সংশোধিত জীবন লাভের মাধ্যমে। আল্লাহর নিজের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি কোনো কিছুতে নেই, যেহেতু তিনি সকল অভাব ও বিশ্বজগতের সকল প্রয়োজনের উর্ধে।

প্রকৃত সত্য সঠিক পথ হচ্ছে সেই পথ যা ঈমানের আলোকে সমুজ্জ্বল এবং আল্লাহর আনুগত্যে সমৃদ্ধ। অতএব, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা যা তিনি গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে মঞ্জুর করেছেন তাইই একমাত্র সঠিক সোজা ও সৌভাগ্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর বাইরে যা কিছু আছে

সবই ভুলে ভরা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন বাঁকা পথ যা সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে না, না তার পরিসমাপ্তি হয়েছে কোনো সত্য সঠিক পথের দিকে।

আল্লাহর দরবারে বান্দার দোয়া তখনই মঞ্জুর হওয়ার আশা করা যায় যখন তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে সত্য সঠিক পথে চলতে থাকে। তাই তাদের কর্তব্য একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানানো এবং কোনো ব্যস্ততা না দেখানো। কারণ তিনিই নির্ধারিত করে রেখেছেন দোয়া কবুলের নির্দিষ্ট সময়কে এবং সে নির্ধারিত সময় একমাত্র তাঁরই জ্ঞানভান্ডারে রয়েছে।

দেখুন, এ বিষয়ের ওপর কয়েকটি হাদীস কি সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছে,

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন বান্দা যখন তাঁর দিকে হাত দুটি প্রসারিত করে দিয়ে কিছু চায় তখন সেই দুটি হাতকে ব্যর্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ তায়ালা লজ্জা বোধ করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা মায়মূনের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি এনেছেন।

মূল হাদীসটি নিম্নরূপ,

১. এবাদা ইবনেস্ সামেত (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে নবী (স.) এরশাদ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের কাছে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ের জন্যে আবেদন জানায় তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে তা দান করেন অথবা ওই রকমই কোনো অকল্যাণ থেকে তাকে বাঁচিয়ে নেন। এই আবেদন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মঞ্জুর করেন যতক্ষণ সে কোনো পাপপূর্ণ জিনিস না চায় অথবা তার চাওয়ার মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কথা না থাকে। (তিরমিযী)

২. বোখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির দোয়া ততক্ষণ কবুল করা হয় যতক্ষণ সে এই বলে ব্যস্ততা না দেখায় যে আমি দোয়া করলাম, কিন্তু আমার দোয়া কবুল করা হলো না।

৩. সহীহ্ মুসলিম নবী (স.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন, কোনো পাপপূর্ণ কথা বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কোনো আবেদন না জানানো হলে বান্দার অন্য সকল দোয়া কবুল হতে থাকে।

বলা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ব্যস্ততা কী জিনিস? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমি দোয়া করেছি, বারবার আমি দোয়া করেছি, কিন্তু, আমার দোয়া কবুল হলো বলে তো দেখলাম না, এইভাবে সে হতাশ হয়ে যায় এবং দোয়া করা বন্ধ করা দেয় (এরই নাম ব্যস্ততা)।

আর রোযাদারদের দোয়াই সব থেকে তাড়াতাড়ি কবুল হয়। যেমন ইমাম আবু দাউদ আত্তায়ালেসী তার মোসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বরাত দিয়ে হাদীস এনেছেন।

তিনি বলেন, 'আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, রোযাদারের জন্যে ইফতারের সময় (একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দেয়া হয়েছে) তার দোয়া কবুল করা হয়। একারণে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইফতারির সময় পরিবারের সকল লোকদেরকে ডেকে একত্রিত করতেন এবং দোয়া করতেন।

সুনানে ইবনে মাজাতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বরাত দিয়ে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী (স.) বলেছেন, নিশ্চয়ই ইফতারের সময় রোযাদারদের জন্যে এমন দোয়া করার সুযোগ দেয়া হয়েছে যা ফিরিয়ে দেয়া হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে মোসনাদে ইমাম আহমাদ সুনানে তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে হাদীসটি এসেছে তা হচ্ছে,

'তিন ব্যক্তি এমন আছে যাদের দোয়া (কবুল না করে) ফিরিয়ে দেয়া হয় না, ন্যায়পরায়ন শাসনকর্তা (বা নেতা), ইফতার না করা (রোযা না ভাংগা) পর্যন্ত রোযাদার এবং মযলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির ফরিয়াদ। শেষোক্ত এই ব্যক্তির দোয়াকে কেয়ামতের দিন মেঘমালার উপরে তুলে নেয়া হবে এবং সেই দোয়াকে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে আকাশের দরজাগুলোকে খুলে দেয়া হবে এবং আল্লাহ তায়ালা বলবেন,

'আমার ইযযতের কসম, আমি কিছু সময় পরে হলেও তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।' এই জন্যেই দেখা যায়, রোযার বর্ণনা দান করার সাথে সাথেই দোয়ার বর্ণনাও এসেছে।

রোযার আরো কিছু বিধান

এরপর বর্ণনা প্রসংগে ঈমানদারদের জন্যে রোযার কিছু নিয়ম-কানুনও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে রোযার সময়ে মাগরেব থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশাকে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। একইভাবে খানাপিনাও হালাল করেছেন। অনুরূপভাবে রোযার মাসে এতেকাফের সময়ও ফজর থেকে মাগরেব পর্যন্ত যেমন খানাপিনা হারাম তেমনি মাসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রী সংসর্গও নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে। এ বিষয়ের কালামুল্লাহতে এরশাদ হয়েছে,

রোযার মাসের রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যৌন কাজের জন্যে যাওয়াকে তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে, ...এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় আদেশ নিষেধ মানুষদের কাছে (খুলে খুলে) বলে দিয়েছেন যাতে করে তারা (সব ধরনের অনাচার থেকে) বেঁচে থাকতে পারে। –আয়াত ১৭৮

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রোযার হুকুম আসার পর প্রথম প্রথম কোনো রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করার পর ঘুমিয়ে পড়লে খানাপিনা এবং স্ত্রী সংসর্গ সবই হারাম হয়ে যেতো। ফজরের পূর্বে যে কোনো সময় ঘুম ভেংগে গেলেও খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সংসর্গ করার আর অনুমতি ছিলো না। এ রকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায় যে ঠিক ইফতারের সময় ঘরে খাবার কারো কারো থাকেনি এবং তারা নিদ্রায় ঢলে পড়েন। তারপর ঘুম যদিও ভেংগেছে, কিন্তু খানাপিনা হালাল না থাকার কারণে না খেয়েই পরের দিন রোযা রেখেছেন এবং পর দিন মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছেন।

এ খবরটি নবী (স.)-এর কাছে পৌঁছেছে। একইভাবে কেউ কেউ ইফতারের পর (পুরুষ ও মহিলা) ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারপর হঠাৎ করে মিলনাকাংখা জেগে ওঠায় সামলাতে না পেরে গুনাহে আপতিত হয়ে পড়েছেন।

এ খবরটিও নবী (স.)-এর কাছে পৌঁছে গেছে এবং এই বিধানটি ভংগ হওয়ার কারণে তৎকালীন ওই মুসলমানদের পাকড়াও করাটাও বেশ জটিল মনে হয়েছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে সহজ করে দিলেন যেহেতু তাদের দুর্বলতা তাদের নিজেদের কাছেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়ে বুঝার সুযোগ দিলেন যে প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদের জন্যে সব কিছু সহজ করে দিতে চান এবং তাদের তাওবা কবুল করা দ্বারা তাদের প্রতি তাঁর রহমতের অমিয় ধারা যে অবিরত ধারায় বর্ষিত হয় তাও বুঝাতে চান। এরপর এই আয়াতটি নাযিল হলো। এই আয়াত দ্বারা ফজর থেকে মাগরেব পর্যন্ত স্ত্রীভোগ হালাল করে দেয়া হলো।

'হালাল করে দেয়া হলো তোমাদের জন্যে রোযার রাত্রিগুলোতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশাকে।'

'রফাস্' শব্দটি দ্বারা স্ত্রী সম্ভোগের পূর্ব প্রস্তুতি অথবা স্ত্রী সম্ভোগ উভয়টিকেই বুঝায়। উভয় অর্থেই আলোচ্য আয়াত ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো অর্থে কোরআন এই আয়াত ব্যবহার করেনি বরং স্বামী স্ত্রীর মোহাব্বাতপূর্ণ খোলাখুলি মেলামেশার অর্থে, যা স্বামী-স্ত্রীকে একান্ত ঘনিষ্ঠ করে দেয় এবং পরস্পরের আর কোনো ব্যবধান থাকে না। এইভাবে তাদের জৈবিক চাহিদাও পূরণ হয়ে থাকে যা আল্লাহরই এক মহা দান। এইজন্যে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।'

লেবাস বা পোশাকের কাজ হচ্ছে আচ্ছাদন করা বা ঢেকে দেয়া এজন্যে লেবাসকে আচ্ছাদনকারী এবং নিরাপত্তাদানকারী বলা হয়। এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক এই লেবাসেরই মতো যা তাদের একে অপরকে ঢেকে দেয় এবং একে অপরের জন্যে নিরাপত্তাদানকারী হিসেবে কাজ করে, আর ইসলাম যেহেতু জগতের সকল মানুষের জন্যে চিন্তা করে এবং তার প্রাকৃতিক সকল চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করে, তাকে সর্বোত্তভাবে উন্নতির চরম শিখরে উঠাতে চায়, এজন্যে তার সকল চাহিদা পূরণের পথকে সহজ করে দিয়েছে। ইসলাম রক্ত মাংসের চাহিদা পূরণে যথাযথ সাড়া দেয়, প্রতিপালন করে মানুষের মধ্যকার কোমল বৃত্তিগুলোকে এবং পরস্পরের ইযযত আবরুকে ঢেকে রাখতে চায় এবং যাতে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে তার ব্যবস্থা দেয়।

মানুষের মনের মধ্যে যে সুপ্ত কামনা বাসনা রয়েছে তা আল্লাহ তায়ালা উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। তিনি তাদের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর নিজ মেহেরবানী বলে সে প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা দিচ্ছেন, বলছেন–

'আল্লাহ তায়ালা জেনে নিয়েছেন যে তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছিলে, তারপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন।'

এখানে আত্মপ্রবঞ্চনা বা নিজেদের সাথে খেয়ানতের কথা বলতে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রদমিত কামনা বাসনা এবং তাদের প্রচন্ড আবেগের গোপন বহিপ্রকাশকে বুঝিয়েছেন অথবা বাস্তব যৌন ক্রিয়ার অর্থে ওই খেয়ানতের কথা উচ্চারণ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে পাওয়া যায় যে এই খেয়ানতের কাজ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হৃদয়েও ক্ষমা পাওয়ার আশায় কোনো কোনো ব্যক্তি নিজ থেকে এসে স্বীকার গিয়েছেন যে তাদের দ্বারা অন্যায় হয়ে গেছে। তাই, আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করেছেন ও ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তারপর যেহেতু তাদের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং যেহেতু তাদের অদম্য এই চাহিদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন, তাই তাদের জন্যে ওই দুর্দমনীয় কামনা বাসনাকে হালাল করে দিয়েছেন। অনুমতি দিতে গিয়ে তিনি এরশাদ করছেন– এখন তোমরা চাইলে তাদের সাথে সহবাস করতে পারো।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক এই চাহিদা মেটানোর হালাল ব্যবস্থা পেয়ে তোমরা যেন এতটা প্রলুব্ধ না হয়ে যাও যে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কথাই মনে থাকবে না। এবং তোমাদের মন মগয থেকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকা অবস্থাটাও যেন দূর হয়ে না যায়। তাই বলেছেন,

'আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তা তোমরা খুঁজে নাও'। তালাশ করো ও গ্রহণ করো তোমাদের স্ত্রীদের সাথে আনন্দঘন মিলনের সুযোগকে এবং পরিণতিতে আল্লাহর দান হিসেবে সন্তান সন্ততি গ্রহণ করো, কারণ এই উভয় শ্রেণীর জিনিসই আল্লাহর মেহেরবানীর দান।

আর সুখ-সম্পদের যে সব জিনিস তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তা তিনি তোমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন এবং তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করাকেও তিনি বৈধ ঘোষণা করেছেন। এগুলো আল্লাহর দান হিসেবে আল্লাহর নামেই এগুলো লাভ করা যায়।

এগুলো চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অজানা রহস্য ও বিশেষ এক তাৎপর্য আছে এবং এসব কিছু বান্দার জন্যে ব্যবস্থা করে রাখার এক বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং, এগুলো শুধুমাত্র শরীরের সাথে সম্পর্কিত পাশবিক সম্ভোগই নয়, যার সাথে উর্ধাকাশের মালিকের কোনো যোগাযোগ থাকবে না।

এইভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু মহান জিনিস দান করেছেন যা ওই সাময়িক আনন্দ অনুভূতি থেকে অনেক বেশী মূল্যবান এবং অনেক বেশী স্থায়ী ও মহান, এমনকি সারা পৃথিবী থেকেও তা মর্যাদাবান। আর এইভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয় এবং তাদের মধ্যে স্থায়ী কোমলতা গড়ে ওঠে।

কোরআনে কারীমে এইসব বিষয় বারবার উল্লেখ থাকায় এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণার কথা বারবার আসায় আমরা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও ফলপ্রসূ তথ্য পাই। জানতে পারি কি নিহিত রয়েছে তার প্রকৃতির মধ্যে এবং তার শক্তি ও স্বভাবের মধ্যে রয়েছে কত উজ্জ্বল সম্ভাবনার বীজ।

মানুষকে প্রশিক্ষণ দান, তার উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এইসব পদ্ধতিই হচ্ছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। মহান স্রষ্টার মহিমাময় হাত থেকেই নির্গত হয়ে এসেছে এই পদ্ধতি। আর যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন কোনটি উত্তম ও সঠিক পথ এবং তিনি তাদের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের খবর রাখেন।

সেহেরীর সময়সীমা

আর যেমন করে স্ত্রী সংসর্গকে আল্লাহ তায়ালা রোযার রাত্রিতে হালাল করে দিলেন তেমনি সারা রাত ভর খাওয়া-দাওয়া ও পান করাকেও হালাল বলে ঘোষণা করলেন। এরশাদ হলো,

'আর খাও এবং পান করো ততোক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তোমাদের কাছে সোবহে কাযিবের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো সূত্রবৎ রেখার মধ্য থেকে প্রথম প্রভাতের শুভ্র সূত্রবৎ রেখা প্রকাশিত না হয় ।'

যতক্ষণ পূর্ব দিগন্তে এবং পাহাড়ের চূড়াসমূহের ওপর আলো ছড়িয়ে না পড়ে। আসলে আকাশে কোনো শুভ্র সূতা দেখা যায় না, এটা সোবহে সাদেকের সময় উদীয়মান শুভ্র রেখাকে বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত যেসব হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি এই সময়টা হচ্ছে সূর্য উদয়ের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু, আজকাল আমাদের দেশে আমরা সাধারণত যা করি এটা সম্ভবত অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যেই করি।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে জরীর বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

'তোমাদেরকে বিলালের আযান এবং দীর্ঘ ফজর (এর সময়) যেন খানাপিনা বন্ধ করতে উদ্বুদ্ধ না করে, বরং দিগন্ত-বলয়ে পরিব্যাপ্ত ফজরই আসল খানাপিনা বারণকারী সময়।'

ইবনে জরীর সামুরার আর একটি রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে,

'রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, বিলালের আহবান (আযান) এবং এই শুভ্রতা যেন তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে না ফেলে (তোমরা খানাপিনা করতে পারো) ফজর এর ওয়াক্ত ফুটে না ওঠা পর্যন্ত অথবা ফজর উদিত না হওয়া পর্যন্ত।

বিলাল (রা.) ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করার জন্যে একটু তড়িঘড়ি করে আযান দিতেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকেতুম (রা.) খানাপিনা বন্ধ করানোর জন্যে দেরীতে আযান দিতেন। আর এই জন্যে এখানে বিলাল (রা.)-এর আযানের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে।

এতেকাফের বিধান

এরপর মাসজিদে এতেকাফ কালীন অবস্থায় স্ত্রী সংসর্গে আসার বর্ণনা আসছে। এতেকাফ অর্থ একান্তভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় মাসজিদে অবস্থান। এ সময়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও খানাপিনার প্রয়োজন ছাড়া বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

রমযান মাসের শেষের দিনগুলোতে মসজিদে এতেকাফে বসা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (স.) রমযানের শেষ দশ দিনে এতেকাফে বসতেন বলে এই সময়ে মসজিদে এতেকাফ করা সুন্নত। এ সময়টি একান্তভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্যেই নির্দিষ্ট, আর এ কারণেই এ সময়ে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ। যাতে করে পরিপূর্ণ ভাবে এই সময়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা যায়। এসময়ের মধ্যে মন মগযকে সকল কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে এবং সকল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে পেশ করা হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মেলামেশা করো না যখন তোমরা মাসজিদে এতেকাফে বসে থাকো।'

ওই সময়ে আত্মসংযম ও রোযা-ভংগ (অর্থাৎ রাতে) এক সাথেই করতে হয়। পরিশেষে আল্লাহর সাথেই সকল কাজের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলাই কাম্য। এ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করা। সে পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রহণ বর্জন, কোনো কাজ করা, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সক্রিয় হওয়া ও নিষ্ক্রীয় হওয়া সবই মওলা পাকের নির্দেশিত পন্থায় হওয়া প্রয়োজন।

কোরআনের মধ্যে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে কাছে যেতেই মানা করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যবহারগুলোকে এমনভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যাতে করে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করা যায়, কারণ যে ব্যক্তি সীমারেখার আশে-পাশে ঘোরাফেরা করে, যে কোনো মুহূর্তে তার দ্বারা সীমা লংঘন হয়ে যেতে পারে। আর মানুষের অবস্থা হচ্ছে, সব সময়ে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, আর সত্যিকারে বলতে কি বাস্তবে মানুষ সকল সময়ে নিজেকে কন্ট্রোল করতেও পারে না।

সুতরাং, এটাই তার জন্যে ভালো যে সে কাছে গিয়ে, সান্নিধ্যের কারণে আবেগমুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাক এবং নিজেকে সেই পরীক্ষার মধ্যে না ফেলুক যা যৌন ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। সে হয়তো আত্ম-বিশ্বাস রাখে যে কাছে যাবে, সব কিছু করবে, কিন্তু মন যখনই বাস্তব কিছু করতে চাইবে তখনই নিজেকে সরিয়ে নেবে, কিন্তু এটা সত্য যে তার নিয়ন্ত্রণের বাঁধ যে কোনো মুহূর্তে ভেংগে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। এই জন্যেই বলা হয়েছে,

'স্ত্রীর নিকটবর্তীও হয়ো না। এখানে আয়াতের উদ্দেশ্যে অবশ্য এই কথা বলা যে, স্ত্রী সম্ভোগ করো না।'

এই নির্দেশ পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে নিষিদ্ধ কাজগুলো পরহেয করে চলতে পারে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার কাছে চাইছেন, আর এইজন্যে তিনি অতি স্পষ্টভাবে তাঁর আয়াতগুলোতে বর্ণনা করছেন যাতে করে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে সে নির্দেশগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে। এইই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য যাতে ঈমানদাররা উপনীত হতে পারে এহেন অনুগত মোমেনরাই সকল অবস্থায় আল্লাহর সম্বোধনের পাত্র।

অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ ভোগ করা

রোযার ছায়াতলে এবং খাদ্য ও পানীয় নিষিদ্ধ করণের মাধ্যমে অন্য যে হুশিয়ারীটি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে মানুষ যেন নাহক ভাবে কারো ধন সম্পদ ভক্ষণ না করে, আত্মসাৎ না করে। নানা ছল-চাতুরীর দ্বারা অথবা সে যেন বিচারকদের সামনে নানা প্রকার ভুয়া দলীল প্রমাণ পেশ করে ভুল ফয়সালা হাসিল না করে এবং মানুষকে না ঠকায়।

কথার মারপ্যাচে ফেলে অথবা কূ-যুক্তির আশ্রয় নিয়ে ফয়সালাকারীর ফয়সালাকে যেন সে বিভ্রান্ত না করে। আসলে এইসব বিভ্রান্তিকর পদ্ধতিতে অনেক সময় মূল সত্যকে চাপা দেয়া হয়। এই কারণেই আল্লাহর সীমানাগুলো চিহ্নিত করার পর এই সতর্কীকরণ এসেছে। এরপর আহবান জানানো হয়েছে এই সকল প্রকার অন্যায় থেকে দূরে থাকতে। যাতে করে বান্দা আল্লাহভীতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার আওতায় এসে তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকতে পারে। দেখুন আল্লাহর বাণী,

'আর খেয়ো না ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে যখন তোমাদের মধ্যে আদান-প্রদান করো এবং মানুষের ধন সম্পদের একটি বিশেষ অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনে বুঝে তা শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ো না।'

হাফেয ইবনে কাসীর এই আয়াতটির তাফসীর বর্ণনা প্রসংগে বলেন

'আলী ইবনে আবী তালহা বলেছেন এবং ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত যে, তারা বলেছেন এই আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা অন্যের সম্পদ আমানত রেখে প্রমাণ না থাকার কারণে তা অস্বীকার করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আদালত পর্যন্ত যায় অথচ সে ভালো করেই জানে যে, সে অন্যের অধিকার খর্ব করছে, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করছে, হারাম খাচ্ছে।

একই বিসয়ে মোজাহেদ, সাঈদ বিন যোবায়র, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, মোকাতিল বিন হায়ান এবং আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম ও বলেছেন, যখন তুমি নিজেকে যালিম বলে জান, সেই অবস্থায় তুমি আর লড়াই ঝগড়া করো না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে উম্মে সালামার বরাত দিয়ে যে হাদীসটি এসেছে তাতে বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি একজন মানুষ, আমার কাছে ঝগড়া বিবাদের মামলা আসে। সেখানে বাদী-বিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ বাকপটু থাকে এবং একজন আর একজনকে যুক্তি তর্ক দিয়ে হারিয়ে দেয়, ফলে ওই জয়ী ব্যক্তির পক্ষে আমি রায় দিয়ে দেই। এমতাবস্থায় কোনো মুসলমানের হক নষ্ট হলে ওই ব্যক্তির জন্যে আগুনের একটি টুকরা নির্ধারিত হয়ে যায়। এটা জানার পর সে এ বোঝা বহন করুক অথবা তা পরিত্যাগ করুক।

এমনি করে, মুসলমানরা, তাদের দাবীর আসল অবস্থা যখন বুঝতে পারে তখন তা পরিত্যাগ করে। অতএব, একথা বুঝা দরকার যে, শাসনকর্তার ফায়সালা দ্বারা একটি হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না, আর না কোনো হালাল জিনিস হারাম হয়ে যায়। ফায়সালা তো প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে যে ধোঁকা দেয় সেইই দায়ী হবে এবং ওই ভুল তথ্য বা ভুল যুক্তির ভিত্তিতে যে ফায়সালা আসবে তার কারণে ওই বাকপটু ব্যক্তিকেই গুনাহের ভাগী হতে হবে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَإِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

রুকু ২৪

১৮৯. (হে নবী,) তারা তোমাকে নতুন চাঁদগুলো (ও তাদের বাড়া কমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, (মূলত) এগুলো হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (একটি স্থায়ী) সময় নির্ঘন্ট (-যার মাধ্যমে মানুষরা দিন তারিখ সম্পর্কে জানতে পারে), তাছাড়া (এর মাধ্যমে লোকেরা) হজ্জের সময়সূচীও (জেনে নিতে পারে। এহরাম বাঁধার পর) পেছন দরজা দিয়ে (ঘরে) প্রবেশ করার মাঝে কোনো সওয়াব নেই, আসল সওয়াব হচ্ছে কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলো (তা দেখা, এখন থেকে) ঘরে ঢোকার সময় (সামনের) দুয়ার দিয়েই তোমরা আসা যাওয়া করো, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হতে পারবে। ১৯০. তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সেসব লোকের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, (কিন্তু কোনো অবস্থায়ই) সীমালংঘন করো না; কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ১৯১. (সীমালংঘনের পর অতপর) যেখানেই তোমরা তাদের পাও সেখানেই তোমরা তাদের হত্যা করো, যে সব স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে তোমরাও তাদের সেসব স্থান থেকে বের করে দাও (জেনে রেখো), ফেতনা ফাসাদ (দাঙ্গা হাঙ্গামা) নরহত্যার চাইতেও বড়ো অপরাধ, তোমরা কাবা ঘরের পাশে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের আক্রমণ না করে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো; (মূলত) এভাবেই কাফেরদের শাস্তি (নির্ধারণ করা হয়েছে)। ১৯২. তবে তারা যদি (যুদ্ধবিগ্রহ থেকে) ফিরে আসে তাহলে (মনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ
قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۖ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۖ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (যমীনে) ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া) জীবন ব্যবস্থা (পূর্ণাংগভাবে) আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (তবে) যালেমদের ওপর (এটা প্রযোজ্য নয়)। ১৯৪. একটি সম্মানিত মাসের বদলেই একটি সম্মানিত মাস (আশা করা যাবে, প্রয়োজনে) এ সম্মানিত মাসসমূহেও প্রতিশোধ (ব্যবস্থা) বৈধ হবে; (এ সময়) যদি কেউ তোমাদের ওপর হস্ত প্রসারিত করে তাহলে তোমরাও তাদের ওপর তেমনি হস্ত প্রসারিত করে (জবাব) দাও, তবে (সর্বদাই) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, মনে রেখো, যারা (সীমালংঘন থেকে) বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন। ১৯৫. আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করো, (অর্থ সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা (অন্য মানুষদের সাথে দয়া) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। ১৯৬. আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টির) জন্যে হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করো; (পথে) যদি তোমাদের কোথাও আটকে দেয়া হয় তাহলে সে স্থানেই কোরবানীর জন্যে যা কিছু সহজভাবে (হাতের কাছে) পাওয়া যায় তা দিয়েই কোরবানী আদায় করে নাও, (তবে) কোরবানীর পশু তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না; যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা যদি তার মাথায় কোনো রোগ থাকে (যে কারণে আগেই তার মাথা মুন্ডন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে), তাহলে সে যেন এর বিনিময় (ফেদিয়া আদায় করে, এবং তা) হচ্ছে কিছু রোযা (রাখা) অথবা অর্থ দান করা, কিংবা কোরবানী আদায় করা, অতপর

نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومٰتٌ ۚ
فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ
وَاتَّقُونِ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن
رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে তখন তোমাদের কেউ যদি এক সাথে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে চায়, তার উচিত (তার জন্যে) যা সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী আদায় করা, যদি কোরবানী করার মতো কোনো পশু সে না পায় (তাহলে) সে যেন হজ্জের সময়কালে তিনটি এবং তোমরা যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন সাতটি– (সর্বমোট) পূর্ণ দশটি রোযা রাখবে, এই (সুবিধা)-টুকু শুধু তাদের জন্যে, যাদের পরিবার পরিজন আল্লাহর ঘরের আশেপাশে বর্তমান নেই; তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো, জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কঠোর আযাব প্রদানকারী বটে!

রুকু ২৫

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ (একান্ত) সুপরিচিত, সে সময়গুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ (আদায়) করার মনস্থ করবে (সে যেন জেনে রাখে), হজ্জের ভেতর (কোনো) যৌনসম্ভোগ নেই, নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়াঝাটি, আর যতো ভালো কাজ তোমরা আদায় করো আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তা জানেন; (হজ্জের নিয়ত করলে) এর জন্যে তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, যদিও আল্লাহর ভয়টাই হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়, অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো। ১৯৮. (হজ্জের এ সময়গুলোতে) যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে (গিয়ে কোনো অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে) চাও তাতে তোমাদের কোনোই দোষ নেই, অতপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে তখন (মোযদালাফায়) 'মাশয়ারে হারাম'-এর কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করবে, (ঠিক) যেমনি করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাঁকে ডাকার) পথ বলে দিয়েছেন, তেমনি করে তাঁকে স্মরণ করবে, ইতিপূর্বে তোমরা (আসলেই) পথভ্রষ্টদের দলে শামিল ছিলে।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

১৯৯. তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে অন্য (হজ্জ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে, (নিজেদের ভুল ভ্রান্তির জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেন, তিনি বড়োই দয়ালু! ২০০. যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের যাবতীয়) আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেবে তখন (এখানে বসে আগের দিনে) যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের (গৌরবের কথা) স্মরণ করতে, তেমনি করে– বরং তার চাইতে বেশী পরিমাণে (এখন) আল্লাহকে স্মরণ করো; অতপর মানুষদের ভেতর থেকে একদল লোক বলে, হে আমাদের মালিক, (সব) ভালো জিনিস তুমি আমাদের এ দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, বস্তুত (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকী) থাকে না। ২০১. (আবার) এ মানুষদেরই আরেক দল বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, এ দুনিয়ায়ও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো, পরকালেও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো; (সর্বোপরি) তুমি আমাদের আগুনের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও। ২০২. এ ধরনের লোকদের তাদের নিজ নিজ উপার্জন মোতাবেক তাদের যথার্থ হিস্যা রয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ২০৩. হাতেগনা (হজ্জের) এ কয়টি দিনে (বেশী পরিমাণে) আল্লাহকে স্মরণ করো; (হজ্জের পর) যদি কেউ তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে (মিনা থেকে মক্কায় ফিরে আসে) তাতে (যেমন) কোনো দোষ নেই, (তেমনি) যদি কোনো ব্যক্তি সেখানে আরো বেশী অপেক্ষা করতে চায় তাতেও কোনো দোষ নেই, (এ নিয়ম হচ্ছে) তার জন্যে, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো, একদিন তোমাদের তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।

তাফসীর ১৮৯-২০৩

এই আলোচনাটি হচ্ছে পূর্ববর্তী আলোচনার মতো মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, জীবন যাপন প্রণালী এবং আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় শরীয়তের বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত। এ আলোচনায় নতুন চাঁদ ও চন্দ্রমাস সংক্রান্ত বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে জাহেলী যুগের একটি কুপ্রথারও এখানে সংশোধন করা হয়েছে। সেই কুপ্রথাটি হলো কোনো কোনো সময়ে বাড়ীর সদর দরজার পরিবর্তে পেছন দরজা দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করা সংক্রান্ত।

তারপর সাধারণ সময়ে এবং বিশেষভাবে নিষিদ্ধ সময়ে ও 'মাসজিদুল হারামের' কাছে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া সংক্রান্ত বিধিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষে সেই সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিমার্জিত হজ্জ ও ওমরার নিয়মাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে, যা ইসলামে প্রবর্তিত হয়েছে এবং যাকে ইসলাম জাহেলীয়াতের ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত করে পরিশুদ্ধ রূপ দিয়েছে।

এভাবে পূর্বোক্ত আলোচনার মতই এখানেও আমরা এমন কিছু বিধি-বিধান দেখতে পাই, যা ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এমন বিধি বিধানেরও সাক্ষাত পাই, যা নিছক আনুষ্ঠানিক এবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত বিধিমালার সাথেও আমরা পরিচিত হই। এই সমস্ত বিধিমালা একই যোগসূত্রে গ্রোথিত এবং এর প্রত্যেকটি বিধির শেষে আল্লাহকে ভয় করার বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করার বিষয়টি আলোচনার অব্যবহিত পর সততার প্রচলিত অর্থ সংশোধন করে তার আসল অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সততা শুধু বাহ্যিক কাজকর্মেই নয় বরং তাকওয়া ও আল্লাহভীতিতে নিহিত। 'বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করায় সততা প্রমাণিত হয় না। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার ভেতরেই সততা রয়েছে। তোমরা বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে এসো। আর আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য মন্ডিত হবে।'

সাধারণ সময়কার যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বাড়াবাড়ি ও আগ্রাসী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে। আর সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর ভালোবাসা ও বিরাগের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে।

'আল্লাহ তায়ালা আগ্রাসী ও সীমা অতিক্রমকারীকে ভালোবাসেন না।'

আর নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সংক্রান্ত বিধানের শেষে আল্লাহকে ভয় করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে,

'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে আছেন।'

আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ জারী করার সংগে সংগে পরোপকারীদেরকে যে আল্লাহ ভালোবাসেন, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

'পরোপকার করো। আল্লাহ পরোপকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

হজ্জের কতিপয় বিধান বর্ণনার পর এই বলে উপসংহার টানা হয়েছে যে,

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'

অপর একটি মন্তব্য করা হয়েছে হজ্জের নির্ধারিত সময় এবং হজ্জ আদায়কালে অশ্লীলতা, পাপাচার ও ঝগড়া কলহ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদানের পর। বলা হয়েছে,

'তোমরা পাথেয় নিয়ে যেও। তবে সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে আল্লাহভীতি। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা! তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।'

এমনকি হজ্জ সমাপনের পর আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়ার পরও এই বলে উপসংহার টানা হয়েছে যে,

'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।'

এভাবে আমরা এসব বিষয়কে পরস্পরের মধ্যে গভীরভাবে সম্পৃক্ত দেখতে পাই। এই সম্পৃক্ততা ইসলামের একটা স্বভাবগত ও মজ্জাগত ব্যাপার। এখানে আনুষ্ঠানিক এবাদাত বন্দেগী হৃদয়ের ভাবাবেগ এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান থেকে কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিধান এর অন্তর্ভুক্ত বলেই ইসলাম এত সুষ্ঠু, সুষম ও নিখুঁত। এতে হৃদয়ঘটিত যাবতীয় বিষয় এবং সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে বলেই ইসলাম এত ভারসাম্যপূর্ণ।

ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, তাকে একটা একক ও সুসমন্বিত চিন্তাধারা এবং একক সুসমন্বিত ও সর্বব্যাপী বিধানের অওতাধীন করে। আল্লাহর শরীয়তকে সকল বিধি ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করার মাধ্যমে সে এই অসাধারণ কাজ সমাধা করে।

আলোচনার এই পর্বের শুরু থেকেই আলোচ্য সূরার একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যটি হলো, ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমানরাও যে রসূল (স.)-কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, তারই কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতেন এ জন্যে যে, ইসলাম গ্রহণের পর তারা যে নতুন জীবনের সূচনা করেছিলেন, তাতে তারা কিছু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো। সেই পরিস্থিতিতে তারা তাদের নতুন চিন্তাধারা ও নতুন বিধি ব্যবস্থা অনুসারে কিভাবে জীবন যাপন করবেন, সেটাই ছিলো তাদের জিজ্ঞাসার বিষয়। তাছাড়া কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক বিষয় এমন ছিলো, যা তাদের অনুভূতিকে আকৃষ্ট করতো। সেইসব বিষয় সম্পর্কেও তারা প্রশ্ন করতেন।

উদাহরণ স্বরূপ, তারা চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। জানতে চাইতেন যে, চাঁদের রহস্যটা কী? কি কারণে চাঁদ প্রথমে সরু আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর বড় হতে হতে পূর্ণিমায় রূপ ধারণ করে, অতপর পুনরায় ছোট হতে হতে সেই প্রথম দিনের বাকা সরু চাঁদে পরিণত হয়, অতপর পুনরায় ক্ষুদ্র সরু চাঁদ হয়ে পুনপ্রকাশিত হওয়ার আগে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

তাঁরা আরো প্রশ্ন করতেন, আল্লাহর পথে কিভাবে অর্থ ব্যয় করবেন, নিজেদের কোন ধরনের সম্পদ থেকে কী পরিমাণে ও কী হারে ব্যয় করবেন? নিষিদ্ধ মাসে ও মাসজিদুল হারামের কাছে যুদ্ধ বিগ্রহ করা বৈধ কিনা তাও জিজ্ঞাসা করতেন। মদ ও জুয়া সম্পর্কেও তারা জিজ্ঞাসা করতেন। জাহেলী যুগে তো তারা মদ জুয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। এখন এগুলো সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

তারা জানতে চাইতেন মেয়েদের ঋতুস্রাব সম্পর্কেও। ঋতুকালে স্ত্রীলোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক রাখা চলবে কি না। তারপর স্বামী স্ত্রীর একেবারে গোপনীয় বিষয় সম্পর্কেও তারা জিজ্ঞাসা করতেন। কখনো কখনো এ সব বিষয়ে স্ত্রীরা অগ্রণী হয়েও জিজ্ঞাসা করতেন।

কোরআনের অন্যান্য সূরায় আরো বহু বিষয়ে জিজ্ঞাসার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব প্রশ্ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এসব বিষয়ে প্রশ্ন করার ভেতর দিয়ে প্রথমত এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তখন মুসলিম সমাজের জীবনধারায় ও পারস্পরিক সম্পর্কে যথেষ্ট খোলামেলা ভাব, স্বচ্ছতা, সরলতা, প্রাণোচ্ছলতা ও ক্রমবিকাশের ভাবধারা পরিস্ফুট ছিলো এবং একটা বিশেষ ভাবমূর্তির অধিকারী ও আপন সদস্যদেরকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধকারী সেই ইসলামী সমাজটিতে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিলো।

সেই সমাজের লোকেরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো না। তারা একটা পরিপাটি, সুশৃংখল ও সুসংবদ্ধ উম্মাহ তথা মহা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো। সেই সমাজ ছিলো একটা অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। সেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এ কথা জানার জন্যে সর্বদা ব্যাকুল থাকতো যে, তার জীবন যাপনের পথ পন্থা কী হবে এবং কার সাথে তাকে কি কি ধরনের সম্পর্ক করে চলতে হবে।

এটা নিসন্দেহে একটা নতুন পরিস্থিতি ছিলো এবং এ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ইসলামের চিন্তাধারা, জীবন পদ্ধতি ও নেতৃত্বের সমান অবদান ছিলো। একটা সর্বাত্মক ও সর্বাংগীন সামাজিক, চিন্তাগত, চেতনাগত ও মানবিক উন্নতি ও অগ্রগতি ছিলো এই নয়া পরিস্থিতির সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক।

দ্বিতীয়ত, এ সব জিজ্ঞাসা ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতির তিক্ষ্ণতা ও গণমানসের ওপর নবাগত ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রাধান্য বিস্তার করার লক্ষণ। এই প্রাধান্যের ফলে প্রত্যেক মুসলমান তার দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো কাজই করতে সাহস পেতো না, যার সম্পর্কে ইসলামের মতামত তার সুনিশ্চিতভাবে জানা থাকতো না।

জাহেলীয়াত যুগের যাবতীয় চিত্তাকর্ষক জিনিসের প্রতি তাদের আকর্ষণ আসক্তি ও আস্থা লোপ পেয়েছিলো। ফলে আগেকার প্রচলিত রীতিনীতিকে তারা অনুসরণের যোগ্য মনে করতো না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে তারা নতুন নীতিমালা ও শিক্ষা লাভের জন্যে অপেক্ষমান ও উদগ্রীব থাকতো। নিরেট জাহেলীয়াত থেকে সবেমাত্র মুক্তি লাভকারী সমাপ্ত এই নব চেতনার উন্মেষ যে নিখুঁত ও বিশুদ্ধ ঈমানেরই অবদান ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এভাবে যথার্থ ঈমানে উত্তরণ ঘটলেই মানব মন তার যাবতীয় পূর্বতন আকর্ষণ ও আসক্তির জিনিসগুলোর প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ হারিয়ে বসে এবং জাহেলীয়াত যুগের সকল আদত অভ্যাস ও রীতিনীতির ব্যাপারে সে সতর্ক ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। আর এর পাশাপাশি নতুন গৃহীত আদর্শ ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ গ্রহণের জন্যে সে ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। যাতে তার আলোকে নিজের নতুন জীবনকে স্বার্থকভাবে ও নিষ্কলুষভাবে গড়ে তুলতে পারে। তাই নবাগত ইসলামী আদর্শের পক্ষ থেকে যখন সে তার পূর্বতন রীতিনীতির কিছু অংশকে বহাল রাখতে দেখে, তখন তাকে ইসলামী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত করেই গ্রহণ করে।

কেননা নবাগত ব্যবস্থা পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কেই বাতিল করে দেবে এটা জরুরী নয়। তবে এটা অবশ্যই জরুরী যে, নবাগত আদর্শের মৌলিক নীতিমালার সাথে এইসব খুঁটিনাটি বিধির এমন সমন্বয় ঘটাতে হবে যেন তা এই নবাগত আদর্শেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তার সকল অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায় এবং তার মূলধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হজ্জের যে বিধানগুলোকে ইসলাম বহাল রেখেছে, তার ক্ষেত্রে সে এই প্রক্রিয়াই কার্যকর করেছে। ফলে সেগুলো এখন ইসলামেরই অংগে পরিণত হয়েছে, ইসলামের ওপরই তার ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং জাহেলীয়াতের সাথে তার সকল সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই জিজ্ঞাসাগুলো থেকে তৃতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তা এই সময়কার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে মদীনায় ইহুদীরা ও মক্কায় মোশরেকরা প্রায়ই ইসলামের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতো। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন ঘটনা ও কর্মকান্ড নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারাভিযান চালাতো।

উদাহরণস্বরূপ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ক্ষুদ্র সেনাদলটি কর্তৃক মোশরেকদের সাথে নিষিদ্ধ মাসে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে যে প্রচারণা চালানো হয়, তার উল্লেখ করা যায়। এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ছিলো এবং তার জবাব দেয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, যাতে এই প্রচারাভিযান বন্ধ হয় এবং মুসলমানদের মন থেকে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়।

এ প্রসংগে যে কথাটা হৃদয়ংগম করা প্রয়োজন তা এই যে, কোরআন সব সময়ই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলো, চাই তা ইসলামী ও অনৈসলামিক চিন্তাধারার যুদ্ধ হোক, অথবা মুসলিম উম্মাহ ও তার ধ্বংসকারী শত্রুদের মধ্যে বহিরাংগনে ঘটমান সংঘর্ষ হোক।

এই সংঘাত ও সংঘর্ষ এখনো অব্যাহত রয়েছে। কেননা মানুষের মন মানস ও স্বভাব প্রকৃতি যথারীতি বহাল রয়েছে। মুসলিম জাতির শত্রুরাও তাদের শত্রুতার নীতিতে অটল। আর কোরআনও বিদ্যমান। কিন্তু কোরআন শুধু বিদ্যমান থাকলেই চলবে না, তাকে যুদ্ধ ও সংগ্রামের ময়দানে উপস্থিত রাখতে হবে। তাহলে এই কোরআন একদিন যেমন সংগ্রামের নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি আজও দেবে। এ ছাড়া মানব জাতির ও মুসলিম জাতির নিস্তার নেই, মুক্তি নেই। এ সত্য উপলব্ধি না করা পর্যন্ত মুসলমানদের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ রুদ্ধ।

অন্তত এতটুকু কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল করা চাই যে কোরআনকে জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কার্যকর শক্তি ও পথনির্দেশক হিসাবে উপলব্ধি করা ও বিবেচনা করার মনোভাব নিয়েই তার শরণাপন্ন হওয়া আমাদের কর্তব্য। কোরআনকে শুধু সুরেলা ও মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করে ক্ষান্ত থাকার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি।

একে নাযিল করেছেন একটি সবল, জীবন্ত ও সক্রিয় এক সংগঠক হিসাবে, একটি নতুন চিন্তাধারার নির্মাতা হিসাবে, জাহেলী চিন্তধারার প্রতিরোধকারী ও তা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষাকারী ও ত্রাণকারী হিসাবে। একটি পূর্ণাংঙ্গ জীবন বিধানের নির্মাতা ও চালক হিসাবে। যেন কন্টকাকীর্ণ, বিপদাপদে পরিপূর্ণ ও প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনায় আচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করে মানবজাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তার মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দিতে পারে। কোরআনকে এভাবেই বুঝতে ও গ্রহণ করতে হবে– প্রচলিত প্রথামাফিক কেবল সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার পুস্তক হিসাবে নয়।

এবার আমরা এই পর্বের আয়াতগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হবো।

কোরআনের লক্ষ ও বৈশিষ্ট

'ওরা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাও, চাঁদ মানুষের জন্যে একটি সময় নিঘন্ট ও হজ্জের জন্যে সময় নির্দেশক।' ..... (আয়াত ১৮৯)

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আমরা ইতিপূর্বে যে প্রশ্নের উল্লেখ করেছি রসূল (স.)-কে সে ধরনেরই প্রশ্ন করা হয়েছিলো। অর্থাৎ চাঁদের আবির্ভাব, ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রম হ্রাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, এমনটি কেন হয়? অপরাপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে আল্লাহর রসূল, চাঁদকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে।

সম্ভবত প্রশ্নের এই শেষোক্ত ধরনটি প্রদত্ত জবাবের সাথে অধিকতর মানানসই। এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স.)-কে বললেন, 'তুমি বলে দাও, চাঁদ মানুষের জন্যে ও হজ্জের জন্যে সময় নির্দেশক' ....অর্থাৎ মানুষের এহরাম বাঁধা ও খোলায়, রোযা রাখা ও তা থেকে বিরত হওয়ায়, বিয়ে তালাক ও ইদ্দতের সময় গননায়, ব্যবসা' ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের সময় স্থির করা হয় এবং ধর্মীয় ও সাংসারিক কর্মকান্ডে সমভাবে সহায়ক।

উপরোক্ত জবাব প্রথম রেওয়ায়াতে বর্ণিত প্রশ্নের হোক বা দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে বর্ণিত প্রশ্নের, উভয় অবস্থাতেই তাকে মুসলমানদের বাস্তব জীবন ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, নিছক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তথ্যের সাথে নয়। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বাস্তব জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে চাঁদের স্বার্থকতা ও ভূমিকা কি, সে বিষয়ে অবহিত করেছেন।

মহাশূন্যে চাঁদের আবর্তন বিবর্তন কিভাবে হয়, সে ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি, যদিও প্রশ্নের ভেতরে সেটাই জানতে চাওয়া হয়েছিলো এবং বলা হয়েছিলো যে, চাঁদ এমন সরু হয়ে যায় কেন ইত্যাদি ইত্যাদি? সৌরমন্ডলে বা মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত জ্যোতিষ্ক মন্ডলীর ভারসাম্য রক্ষায় চাঁদের ভূমিকা কি, সে সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালা কোনো কথা বলেননি। যদিও সেটা এই প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত ছিলো যে, আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে চাঁদ সৃষ্টি করেছেন, জবাব দানের এই বিশেষ ভংগীর মধ্য দিয়ে আসলে কি ইংগিত দেয়া হয়েছে, এটাই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, কোরআন এসেছিলো একটি বিশেষ আদর্শ ও চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাতে, একটি বিশেষ জীবন যাপন পদ্ধতি ও বিশেষ সমাজ গড়ে তুলতে। কোরআন উদ্যোগী ছিলো পৃথিবীতে এমন একটি অভিনব জাতি গড়ে তুলতে, যা মানব জাতির নেতৃত্ব দানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে, এমন একটি অনবদ্য সমাজ গড়ে তুলতে যার সমকক্ষ কোনো সমাজ ইতিপূর্বে কখনো গঠিত হয়নি। সে এসেছিলো একটি অভূতপূর্ব আদর্শ জীবন ধারার প্রবর্তন করতে। পৃথিবীতে সেই জীবন ধারার ভিত্তি গড়ে তুলতে এবং মানব জাতিকে সেদিকে পথ প্রদর্শন করতে।

এ প্রশ্নের যদি 'বৈজ্ঞানিক' জবাব দেয়া হতো, তাহলে হয়তো বা তা প্রশ্নকারীদের মহাশূন্য সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান সরবরাহ করতো। যেহেতু তৎকালে এ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিলো খুবই কম, তাই এরূপ বৈজ্ঞানিক জবাব পেলে তাদের এই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করতো। শুধু যে এই জ্ঞান মানুষের কম ছিলো তাই নয়, বরং এ সম্পর্কে যা কিছু জানা ছিলো, তাও নানারকম সন্দেহ-সংশয়ে পরিপূর্ণ ছিলো। কেননা এ ধরনের পুঁথিগত তথ্যের জন্যে অনেক লম্বা যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে হতো। অথচ সেকালের গোটা দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তির জগতে যে অবস্থা বিরাজ করছিলো, তাতে এই ধরনের যুক্তিতর্ক অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে উঠতো।

এ কারণে কোরআন এ বৈজ্ঞানিক জবাব এড়িয়ে যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করেছে। কেননা তখনো মানব জাতি ওই ধরনের জবাব উপলব্ধি করার যোগ্য হয়ে ওঠেনি, আর কোরআনের সেই প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল করতেও তা তেমন সহায়ক হতো না, যার জন্যে কোরআন নাযিল হয়েছিলো। তা ছাড়া কোরআন এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্রও নয়। কেননা কোরআন এসেছিলো এইসব খুঁটিনাটি তথ্যের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। সে নিছক মহাশূন্যে বিজ্ঞান, রসায়ন কিংবা চিকিৎসা বিদ্যার পুস্তক হিসাবে নাযিল হয়নি। অথচ কোরআনের অতি উৎসাহী ভক্তদের কেউ কেউ কোথায় কোন্ বিজ্ঞান বিরোধী তত্ত্ব পাওয়া যায় তার অন্বেষণে গলদঘর্ম হয়ে থাকে।

উক্ত উভয় ধরনের প্রচেষ্টার মূলেই রয়েছে এই মহাগ্রন্থের স্বভাব প্রকৃতি, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি। কোরআনের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের সত্ত্বা ও জীবন। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সৃষ্টিজগত সম্পর্কে, স্রষ্টার সাথে গোটা সৃষ্টি জগতের সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে এবং সৃষ্টি জগতে মানুষের অবস্থান ও তার প্রতিপালকের সাথে তার সংযোগ ও সম্বন্ধ সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাংগ ধারণা প্রদান। আর এই ধারণার ভিত্তিতে এমন একটা

জীবন যাপন পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করাও তার উদ্দেশ্য, যা মানুষকে তার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। বলা বাহুল্য, মানুষের এই শক্তির মধ্যে তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিও অন্তর্ভুক্ত। এই বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি মানুষের অন্য সকল শক্তিকে সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত করার পর এবং তার কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করার পর তার সাধ্য অনুসারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা ও তার ফলাফল অর্জন করে থাকে। অবশ্য সেই ফলাফল স্বভাবতই চূড়ান্ত নয় এবং সর্বাত্মকও নয়।

কোরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বয়ং মানুষ, তার ধারণা বিশ্বাস, আবেগ ও উপলব্ধি, কার্যকলাপ ও আচরণ এবং তার সম্পর্ক ও বন্ধন। দুনিয়ার অন্যান্য বস্তু সংক্রান্ত বিদ্যা ও জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বস্তু জগতে বস্তু জগতেরই বিভিন্ন উপায় উপকরণের সাহায্যে নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন ও সৃষ্টিধর্মী কর্মকান্ড পুরোপুরিভাবে মানবীয় বিবেক বুদ্ধি, পরীক্ষা নিরীক্ষা, অন্বেষণ ও অনুসন্ধান, আন্দাজ অনুমান ও মতবাদসমূহের হাতে ন্যস্ত। কেননা, এগুলো হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের খেলাফত পরিচালনার ভিত্তি। আর এগুলো অর্জনের যোগ্যতাও তার জন্মগতভাবেই রয়েছে।

কোরআন তার এই স্বভাবগত ও জন্মগত যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে বিশুদ্ধ করে, যাতে তা বিনষ্ট বা বিকৃত না হয়। আর যে পরিবেশে ও ব্যবস্থায় সে জীবন ধারণ করে তাকেও কোরআন পরিশুদ্ধ করে, যাতে তার জন্মগত যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে সে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। কোরআন তাকে সৃষ্টিজগতের স্বভাব প্রকৃতি ও গুণাগুণ সম্পর্কে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক কিরূপ সে সম্পর্কে, সৃষ্টিজগতের সাথে তার সমন্বয় সম্পর্কে এবং যেহেতু মানুষ নিজে এই জগতেরই একটি অংশ, তাই সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে তাকে মৌলিক ও সাধারণ ধারণা প্রদান করে।

এরপর তাকে সৃষ্টিজগত ও তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনে ও সেই জ্ঞানকে স্বীয় খেলাফত পরিচালনার কাজে প্রয়োগ করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়। কোরআন এ ব্যাপারে তাকে বিস্তারিত জ্ঞান সরবরাহ করে না। কেননা এই বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন তার ব্যক্তিগত কাজেরই অংশ।

কোরআনের অতি উৎসাহী ভক্তদের এই সরলতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই যে, তারা কোরআনের অংশ নয় এমন জিনিসকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন জিনিসকে তার দায়িত্ব বলে গণ্য করতে চান এবং তার ভেতর থেকে চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, মহাশূন্য বিদ্যা ইত্যাদির খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ধার করতে চান। ভাবখানা এই যে, এ দ্বারা তারা যেন কোরআনের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান!

কোরআনের তথ্য ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার

কোরআন তার মূল আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে একটি পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। তার আলোচ্য বিষয়টি উপরোক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের সব কটির চাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। কেননা মানুষই ওইসব বিদ্যা ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে উদ্ভাবন করে ও তাকে কাজে লাগায়। গবেষণা ও অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রযুক্তি স্বয়ং মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য। আর কোরআন সেই মানুষকে খেলাফতের যোগ্য করে গড়ে তোলে।

অনুরূপভাবে যে মানব সমাজ মানুষের অভ্যন্তরে লুকানো শক্তিগুলোকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়ে থাকে, সেই সমাজকে গড়ে তোলার কাজও কোরআনই সম্পন্ন করে।

অতপর যখন একটি সুস্থ ও সুষ্ঠু চিন্তা, ভাবাবেগ ও ধ্যান ধারণাসম্পন্ন মানুষ তৈরি হয়ে যায় এবং তাকে তৎপরতা চালানোর সুযোগদানকারী সমাজও যখন গঠিত হয়ে যায়, তখন কোরআন মানুষকে সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধ চিন্তা গবেষণা ও বিচার বিবেচনার মানদন্ড দিয়ে স্বাধীন ছেড়ে দেয় যে, সে চিন্তা গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাক এবং তাতে সে ভুল কিংবা নির্ভুল যে ফলাফলই লাভ করে, করুক।

অনুরূপভাবে সৃষ্টিজগতের স্বভাব প্রকৃতি ও স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্কের ধরন এবং সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মহাবিশ্ব সম্পর্কে কোরআন মাঝে মাঝে যে অকাট্য তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ পরিবেশন করে থাকে, সেগুলোকে মানবীয় বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত আন্দাজ অনুমান ও মানব রচিত মতবাদসমূহের সাথে যুক্ত ও তার ওপর নির্ভরশীল মনে করা আমাদের জন্যে সংগত হতে পারে না। এমনকি মানুষ যেগুলোকে 'বৈজ্ঞানিক তথ্য' হিসাবে উল্লেখ করে থাকে এবং যেগুলোকে সে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্ভুল ও অকাট্য ফলাফল মনে করে থাকে, সেগুলোর সাথেও নয়।

কোরআনে বর্ণিত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য অকাট্য চূড়ান্ত পূর্ণাংগ। পক্ষান্তরে মানুষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় চাই তা তার আয়ত্তাধীন যে কোনো উপায় উপকরণের সাহায্যেই উপনীত হোক না কেন তা চূড়ান্তও নয়, অকাট্যও নয়। সে সব তত্ত্ব তথ্য ও সিদ্ধান্ত মানুষের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল এবং যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে ও যে উপায়-উপকরনের সাহায্যে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালিত ও এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং খোদ মানবীয় বিজ্ঞানের স্বাভাবিক দাবী অনুসারেই এটা নীতিগতভাবে ভুল হবে যদি আমরা কোরআনের অকাট্য ও অভ্রান্ত তথ্যাবলীকে সীমাবদ্ধ মানবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবিত অপরিপক্ক তথ্যাবলীর সাথে যুক্ত ও নির্ভরশীল মনে করি।

উল্লেখিত বক্তব্য এ যাবত আবিস্কৃত 'বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর' ব্যাপারে প্রযোজ্য। বিশেষত যে সব আন্দাজ অনুমান ও মতবাদকে 'বৈজ্ঞানিক' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা আরো স্পষ্ট। এ সব আন্দাজ অনুমান ও মতবাদের মধ্যে রয়েছে মহাশূন্য সংক্রান্ত সকল মতবাদ, মানুষের অবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত সকল মতবাদ, মানুষের মন ও তার আচরণ সংক্রান্ত সকল মতবাদ এবং পৃথিবীতে মানুষের সামাজিক জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত সকল মতবাদ। এ সমস্ত মতবাদ, এমনকি, খোদ্ মানবীয় বিচার বুদ্ধির আলোকেও 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য' নয়। এগুলো নিছক অনুমান ও ধারণা মাত্র। এর গুরুত্ব কেবল এতটুকুই যে, এ সব আন্দাজ অনুমান সর্বাধিক সংখ্যক প্রাকৃতিক, জৈবিক, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম।

এগুলোর এই গুরুত্ব সেই দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে, যেদিন আরেকটি আন্দাজ অনুমান এসে আরো বেশী সংখ্যক রহস্যের ব্যাখ্যা দেবে অথবা আরো নির্ভুল ও সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেবে। এ জন্যে এসব আন্দাজ অনুমান ও মতবাদ সর্বদাই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনযোগ্য। এমনকি কখনো কখনো নতুন কোনো অনুসন্ধান যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটায় কিংবা প্রাচীন পর্যবেক্ষণসমূহের নতুন কোনো ব্যাখ্যার উদ্ভব ঘটায় গোটা মতবাদটিরই বিলুপ্তি কিংবা আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

যখনই কোরআনের কোনো সাধারণ ইশারা ইংগিতকে কোনো মানবীয় মতবাদ বা কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা তথ্যের সাথে যুক্ত করা হয়। তখন প্রথমত, তাতে একটা মৌলিক নীতিগত

ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, তার এমন তিনটে কুফল অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যার কোনোটাই কোরআনের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সংগতিশীল নয়।

প্রথমত, এটা মানসিক পরাজয়ের নামান্তর। এই পরাজয় মানুষকে এরূপ ধারণায় লিপ্ত করে যে, বিজ্ঞানই হলো পরাক্রমশালী ও নিয়ামক শক্তি আর কোরআন তার অনুগামী। এই ধারণার কারণে একশ্রেণীর লোক বিজ্ঞানের সাহায্যে কোরআনের পক্ষে যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকে। অথচ কোরআন নিজের আলোচ্য বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং তার উপস্থাপিত তথ্যাবলীর ব্যাপারে তা অকাট্য ও চূড়ান্ত।

অন্যদিকে বিজ্ঞান গতকাল যাকে সত্য বলে সাব্যস্ত করেছিলো, আজ তাকে খন্ডন করছে। এটা তার চিরাচরিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা চূড়ান্তও নয়, সর্বাত্মকও নয়। কারণ তা মানুষের মধ্যস্থতা, তার বুদ্ধিমত্তা ও সাজ সরঞ্জামের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষের এই জিনিসগুলো সব সময় একই ধরনের বা চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক সিদ্ধান্তই দেবে তা স্বভাবতই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এটা কোরআনের স্বভাব প্রকৃতি এবং তার লক্ষ্য ও ব্রত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভুল বুঝাবুঝির ফল। স্বভাব প্রকৃতি ও লক্ষ্যের বিচারে কোরআন হলো এমন এক নিগূঢ় ও চূড়ান্ত সত্যের বাহক, যা মানুষকে এই বিশ্ব প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে তোলে, যাতে পার্শ্ববর্তী প্রকৃতির সাথে তার সংঘাত না বাঁধে, বরং সাজুয্য ও সমন্বয় ঘটে এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালনে কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও জাগতিক নিয়মকে সে কাজে লাগাতে পারে।

এসব প্রাকৃতিক নিয়ম সে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, ও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা জানতে পারে। তার খোদাপ্রদত্ত বিবেকবুদ্ধিই তাকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত পথের সন্ধান দিয়ে থাকে, যাতে সে তদনুযায়ী কাজ করতে পারে। বস্তু জগত সংক্রান্ত তৈরী তথ্য অর্জন করাই তার কাজ নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, কোরআন বিশ্ব জগতের স্বভাব প্রকৃতি ও তার নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে মানুষ গড়ার কাজটি করে থাকে, মানুষের আপেক্ষিক স্বভাব প্রকৃতি যতোখানি তার অনুমতি দেয় ঠিক ততোখানিই।

তৃতীয়ত, এটা (মানব রচিত জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে কোরআনকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা) কোরআনের আনুগত্য ও অনুসরণের সাথে সাথে তাকে নিয়ে মানব রচিত অস্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল আন্দাজ অনুমান ও মতবাদসমূহের পিছু পিছু ছুটে চলার সুবিধার্থে ক্রমাগত ব্যাখ্যা দিতে থাকার শামিল।

উপরোক্ত তিনটি জিনিসের একটিও কোরআনের মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সংগতিশীল নয়। অনুরূপভাবে, আগে যেমন বলেছি, তা নীতিগতভাবেও ত্রুটিপূর্ণ।

তবে এ সব কথার অর্থ এ নয় যে, আমরা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা আদৌ উপকৃতই হবো না। জীবন জগত ও মানুষ সংক্রান্ত যে সব নবনব তত্ত্ব ও তথ্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করে চলেছে, তাকে অন্তত কোরআন বুঝার কাজে ব্যবহার না করে আমরা কিছুতেই পারি না। আমাদের বক্তব্যের অর্থ এটা ছিলো না যে, আমরা বিজ্ঞানকে একেবারেই আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবো। আল্লাহ তো নিজেই বলেছেন,

'আমি অচিরেই আমার নিদর্শনগুলোকে প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে এবং তাদের সত্ত্বার অভ্যন্তরে দেখাবো, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কোরআনই সঠিক।'

এই আভাস থেকে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে ও মানবীয় সত্ত্বার অভ্যন্তরে লুকানো আল্লাহর যে সব নিদর্শনকে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করছে, তা নিয়ে সব সময় চিন্তাভাবনা ও বিচার গবেষণা চালানো আমাদের কর্তব্য। শুধু তাই নয়, কোরআনের বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের আলোকে আমরা পেয়ে থাকি, তাকে যতো দূর সম্ভব প্রসারিত করাও আমাদের দায়িত্ব। যে সব তত্ত্ব ও তথ্য চূড়ান্তও নয়, সর্বাত্মকও নয়, তার সাথে কোরআনের বক্তব্যকে যুক্ত না করে এ কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি? একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, কোরআন বলেছে,

'....তিনি সকল জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথোপযুক্তভাবে পরিমিত করেছেন।'..

অপর দিকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও নিপুণ সমন্বয় ও সাজুয্য বিদ্যমান। পৃথিবী যে বিশেষ আকৃতি নিয়ে বিরাজমান, সূর্য থেকে যে পরিমাণ দূরত্বে তার অবস্থান, পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্ব, পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ ও সূর্যের যে আকৃতি, তার আবর্তনের যে গতি, তার যে আকর্ষণ শক্তি, এবং তার পৃষ্ঠদেশের এই বৈচিত্রপূর্ণ প্রকৃতি এবং এ ধরনের হাজারো বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটার কারণেই তার মধ্যে জীবনের আবির্ভাব ও বিকাশের উপযোগী ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারছে।

সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটিও নিতান্ত আকস্মিক বা কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এইসব বিষয় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে আমরা উক্ত আয়াত, 'তিনি সকল জিনিসকে সৃষ্টি ও পরিমিত করেছেন' এর ব্যাপকতর ও গভীরতর মর্ম উপলব্ধি করতে পারি। সুতরাং সে জন্যে ওইসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পর্যবেক্ষণ করা দূষণীয় নয়। এটা সম্পর্ণ বৈধ এবং কাংখিতও।

কিন্তু যে জিনিসটি অবৈধ ও বৈজ্ঞানিকভাবে অশুদ্ধ, সেটি অন্য কয়েকটি উদাহরণে দেখা যাবে। যেমন কোরআন বলছে, 'আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।' এর পরই ডারউইনের বিবর্তনবাদের আবির্ভাব ঘটলো। এই মতবাদ অনুমান চালালো যে, জীবনের সূচনা হয়েছে একটি অণুকোষের আকারে এবং এই অণুকোষটির জন্ম হয়েছে পানির মধ্যে। এই অণুকোষটি প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত মানব সৃষ্টির কাজ সুসম্পন্ন হলো। এখন আমরা কি কোরআনের এই আয়াতটিকে উক্ত মতবাদটির সমর্থক মনে করবো এবং বলবো যে, কোরআন আসলে ডারউইনের ওই মতবাদই বুঝাতে চাইছে?

মোটেই তা নয়। প্রথমত, এই মতবাদ অকাট্য ও চূড়ান্ত মতবাদ নয়। কেননা মাত্র এক শতাব্দী পরিমাণ সময়ের মধ্যেই এই মতবাদকে এতবার সংশোধন করা হয়েছে যে, তা প্রায় আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্যের প্রজাতিক উত্তরণ ঘটে এবং কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উত্তর পুরুষে স্থানান্তরের অবকাশ নেই, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত কম যে, তার কারণে উক্ত মতবাদ শুধু ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণই হয়ে যায়নি বরং প্রায় বাতিল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তার একেবারে বাতিল হয়ে যাওয়া প্রায় অবধারিত।

পক্ষান্তরে কোরআনের বর্ণিত তথ্য মাত্রেই চূড়ান্ত ও অকাট্য সত্য। কিন্তু তাই বলে এই তথ্যটিই তার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে এটা জরুরী নয়। কেননা কোরআনের বর্ণিত তথ্য শুধু মানুষের উৎপত্তির উৎসটিই উল্লেখ করে। কিন্তু এই উৎপত্তির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে না। তার মূল বক্তব্যে সে চূড়ান্ত ও অকাট্য। আর সেটি হচ্ছে শুধু মানুষের উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে। এর বেশী কিছু নয়। কোরআন বলে,

'সূর্য তার একটি কেন্দ্রবিন্দু অভিমুখে চলমান।'

এখানে সূর্য সম্পর্কে একটি অকাট্য ও চূড়ান্ত সত্য প্রমাণিত হলো যে, সূর্য গতিশীল ধাবমান। ওদিকে বিজ্ঞান বলে যে, সূর্য তার চার পাশে বিরাজমান গ্রহ নক্ষত্রের তুলনায় প্রতি সেকেন্ডে ১২ মাইল বিচরণ করে। কিন্তু যে ছায়াপথের সে একটি নক্ষত্র, সেই ছায়াপথের সাথে তার বিচরণের গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে ১৭০ মাইল। কিন্তু মহাশূন্য সংক্রান্ত এই সব মতবাদ কোরআনের আয়াতের মূল লক্ষ্য নয়।

বিজ্ঞানের দেয়া এই মতবাদ আমাদেরকে এমন একটা আপেক্ষিক তথ্য দান করে, যা চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সত্য নয়, বরং তা বাতিল বা পরিবর্তনযোগ্য। কিন্তু কোরআনের আয়াত আমাদেরকে একটি অকাট্য ও শাশ্বত সত্য জানায়। সেই অকাট্য ও শাশ্বত সত্য এই যে, সূর্য স্থির নয় গতিশীল। তার দেয়া সত্য এতটুকুই। এর বেশী নয়। সুতরাং আমরা কোরআনের এই সত্যকে উল্লেখিত মানবরচিত মতবাদটির সাথে কখনো যুক্ত করবো না। কোরআন অন্যত্র বলে,

'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখেনি যে, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে যুক্ত ছিলো, অতপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছি।'

এরপর এক সময় বিজ্ঞান এই মতবাদ দিলো যে, পৃথিবী সূর্যের অংশ ছিলো, পরে তা সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তখন আমরা কি কোরআনের এই আয়াতকে উক্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুধাবন করার কাজে ব্যবহার করবো আর বলবো যে, কোরআন আসলে এই মতবাদের কথাই বুঝিয়েছে? না, কোরআন এটা বুঝাতে চায়নি। কেননা এই মতবাদটি চূড়ান্ত ও অকাট্য নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে এ ধরনের আরো কয়েকটি মতবাদ রয়েছে। কিন্তু কোরআন যে কথাটা বলেছে তা চূড়ান্ত অকাট্য ও সর্বাত্মক সত্য। সে শুধু এতটুকুই বলেছে যে, পৃথিবীকে আকাশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এ কাজটি কিভাবে করা হয়েছে? সেই আকাশই বা কি, যা থেকে পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে? আয়াতে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তাই এ বিষয়ে বিজ্ঞানের অনুমান নির্ভর কোনো মতবাদ সম্পর্কে এ কথা বলা সংগত হবে না যে, ওটাই আয়াতের মর্ম ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ পর্যায়ে আমরা এটুকু বিশ্লেষণই যথেষ্ট মনে করি। কেননা আমি শুধু চেয়েছিলাম কোরআনের আয়াতের মর্ম ও বক্তব্য কত ব্যাপক ও সুক্ষ্ম, তা অনুধাবনের জন্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনকে ব্যবহার করার সঠিক পন্থা কি, তাই নিরূপণ করতে। আমি কোরআনের আয়াতের মর্ম উদ্ধারের জন্যে কোনো বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আয়াতকে এমনভাবে যুক্ত করতে চাইনি যে তা পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, বা বিজ্ঞান থেকে তার যথার্থতা ও সামঞ্জস্যশীলতা প্রমাণ করতে হবে। আর বলাই বাহুল্য যে, উক্ত দুটি পন্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কুসংস্কারের মূলোৎপাটন

এরপর আমি পুনরায় কোরআনের আয়াতের পরবর্তী অংশের ব্যাখ্যায় ফিরে আসছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'পেছন দিক দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করা কোনো পুণ্যের কাজ নয়। পুণ্যের কাজ হলো (আল্লাহকে) ভয় করা। তোমরা বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। হয়তো তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে।'

আয়াতের দুই অংশের মাঝে যোগসূত্র এই যে, প্রথমাংশে চাঁদকে মানুষের জন্যে ও হজ্জের জন্যে সময় নির্দেশক বলা হয়েছে আর দ্বিতীয়াংশে হজ্জ সংক্রান্ত একটা জাহেলী প্রথার প্রতি

ইংগিত করা হয়েছে। সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত বা'রা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আনসাররা হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় বাড়ীর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো না। কিন্তু এক ব্যক্তি সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে যথেষ্ট লজ্জা দেয়া হলো। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা যে কোনো সফর থেকে আসুক না কেন, বাড়ীতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো না। তাই এ আয়াত নাযিল হয়।

প্রকৃত ব্যাপার যেটাই হোক না কেন, কোনো সাধারণ সফরের ব্যাপারে তাদের এরূপ অভ্যাস থেকে থাক কিংবা হজ্জের ব্যাপারে এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমানরা একে একটা পুণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করতো। তাই তাদের এই ধারণাকে খন্ডন করতে এ আয়াত নাযিল হয়। উক্ত ভিত্তিহীন কাজটির বিলোপ সাধন এবং মোমেনের দৃষ্টিতে সত্যিকার পুণ্যের কাজ কি, তা জানিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য।

বস্তুত প্রকৃত পুণ্য ও সওয়াবের কাজ হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এবং গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রত্যক্ষ তদারকী ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার নামই তাকওয়া। তাকওয়া এমন কোনো আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক কাঠামো সম্বলিত ব্যাপার নয়, যা ঈমানের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ করে না এবং একটা জাহেলী প্রথা ছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

আয়াতের শেষাংশে বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অবলম্বনের নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং তাকে মুক্তির উপায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে কোরআন মানুষের মনকে ঈমানের আসল তত্ত্বের সাথে পরিচিত করে। সেই তত্ত্ব হচ্ছে তাকওয়া। সে বলে যে, এই তত্ত্বের ওপর দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ নির্ভরশীল।

এই সাথে কোরআন ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে অসার ও নিস্ফল জাহেলী প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করতো চাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ যে মূল্যবান নেয়ামত দিয়েছেন এবং মানুষের সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সুবিধা করে দিয়েছেন তা অনুধাবন করার জন্যে মোমেনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। একটিমাত্র ক্ষুদ্র আয়াতেই সে এইসব শিক্ষা দিয়েছে।

যুদ্ধবিগ্রহ প্রসংগে কতিপয় নির্দেশ

এরপর সাধারণভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে মাসজিদুল হারামের কাছে ও নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে। সেই সাথে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের আহবানও জানানো হয়েছে। জেহাদের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। ১৯০নং থেকে ১৯৫ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে এ বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে।

কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতগুলোই হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। এর আগে সূরা হজ্জে আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেনদেরকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের শিকার মযলুম মুসলমানদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। মোমেনরা তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই অনুমতি আসলে তাদের ওপর জেহাদ ফরয করা ও তাদেরকে ক্ষমতাসীন করার পূর্বাভাস মাত্র। সূরা হজ্জের সেই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

'যাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা নির্যাতিত। আর আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ী

থেকে অবৈধভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধুমাত্র এ জন্যে যে, তারা বলেছিলো আল্লাহ আমাদের প্রভু।'

বস্তুত আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে উপাসনালয়সমূহ ও মাসজিদসমূহ- যাতে আল্লাহর নাম বেশী করে স্মরণ করা হয় তা ধ্বংস হ'য়ে যেত। আল্লাহকে যে সাহায্য করে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর মহাপ্রতাপশালী। (সেইসব মযলুম মোমেনকে অনুমতি দেয়া হয়েছে) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাশীল করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ নিষিদ্ধ করবে। আল্লাহর হাতেই রয়েছে সব কিছুর শেষ পরিণতি।'

এ জন্যে তারা জানতেন যে, কোন কারণে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এই যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কেন আহবান জানানো হয়েছে। ইতিপূর্বে যখন তারা মক্কায় ছিলেন, তখন তাদেরকে যুলুম প্রতিহত করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছিলো,

'তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো, যাকাত দাও।'

নিশ্চয়ই হাতগুটানোর এই নির্দেশের পেছনে আল্লাহর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো। যা তিনি নিজেই স্থির করেছিলেন। মানবীয় চিন্তাশক্তি যদিও এর সকল কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম নয় তথাপি এর কিছু কিছু সম্ভাব্য কারণ আমরা অনুমান করতে পারি।

এই বিরতি ও সংযম অবলম্বনের আদেশের প্রথম যে কারণটি আমরা দেখতে পাই তাহলো প্রথম প্রথম আরব মুসলমানদেরকে ধৈর্যধারণের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা, যাতে তারা নেতার প্রতি অনুগত থাকতে ও অনুমতির অপেক্ষা করতে পারে। জাহেলীয়াতের যুগে তারা অতিমাত্রায় লড়াকু ও জংগী স্বভাবসম্পন্ন ছিলো। যুদ্ধের প্রথম ডাকেই তারা হুংকার দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তো এবং ন্যায় অন্যায় বাছবিচারের জন্যে কিছুমাত্র ধৈর্যধারণ করতো না।

অথচ মুসলিম উম্মাহকে যে বিরাট ও মহৎ কাজের জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো, তার স্বাভাবিক দাবী ছিলো এই যে, এই অসংযত মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, তাকে পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক নেতৃত্বের অনুগত করতে হবে, নেতা ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও স্থির মস্তিষ্কে পরিকল্পনা করে যে সিদ্ধান্ত নেয় তা মেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। এমনকি এই আনুগত্যের বিনিময়ে যদি আবেগে, উত্তেজনায় ও প্রতিহিংসায় অধীর হয়ে প্রথম ডাকেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোত্রীয় আভিজাত্য চরিতার্থ করার চিরাচরিত অভ্যাসকে জলাঞ্জলীও দিতে হয়, তবে তাও দিতে হবে।

এ কারণেই হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও হামযা ইবনে আব্দুল মোত্তালেবের মতো প্রথম যুগের বীর মোমেনরা তাদের অসাধারণ শৌর্য বীর্য সত্তেও মোমেনদের ওপর ক্রমাগত যুলুম নির্যাতন চলতে দেখেও ধৈর্যধারণ করতে পেরেছিলেন, রসূল (স.)-এর আদেশের অপেক্ষায় নিজেদের আবেগ-উত্তেজনাকে দমন করতে পেরেছিলেন এবং সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশের কাছে নতি স্বীকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখন এ কথাই বলা হচ্ছিলো যে, 'তোমরা হাত গুটিয়ে রাখো, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।'

এ কারণেই ওই সকল মহান ব্যক্তির জাত্যাভিমান ও আনুগত্যে, শৌর্য বীর্যে ও স্থিরতায় এবং প্রতিরোধ স্পৃহায় ও আত্মসংযমে পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কেননা তাদেরকে একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো।

মক্কী জীবনে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে মোমেনদেরকে বিরত রাখার পেছনে দ্বিতীয় যে কারণটি আমরা সক্রিয় দেখতে পাই তা এই যে, আরবের সাধারণ সামাজিক পরিবেশে আত্মমর্যাদাবোধ,

উদারতা, মহানুভবতা ও মযলুমের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য করার মানসিকতা, এক ঘা খেয়ে পাল্টা দুই ঘা বসিয়ে দেয়ার মতো লোক যখন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান, তখনও তাদের ক্রমাগত নির্যাতন সহ্য করায় সাধারণ আরবদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারতো।

তাদের সুপ্ত মহানুভবতা ও আত্মমর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা ও তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি দরদ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। বাস্তবেও এটি সংঘটিত হয়েছিলো যখন সমগ্র কোরায়শ 'শা'বে আবু তালেব' নামক পার্বত্য উপত্যকায় বনু হাশেম গোত্রকে অন্তরীণ ও বয়কট করে রেখেছিলো, যাতে বনু হাশেম গোত্র রসূল (স.)-কে রক্ষা করার স্পৃহা ও মনোবল হারিয়ে ফেলে। বনু হাশেমের ওপর কোরায়শের এই যুলুম যখন চরম আকার ধারণ করলো, তখন কিছু লোকের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত সহানুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ উথলে উঠলো। তারা গোপনে বয়কটের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেললো। এভাবে এই সার্বজনীন সহানুভূতি বোধের প্রভাবে গোটা বয়কট প্রক্রিয়ার বিলুপ্তি ঘটলো।

বস্তুত রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাসকে যখন আমরা একটি আন্দোলনের ইতিহাস হিসাবে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের স্পষ্টত মনে হয় যে, আরব গণমানসে এই স্বভাবসুলভ সহমর্মিতা ও আত্ম মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যেই ইসলামী নেতৃত্ব মুসলমানদেরকে সশস্ত্র প্রতিরোধ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট আর একটি বিষয় এই যে, ইসলামী নেতৃত্ব তখন ঘরে ঘরে রক্তাক্ত যুদ্ধ বেধে যাক তা চায়নি। এক একজন মুসলমান তখন এক একটি পরিবারের সদস্য ছিলো। এই সকল পরিবারের লোকেরাই তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিলো এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরে আসার জন্যে চাপ দিচ্ছিলো। এই সর্বব্যাপী নির্যাতন ও নিগ্রহের জন্যে কোনো একটি একক কর্তৃপক্ষ দায়ী ছিলো না। সেদিন যদি মুসলমানদেরকে এই যুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনুমিত দেয়া হতো, তাহলে এই অনুমতির অর্থ দাঁড়াতো ঘরে ঘরে যুদ্ধ বেধে যাওয়া এবং প্রত্যেক পরিবারে রক্তপাত হওয়া।

এতে করে আরব সমাজের চোখে ইসলাম পরিবারে পরিবারে ভাংগন ধরানো ও ঘরে ঘরে যুদ্ধের আগুন জ্বালানো একটি আন্দোলন বলে পরিচিত হতো। কিন্তু হিজরতের পরে আর পরিস্থিতি সে রকম থাকেনি। তখন মুসলিম দলটি একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের আকারে মক্কায় বিদ্যমান অন্য একটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো, তার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ও আক্রমণ পরিচালনা করছিলো। মক্কায় প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ পরিবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো, এটি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতি। মুসলমানদেরকে যে মক্কায় যুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেয়া হয়নি, তার পেছনে এই কয়টি মহৎ উদ্দেশ্য আপাত দৃষ্টিতে আমাদের চোখে পড়ে।

এর সাথে এটাও যোগ করা যেতে পারে যে, মুসলমানরা সে সময় সংখ্যালঘু ছিলো এবং মক্কায় শত্রু বেষ্টিত ছিলো। সে সময় তারা যদি প্রকাশ্য সামরিক নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সংঘবদ্ধ জংগী দল হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতো এবং মোশরেকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তাহলে তাদেরকে ব্যাপক হত্যাকান্ডের শিকার হতে হতো। তাই আল্লাহর ইচ্ছা হলো যে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক এবং তারা একটি নিরাপদ ঘাঁটিতে আশ্রয় নিক।

এটি যখন সম্পন্ন হলো তখন তিনি তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন।

যাই হোক, এরপর যখন যুদ্ধের নির্দেশাবলী জারী হতে থাকে তখন পর্যায়ক্রমে এবং ইসলামী আন্দোলনের চাহিদা অনুসারে প্রথমে আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরে এবং পরে আরবের বাইরে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হতে থাকে। এখানে যে আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, তা প্রাথমিক যুগে নাযিল হওয়া আয়াত। মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সূচনাকালের পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে কিছু নির্দেশ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর বেশ কিছু নির্দেশ যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামের চিরস্থায়ী ও সাধারণ নীতিমালা হিসাবে গণ্য। সূরা তাওবায় এতে সামান্য কিছু রদবদলের ঘোষণা ছাড়া নীতিগতভাবে এর তেমন কোনো পরিবর্তন আর কখনো হয়নি।

জেহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রসংগত ইসলামের জেহাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা কথা বলা বোধহয় সমীচীন হবে। এখানে নির্দিষ্টভাবে কোরআনের উক্তিসমূহের ব্যাখ্যা দিতে যাওয়ার আগে যুদ্ধ সংক্রান্ত এই আয়াত কয়টি এবং কোরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসাবে আমার এই কথাটা যথেষ্ট ফলদায়ক প্রমাণিত হবে বলে আশা করা যায়।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ইসলাম তার মনোনীত আকিদা বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতির যে সর্বশেষ রূপটি নিয়ে এসেছে, তাকে সে পৃথিবীতে সর্বোতভাবে সমগ্র মানব জাতির অনুসৃত বিধি ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। সে চায়, মুসলিম উম্মাহ এই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী মানব জাতিকে আল্লাহর পথে টেনে নিয়ে যাক। কেননা, এই জীবন ব্যবস্থা যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে এবং তা যে মানব জাতির ও সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়, সে কথা কোরআনে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইসলামের কামনা, মুসলিম উম্মাহ মানব জাতিকে তার দেয়া সঠিক ও নির্ভেজাল কল্যাণের পথে পরিচালিত করুক।

কেননা জাহেলীয়াতের যতো বিধি ব্যবস্থা রয়েছে, তার কোনোটিতে এই সঠিক ও নির্ভেজাল কল্যাণের নিশ্চয়তা নেই। এটি এমন এক অতুলনীয় নেয়ামত, যা থেকে মানব জাতির বঞ্চিত হওয়া তার সকল কল্যাণ ও সকল সাফল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ারই শামিল। আর এই নেয়ামত থেকে তাকে যে বঞ্চিত করে, এই নেয়ামত অর্জনে তাকে যে বাঁধা দেয়, মানব জাতির জন্যে তার চেয়ে বড় শত্রু ও বড় অত্যাচারী আর কেউ নেই। কেননা মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামীন মানুষের জন্যে তার মনোনীত এই বিধানে যে উন্নতি, উৎকর্ষ, পূর্ণতা ও সুখ শান্তি নিহিত রেখেছেন, তা আর কোথাও রাখেননি।

তাই এটা মানুষের একটা অন্যতম অধিকার যে, আল্লাহর এই পূর্ণাংগ জীবন বিধানের দিকে তাকে আহবান জানানো হবে এবং আহবান জানানোর পর তাকে তা গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হবে। এটা গ্রহণে তার পথে কোনো বাঁধা আসবে না এবং কোনো শক্তি তার পথ আগলে রাখবে না। কেউ এ আহবান শোনার পর তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে চাইলে করুক। কিন্তু তাই বলে আহবানের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করার অধিকার তার নেই। বরঞ্চ এই আহবান যাতে অবাধে, নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে চালু থাকতে পারে তার নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে অংগীকারাবদ্ধ হতে হবে। আর মুসলিম দল বা সংগঠনকে এই আহবান চালু রাখতে কোনো বাধা দেয়ারও তার কোনো অধিকার নেই।

আর আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে তাঁর এই দ্বীন গ্রহণের পথে চালিত করেন, তাদের এই নিশ্চয়তা লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর তাকে তা থেকে ফেরানোর জন্যে নির্যাতন চালিয়ে বা লোভ দেখিয়ে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে না কিংবা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে না, যা মানুষকে দ্বীনের পথে চালিত হওয়া ও তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। আর মুসলিম সমাজ ও সংগঠনের কর্তব্য এই যে, তাদের ওপর কেউ নির্যাতন চালানোর ও চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করলে শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করবে। নিজেদের আকীদা বিশ্বাস, আদর্শ ও মতামতের স্বাধীনতাকে নিরাপদ করা, আল্লাহর পথ অবলম্বনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানকে চালু রাখা ও এই সর্বব্যাপী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা থেকে মানব জাতিকে মুক্ত ও রক্ষা করার স্বার্থেই এই যুলুম নির্যাতন ও প্রলোভনকে প্রতিহত করতে হবে।

দাওয়াত প্রাপ্তির অধিকার, দাওয়াত গ্রহণের অধিকার এবং দাওয়াত গ্রহণের পর গ্রহণকারীদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার– এই তিন প্রকারের অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের পর এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে মুসলিম সমাজের ওপর আরেকটি দায়িত্ব অর্পিত হয়। সেই দায়িত্ব এই যে, স্বাধীনভাবে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কার্যক্রমকে চালু রাখতে বাঁধা দেয় অথবা তা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে হুমকি দেয় এবং মানুষকে জরবদস্তি মূলকভাবে তা থেকে ফিরিয়ে রাখে এমন যে কোনো শক্তিকে চূর্ণ করা ও ধ্বংস করা চাই।

মুসলিম সমাজ ও সংগঠনের উচিত সার্বক্ষণিকভাবে এ উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত থাকা যেন পৃথিবীর কোনো শক্তিই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের ওপর যুলুম নিপীড়ন চালাতে বা লোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে বিপথগামী করতে না পারে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর একচেটিয়া ও নিরংকুশ আনুগত্য ছাড়া আর কোনো আনুগত্য অবশিষ্ট না থাকে। এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলাম গ্রহণের জন্যে বলপ্রয়োগ করতে হবে, বরং এর অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনের প্রাধান্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে কোনো ভয় ভীতি যেন তাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পাওয়া, তা গ্রহণ করা ও তার ওপর অবিচল থাকাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি যেন বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। পৃথিবীতে এমন কোনো পরিস্থিতি বা বিধি ব্যবস্থা যেন চালু থাকতে না পারে যা মানুষকে আল্লাহর নূর ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখতে এবং এদেরকে কোনো উপায়ে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

ইসলামের জেহাদ কার্যক্রম এই কয়টি সাধারণ নীতিমালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একমাত্র এইসব মহৎ উদ্দেশ্যেই তা পরিচালিত। এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং এর আর কোনো লক্ষ্য নেই।

ইসলামের জেহাদের উদ্দেশ্য কেবল তার আকীদা ও নীতিমালার সংরক্ষণ, তাকে বাধামুক্তকরন, তাকে যুলুম নিপীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তকরণ। তার আইন বিধান ও শরীয়তকে বাস্তব জীবনে নিরাপদে চালু থাকতে দেয়া এবং পৃথিবীতে তার পতাকাকে এমনভাবে উড্ডীন রাখা যেন তার ওপর আগ্রাসন চালানোর ইচ্ছা পোষণকারী আগ্রাসন চালানোর আগেই ভয় পেয়ে তা থেকে বিরত হয় এবং যে-ই ইসলামের প্রতি আগ্রহী ও আকৃষ্ট হয়, সে যেন নির্ভয়ে তার কাছে আশ্রয় নিতে পারে ও পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে বাধা দিতে না পারে।

ইসলাম যে জেহাদের আদেশ দেয় তা একমাত্র এটাই। এই জেহাদকেই ইসলাম স্বীকৃতি দেয়, এরই জন্যে সে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দেয়, যারা এটা করতে গিয়ে নিহত হয় তাদেরকে শহীদ গণ্য করে এবং যারা এর ব্যয়ভার বহন করে তাদেরকে বন্ধু ও মিত্র বলে বিবেচনা করে।

কোরায়শ বংশীয় মোশরেকদের মোকাবেলায় মুসলমানরা মদীনায় যে পরিস্থিতিতে জীবন ধারণ করছিলেন, সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতগুলোর অবতারণা। মোশরেকরা তাদেরকে তাদের জন্মভূমি ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলো, একমাত্র ইসলাম গ্রহণের দায়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলো এবং তাদের আকীদা বিশ্বাসের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিলো যাতে তারা তা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও মোমেনদেরকে তাদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে লড়াই করতে না দিয়ে সুনির্দিষ্ট আয়াতগুলোতে ইসলামী জেহাদের সেইসব নীতিমালাই তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বপ্রথমে মুসলমানদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন কেবলমাত্র সেইসব মোশরেকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে যারা তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং অব্যাহতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ আক্রমণ যে স্থানেই ঘটুক এবং যে সময়েই ঘটুক, তা যেন তারা প্রতিহত করে। তবে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করা চলবে না। ১৯০ নং আয়াতের ভাষা লক্ষ্য করুন,

‘তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায় তবে সীমালংঘন করো না। যারা সীমালংঘন করে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।’

এভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রথম আয়াতেই আমরা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাই। আর তা প্রথম বাক্যটিতেই এভাবে বলে দেয়া হয়েছে,

‘তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায়।’ অর্থাৎ এ যুদ্ধ শুধু আল্লাহর জন্যে। আবহমান কাল ধরে যুদ্ধের যেসব উদ্দেশ্যের সাথে মানব জাতি পরিচিত, তার কোনোটির জন্যেই নয়। পৃথিবীতে গৌরবের ডংকা বাজানো বা আধিপত্য ও পরাক্রম লাভের জন্যে নয়, গনীমত ও ধনসম্পদ লাভের জন্যে নয়, বাণিজ্যিক প্রসার প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ ও উপনিবেশ লাভের জন্যে নয় এবং একশ্রেণীর ওপর আর একশ্রেণীর অথবা এক জাতির ওপর আর এক জাতির প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেও নয়।

যুদ্ধের সময় মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামের কঠোর বিধান

ইসলামে যে কয়টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জেহাদের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, শুধুমাত্র সেইসব উদ্দেশ্যেই এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে। এ যুদ্ধ আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চে স্থান দেয়ার জন্যে, তাঁর বিধানকে মানব জীবনে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, মোমেনদেরকে ধর্মচ্যুত করার যে কোনো ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করার জন্যে এবং তাদেরকে গোমরাহী, নৈরাজ্য ও বিকৃতির মুখে ঠেলে দেয়ার যে কোনো চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্যে পরিচালিত ও অনুমোদিত।

এ ছাড়া আর সব রকমের যুদ্ধ ইসলামে অননুমোদিত ও অবৈধ। সেইসব অবৈধ যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ পরিচালনাকারী আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিদানও পাবে না, মর্যাদাও পাবে না।

উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার পর এর ব্যপ্তি ও সীমা চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে, ‘বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আক্রমণকারী ও যুদ্ধরত শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে যখন নিরীহ নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় ও অযোদ্ধা জনতার ওপরও আক্রমণ পরিচালনা করা হয়, তখন সেটাই হয় বাড়াবাড়ি। নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং নিভৃতে উপাসনা ও তপস্যায় লিপ্ত যে

কোনো ধর্মের ব্যক্তিবর্গ যারা ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম সমাজের জন্যে বিপজ্জনক নয়, তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও বাড়াবাড়ির শামিল।

অনুরূপভাবে ইসলাম যুদ্ধের যে সব শালীন ও সুসভ্য রীতিনীতি প্রবর্তন করেছে, যে সব রীতিনীতি দ্বারা সে আধুনিক ও আদিম জাহেলীয়াতের পৈশাচিক হিংস্রতা ও নৃশংসতার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে, যুদ্ধের ঘৃণ্য ও তাকওয়া বিরোধী কর্মকান্ড বিলোপ করতে চেয়েছে, সেইসব রীতিনীতি লংঘন করাও বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত।

যুদ্ধের এইসব শালীন ও সুসভ্য রীতিনীতির সাথে মানবজাতি সর্বপ্রথম ইসলামেরই কল্যাণে ও অনুগ্রহে পরিচিত হতে পেরেছে। তার ধরন ও প্রকৃতি বহুসংখ্যক হাদীস ও সাহাবীদের বাণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। এ ধরনের কতিপয় হাদীস ও সাহাবীদের উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো,

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত কোনো এক যুদ্ধে জনৈকা নিহত মহিলার লাশ পাওয়া গেলো। তা দেখে রসূল (স.) সবাইকে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন (মোয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে সে যেন মুখমন্ডলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার রসূল (স.) আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠানোর সময় বললেন, অমুক অমুক ব্যক্তিকে (কোরায়শ বংশীয় দু'জন) যদি পাও, তবে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিও।

তারপর যখন আমরা রওনা হতে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। কাজেই তোমরা এ দুইজনকে পেলে হত্যা করে ফেলো।' (বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (স.) বলেছেন, যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছে, তারা হত্যা থেকে নিরাপত্তা লাভের সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আনসারী বর্ণনা করেন যে রসূল (স.) যুদ্ধের সময় শত্রুর ফেলে যাওয়া সম্পদ লুটপাট করতে এবং শত্রুর লাশকে ক্ষত বিক্ষত ও মুখ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। (বোখারী)

হযরত আবু ইয়া'লা বলেন, আমরা খালেদ বিন ওলীদের ছেলে আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের কাছে শত্রুপক্ষীয় চারজন নাস্তিক লোককে আনা হলো। আব্দুর রহমান তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। অতপর তাদেরকে ভোতা বর্শা দিয়ে হত্যা করা হলো। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী এ ঘটনার খবর জানতে পেরে বললেন, রসূল (স.) কাউকে ভোতা অস্ত্র দিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ আমি নিজেই শুনেছি। সেই আল্লাহর কসম। যার হাতে আমার প্রাণ, (মানুষ তো দূরের কথা) একটা মুরগী হলেও আমি তাকে ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে হত্যা করতাম না। আব্দুর রহমান এ কথা শুনে চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন। (ভোতা অস্ত্র দিয়ে বা তরবারীর অধারালো অংশ দিয়ে হত্যা করায় বিলম্বে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটে। আর আব্দুর রহমান যে চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করলেন, এটা ছিলো নিষিদ্ধ পন্থায় হত্যাকান্ডের কাফফারা)

হযরত হারেস বিন মুসলিম (রা.) জানান যে, একবার রসূল (স.) আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে পাঠালেন। যখন আমরা আক্রমণ পরিচালনার জায়গায় পৌঁছলাম, তখন আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে আমার সংগীদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। শত্রু জনপদের লোকেরা ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা কালেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করো। তাহলে তোমাদের জানমাল রক্ষা পাবে। তারা কালেমা পড়লো। তখন আমার সাথীরা আমাকে ভর্ৎসনা করলো যে, তুমি আমাদেরকে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে বঞ্চিত করেছো।

এরপর রসূল (স.)-এর কাছে ফিরে আসার পর আমার সাথীরা তাঁকে আমার কাজটির কথা জানালো। রসূল (স.) তা শুনে আমাকে ডাকলেন এবং আমি যা করেছি তার প্রশংসা করে বললেন, তুমি যাদেরকে বাঁচিয়েছো, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি বাবদ তোমার জন্যে আল্লাহ পুরস্কার বরাদ্দ করেছেন। (আবু দাউদ)

হযরত বারীদা (রা.) বলেন, 'যখনই রসূল (স.) কাউকে সেনাপতি নিয়োগ করতেন, তাকে উপদেশ দিতেন যেন তিনি আল্লাহকে ভয় করে চলেন এবং তার সহযোগী মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। তারপর তাকে বলতেন, আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পথে অভিযানে রওনা হও, যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে তাদের সাথে লড়াই করো, যুদ্ধ করো, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজী করো না, মৃতের লাশকে বিকৃত করো না এবং শিশুকে হত্যা করো না।' (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত ইমাম মালেক বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তার সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিতেন, 'তোমরা এমন একশ্রেণীর লোকের সাক্ষাত পাবে যারা দাবী করে যে, তারা আল্লাহর জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। তাদেরকে বলতে দাও। আসলে তারা আল্লাহর জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেনি। তোমরা কোনো নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করো না।'

এ হচ্ছে ইসলামের অনুমোদিত যুদ্ধের স্বরূপ এবং তার আচরণ রীতি। এ কয়টি হাদীস থেকে ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্যও অবগত হওয়া যাচ্ছে। আর এইসব রীতিনীতি ও উদ্দেশ্য উপরোক্ত ১৯০ নং আয়াত থেকেই পরিস্ফুট হয়েছে।

মুসলমানরা জানতো যে, তারা তাদের লোকবল দ্বারা জিততে পারবে না। কেননা তাদের লোকসংখ্যা কম। তারা এও জানতো যে, তারা তাদের উপায় উপকরণ ও সাজ সরঞ্জামের জোরেও জিততে পারবে না। কেননা তাদের কাছে এ সব জিনিস তাদের শত্রুদের তুলনায় অনেক কম। তারা শুধু তাদের ঈমান, আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য ও আল্লাহর সাহায্যের বলেই জিততে পারে।

যখন তারা আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের নির্দেশের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হবে, তখন তাদের বিজয়ের একমাত্র উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত হবে, এ জন্যে ইসলাম যুদ্ধের যেসব শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিয়েছে, তাকে মুসলমানরা তাদের সেইসব শত্রুর বেলায়ও মেনে চলেছে, যারা এক সময় বাগে পেয়ে তাদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে এবং শহীদ মুসলমানদের লাশকেও চরম পৈশাচিকভাবে বিকৃত করেছে।

এ সব তিক্ত স্মৃতির প্রভাবে রসূল (স.) ক্রোধে অধীর হয়ে দু'জন কোরায়শীকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েও পরক্ষণেই তা প্রত্যাহার করেছেন এবং আগুন দিয়ে পোড়াতে নিষেধ করেছেন। কেননা আগুন দিয়ে পোড়ানো একমাত্র আল্লাহর কাজ।

জেহাদ সম্পর্কিত কিছু কঠোর নির্দেশ

পরবর্তী আয়াতে যারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্যে নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে জোরদার আদেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, একমাত্র 'মাসজিদুল হারাম' ছাড়া আর যেখানে যে অবস্থায় তাদেরকে পাও হত্যা করো। তবে মাসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে যদি কাফেররা প্রথম আক্রমণ চালায়, তবে সেখানেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি তারা ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে মুসলমানদেরকে তাদের ওপর আক্রমণ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে – ইতিপূর্বে তারা যতই অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে থাক না কেন।

১৯১ ও ১৯২ নং আয়াত দুটি লক্ষ্য করুন,

'ওদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছিলো সেখান থেকে তাদেরকেও বহিষ্কার করো। আর অরাজকতা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। মাসজিদুল হারামের কাছে তাদের ওপর আক্রমণ চালিওনা যতক্ষণ তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ না চালায়। তারা যদি আক্রমণ চালায় তবে তাদেরকে হত্যা করো। কাফেরদের শাস্তি এ রকমই। তবে তারা যদি সংযত হয় তাহলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াশীল।'

মানুষকে ধর্ম পালনে বা গ্রহণে বাঁধা দেয়া বা তা থেকে ফিরিয়ে রাখা মানব জীবনের সবচেয়ে পবিত্র অধিকারের ওপর আক্রমণ চালানোর শামিল। তাই এটি হত্যাকান্ডের চেয়েও গুরুতর অপরাধ। এই বাধা দান ও ফিরিয়ে রাখার কাজটি সক্রিয়ভাবে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি দান ও নির্যাতনের মাধ্যমেই হোক অথবা এমন অরাজক ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমেই হোক যা সৎ মানুষকে বিপথে চালিত করে, অসৎ ও দুর্নীতি পরায়ন করে, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর বিধানকে প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা করাকে ভালো কাজ বলে ভাবতে শেখায়।

এ ধরনের পরিস্থিতির সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা যা ধর্মীয় শিক্ষাকে নিষিদ্ধ, নাস্তিকতার শিক্ষাকে বৈধ, ব্যাভচার ও মদ্যপানের ন্যায় অনৈসলামিক ও হারাম কাজগুলোকে চালু এবং যাবতীয় প্রচার ও নির্দেশনার মাধ্যমকে ব্যবহার করে এগুলোকে জনসাধারণের চোখে সংগত ও শোভন কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহর বিধানে যেসব জিনিস ভালো ও ন্যায়সংগত, সেগুলোকে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা খারাপ জিনিস হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এই পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে বহু অনুমানসর্বস্ব জিনিসকে এমন অপরিহার্য বানিয়ে দাঁড় করায়, যা থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

আকীদা বিশ্বাস ও মতামতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামের এই দৃষ্টিভংগী এবং তাকে মানব জীবনে এরূপ সর্বোচ্চ মর্যাদা দান ইসলামের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে যে মত পোষণ করে তার সাথে সংগতিপূর্ণ। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য। (বস্তুত আল্লাহর আনুগত্য সূচক প্রতিটি তৎপরতাই এবাদাতের শামিল।) আর মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার বিশ্বাস ও মতামতের স্বাধীনতা। তাই যে ব্যক্তি তার এই স্বাধীনতাকে হরণ করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে তার মনগড়া ধর্ম গ্রহণ বা পালনে বাধা দেয়, সে তার ওপর এমন আঘাত হানে, যা তার প্রাণ সংহারকারীর আঘাতের চেয়েও নৃশংসতর

এজন্যে ইসলাম হত্যার মাধ্যমেই এ অপরাধ প্রতিহত করার বিধান জারী করেছে। কোরআন এ কথা বলেনি যে, 'তাদের সাথে যুদ্ধ করো।' সে বলেছে, 'তাদের হত্যা করো।' সে বলেছে, 'তাদের যেখানেই পাও হত্যা করো।' অর্থাৎ যেখানে যে অবস্থায় পাও, যেভাবে পারো তাদেরকে হত্যা করো। অবশ্য ইসলামী শিষ্টাচার মেনে তাদেরকে আগুন দিয়ে পোড়ানো বা লাশ বিকৃত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

'মাসজিদুল হারামে' তথা পবিত্র কাবার চত্বরে যুদ্ধ বিগ্রহ ও খুনখারাবীর অনুমতি নেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া কবুল করে এ জায়গাটিকে ও এর সন্নিহিত এলাকাকে নিরাপদ ঘোষণা করেছেন এবং এখানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। একমাত্র সেইসব কাফের এই নিরাপত্তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, যারা এই স্থানের পবিত্রতা লংঘন করে এবং এখানে এসে মুসলমানদের ওপর প্রথম আক্রমণ চালায়। এরূপ অবস্থায় মুসলমানরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই ওই কাফেরদের সমুচিত শাস্তি। কেননা তারা যুগ যুগ ধরে এই পবিত্র ঘরের প্রতিবেশী হিসাবে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করেও এর পবিত্রতার প্রতি সম্মান দেখায়নি এবং মানুষকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে।

'তবে যদি তারা সংযত হয় তবে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া লাভের যোগ্যতা সৃষ্টিকারী এই সংযম হচ্ছে পুরোপুরি কুফরি থেকে বিরত হওয়া-কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ 'আগ্রাসন বা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা থেকে বিরত হওয়া নয়। কেননা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন বন্ধ করলে বড়জোর মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি করবে, কিন্তু তাতে তারা আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া লাভের যোগ্য হবে না। তাই এখানে ক্ষমা ও দয়ার উল্লেখ করে প্রকৃত পক্ষে কাফেরদেরকে ঈমান আনতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে তারা কুফুরী ও আগ্রাসী নীতি উভয়টি ত্যাগ করে ক্ষমা ও দয়া অর্জন করে।

যে কাফেররা একদিন মুসলমানদের ওপর হত্যা ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়েছিলো এবং অবর্ণনীয় নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার তান্ডব সৃষ্টি করেছিলো, তারা শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেই সকল মৃত্যুদন্ড ও অর্থদন্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এটা যে ইসলামের কত বড় মহানুভবতা, তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

যে যুদ্ধের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষকে বল প্রয়োগে অথবা বল প্রয়োগ সদৃশ পারিপার্শিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখা হবে না এবং তাদেরকে বিপথগামী অসৎ দুর্নীতিপরায়ন ও চরিত্রহীন বানাতে পারে এমন প্রলুব্ধকারী ও বিভ্রান্তিকর উপকরণসমূহ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে না এটা নিশ্চিত করা। এটা এভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে যে, আল্লাহর দ্বীনকে ও তার সমর্থকদেরকে এতটা শক্তিশালী ও প্রতাপশালী বানিয়ে দেয়া হবে যে, ইসলামের শত্রুরা তার ক্ষতি সাধন করতে এবং জনগণের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে ভয় পায়। আর ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক কোনো মানুষ এই আশংকায় তা থেকে বিরত থাকবে না যে, কোনো শক্তি তাকে বাধা দিতে পারে কিংবা তার ওপর যুলুম ও নির্যাতন চালানো হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হলে মুসলিম জাতিকে এ ধরনের আগ্রাসী যালেম শক্তিগুলোকে খতম করা ও আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করার সংকল্প নিয়ে অক্লান্তভাবে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

অবিরাম যুদ্ধ

অতপর ১৯৩ নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

'তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও, যখন আর কোনো বাধা বিপত্তি অবশিষ্ট থাকবে না এবং আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে তারা যদি নিরস্ত্র হয়, তবে তাদের সাথে আর কোনো শত্রুতা থাকবে না, অবশ্য যালেমদের কথা ভিন্ন।' এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় আরব উপদ্বীপে একমাত্র মোশরেকরাই ছিলো সেই শক্তি, যা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিচ্ছিলো, ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগের প্ররোচনা দিচ্ছিলো এবং আল্লাহর দ্বীনের নিরংকুশ আধিপত্য ও বিজয়ের পথ রোধ করছিলো।

কিন্তু স্থান ও কালের বিচারে এ আয়াতের বক্তব্য আরব উপদ্বীপের তৎকালীন মোশরেকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল জায়গার ও সর্ব যুগের এরূপ প্রতিবন্ধক শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা এমন যালেম শক্তির উদ্ভব প্রতিদিনই হচ্ছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, আল্লাহর পথের আহবানে সাড়া দিতে আগ্রহী হলে তা গ্রহণে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তা মেনে চলতে দিচ্ছে না। মুসলিম জাতির ওপর এ দায়িত্ব চিরদিনই ন্যস্ত রয়েছে যে, এ ধরনের যালেম শক্তিকে যেন তারা ধ্বংস করে দেয়, তাদের গোলামী থেকে যেন জনগণকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর দাওয়াত তারা যেন শুনতে ও স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে।

ফেতনা তথা ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকানোর যে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা তথা চক্রান্ত, সন্ত্রাস, গোলযোগকে হত্যার চেয়েও গুরুতর আখ্যা দেয়ার পর তার উচ্ছেদ সাধন ও প্রতিহত করনের এই পুনরুল্লেখ ও পুনরুক্তি থেকে বুঝা যায় ইসলাম এ বিষয়টিকে কত গুরুত্ব দেয়। সে এই মর্মে একটি মহান মতবাদ তুলে ধরে যে, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আসলে মানুষের পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়। এই পুনর্জন্ম বা নবজন্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মূল্য তার আকীদা ও বিশ্বাসের মূল্য অনুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এক পাল্লায় তার জীবন ও অপর পাল্লায় তার আকীদা বিশ্বাসকে রাখা হলে আকীদার পাল্লাই ভারী হয়। এই মতবাদে 'মানুষের" শত্রু কারা তাও নির্ণিত হয়ে যায়।

মানুষের প্রকৃত শত্রু হচ্ছে তারা যারা কোনো মোমেনকে তার ধর্ম থেকে ফেরানোর অপচেষ্টা চালায় এবং কোনো মুসলমানকে নিছক ইসলাম গ্রহণ বা পালনের দায়ে নির্যাতন করে। তারাই মানব জাতিকে তার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠতম উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে এবং তার আল্লাহর দ্বীন গ্রহণের পথ অবরোধ করে। মানবতার এই দুশমনদেরকে প্রতিহত করা ও হত্যা করা মুসলিম জাতির কর্তব্য যাতে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ী হওয়ার পথে আর কোনো বাধা বিপত্তি অবশিষ্ট না থাকে।

বস্তুত কোরআন অবতরণের সূচনাকাল থেকেই যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের এই নীতি চালু রয়েছে এবং তা কার্যকর রয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে আক্রমণ ও নির্যাতন পরিচালনাকারীদের আচরণ নানারকমের হয়ে থাকে। আর মোমেনরা এই নির্যাতন ও যুলুম কখনো ভোগ করে ব্যক্তিগতভাবে, কখনো দলগতভাবে আবার কখনো জাতিগতভাবে, তবে যে যেভাবেই নির্যাতনের সম্মুখীন হোক না কেন, নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা ও তাকে খতম করা তার কর্তব্য। এভাবেই ইসলামের এই সুমহান নীতিকে সে বাস্তবায়িত করবে। আর এটা হচ্ছে মানুষের নতুন জন্মের শামিল।

কিন্তু যখনই যালেমরা যুলুম ও নির্যাতন থেকে বিরত হবে এবং মানুষকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণের পথে বাধা দেয়া বন্ধ করবে, তখন আর তাদের সাথে শত্রুতা থাকবে না। কেননা যুলুম ও যালেমকে প্রতিহত করাই জেহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এটাই ১৯৩ নং আয়াতের মর্ম। এখানে যালেমকে প্রতিহত করার সংগ্রামকে 'উদওয়ান' তথা শত্রুতা ও আক্রমণ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে নিছক শাব্দিক সাদৃশ্যের কারণে। নচেৎ এটা আসলে সুবিচার ও মযলুমদের ওপর যুলুমের প্রতিকার।(১)

পবিত্র মাসে যুদ্ধের বিধান

ইতিপূর্বে যেমন মাসজিদুল হারামের কাছে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি ১৯৪ নং আয়াতে জানানো হচ্ছে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিধান,

'পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র জিনিস যার অবমাননা নিষিদ্ধ, তার অবমাননায় সমান প্রতিশোধ। সুতরাং যে কেউ তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে, তোমরাও তার ওপর অনুরূপ আক্রমণ চালাও। তবে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ সংযমী লোকদের সাথে থাকেন।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা লংঘন করে, তার শাস্তি এই যে, নিষিদ্ধ মাস তাকে যে নিরাপত্তা দিতো, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। স্থানের দিক দিয়ে পবিত্র গৃহ মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার মরুদ্যান বানিয়েছেন, তেমনি কালের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে বানিয়েছেন শান্তি ও নিরাপত্তার মরুদ্যান। উল্লেখিত স্থানে ও সময়ে সকলের রক্ত, সম্পদ ও সম্ভ্রম সংরক্ষিত হবে। কোনো প্রাণীকে ওই সময়ে ও স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা যাবে না। যে ব্যক্তি এই মরুদ্যানে আশ্রয় নিতে ও এর রক্ষাকবচ নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ ও গ্রহণ করতে চায় না এবং মুসলমানদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তার শাস্তি এই যে, স্বয়ং তাকেও তা থেকে বঞ্চিত করা হবে। যে ব্যক্তি অন্যের জানমাল ও সম্ভ্রমে পবিত্রতা ও নিরাপত্তা লংঘন করে, তারও জানমাল ও সম্ভ্রমের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে না।

বস্তুত সকল পবিত্রতা ও নিরাপত্তার লংঘন সমভাবে শাস্তিযোগ্য ও প্রতিশোধযোগ্য। তবে এই শাস্তি ও প্রতিশোধের বিধান মুসলমানদের জন্যে কঠোরভাবে সীমিত। তারা কখনো এই সীমা লংঘন করবে না এবং অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া ও সমপরিমাণের অতিরিক্ত বিন্দুমাত্রও কারো জানমাল ও সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধন করবে না।

'সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে, তোমরাও তার ওপর আক্রমণ চালাও।'

এখানে কিছুমাত্র সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা চলবে না। মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে তাকওয়া তথা কঠোর সতর্কতা ও সংযমের নীতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। তারা তো আগে থেকেই জানে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বিজয় লাভ করতে পারবে না। তাই এখানে তাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়ার পর স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তাকওয়া

(১) অবশ্য পরবর্তীকালে সূরা তাওবায় এই উদার নীতির সংশোধন পূর্বক এই মর্মে আদেশ নাযিল হয় যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সকল মোশরেক ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হবে। বহির্বিশ্বে রোম ও পারস্যের শত্রু পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় যাতে আরবের অভ্যন্তরে একটিও শত্রু না থাকে এবং সমগ্র উপদ্বীপে কেবলমাত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয় সে জন্যে এ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে সংশোধনী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো।

অবলম্বনকারীদের সাথেই থাকেন। আর আল্লাহ তায়ালা যাদের সাথে থাকেন তাদের বিজয়ের যে পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই 'আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন' এ কথাটার মধ্যেই সকল প্রত্যাশা পুরণের পূর্ণ নিশ্চয়তা ও আশ্বাস রয়েছে।

আল্লাহর পথে ব্যয়

জেহাদে যেমন জনবলের প্রয়োজন থাকে, তেমনি ধনবলেরও প্রয়োজন থাকে। জেহাদের সংকল্প গ্রহণকারী মুসলমান মাত্রেই যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও রসদপত্র সংগ্রহ করে নিজেকে নিজেই প্রস্তুত করে নিতো। সেখানে সৈনিক ও সেনাপতিরা কোনো বেতন নিতেন না। তারা স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে জানমাল দিয়ে লড়তেন। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যখন একটি কার্যকর ও সুশৃংখল সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তখনই এরূপ স্বতস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবকদের বাহিনী তৈরী হয়। ইসলামী রাষ্ট্রকে এখন আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুশমনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে তার নিজস্ব কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় করে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসে।

তবে এ কথাও সত্য যে, বেশ কিছু দরিদ্র মুসলমান এমনও ছিলো, যারা জেহাদে আগ্রহী ছিলো এবং আল্লাহর বিধান ও ইসলামের পতাকাকে শত্রুর ছোবলমুক্ত করার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রামে ইচ্ছুক ছিলো, অথচ তাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, অস্ত্র ও বাহন ইত্যাদি ছিলো না এবং তা সংগ্রহের সামর্থও ছিলো না। তারা রসূল (স.)-এর কাছে এসে দূরবর্তী রণাংগনে পৌঁছার বাহন চাইতো। কেননা সেখানে হেঁটে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। রসূল (স.) যখন তা দিতে অক্ষম হতেন তখন পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে, তারা নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে ফিরে যেত। কেননা তাদের অর্থ ব্যয় করে প্রয়োজনীয় বাহন সংগ্রহ করার সামর্থ ছিলো না।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোরআন হাদীসে আল্লাহর পথে দান করার বহুসংখ্যক নির্দেশ এসেছে। যাতে যোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত করার ব্যয় নির্বাহ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেহাদের আহবানের সাথে সাথেই আর্থিক দানেরও আহবান জানানো হয়েছে। এমনকি আল্লাহর পথে ব্যয়ে কার্পণ্য করাকে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার শামিল বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫ নং আয়াত লক্ষ্য করুন,

'আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। সৎকাজ করো। আল্লাহ তায়ালা সৎ কর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।'

বস্তুত আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় থেকে বিরত থাকা হচ্ছে কার্পণ্যের দ্বারা নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর। অনুরূপভাবে, এটা সমাজকে অর্থনৈতিক ঘাটতির মধ্যে নিক্ষেপ ও সঠিকভাবে দুর্বল করার শামিল। বিশেষভাবে যে ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান ও ত্যাগ কোরবানীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার বেলায় কথা আরো বেশী করে প্রযোজ্য।

এরপর আয়াতের শেষাংশে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে জেহাদ ও অর্থ ব্যয়ের পর্যায় থেকে উন্নীত করে এহসান এর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমরা 'এহসান' বা সৎ কাজ করো। আল্লাহ সৎ কর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।'

এহসান ইসলামে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী একটি গুণ। রসূল (স.) এহসানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদাত করবে যেন তাকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি তাঁকে তুমি দেখতে না পাও, তবে অন্তত এতটুকু মনে রাখো যে তোমাকে তিনি অবশ্যই দেখতে পান।'

মানুষের মন যখন এ পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন সে স্বতস্ফূর্তভাবে যাবতীয় এবাদাতে নিয়োজিত হয়, সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকে, ছোট ও বড় সকল কাজে এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে দেখতে পায়।

এই উক্তিটির মধ্যদিয়ে আল্লাহর পথে সশস্ত্র জেহাদ ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনার সমাপ্তি টানার অর্থ স্পষ্টত এটাই দাঁড়ায় যে, জেহাদের ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের মনকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর 'ইহসানে' উন্নীত করতে চান।

হজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত আলোচনা

এই আলোচনার পর হজ্জ, ওমরা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। প্রথমে চন্দ্রমাসসমূহ সম্পর্কে , এই চন্দ্রমাসগুলো যে মানুষের জন্যে ও হজ্জের জন্যে সময় নির্দেশক, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। তারপর আলোচনা করা হয়েছে নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ বিগ্রহ ও মাসজিদুল হারাম সম্পর্কে। আর সর্বশেষে আলোচনা এসেছে হজ্জ ওমরা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে। সুতরাং এ বিষয়গুলোর ভেতরে একটা সুসমন্বিত ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট।

১৯৬ নং আয়াত থেকে ১০৩ নং আয়াত লক্ষ্য করুন।

হজ্জ সংক্রান্ত এই আয়াতগুলো কবে নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য নেই। কেবল একটি মাত্র রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হজ্জে যাওয়ার পথে কোনো বাধা পেয়ে হজ্জে যেতে অসমর্থ হলে সহজলভ্য জন্তু কোরবানী দেয়ার বিধান সম্বলিত ১৯৬ নং আয়াতটি নাযিল হয় ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়াবিয়া নামক স্থানে। অনুরূপ হজ্জ ফরয হওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখও আমাদের জানা নেই, চাই তা সূরা বাকারার আলোচ্য ১৯৬ নং আয়াত দ্বারাই ফরয হোক কিংবা সূরা আলে-ইমরানের ৯৪ নং আয়াত দ্বারা।

এ দুই আয়াতের কোনোটিরই নাযিল হওয়ার সময় সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। 'যাদুল মায়া'দ' নামক গ্রন্থে ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেছেন যে, ৯ম কিংবা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছিলো। তিনি যুক্তি দেন যে, রসূল (স.) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং সেটা তিনি হজ্জ ফরয হবার পরই করে থাকবেন, চাই তা ওই বছরেই হয়ে থাক কিংবা পূর্ববর্তী বছরে। কিন্তু এটা তেমন সবল যুক্তি নয়। কেননা রসূল (স.) অন্য কোনো কারণেও ১০ম হিজরী পর্যন্ত হজ্জকে মুলতবী করতে পারেন।

বিশেষত যখন আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ৯ম হিজরীতে হযরত আবু বকর (স.)-কে হজ্জের আমীর নিয়োগ করে পাঠান, তখন এ যুক্তি মোটেই ধোপে টেকে বলে মনে হয় না। হাদীস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, রসূল (স.) তবুক অভিযান থেকে ফেরার পর হজ্জ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়লো যে, মোশরেকেরা চিরাচরিত নিয়মে হজ্জে যোগদান করে থাকে এবং তাদের অনেকে নগ্ন হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে অভ্যস্ত।

তাই তাদের সাথে একত্রে হজ্জ করা তিনি পছন্দ করলেন না, এই সময় সূরা তাওবা নাযিল হলো। রসূল (স.) সূরা তাওবার বক্তব্য অনুসারে হযরত আলী (রা.)-কে মক্কায় পাঠিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, মোশরেকদের সাথে সমঝোতা ও সহাবস্থানের সমাপ্তি ঘটেছে। কোরবানীর দিন লোকেরা মিনায় সমবেত হলে হযরত আলী সেখানে ঘোষণা করলেন যে,

'কাফেররা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং এ বছরের পর আর কোনো মোশরেক হজ্জ করার এবং নগ্নাবস্থায় কেউ কাবা শরীফের তওয়াফ করার সুযোগ পাবে না। আর যার সাথে রসূল (স.)-এর কোনো চুক্তি আছে, তার সাথে তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করবেন।'

সুতরাং তিনি পবিত্র কাবা শরীফ মোশরেক ও নগ্ন তওয়াফকারীদের কবল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হজ্জ স্থগিত রাখলেন।

আরো একটা যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, হজ্জ ফরয হওয়া ও হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের নির্দেশ ইসলাম ইতিপূর্বেই দিয়েছিলো। তাছাড়া হজ্জ যে একটা ফরয কাজ, তা হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাকালেই জানানো হয়েছিলো। তবে এই উক্তির সপক্ষে তেমন কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মক্কী সূরা 'হজ্জের' কিছুসংখ্যক আয়াতে হজ্জের অধিকাংশ করণীয় কাজের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, ইবরাহীম (আ.)-কে এ সব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। ওই সূরার ২৬ থেকে ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'স্মরণ করো সেই সময়টিকে, যখন আমি ইবরাহীমকে এই ঘরের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম (এই নির্দেশ সহকারে যে) আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না, আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও রুকু সেজদাকারী লোকদের জন্যে পবিত্র রাখো। লোকদেরকে হজ্জ করার জন্যে আহবান জানাও, তারা তোমার কাছে সকল দূরবর্তী স্থান থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে, যাতে তাদের জন্যে এখানে রক্ষিত সুবিধাসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সেই জন্তু জানোয়ারের ওপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন, তা তারা নিজেরাও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরকেও দেবে। পরে তারা নিজেদের ময়লা কালিমা দূর করবে। নিজেদের মান্নতসমূহ পূরণ করবে এবং প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে।'

অতপর ৩২ নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

'এটাই হচ্ছে আসল হজ্জ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তার সে কাজ অন্তরের তাকওয়ার আওতাভুক্ত।'

অতপর ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'কোরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের জন্যে তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। কাজেই ওইগুলোকে দাঁড় করিয়ে ঐগুলোর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আর (কোরবানীর পর) যখন তাদের পিঠগুলো মাটির ওপর স্থির হয়, তখন তা থেকে নিজেরাও খাও, আর যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে চুপচাপ আছে এবং যারা এসে নিজেদের অভাবের কথা ব্যক্ত করে, তাদেরকেও খাওয়াও। তোমরা যাতে শোকর আদায় করো, সে জন্যে এই জন্তুগুলোকে আমি এভাবে তোমাদের জন্যে অনুগত করে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে ওইসব জন্তুর গোশতও পৌঁছে না, রক্তও পৌঁছে না, কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছে। তোমরা যাতে তাঁর হেদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারো। সে জন্যে তিনি এভাবে ওই জন্তুগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আর তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।'

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে কোথাও সরাসরিভাবে এবং কোথাও ইংগিতে হজ্জের কয়েকটি মৌলিক কাজ ও আচার অনুষ্ঠান যথা কোরবানী, তওয়াফ, এহরাম থেকে মুক্ত হওয়া ও আল্লাহর নাম স্মরণ করা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনার মাধ্যমে এখানে প্রকারান্তরে মুসলিম উম্মাহকেই সম্বোধন করা হয়েছে। মুসলমানরা যেহেতু হযরত ইবরাহীমের সন্তান এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) হজ্জের এই সব আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, তাই এ বর্ণনা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, হজ্জ অনেক

আগে থেকেই মুসলমানদের ওপর ফরয হয়ে আছে। কিন্তু কাবা শরীফের যাবতীয় কর্তৃত্ব মোশরেকদের হাতে থাকায় এবং সেই মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের বনিবনা না থাকায় এ যাবত মুসমানদের পক্ষে হজ্জ পালন করা সম্ভব ছিলো না। এটা একটা ভিন্ন যুক্তি বটে।

ইতিপূর্বে এই পারার শুরুতে আমি এ কথা বলে এসেছি যে, দ্বিতীয় হিজরীতে কেবলা পরিবর্তনের পর কিছু কিছু মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে হজ্জ আদায় করতেন। যাই হোক, হজ্জ ফরয হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হলো হজ্জ সংক্রান্ত আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে এটুকুই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।

এবার ১৯৬ নং আয়াত লক্ষ্য করুন। এতে বলা হয়েছে,

'তোমরা হজ্জ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণ করো। তবে কোথাও যদি অবরুদ্ধ হয়ে যাও, তবে যে কোরবানীই সম্ভব, তাই পেশ করে দাও। আর যতক্ষণ কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে না যায়, ততক্ষণ নিজের মাথাকামিওনা। কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন হয়ে পড়ে, অথবা তার মাথায় কোনো ব্যাধি হয়, (এবং সে জন্যে মাথা কামিয়ে ফেলে) তার ফিদিয়া হিসাবে রোযা রাখা, সদকা দেয়া অথবা কোরবানী করা কর্তব্য। এরপর যদি শান্তি ফিরে আসে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় (এবং তোমরা হজ্জের আগেই মক্কায় পৌঁছে যাও) তবে তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত ওমরার সুযোগ গ্রহণ করবে, সে যেন সমর্থ অনুসারে কোরবানী দেয়। আর তা সম্ভব না হলে সে যেন তিনটি রোযা হজ্জের সময়ে এবং সাতটি বাড়ী ফেরার পর রাখে। এভাবে মোট দশটি রোযা পূর্ণ হবে। যাদের ঘরবাড়ি মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী নয় তাদের জন্যে এই সুবিধা। আল্লাহর এই আদেশসমূহ সম্পর্কে সতর্ক থাকো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।'

এ আয়াতের বর্ণনাভংগীতে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাহলো আইনগত বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের নৈপুণ্য ও সুক্ষ্মতা, আয়াতটিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্তকরণ এবং প্রত্যেক অংশে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট বর্ণনা এবং প্রত্যেক বিধির শেষে তার ব্যতিক্রমের উল্লেখ করার পরই পরবর্তী বিধি বর্ণনা করা, আর সবার শেষে এই সবকয়টি বিষয়কে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার সাথে সংযুক্ত করা।

আয়াতের প্রথম অংশটিতে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্জ ও ওমরা আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি যখন তার কাংখিত কাজ শুরু করবে, তখন হজ্জ বা ওমরা যেটি দিয়েই সে শুরু করুক না কেন, উভয়টি যেন সম্পূর্ণ করে এবং তা যেন একাগ্রভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করে। এই অংশটি হলো,

'হজ্জ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণ করো।'

কোনো কোনো তাফসীরকার এই আদেশ থেকে বুঝেছেন যে, এ দ্বারা হজ্জ ফরয করা হয়েছে। আবার অন্যদের মত এই যে, হজ্জ যখনই শুরু করা হোক না কেন, পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে হবে এটাই এ আদেশের মর্ম ও লক্ষ্য। শেষোক্ত মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ওমরা সর্বসম্মতভাবেই ফরয নয়, তথাপি এখানে তা হজ্জের মতোই পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই উক্তি দ্বারা হজ্জ ফরয করা উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্পূর্ণ করার আদেশ দেয়াই উদ্দেশ্য।

আরেকটি বিষয়ও এখান থেকে জানা যায় যে, ওমরা প্রাথমিকভাবে আবশ্যিক কাজ না হলেও একবার তা শুরু করা হলে শেষ করা ওয়াজেব। আর একমাত্র আরাফার ময়দানে অবস্থান ছাড়া ওমরার যাবতীয় কার্যকলাপ হজ্জের মতোই। সর্বাধিক প্রচলিত মতানুসারে ওমরা সারা বছর করা যায়। এর জন্যে হজ্জের মতো নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস জরুরী নয়।

হজ্জ ও ওমরাকে পরিপূর্ণভাবে সমাধা করার এই সাধারণ নির্দেশের একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে অবরোধমূলক অবস্থা। কোনো শত্রু হজ্জ ও ওমরা আদায়কারীকে তার সকল আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সুযোগ না দিলে সেটি সর্বসম্মতভাবে অবরোধমূলক পরিস্থিতি বিবেচিত হবে। আর কোনো রোগব্যাধি বা অনুরূপ কোনো বাধার কারণে হজ্জ ও ওমরার কাজ পূর্ণরূপে সমাধা করা অসম্ভব হলে তাও অবরোধ বলে গণ্য হবে। রোগজনিত অবরোধের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মত এই যে, রোগজনিত অবরোধকে অবরোধ বলে গণ্য করা হবে।

'তবে কোথাও যদি অবরুদ্ধ হয়ে যাও, তাহলে যে কোরবানীই সম্ভব পেশ করে দাও।' এরূপ পরিস্থিতিতে হজ্জ বা ওমরাকারী তার পক্ষে যে কোরবানীই করা সম্ভব হয় করে দেবে এবং যেখানে সে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে সেখানেই এহরাম থেকে মুক্ত হবে। চাই সে আদৌ মাসজিদুল হারামে পৌঁছতে না পেরে থাকুক কিংবা মীকাতে এহরাম বাঁধা ছাড়া হজ্জ ও ওমরার আর কোনো আচার অনুষ্ঠান না করে থাকুক।'

(হজ্জকারী ও ওমরাকারী যে স্থান থেকে হজ্জ বা ওমরার কাজ শুরু করে অথবা এই সাথে দুটোই শুরু করে, সেলাই করা পোশাক বর্জন করে এবং চুল কাটা, কামানো, নখ কাটা এবং কোনো পশু বা পাখী শিকার করা ও খাওয়া ইত্যাদি তার ওপর হারাম হয়ে যায়, সেই জাগাকে মীকাত বলা হয়।)

হোদায়বিয়াতে এরূপ ঘটনাই ঘটেছিলো। ৬ষ্ঠ হিজরীতে মোশরেকরা রসূল (স.) ও তাঁর সহযাত্রী মুসলমানদেরকে মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা দিয়েছিলো অতপর তাঁর সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করে। এই সন্ধি চুক্তি অনুসারে তাঁকে পরের বছর ওমরা করার অনুমতি দেয়া হয়। বর্ণিত আছে যে, এই সময় এ আয়াত নাযিল হয়। রসূল (স.) তার সহযাত্রী মুসলমানদেরকে ওইস্থানেই কোরবানী করার ও এহরাম থেকে মুক্ত হবার নির্দেশ দেন।

এই আদেশ কার্যকর করতে তারা ইতস্তত করছিলেন। সচরাচর যে জায়গায় কোরবানী করা হয়ে থাকে, সেখানে পৌঁছার আগেই কোরবানী করা তাদের কাছে খুবই কঠিন বলে মনে হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত রসূল (স.) তাদের সামনে নিজের জন্যে কোরবানী করলেন এবং নিজের এহরাম থেকে মুক্ত হলেন, অমনি সকল মুসলমান তাঁর আদেশ কার্যকর করলেন। (আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্যে সূরা আল-ফাতাহ এর তাফসীর-এ দ্রষ্টব্য।)

'যে কোরবানীই সম্ভব হয়।' এ কথার অর্থ হলো, যে কোরবানীই হস্তগত হয় এবং সহজসাধ্য হয়। অবশ্য কোরবানী হওয়া চাই পশু জাতীয় এবং তা উট, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এই পাঁচ রকমের কোনো একটি হওয়া চাই। তবে একটি গরু বা উটে একাধিক হাজী অংশ নিতে পারে, যেমন হোদায়বিয়ায় প্রত্যেক উটে সাত জন করে হাজী অংশ নিয়েছিলেন। এটাই হবে সহজসাধ্য কোরবানী। ছাগল বা ভেড়ার একটি একজনই কোরবানী করবে।

হোদায়বিয়ার ঘটনার ন্যায় শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার অবস্থাকে উক্ত বিধির ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করার পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, সেটি হলো কাজটিকে সহজ করে দেয়া। হজ্জ ও ওমরার নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠানগুলোর প্রথম উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দীপনার সঞ্চার এবং ফরয এবাদাতগুলো যথাযথভাবে আদায় করা। এটা যখন সম্পন্ন হয়েছে এবং অতপর শত্রু, রোগব্যাধি ইত্যাদির কারণে পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন হজ্জ ও ওমরাকারীকে তার হজ্জ বা ওমরার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ধরে নিতে হবে যে, সে যেন তা সম্পন্ন করেছে। তার কাছে যে জন্তুই থাকে, তা কোরবানী করে দিয়ে এহরাম মুক্ত হতে

পারবে। সহজীকরনের এই নীতি ইসলামের মূল প্রাণশক্তি, এবাদাতের উদ্দেশ্য ও যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ।

প্রথম সাধারণ আদেশ থেকে, এই ব্যতিক্রমমূলক বিধি ঘোষণা করার পর আয়াতের পরবর্তী অংশে হজ্জ ও ওমরার নতুন বিধি ঘোষণা করা হচ্ছে,

'কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাওয়ার আগে তোমরা মাথা কামিও না।'

এই নিষেধাজ্ঞা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করা হয় এবং এ ব্যাপারে কোনো বাধা বিপত্তি দেখা দেয় না। এক্ষেত্রে কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাওয়ার অর্থাৎ কোরবানীর জন্তু তার জবাইয়ের সানে মিনায় পৌঁছে যাওয়ার আগে মাথা কামানো যাবে না। কেননা মাথা মুন্ডানো হচ্ছে হজ্জ বা ওমরা বা উভয়টির এহ্রাম থেকে অব্যাহতি লাভের সংকেত।

৯ই যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান ও সেখান থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর দশ তারিখে মিনায় কোরবানী করতে হয়। এই কোরবানীর পরই এহরাম শেষ হয়ে যায়। মিনায় কোরবানীর জন্তু পৌঁছার আগে চুল ছাঁটা বা কামানোর কোনো অবকাশ নেই, তাই তার আগ পর্যন্ত এহ্রামও যথারীতি বহাল থাকবে।

কিন্তু এই সাধারণ নিষেধাজ্ঞারও ব্যতিক্রম আছে। সেটি হচ্ছে,

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন থাকবে কিংবা তার মাথায় যন্ত্রণা থাকবে, (এবং সে জন্যে মাথা কামিয়ে ফেলে) তার ফিদিয়া হিসাবে রোযা রাখা অথবা সদকা দেয়া অথবা কোরবানী করা উচিত'।

বস্তুত কোনো রোগব্যাধির জন্যে যদি মাথা কামানোর প্রয়োজন পড়ে, কিংবা চুল লম্বা হয়ে গেলে ও না আঁচড়ালে তাতে উকুন ইত্যাদি জন্মে কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহলে এহ্রামের সময় কোরবানীর যে জন্তু সাথে নিয়েছিলো তা তার জবাইয়ের স্থানে পৌঁছার আগে এবং হজ্জের সকল কাজ সমাধা করার আগে বাস্তব পরিস্থিতির কারণে মাথা কামানো জায়েয হবে। কেননা ইসলাম উদারতর ব্যবস্থা।

তবে এই মাথা মুন্ডানোর জন্যে ফিদিয়া দিতে হবে। ফিদিয়া হলো তিনদিন রোযা রাখা, অথবা ছয়জন দরিদ্র লোককে এক ওয়াক্ত খাওয়ানোর মাধ্যমে (অথবা সেই পরিমাণ অর্থ) সদকা প্রদান অথবা একটি ছাগল যবাই করে তা বন্টন করা। এই বিকল্প পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। বোখারী শরীফে উদ্ধৃত এই হাদীসে হযরত কা'ব বিন আজরা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে গেলাম। তখন আমার মুখমন্ডলে উকুন গড়িয়ে পড়ছিলো। তা দেখে রসূল (স.) বললেন,

'আমি যে অবস্থা দেখছি তা এই যে, এই উকুন তোমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। তুমি একটা ছাগল সংগ্রহ করতে পারো না? আমি বললাম, না, তিনি বললেন, তাহলে তিন দিন রোযা রাখো, অথবা ছয়জন মেসকীনকে মাথা প্রতি আধা সা' খাবার দাও এবং মাথা কামিয়ে ফেল।'

এরপর হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কে একটা নতুন সাধারণ বিধি ঘোষণা করা হচ্ছে,

'এরপর যখন তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, তখন তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত ওমরার সুযোগ গ্রহণ করবে, সে যেন নিজের সামর্থ অনুসারে কোরবানী দেয়।'

অর্থাৎ যখন কোনো বাধাবিপত্তি ও অবরোধের সম্মুখীন হবে না এবং হজ্জের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে সমর্থ হবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসার আগ পর্যন্ত হাতে যে সময় পাওয়া যায় তা কাজে লাগিয়ে ওমরা করতে চায়, সে যেন সহজে সম্ভব হয় এমন একটা কোরবানী দিয়ে দেয়।

এই বিধিটি খোলাসা করে বললে এরূপ দাঁড়ায়–প্রথমত, কোনো মুসলমান হজ্জের মাসগুলোতে অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে ওমরার নিয়তে মীকাত থেকে এহরাম বাঁধলো এবং কা'বা শরীফে তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ায় সা'ই করার মাধ্যমে তওয়াফ সম্পন্ন করার পর হজ্জের জন্যে পুনরায় এহরাম বাঁধলো ও হজ্জের সময়ের অপেক্ষা করতে থাকলো। তার এই কার্যক্রম হবে ওমরার পরে হজ্জের সুযোগ গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, মীকাত থেকে একই সাথে হজ্জ ও ওমরার জন্যে এহরাম বাঁধলো।

অতপর ওমরার কাজ সম্পন্ন করার পর হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলো। এই দুটি অবস্থা 'হজ্জে তামাত্তু'র অবস্থা। এই উভয় অবস্থায় ওমরা আদায়কারীকে ওমরা সমাপনের পর এহরাম খোলার জন্যে তার সামর্থ অনুসারে কোরবানী করতে হবে। ওমরা ও হজ্জের মাধ্যমে সে এহরাম মুক্ত অবস্থায় কিছু সময় অবস্থানের সুযোগ পাবে এটাই 'তামাত্তু'। 'সামর্থ অনুসারে' কথাটার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে উট, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার মধ্যে যেটি ক্রয় করা ও কোরবানী করার সামর্থ রাখে সেটি কোরবানী দেবে।

আর যদি কোনো কোরবানীই দিতে না পারে তবে তার ফিদিয়ার বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। সেটি হলো,

'যে ব্যক্তি তা না পারবে, সে হজ্জের মওসুমে তিন দিন এবং বাড়ীতে ফিরে আসার পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখবে।'

যিলহজ্জের নয় তারিখে আরাফায় অবস্থানের আগেই উক্ত তিনটি রোযা রেখে নেয়া উত্তম। আর বাকী সাত দিনের রোযা আপন বাসস্থানে ফিরে আসার পর রাখতে হবে। 'এই পূর্ণ দশ দিন' কথাটা বলার উদ্দেশ্য বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর এই কোরবানী বা রোযার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, হজ্জ ও ওমরার মাঝখানে এহরামমুক্ত অবস্থায়ও যেন আল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্ক বজায় থাকে, হজ্জের পরিবেশ সংক্রান্ত অনুভূতি ও চেতনা যেন ব্যাহত না হয় এবং এই ফরয কাজটি আদায় কালে নিজের প্রকৃতি ও চাল চলনের ওপর অত্যাবশ্যকীয় সতর্ক প্রহরা যেন বজায় থাকে।

যারা হারাম শরীফের স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের যেহেতু ওমরা আদায় করার নিয়ম নেই, বরং তাদের শুধু হজ্জই আদায় করতে হয়। তাই তাদের 'তামাত্তু' তথা হজ্জ ও ওমরার মাঝে এহরাম খোলার প্রশ্নই ওঠে না, আর সে কারণে স্বভাবতই তাদের ফিদিয়া দিতে বা রোযাও রাখতে হয় না। এ কথাই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে,

'যাদের ঘরবাড়ী মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী নয়, কেবলমাত্র তাদের জন্যেই এ সুবিধা।' হজ্জ ও ওমরার এই বিধি কয়টি বর্ণনা করার পর কোরআন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার মানসে তার স্বভাবসুলভ ভংগীতে এভাবে উপসংহার টেনেছে, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।'

বস্তুত এইসব বিধি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা একমাত্র তাকওয়া দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে ও তাঁর আযাবকে ভয় করা। এহরাম স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে সংযমী করে তোলে। সেই এহরাম থেকে যখন সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয়া হলো, তখন হৃদয়ে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা হলো, যাতে ওই সংযমী ভাবটা তখনো বহাল থাকে এবং কুপ্রবৃত্তির ওপর সতর্ক প্রহরা বজায় থাকে।

এরপর শুরু হচ্ছে শুধুমাত্র হজ্জের বিধিমালার বিবরণ। এখানে হজ্জের সময় ও তার নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর পূর্ববর্তী বিধিমালার মতো এই বিধিমালার সাথেও রয়েছে তাকওয়ার শিক্ষা। ১৯৭ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

'হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে। অতপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তার জন্যে হজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ বৈধ নয়। তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ করো, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা করো যদিও আল্লাহর ভয়টাই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমরা আমাকে ভয় করো।'

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, হজ্জের জন্যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। সে সময় হচ্ছে কয়েকটি সুপরিচিত মাস। মাসগুলো হলো শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এই নির্দিষ্ট মাসগুলোতে ছাড়া হজ্জের এহরাম শুদ্ধ নয়। তবে কোনো কোনো মতে সারা বছরই হজ্জের এহরাম বৈধ। নির্দিষ্ট সময়ে হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করার জন্যে এই মাস কয়টি চিহ্নিত করার পক্ষে যারা মত দেন তারা হচ্ছেন ইমাম আবু হানীফা। আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবরাহীম নাখয়ী, সাওরী, লাইস, শাফেয়ী। ইবনে আব্বাস, জাবের, আতা, তাউস, মোজাহেদ প্রমুখ এবং এই মতই সমধিক প্রসিদ্ধ।

এই সুবিদিত মাস কয়টিতে যে ব্যক্তি হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নেবে এবং সে জন্যে সে এহরাম বাঁধবে। তাকে সমগ্র হজ্জের মওসুমে 'রাফাছ', 'ফুসূক' ও 'জিদাল' থেকে বিরত থাকতে হবে। 'রাফাছ' হলো মহিলাদের উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে যৌন সংগমের বিষয় অথবা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিষয়ে আলোচনা করা।

'ফুসূক' বলতে বুঝানো হয় ছোট কিংবা বড় গুণাহর কাজ করা। আর 'জিদাল' হলো কোনো বিষয়ে এমনভাবে তর্ক বিতর্ক বা ঝগড়া করা, যাতে একপক্ষ অপর পক্ষের ওপর রাগান্বিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে। নাম উল্লেখ করে এ তিনটি জিনিস নিষেধ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এমন যাবতীয় কথা ও কাজ এর আওতায় এসে যায়। যা হজ্জের সময় পালনীয় ও অনুসরণীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা, আল্লাহর জন্যে সর্বাধিক ত্যাগের মনোভাব, যাবতীয় পার্থিব ও জৈব প্রয়োজনের উর্ধে ওঠা, অন্য সকল সম্পর্কের চাইতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সেলাই করা কাপড় পর্যন্ত পরিহার করে পরম বিনয় সহকারে আল্লাহর ঘরে হাযির হওয়ার আবশ্যকতার মধ্য দিয়ে যে পূতপবিত্র পরিবেশ গড়ে ওঠে তার পরিপন্থী।

আয়াতের প্রথমাংশে হজ্জের সময় যাবতীয় অবাঞ্ছিত ও কুরুচিপূর্ণ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার পর আয়াতের পরবর্তী অংশে ভালো কাজে উৎসাহিত করার জন্যে বলা হয়েছে।

'আর তোমরা যা কিছু ভালো কাজ করবে। তা আল্লাহ তায়ালা জানবেন।'

বস্তুত মোমেনের চেতনা ও অনুভূতির কাছে এই কথাটা স্মরণ করাই যথেষ্ট যে, তার যে কোনো ভালো কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত থাকেন এবং তাকে সৎ কাজে উৎসাহিত করেন। এটা তার কাছে আসল প্রতিদান পাওয়ার আগে প্রাপ্ত প্রাথমিক প্রতিদান বলে মনে হয়।

এরপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে হজ্জের সফরের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করার আহবান জানান। আহবান জানান শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকারের চাহিদা পূরণকারী পাথেয় সংগ্রহ করার। কথিত আছে যে, ইয়েমেন থেকে একদল লোক একেবারে শূন্য হাতে হজ্জ করতে আসতো। তারা বলতো, 'আমরা আল্লাহর ঘরে যাচ্ছি। তিনি কি আমাদের খাওয়াবেন না?' অথচ এ উক্তি ইসলামের স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী। কেননা ইসলাম মানুষের মনকে একান্তভাবে আল্লাহর

ওপর নির্ভরশীল ও আল্লাহর প্রতি অনুগত করে গড়ে তোলার সাথে সাথে তাকে বাস্তব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপায় উপকরণ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। তাছাড়া উপরোক্ত উক্তিতে,

'যারা আল্লাহর ঘরে হজ্জ করতে যাচ্ছে, তাদেরকে খাওয়ানো আল্লাহরই দায়িত্ব।'

এরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় আল্লাহর প্রতি এক ধরনের অসাবধানতা ও বেয়াদবীর আভাস বিদ্যমান। এ দ্বারা এরূপ ধারণাও প্রকাশ পায় যে, হজ্জ করে যেন আল্লাহর কোনো উপকার সাধন করা হয়, আর সেই উপকারের জন্যে এভাবে খোটা দেয়া হচ্ছে। বস্তুত এ ধরনের অবাঞ্ছিত মানসিকতা প্রতিরোধ করার জন্যেই শারীরিক ও আত্মিক উভয় ধরনের পাথেয় সাথে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে চিরাচরিত নিয়মে তাকওয়া ও খোদাভীতির উপদেশ দেয়া হয়েছে অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সাবলীল ভাষায়। বলা হয়েছে,

'তোমরা পাথেয় নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীতি। আর হে হৃদয়বান লোকেরা! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।'

বস্তুত তাকওয়া বা খোদভীতি হচ্ছে আত্মা ও মনের খোরাক। এই খোরাক দ্বারাই আত্মা পরিপুষ্ট, শক্তিশালী ও আলোকময় হয়। এর সাহায্যেই সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে ও মুক্তি লাভ করে। আর হৃদয়বান লোকেরাই সর্বাগ্রে তাকওয়ার উপদেশ হৃদয়ংগম করে থাকে এবং তারাই এই পাথেয় দ্বারা সর্বোত্তমভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

হজ্জের আরো কিছু বিধিবিধান

পরবর্তী আয়াতেও হজ্জের বিধি বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। এ আয়াতে হাজীদের হজ্জের পাশাপাশি ব্যবসায় বা মজুরী সাপেক্ষ কোনো কাজ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে এবং আরাফাত থেকে যাত্রা, যেকের ও গুনাহ মাফ চাওয়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৯৮ ও ১৯৯ নং আয়াতের বক্তব্য,

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে তাতে আপত্তি নেই। তারপর যখন আরাফাত থেকে যাত্রা করবে তখন 'মাশয়ারে হারাম' (মুযদালেফায়) থেমে আল্লাহর যেকের করো। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে তাকে স্মরণ করো। অন্যথায় ইতিপূর্বে তো তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে। অতপর যেখান থেকে সবাই প্রত্যাবর্তন করে, সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন করো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

ইমাম বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ওকায, মাজান্না ও যুলমাজায এই তিন জায়গায় জাহেলীয়াত যুগে বাজার বসতো। এ কারণে হজ্জের সময়ে বেচা কেনার কাজ করাকে মুসলমারা গুনাহ ও জাহেলী কাজ মনে করতো। সে জন্যে নাযিল হলো যে,

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে তাতে আপত্তি নেই।'

অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে বাণিজ্যিক ও লাভজনক লেনদেনের কাজ করায় দোষ নেই। আবু দাউদ শরীফেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজ্জের মওসুমে মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্য ও বেচা-কেনা এড়িয়ে চলতো আর বলতো যে, এ হচ্ছে আল্লাহর যেকেরের মওসুম। এ জন্যে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি ইবনে ওমরকে বললাম!' আমরা তো হজ্জের সময় মজুরীও খাটি। আমাদের হজ্জ হবে তো?'

ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তোমরা কি কাবা শরীফের তওয়াফ করো না? তোমরা কি ভালো কাজ করো না? তোমরা কি পাথর নিক্ষেপ ও মাথা মুন্ডন করো না?

'আমরা বললাম, হ্যাঁ, এসব তো করি।'

তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর কাছে এসে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলো। তিনি এর কোনো জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ পরই জিবরীল এই আয়াত নাযিল করলেন যে, 'তোমরা (হজ্জের সময়) আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে তাতে আপত্তি নেই।'

হযরত ওমর (রা.)-এর ভূতপূর্ব গোলাম আবু সালেহ বলেন, 'আমি বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনারা হজ্জের সময় ব্যবসা বাণিজ্য করতেন?'

তিনি বললেন, হজ্জের সময় ছাড়া সে কালে আরবদের জীবিকা উপার্জনের কি আর কোনো উপায় ছিলো?'

উল্লেখিত বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় যে, জাহেলী যুগে যে সব কাজ অবাধে ও নিসংকোচে করা হতো, সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানরা কতো সংকোচ অনুভব করতো এবং সেগুলো করার উদ্যোগ নেয়ার আগে ইসলামের মতামত জেনে নিতে কিরূপ ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতেন। এই পারার শুরুতে আমরা এই পরিস্থিতির ব্যাপারে আলোচনা করে এসেছি সাফা ও মারওয়া পরিভ্রমণ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে।

আলোচ্য ১৯৮ নং আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে কোরআন হজ্জের মওসুমে বেচাকেনা ও ভাড়ার লেনদেন বৈধ করেছে এবং একে 'আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ' নামে আখ্যায়িত করেছে। এরূপ আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য এই যে, কোনো ব্যক্তি যখন ব্যবসা বাণিজ্য করে, যখন মজুরীর বিনিময়ে কোনো কাজ করে এবং যখন উপার্জনের উপায় উপকরণ অন্বেষণ করে, তখন সে যেন উপলব্ধি করে যে, সে শুধু নিজের কাজের দ্বারাই নিজের জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম নয় বরং এ দ্বারা সে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহই প্রার্থনা করে থাকে এবং তার পর আল্লাহই তাকে জীবিকা দেন।

সুতরাং তার এ কথা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, যখন সে নিজের জীবিকা বা অন্য কিছু উপার্জন ও হস্তগত করে, তখন এইসব জিনিস সে যে উপায়-উপকরণের মাধ্যমে অর্জন করে, তার অন্তরালে আসলে সে আল্লাহর অনুগ্রহই প্রার্থনা করে থাকে। জীবিকা উপার্জনকালে যদি এই অনুভূতি তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তাহলে জীবিকা উপার্জনের সেই সময়টিতে সে আল্লাহর এবাদাতেই লিপ্ত থাকে।

সুতরাং সেই উপার্জনের কাজটি আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের দিক দিয়ে হজ্জ নামক এবাদাতের বিপরীত কিছু নয়। আর ইসলাম মোমেনের হৃদয়ে এই অনুভূতি বদ্ধমূল করার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়ার পরই তাকে যে কোনো আর্থিক লাভজনক কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। কেননা এরূপ মানসিকতা সহকারে তার প্রতিটি কথা ও কাজ এবাদাতে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এ কারণেই জীবিকা উপার্জন সংক্রান্ত এই বাক্যটিকে হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি নিয়ে আলোচনারত আয়াতের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছে। বস্তুত এ আয়াতের পরবর্তী অংশে আরাফাত থেকে রওনা হওয়া ও মুযদালেফায় গিয়ে আল্লাহর যেকের করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যথা,

'অতপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওনা হবে, তখন 'মাশয়ারে হারামে' (মুযদালেফায়) আল্লাহর যেকের করো। তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেই ভাবে তাকে স্মরণ করো ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে।'

বস্তুত, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান হজ্জের প্রধান অংগ। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'হজ্জ হচ্ছে আরাফাত (তিনবার) । যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার আগে আরাফাতে অবস্থানকে ধরতে পারবে, তার হজ্জ আদায় শুদ্ধ হবে। আর মিনায় অবস্থানের জন্যে তিন দিন নির্ধারিত। যে ব্যক্তি দ্রুততার সাথে দুই দিনে কাজ সারবে, তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যার বিলম্ব হবে, তারও কোনো গুনাহ হবে না।'

উল্লেখ্য যে, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের নির্ধারিত সময় হচ্ছে ৯ই যিলহজ্জ যোহর থেকে ১০ই যিলহজ্জ ফজর হওয়া পর্যন্ত। ইমাম মোহাম্মাদের মতে ৯ই যিলহজ্জ দিনের শুরু থেকে আরাফাতে অবস্থানের সময় শুরু হয়। এই মতের সপক্ষে তিনি ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত হাদীসের বরাত দিয়েছেন, হযরত ওরওয়া বিন মিযরাস বলেন, এক বসর হজ্জের সময় আমি মুযদালেফায় রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করলাম। তখন তিনি নামাযের জন্যে রওনা হচ্ছিলেন। বললাম, হে রসূলুল্লাহ, আমি তায়ী পর্বত থেকে এসেছি। আমার বাহক জন্তুটি এবং আমি উভয়েই ক্লান্ত। আল্লাহর কসম, এমন কোনো পাহাড়ই নেই যার ওপর আমি অবস্থান করিনি। আমার হজ্জ হবে তো?

রসূল (স.) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই নামাযে শরীক হয়েছে, অতপর এখান থেকে রওনা হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করেছে এবং এর আগে এক রাত কিংবা এক দিন আরাফাতে অবস্থান করেছে, তার হজ্জ সমাধা হয়েছে এবং সে নিজের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়েছে।'

উক্ত দুই মতের যেটিই গ্রহণ করা হোক রসূল (স.) এটাকেই অবস্থানের সময় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং আরাফায় অবস্থানের সময় যিলহজ্জের দশ তারিখের ফজর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেছেন যাতে তা মোশরেকদের আরাফায় অবস্থানের সময়ের বিপরীত হয়।

এক হাদীসে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বলেন, রসূল (স.) আরাফায় আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন। ভাষণে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আজকে বৃহত্তর হজ্জের দিন। মোশরেক ও মূর্তি পুজারীরা এই দিনে সূর্যাস্তের আগে নিষ্ক্রান্ত হতো যখন সূর্য পর্বতের মাথার ওপর এমনভাবে শোভা পেতো, যেন তার মুখে মানুষের পাগড়ি শোভা পাচ্ছে। কিন্তু আমরা সূর্য উদিত হওয়ার আগে নিষ্ক্রান্ত হবো, যাতে আমাদের নীতি মোশরেকদের নীতির বিপরীত হয়।'

হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.) কার্যত ৯ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পরে আরাফা ত্যাগ করতেন। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'রসূল (স.) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেন। অতপর যখন আকাশের হলুদ আভা সামান্য অবশিষ্ট আছে এবং সূর্যের গোলাকার আলো অদৃশ্য হয়েছে, তখন নিজের পিছে ওসামাকে বসিয়ে রসূল (স.) রওনা হলেন। বাহক জন্তুর লাগাম কষে টেনে ধরে ডান হাত উঁচিয়ে এই কথা বলতে বলতে রওনা হয়েছেন যে, 'হে লোকেরা, শান্তভাবে চলো, শান্তভাবে চলো।' যখনই কোনো পাহাড় তার সামনে এসেছে, বাহক জন্তুকে একটু ঢিল দিয়েছেন যাতে সে তার ওপর আরোহণ করতে পারে।

অবশেষে মুযদালেফায় পৌঁছে একই আযানে ও দুই একামাতে মাগরেব ও এশার নামায পড়েছেন। এই দুই নামাযের মাঝখানে তিনি কোনো তাসবীহও পাঠ করেননি। তারপর তিনি ফজর পর্যন্ত শয়ন করেছেন। যখন ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন তিনি আযান ও একামাত সহকারে ফজরের নামায পড়েছেন। অতপর বাহক জন্তুর পিঠে আরোহন করে 'মাশয়ারে

হারামে' এসেছেন। সেখানে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহকে ডেকেছেন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব একত্ব ও মহত্ত ঘোষণা করেছেন, এভাবে আলোর প্রভাব অধিকতর উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে সূর্যোদয়ের আগেই রওনা হয়েছেন।'

বেদয়াত ও শ্রেণীবৈষম্যের মূলোৎপাটন

এই ছিলো রসূল (স.)-এর বাস্তব কার্যধারা এবং আয়াতে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে, 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওনা হবে, তখন মাশয়ারে হারামে পৌছে আল্লাহর যেকের করো এবং তিনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তাকে স্মরণ করো। তোমরা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিলে।'

মাশয়ারে হারাম হচ্ছে মোযদালেফা। আরাফাত থেকে রওনা হয়ে এখানে পৌছার পর আল্লাহর যেকের করতে কোরআন নির্দেশ দিচ্ছে। অতপর একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের পক্ষে এই যেকের করা আল্লাহর হেদায়াতের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। তাই এই যেকের উক্ত হেদায়াতের জন্যে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। আর আল্লাহর এই হেদায়াত লাভের আগে তাদের কী অবস্থা ছিলো, তাও এই বলে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, 'এর আগে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে।'

প্রথম যুগের মুসলমানরা উপরোক্ত সত্যটির গভীরতা ও ব্যাপকতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতো। আরবদের ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী ছিলো তাদের নিকটতম অতীতের ব্যাপার। তাদের চিন্তাধারা ও আকীদা বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা এতদূর গড়িয়েছিলো যে, তারা মূর্তি, জ্বিন ও ফেরেশতাদের পূজা করতো এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে ও জিনদেরকে আল্লাহর স্ত্রীপক্ষীয় আত্মীয়স্বজন মনে করতো। তাদের এ ধরনের নিকৃষ্ট, তুচ্ছ ও খাপছাড়া ধ্যান ধারণা তাদের এবাদাত উপাসনা, রীতিনীতি ও আচার আচরণকেও বিক্ষিপ্ত বিশৃংখল ও খাপছাড়া বানিয়ে দিয়েছিলো। কোনো কোনো সময় বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা তারা শুধু এ জন্যে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো যে, তারা তাদের সাথে বিভিন্ন দেবদেবীর নানা রকম সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করতো। তাদের কোনো কোনো সন্তানকে তারা দেবদেবীর নামে মান্নত মানতো ও উৎসর্গ করতো এবং জ্বিনদেরকে তার অংশীদার করতো।

এ ছাড়া আরো বহু রকমের জাহেলী রীতি প্রথা ছিলো, যার পেছনে কোনো যুক্তি প্রমাণ ছিলো না, ছিলো শুধু এইসব খাপছাড়া চিন্তাধারা ও অলীক কল্পনার স্তূপ। তাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও ছিলো প্রচুর বিভ্রান্তি। তাদের মধ্যে ছিলো উৎকট শ্রেণী বৈষম্য যার বিলোপ ঘটানোর জন্যে এই আয়াতে ইংগিত দেয়া হয়েছে,

'অতপর যেখান থেকে সব মানুষ রওনা হয়, সেখান থেকে তোমরাও রওনা হও।'

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চলে আসছে। তাদের গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহ ও রেষারেষির মধ্য দিয়েও তাদের সামাজিক ও নৈতিক বিভ্রান্তি প্রতিফলিত হতো। এইসব যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহ কোন্দলের দরুন আরবরা সমকালীন বিশ্বে কোনো জাতি হিসেবেই গণ্য হতো না। তাদের নৈতিক ভ্রষ্টতা প্রতিফলিত হতো তাদের যৌন উচ্ছৃংখলতা, এবং বিকৃত বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েও। সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো যে, সেখানে সকলের জন্যে গ্রহণযোগ্য কোনো সাধারণ ও স্থায়ী নৈতিক মানদন্ডের অস্তিত্বই ছিলো না। এই সার্বিক অরাজক পরিস্থিতি এবং আরবদের সামগ্রিক বিপর্যস্ত জীবন ধারা ও নিদারুণ মানবিক দুর্দশা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের নৈতিক ও সামাজিক বিকৃতি ও অধোপতন কত নিম্নস্তরে গিয়ে পৌছেছিলো। এই অধপতন থেকে একমাত্র ইসলামই তাদেরকে উদ্ধার করেছিলো।

তাই যখন তারা কোরআনের এই বাণী শুনেছে যে, 'আল্লাহ যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইভাবে তাকে স্মরণ করো, ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে' তখন নিশ্চয়ই তাদের স্মৃতিপটে তাদের ফেলে আসা বিভ্রান্তিময়, অধোপতিত জীবনের সেই সব কলংকময় দৃশ্যগুলো ভেসে উঠেছে, যা তাদের গোটা ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছিলো। অতপর ইসলাম তাদেরকে যে নতুন উচ্চতর স্থানে তুলেছে, যে স্থানের সন্ধান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই দ্বীনের বদৌলতেই দিয়েছেন, সেই স্থানে নিজেদের অবস্থান দেখে তারা যে নিজেদের অস্তিত্বে এই মহাসত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করেছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিতর্কের অবকাশ নেই।

বস্তুত একমাত্র ইসলামই যে মানুষের অধপতন ও দুর্দশা মোচন করে তাকে উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করতে পারে সে কথা সর্বকালের ও সকল প্রজন্মের মুসলমানদের বেলায়ই অকাট্য ও চিরন্তন সত্য। ইসলাম ছাড়া মুসলমানদের কী মূল্য আছে? ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ছাড়া মুসলিম জাতির কী গুরুত্ব আছে? যখন তারা ইসলামের পথে চালিত হবে, ইসলামী জীবন পদ্ধতি যখন তাদের জীবনে বাস্তবায়িত হবে, তখন তারা তুচ্ছ, অধোপতিত ও নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে উন্নত, মর্যাদাবান ও স্থীতিশীল অবস্থায় উন্নীত হবে।

এই বিরাট ও যুগান্তকারী উত্থান তাদের জীবনে কেবল তখনই সম্ভবপর হতে পারে, যখন তারা সঠিক অর্থে মুসলমান হবে, যখন তাদের সমগ্র জীবনকে তারা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে। এই নির্ভুল ও নিষ্কলুষ জীবন পদ্ধতির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত গোটা মানব জাতি অন্ধ জাহেলীয়াতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এই মহাসত্যকে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে, যে সারা পৃথিবীতে তান্ডব নৃত্যরত আধুনিক জাহেলীয়াতের অধীন জীবন যাপন করার পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরশ পাথরের স্পর্শে নব জীবন লাভ করেছে এবং চারপাশের নোংরা পরিবেশের উর্ধে ইসলামী আদর্শের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছে।

ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উচ্চতম শিখর থেকে যখন কোনো মানুষ সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির সামগ্রিক অবস্থান দেখতে পায়, তার চিন্তাধারা, আইন বিধান ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করে, যখন তার বড় বড় প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় এই ভেবে যে, মানব জাতি কী নিদারুণ বিভ্রান্তি, কী শোচনীয় অধোপতন, কী সাংঘাতিক দুর্দশা এবং কী ভয়াবহ অরাজকতায় নিমজ্জিত। এই বিভ্রান্তি এত নিকৃষ্টস্তরে উপনীত হয়েছে যে, কোনো অদৃশ্য সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক ও কোনো আইনদাতা 'ইলাহের' প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না এবং জীবনে কোনো ঐশী আইন ও বিধান পালনের আবশ্যকতা আছে বলে মনেই করে না! এই অবস্থাটাই এখানে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং এটা তাদের ওপর তার বিরাট অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করছেন,

'তিনি যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে তাকে স্মরণ করো। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে।'

হজ্জ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন। এই সম্মেলনে তারা যখন সমবেত হয় তখন একমাত্র ইসলামের বন্ধন ছাড়া এবং একমাত্র ইসলামের চিহ্ন ছাড়া তাদের আর কোনো বন্ধন থাকে না এবং আর কোনো চিহ্ন দ্বারা তারা চিহ্নিত হয় না। কেবল একখন্ড সেলাইবিহীন কাপড় ছাড়া তাদের দেহে আর কোনো আবরণও থাকে না। ব্যক্তিত্ব, গোত্র বা জাতির ভেদাভেদ এখানে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখানে কোনো সম্পর্ক, বন্ধন ও পরিচয় যদি থেকে থাকে তবে তা একমাত্র ইসলামের সম্পর্ক, বন্ধন ও পরিচয়।

কোরায়শ গোত্র জাহেলী যুগে নিজেদের নাম রেখেছিলো 'হুমুস' অর্থাৎ অনুপ্রাণিত সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী। আর এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে সাধারণ আরবদের মধ্যে একটি বিশেষ অধিকার ও সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলো। এসব সুবিধার মধ্যে একটি ছিলো এই যে, তারা অন্যসব মানুষের সাথে আরাফায় অবস্থান করতো না এবং সাধারণ মানুষ যেখান থেকে একসাথে যাত্রা করতো তারা সেখান থেকে যাত্রা করতো না। এই ভেদাভেদ ঘুচিয়ে ইসলামের ইপ্সিত সাম্য মেনে নেয়ার জন্যে তাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়। এর দ্বারা মানুষের সমাজে মানুষের সৃষ্টি করা কৃত্রিম বিভেদের প্রাচীর ভেংগে দিয়ে সকল মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়। বলা হয়,

'অতপর সকল মানুষ যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো।'

ইমাম বোখারী এই মর্মে হাদীস উদৃত করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কোরায়শ ও তাদের অনুগত গোত্রগুলো মুযদালেফায় অবস্থান করতো অথচ অন্য সকল আরব আরাফায় অবস্থান করতো। কোরায়শরা নিজেদেরকে 'হুমুস' নামে আখ্যায়িত করে আভিজাত্য ফলাতো। যখন ইসলাম এলো, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূল (স.)-কে আরাফায় আসার ও অবস্থানের আদেশ দিলেন এবং তারপর সেখান থেকেই যাত্রা করতে বলেছেন। বলেছেন, যেখানে সবাই অবস্থান করে সেখানে সবার সাথে তোমরাও অবস্থান করো, যেখান থেকে তারা যাত্রা করে, সেখান থেকে তোমরাও যাত্রা করো।

বস্তুত ইসলাম কোনো আভিজাত্য ও শ্রেণীবৈষম্য মানে না। তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ একটিমাত্র জাতি। তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ চিরুনীর দাঁতের মতো সমান। তাকওয়া ছাড়া একজনের ওপর অন্যজনের কোনো অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব ইসলাম স্বীকার করে না। যে কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টিকারী ও আভিজাত্য বোধক পোশাক না পরে হজ্জে গমনের জন্যে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সকল মানুষ আল্লাহর ঘরে গিয়ে ভাই ভাই হিসাবে সমান মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সাম্য বহাল ও বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্যেই যখন অভিজাত পোশাক পরিহারের বিধান দেয়া হয়েছে, তখন অভিজাত পোশাক পরিহার করার পর বংশীয় আভিজাত্য ও বড়াই প্রদর্শনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে বৈষম্য সৃষ্টির নতুন অপচেষ্টা যেন না চলে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সব রকমের জাহেলী বিদ্বেষ বৈষম্য পরিহার করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের রং-এ রঞ্জিত হতে হবে। জাহেলী অহংকার ও আভিজাত্যের বড়াই থেকে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। নিষিদ্ধ অশ্লীলতা ঝগড়াকলহ ও অনাচার মূলক কথা, কাজ ও চিন্তা তা যতো নগন্য ও স্বল্পমাত্রারই হোক না কেন হজ্জের সময়ে সংঘটিত হয়ে থাকলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

এভাবে ইসলাম হজ্জের সময় মুসলমানদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মানব জাতিকে সে যে সাম্য ও ঐক্যের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, তারই আলোকে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই ঐক্যের ভিত্তি এতো মযবুত যে, ভাষা, জাতীয়তা, শ্রেণী কিংবা অন্য কোনো ধরনের পার্থিব গুণাগুণ তাকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। ইসলামের এই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার বিরোধী যে কোনো আচরণ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তাই সে এতো তাগিদ দিয়ে থাকে।

হজ্জের সমাপ্ত পর্ব

এরপর লক্ষ্য করুন, আয়াত নং ২০০, ২০১ ও ২০২ এ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সুখ সাচ্ছন্দ কল্যাণ শুধু ইহকালেই দাও। বস্তুত পরকালে তাদের জন্যে কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দাও, পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দাও।' বস্তুত তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত ক্ষিপ্র।'

আগেই বলেছি যে, আরবরা ওকায, মাজান্না ও যুলমাজায নামক বাজারগুলোতে যেতো। এসব বাজার শুধু যে বেচাকেনার স্থান ছিলো তা নয়– এ সব জায়গায় তারা গোত্রীয় বড়াই, পূর্ব পুরুষের গৌরবগাঁথা ও বংশীয় সুনাম সুখ্যাতি প্রচার করতো। তখনো আরবদের মধ্যে এমন কোনো দাওয়াত বা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়নি। যা তাদের এইসব বংশীয় গৌরব কীর্তনের সুযোগ সংকুচিত করে নতুন কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। সমগ্র মানব জাতির স্বার্থ ও কল্যাণকামী এমন কোনো বাণীর সাথে তাদের তখনো পরিচয় ঘটেনি, যাতে তাদের কর্মক্ষমতা ও বাগ্মীতার ব্যবহার সম্ভব হতো।

বস্তুত বিশ্ব মানবতার কল্যাণের নেয়ামক একমাত্র ব্যবস্থার সাথে ইসলামই তাদেরকে যুক্ত করে। পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যবস্থা বা বাণীর সাথে তাদের কোনো সংশ্রব ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেও ছিলো না। পরেও ছিলো না। তারা ছিলো একেবারেই একটা অখ্যাত মানব গোষ্ঠী, তাই এইসব অসার উদ্দেশ্যহীন ও তাৎপর্যহীন অনুষ্ঠানাদিতে সময় কাটানোর জন্যে তারা ওকায, মাজান্না ও যুলমাজাযে আসতো। সেখানে এসে বংশীয় বীরত্ব-গাঁথা ও পিতৃপুরুষের কীর্তিকলাপের স্মৃতিচারণ করতো।

কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়ের পর সে সবের আর প্রয়োজন ও অবকাশ নেই। এখন বাপদাদাকে স্মরণ করার পরিবর্তে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপনের পর কল্যাণমূলক কাজ করতে হবে। ইসলাম আরবদেরকে নতুন জাতিতে রূপান্তরিত করার পর তাদেরকে এই নবতর মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। কাজেই এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাদের ঘাড়ে ন্যস্ত, তাদের ওই ধরনের অর্থহীন অনুষ্ঠানে সময় কাটানোর কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

'তোমাদের পিতৃপুরুষকে যেমন স্মরণ করে থাকো বা তার চেয়েও বেশী' এ উক্তির অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহর সাথে বাপদাদাকেও স্মরণ করতে হবে। এ উক্তিতে বরং ওই কাজের প্রতি এক ধরনের নিন্দাবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং আল্লাহর স্মরণকে তার চেয়ে ভালো কাজ ও উত্তম বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে স্থানে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করা উচিত, সেখানে তোমরা বাপদাদাকে স্মরণ করছো, কাজেই এই আচরণ বদলাও। নিজেদের প্রথাসিদ্ধ পোশাক বাদ দিয়ে যখন আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়েছো তখন আল্লাহকে বাপদাদার চেয়ে বেশী স্মরণ করো। আভিজাত্যের পোশাক যেমন ছেড়েছো, তেমনি বংশীয় আভিজাত্য অহংকারও ত্যাগ করো।

বস্তুত আল্লাহর স্মরণই মানুষকে যথার্থ বড় বানায় এবং উন্নত ও মহিমান্বিত করে, বাপদাদার স্মরণ নয়। কাজেই মানব জাতির জন্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মানদন্ড হচ্ছে তাকওয়া বা

খোদাভীতি, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা। আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার মাধ্যমেই এই নতুন মানদন্ডের অধিকারী হওয়া যায়।

২০১ ও ২০২ নং আয়াতে এই নতুন মানদন্ডে মানুষকে মাপা হয়েছে এবং তাদের মান মর্যাদা ও পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মানুষ দুই ধরনের, এক ধরনের মানুষ দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত এবং দুনিয়ার ওপরই তাদের সকল আশা আকাংখা কেন্দ্রীভূত। বেদুইন মুসলমানরা সাধারণত হজ্জের সময় নির্দিষ্ট দোয়ার জায়গায় এসে এরূপ দোয়া করতো, 'হে আল্লাহ! এ বছরটাতে তুমি ভালো বৃষ্টি দাও এবং ভালো ফসল জন্মাও। তারা আখেরাতের কোনো কথাই বলতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এ সব লোকের প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তবে আয়াতের বক্তব্য আরো ব্যাপক ও কালোত্তীর্ণ। এ ধরনের মানুষ সকল যুগে ও সকল দেশেই পাওয়া যায়। তারা দুনিয়ার পাগল। আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময়ও তারা কেবল দুনিয়ার কথাই উল্লেখ করে। কেননা দুনিয়াই তাদের সব কিছু, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার ভালাই দিলেও দিতে পারেন কিন্তু আখেরাতের ভালাইতে তাদের কোনো অধিকার থাকবে না।

অপর শ্রেণীটি অধিকতর প্রশস্তমনা ও উদারচিত্ত। কেননা তারা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। তারা দুনিয়ার কল্যাণ চায় বটে, তবে আখেরাতের অংশ চাইতে কখনো ভুলে যায় না। তারা বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও, আখেরাতেরও কল্যাণ দাও এবং আগুনের যন্ত্রণা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।'

তারা এই কল্যাণের প্রকৃতি ও ধরন নির্দিষ্ট করে না। সেটা নির্বাচনের ভার তারা আল্লাহর কাছে অর্পণ করে। আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে যা ভালো মনে করেন, পছন্দ করেন। আর মোমেনরা তাঁর পছন্দকেই মেনে নেয় এবং তাতেই খুশী থাকে। তাদের জন্যে সুনিশ্চিত প্রতিদান রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা তা দিতে বিলম্ব করেন না। কেননা আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত ক্ষিপ্র।

আল্লাহর এই শিক্ষা থেকে জানা যায় যে, কার জন্যে মানুষকে একনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত হতে হবে। এ আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত হবে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে নিজের ভালো-মন্দের বাছ-বিচারের দায়িত্ব নিজের হাতে না রেখে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করবে এবং তিনি যা পছন্দ করবেন, তাই সানন্দে মেনে নেবে। সে দুনিয়া ও আখেরাত কোনটারই কল্যাণ ও ভালাই থেকে বঞ্চিত হবে না আর যে শুধু দুনিয়া চাইবে সে আখেরাতের সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। এখানে প্রথম ব্যক্তিই যে লাভবান তা সুস্পষ্ট। আল্লাহর বিবেচনায় ও মানদন্ডে সে অধিকতর লাভবান ও অগ্রাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য। তার দোয়া অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গার কল্যাণ প্রার্থনায় সোচ্চার। ইসলাম এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাই দিয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এটা কামনাই করে না যে, মোমেন দুনিয়ার ব্যাপারে দোয়া করুক। কেননা তাকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে দুনিয়ার খেলাফতের জন্যে। ইসলাম চায়, মোমেনরা দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুক ও তাঁর ফয়সালা মেনে নিক। দুনিয়ার স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তার চার দেয়ালে তারা আটকা পড়ে যাক এটা তার কাম্য নয়। সে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর চার দেয়াল থেকে মোমেনদেরকে মুক্ত করতে চায়। সে দেখতে চায়, তারা এই দুনিয়াতেই কাজ করবে এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে, অথচ তারা দুনিয়ার উর্ধে থাকবে এবং আল্লাহর

সর্বোচ্চ জগতের সাথে যুক্ত থাকবে। তাই তারা যখন ইসলামী আদর্শের সুউচ্চ চূড়া থেকে দুনিয়ার দিকে তাকাবে, তখন দুনিয়াবী স্বার্থ তাদের কাছে অতিশয় ক্ষুদ্র, নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে।

এভাবে আল্লাহর স্মরণ ও ভয়ের দিকে মনযোগ কেন্দ্রীভূত করার মধ্য দিয়ে হজ্জের দিনগুলো ও অনুষ্ঠানগুলো শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে ২০৩ নং আয়াতে বলছেন,

'আর তোমরা নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে, তবে তার কোনো পাপ হবে না। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো গুনাহ হবে না। এটা তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্যে। তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো এবং জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে একত্রিত করা হবে।'

আল্লাহকে স্মরণ করার এই নির্দিষ্ট দিনগুলো হচ্ছে আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্জ), কোরবানীর দিন (১০ই যিলহজ্জ) এবং তার পরবর্তী তাশরীকের দিনসমূহ (অথাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলো হলো তাশরীকের দিনগুলো অর্থাৎ ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ।

ইকরামা বলেন, ' নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো' এ কথার অর্থ হলো, তাশরীকের উক্ত পাঁচ দিনে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীর পাঠ করো, অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলো।

ইতিপূর্বে আব্দুর রহমান বিন মোয়াম্মার আদ্ দায়লামী থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'মিনার দিন হচ্ছে তিনটি, যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসবে, তার কোনো পাপ হবে না। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো গুনাহ হবে না।'

আর আরাফা, কোরবানী ও তাশরীকের দিনগুলো সবই আল্লাহর যেকেরের উপযোগী। এ দিনগুলোর প্রথম দুইদিন অথবা শেষ দুই দিন খোদাভীরুতার শর্তে গ্রহণযোগ্য।

এরপর আয়াতের শেষাংষে হজ্জের সমাবেশকে উপলক্ষ করে কেয়ামতের দিনের সর্ববৃহৎ সমাবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে সেই ভয়ংকর দৃশ্যই মোমেনদের মনে আল্লাহভীতির মনোভাব জাগিয়ে তোলে,

'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে একত্রিত করা হবে।'

এভাবে এ আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে ইসলাম হজ্জকে একটি নিষ্কলুষ ইসলামী অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে, কিভাবে তাকে সকল জাহেলী কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত করেছে, কিভাবে ইসলামের চিন্তাধারা ও ভাবধারার সাথে তার সমন্বয় সাধন করেছে এবং তাকে যাবতীয় দোষক্রটি থেকে মুক্ত করেছে। ইসলাম জাহেলী যুগের যেসব রীতি প্রথাকে বহাল রাখতে চায় তাকে এভাবে পরিশোধিত করেই বহাল রাখে। এটাই ইসলামের নিয়ম। এর ফলে তা আর সেই পুরানো জাহেলী প্রথা হিসাবে টিকে থাকেনি। বরং তা ইসলামী এবাদাতে পরিণত হয়েছে। নতুন পোশাকে একটি সমন্বিত নতুন কাপড়ের টুকরা হিসাবে শোভা পেয়েছে। মোটকথা, কোনো রীতিপ্রথাকে বহাল রাখা বা তাকে যাচাই বাছাই ও সংশোধন করার নিরংকুশ অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র ইসলামেরই রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى
مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَاِذَا قِيْلَ
لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ
بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ

২০৪. মানুষদের মাঝে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবনে যার কথা তোমাকে খুবই উৎফুল্ল করবে, তার মনে যা কিছু আছে তার ওপর সে আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু (এর প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে) সে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি। ২০৫. সে যখন (আল্লাহর যমীনের কোথাও) ক্ষমতার আসনে বসতে পারে, তখন সে নানা প্রকারে অশান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে, (যমীনের) শস্য ক্ষেত্র বিনাশ করে, (জীবজন্তুর) বংশ নির্মূল করে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো বিপর্যয় (সৃষ্টিকারী মানুষদের) পছন্দ করেন না। ২০৬. যখন তাকে বলা হয়, (ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি না করে) তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তখন তাকে (মিথ্যা) অহংকারে পেয়ে বসে যা গুনাহের সাথে (মেশানো থাকে, মূলত) এ (চরিত্রের) লোকের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট; আর তা হচ্ছে একান্ত নিকৃষ্টতম ঠিকানা! ২০৭. এ মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার (এতোটুকু) সন্তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি সত্যিই অনুগ্রহশীল! ২০৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পুরোপুরিই ইসলামে (-র ছায়াতলে) এসে যাও এবং কোনো অবস্থায়ই (অভিশপ্ত) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দুশমন! ২০৯. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন হয়, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহা বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী। ২১০. তারা কি (সেদিনের) অপেক্ষা করছে, যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর ফেরেশতাসহ মেঘের ছায়া দিয়ে (এখানে) আসবেন এবং (তখন

يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ، وَاِلَى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٢١٠ سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ، وَمَنْ
يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢١١ زُيِّنَ
لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ
اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ، وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٢١٢ كَانَ
النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ،
وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ،

তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত) ফয়সালা হয়ে যাবে; (তাছাড়া) সব কয়টি ব্যাপার তো (সর্বশেষে) তাঁর কাছেই উপনীত হবে।

রুকু ২৬

২১১. তুমি বনী ইসরাঈলদের জিজ্ঞেস করো, কি পরিমাণ সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দান করেছি; (আমি তাদের বলেছি,) যার কাছে (হেদায়াতের) নেয়ামত আসার পর সে নিজে তা বদলে ফেলে, (তার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) কঠোর শাস্তিদানকারী। ২১২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে তাদের এ পার্থিব জীবনটা খুব লোভনীয় করে (সাজিয়ে) রাখা হয়েছে, এরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করে, (অথচ) এ ঈমানদার ব্যক্তি– যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে, শেষ বিচারের দিন তাদের মর্যাদা (এদের তুলনায়) অনেক বেশী হবে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন। ২১৩. (এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো (পরে এরা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো)। তখন আল্লাহ তায়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর গুনাহগারদের জন্যে আযাবের সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠালেন, তিনি সত্যসহ গ্রন্থও নাযিল করলেন, যেন তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমূহের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করে; তাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক (বিদ্রোহ ও) বিদ্বেষ

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ
وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ
اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

সৃষ্টির জন্যে মতবিরোধ করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান। ২১৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) বেহেশতে চলে যাবে? (অথচ) পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের (বিপদের) মতো কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি, তাদের ওপর (বহু ধরনের) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে ওঠেছে, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সংগী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কবে (আসবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অতি নিকটে।

তাফসীর

আয়াত ২০৪-২১৪

সাধারণভাবে কোরআনের যাবতীয় নির্দেশাবলী ও আইন বিধানের মধ্য দিয়ে যেমন সামগ্রিকভাবে মানব জাতির জন্যে আল্লাহর মনোনীত এক পূর্ণাংগ জীবন বিধানের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি একজন পাঠক আলোচ্য আয়াতগুলোতে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতিরও সন্ধান পায়। মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কে সার্বিক ও পূর্ণাংগ অভিজ্ঞতা এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মানুষের সত্ত্বাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এবং বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের কল্পনার চোখে বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে।

ফলে তার কাছে মনে হতে থাকে যেন সে এ সব চরিত্র বিশিষ্ট মানুষকে পৃথিবীতে সচল দেখতে পাচ্ছে। তাই সে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে এবং সজোরে বলে ওঠে যে, এই হচ্ছে সেই বিশেষ নমুনার মানুষ, যার কথা কোরআনে বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা দুই শ্রেণীর প্রতীকী মানুষের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। প্রথমটি হলো অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, তুখোড় বাকপটু। প্রচন্ড প্রদর্শনকামী ও অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির। এ ধরনের ব্যক্তির বাহ্যিক চালচলন আনন্দদায়ক, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত লক্ষণাদি উদ্বেগজনক ও বিব্রতকর। তাকে যখন সততা ও আল্লাহভীতির পথ অবলম্বনের আহবান জানানো হয়, তখন সে সত্যের দিকে ফিরে আসে না এবং আত্মশুদ্ধিতে তৎপর হয় না; বরং তার

আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে এবং সত্য ও কল্যাণের আহবানে সে বিরক্ত হয়। অধিকন্তু সে মানুষের জানমাল ধ্বংস করে। আর দ্বিতীয়টি হলো, সত্যনিষ্ঠ মোমেনের, যে নিজেকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর সন্তোষ কামনায় উৎসর্গ করে। এ ব্যাপারে কোনো চেষ্টায় সে কুণ্ঠিত ও নিবৃত হয় না। কেননা সে আল্লাহর পথে আত্মদান করতেও প্রস্তুত এবং সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবিষ্ট।

আর এই দুই ধরনের মানুষের নমুনা বা প্রতীক তুলে ধরার পর আমরা মোমেনদের প্রতি এই মর্মে উদাত্ত আহবান শুনতে পাই যে, তোমরা অকুণ্ঠ চিত্তে, বিনা শর্তে, কোনো অলৌকিক কর্মকান্ড দেখার আবদার ছুঁড়ে ফেলে আল্লাহকে পরখ করার বাসনা পরিহার করে সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করো। বনী ইসরাইল কিন্তু এ কাজটি করেনি। তারা হরেকরকম অলৌকিক কর্মকান্ড বা মোজেযা দেখার বাহানা করে তাদেরকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতের না শোকরী করেছিলো এবং অবাধ্যতা ও কুফরী প্রদর্শন করেছিলো। কোরআন যে শর্তহীন, একনিষ্ঠ ও সার্বিক আত্ম সমর্পণ ও আনুগত্য মোমেনদের কাছে কামনা করেছে, তাকে সে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ নামে আখ্যায়িত করেছে। আর এই কথাটা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবনের এক সুপ্রশস্ত অধ্যায় রচনা করেছে। (পরবর্তীতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ)'

এ আয়াতগুলোতে এক দিকে ঈমান নামক সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও মোমেনদের ওপর আপন ছায়া বিস্তারকারী শান্তির প্রকৃত মর্ম তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে সত্যের দুশমনরা ইসলাম সম্পর্কে কিরূপ খারাপ ধারণা পোষণ করতো এবং সেই বিভ্রান্তিকর কুধারণার কারণে মোমেনদের সাথে কিরূপ বিদ্রুপ করতো, তাও আলোচনা করা হয়েছে। আর এর পাশাপাশি আল্লাহর মানদন্ডে মোমেনের প্রকৃত মর্যাদা কী, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের মর্যাদা কেয়ামতের দিন ইসলাম বিরোধীদের চেয়ে অনেক উপরে থাকবে।'

এরপর সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে মানুষ কিভাবে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে সেই ইতিহাস। আর সেই সাথে কোন মানদন্ড দ্বারা তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারবে, তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহর কেতাবকেই চিরস্থায়ী মানদন্ডরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা পরম সত্য সহকারেই কেতাব নাযিল করেছেন। এই কেতাবের কাজই হলো মানুষের মধ্যে এমনভাবে বিচার ফয়সালা করা, যাতে মানুষের পারস্পরিক বিরোধ বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়।

এরপর যারা নির্ভুল মানদন্ডকে ধারণ করে, তাদের জন্যে যে অগ্নিপরীক্ষা ও বিপদ মুসিবত অপেক্ষা করছে, সেই বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। মুসলিম জামায়াতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর এই মহান কেতাবকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব যারাই বহন ও পালন করে, তাদেরকে সর্বকালেই অনেক দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সইতে হয়েছে ও হয়ে থাকে। এতে করে তারা এই দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে, এর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং এর পথে যাবতীয় বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে ও সকল নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করে অপ্রতিহত গতিতে, অদম্য সাহসে ও অমিত বিক্রমে এগিয়ে যেতে পারে।

এতে করে তারা এক দিকে যেমন বুঝতে পারবে যে, যতো প্রতিকূল অবস্থাই দেখা দিক, এ দায়িত্ব পালন না করে তাদের উপায় নেই, তেমনি এ কথাও হৃদয়ংগম করতে পারবে যে,

পরিস্থিতি ও পরিবেশ যতোই বিপদসংকুল হবে এবং গন্তব্যস্থল যতোই দূরবর্তী মনে হবে, আল্লাহর সাহায্য ততোই নিকটবর্তী এবং বিজয় ও সাফল্য ততোই ত্বরান্বিত হবে।

এভাবে আমরা এ আয়াতগুলোতে মুসলিম জামায়াতের প্রশিক্ষণের জন্যে আল্লাহর মনোনীত এমন একটি পদ্ধতির রূপরেখা দেখতে পাই, যা তাদেরকে যথোচিতভাবে প্রস্তুত করে, যা তার ব্যক্তিত্বে কার্যকরভাবে বিভিন্ন মহৎ শিক্ষা বদ্ধমূল করে এবং এই শিক্ষাগুলো সেইসব নির্দেশমালা ও আইনগত বিধানের মাঝে মাঝে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে, যার সমন্বয়ে মানব জাতির জন্যে আল্লাহর রচিত পরিপূর্ণ জীবন বিধান তৈরী হয়েছে।

এবার উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

২০৪, ২০৫, ২০৬ ও ২০৭ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আসলে কিন্তু সে প্রচন্ড ....সুতরাং জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান। নিশ্চয়ই তা খুব নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর এ ধরনের বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।'

আধুনিক রাজনীতিকদের মুখোষ উন্মোচন

এক অভিনব তুলির বিস্ময়কর ছোঁয়ায় মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যের যে অপূর্ব নিখুঁত ও অভাবনীয় চিত্র এখানে অংকন করা হয়েছে, তা এতোই চমকপ্রদ যে, তা পড়ে আপনা থেকেই মনে হতে থাকে যে, এই অলৌকিক বচনসমূহ কোনোক্রমেই মানুষের রচনা হতে পারে না। কেননা মানুষের রংতুলিতে মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এতো গভীর, এতো স্পষ্ট ও এতো ব্যাপক চিত্রায়ন এতো দ্রুতগতিতে কখনো সম্ভব নয়।

বৈশিষ্টসমূহ নির্ণয়ে ও লক্ষণসমূহ অংকনে এই আয়াতগুলোর প্রতিটি শব্দ যেন অবিকল এক একটি তুলির আঁচড়। আর আঁচড় দিয়ে একটি প্রতীকী ছবি আঁকা শেষ হতেই তা যেন এক একটা জ্যান্ত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। আর সেই জ্যান্ত প্রাণীটির ব্যক্তিত্ব এত নিখুঁত ও স্বচ্ছভাবে ফুটে ওঠে যে, একজন পাঠক আংগুল দিয়ে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্য থেকে বাছাই করে তাকে দেখিয়ে বলতে পারবে যে, কোরআন যাকে বুঝাতে চেয়েছে, এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি। বস্তুত জীব জগতে মহান স্রষ্টা আল্লাহর হাত দিয়ে প্রতি মুহূর্তে যে সৃজনকর্ম সম্পন্ন হচ্ছে, এই আয়াতের শব্দসমূহের চরিত্র চিত্রায়ন ঠিক তদ্রূপ এক একটি সৃজনকর্ম।

এই বাকশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টি, যে নিজেকে তার দর্শক শ্রোতার সামনে ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণ, আন্তরিকতা নিষ্ঠা, স্নেহ মমতা, মহানুভবতা, পরোপকার, হীতকামনা, মানুষের সুখ শান্তি কামনার প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থাপন করে, তার বাকপটুতা, বাগ্মীতা, পরোপকার ও পরহিত কামনায় পরিপূর্ণ কথাবার্তা শ্রোতাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে। সে এই ধারণা শ্রোতার মনে আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে, নিজের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তাকে আরো বিশ্বাসী করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং তাকওয়া ও খোদাভীতি বেশী করে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহকে তার অন্তরে কি আছে সে সম্বন্ধে সাক্ষী করে। অথচ আসলে সে কট্টর বিরোধী। তার অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বিষ কানায় কানায় ভরা। উদারতা ও মমত্ববোধের নামগন্ধও তার হৃদয়ে নেই। সৌজন্য, সৌভ্রাতৃত্ব, ত্যাগ তিতিক্ষা ও পরোপকারের মনোবৃত্তির লেশমাত্রও তার ভেতরে নেই।

ভিতরে ও বাইরে পরস্পর বিরোধী এবং স্বভাবে ও বাহ্যিক চালচলনে বিপরীতমুখী এই পাকা মিথ্যুক ভন্ড ও কপট চরিত্রের মানুষটির মুখোস কাজের সময় সমাগত হলেই খসে পড়ে, তার গুপ্ত আসল চরিত্রটি নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে এবং তার মধ্যে লুকানো হিংসা, বিদ্বেষ ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলছেন ২০৫ নং আয়াতে,

'যখন সে প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে .....'

অর্থাৎ যখন সে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যায়, তখন নৈরাজ্য ও পরের ক্ষতি সাধনই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, নিষ্ঠুরতা যুলুম ও শত্রুতার আচরণেই সে লিপ্ত হয়, আর সেটা প্রকাশ পায় তার শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুকে নিপাত ও নির্মূল করার তৎপরতার মধ্য দিয়ে। এভাবে জীবন্ত শস্য ও প্রাণী হত্যা প্রকৃতপক্ষে এই বদমেযাজী মানুষটির মধ্যে যে নিকৃষ্ট ধরনের হিংসা, দ্বেষ, নৈরাজ্যবাদিতা, অশান্তিপ্রিয়তা, হিংস্রতা ও অকল্যাণকামিতার স্বভাব নিহিত রয়েছে, তারই ইংগিতবহ। অথচ এই জঘন্য স্বভাবকে সে নিজের মিষ্টভাষিতা, বাকপটুতা, বাহ্যত ভালো মানুষ সাজার দক্ষতা এবং প্রদর্শনীমূলক সদাচার, পরোপকার, ঔদার্য ও সৌজন্য দিয়ে আড়াল করে রাখে।

'অথচ আল্লাহ তায়ালা নৈরাজ্য পছন্দ করেন না।'

অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পছন্দ করেন না। আর এই শ্রেণীর মানুষের বাহ্যিক আচরণ যাই হোক না কেন এবং বাহ্যিক সদাচার দিয়ে মানুষকে তারা যতোই ধোঁকা দিক না কেন, তাদের প্রকৃত চরিত্র আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না এবং তিনি তাদের বাহ্যিক আচরণ দ্বারা প্রতারিত হন না।

এরপর ২০৬ নং আয়াতটি কিভাবে এই মানুষটির চরিত্র চিত্রিত করছে লক্ষ্য করুন,

'আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান। নিশ্চয়ই তা খুবই নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।'

অর্থাৎ এই বদস্বভাবের মানুষটি যখন জনসমক্ষ থেকে প্রস্থান করে, তখন স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে সমাজে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে শস্যক্ষেত ও জীবজন্তুর বংশ নিপাত করে। এভাবে সে ধ্বংস ও নাশকতার চিন্তার প্রসার ঘটায় এবং তার বুকের ভেতর যে হিংসা, বিদ্বেষ, নৈরাজ্যপ্রিয়তা ও হিংস্রতা লুকানো রয়েছে, তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এসব কিছু করার পর তাকে যখন আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দেয়া হয়, যাতে সে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করে লজ্জা পায় এবং আল্লাহর গযবের ভয়ে সংযত হয়, তখন সে এই উপদেশদাতার ওপরও ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং এতো অহংকার ও দর্প প্রদর্শন করে যে, তাকে কোনো খোদাভীতির উপদেশ দেয়া, তার কোনো ভুল ধরা ও তাকে শোধরানের চেষ্টা করাকে সে একটা ধৃষ্টতা মনে করে। তার আত্মাভিমান তাকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, বরং পাপাচারে প্ররোচিত ও লিপ্ত করে। আর অপরাধ ও পাপ কাজকেই সে তার সম্মান ও মর্যাদার উৎস মনে করে, যে সত্য ও ন্যায়ের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তার বিরুদ্ধেই সে ক্ষেপে যায় এবং আল্লাহর সামনে সে একেবারেই নির্লজ্জ ও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। অথচ কিছুক্ষণ আগে সেই একই ব্যক্তি তার মনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বড় বড় বুলি ছাড়ছিলো এবং সততা, কল্যাণকামিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রদর্শনী করছিলো।

বস্তুত উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে এই বিশেষ ধরনের মানুষটির চিত্র অংকন এতো নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে যে, যে কোনো পাঠক নিসংকোচে বলে দিতে পারে যে, এই সেই ব্যক্তি যার কথা কোরআন বলেছে। পাঠক তাকে সর্বত্র সব সময় দেখতে পায় এক দুনিয়া পূজারী ব্যক্তি হিসাবে।

পাপাচারের প্ররোচক আত্মাভিমান, বিরোধিতা ও শত্রুতায় কট্টর ও উগ্র মনোভাব, অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা ও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা– এই কয়টি মারাত্মক দোষের প্রতিরোধে আয়াতের শেষাংশে একটা সমুচিত চপেটাঘাত করা হয়েছে উক্ত উগ্র স্বভাবের লোকটির মুখে।

'জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।'

বস্তুত জাহান্নামই তার জন্যে উপযুক্ত এবং ওটাই তার জন্যে যথেষ্ট। যে জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ হবে মানুষ ও পাথর, যে জাহান্নামে পথভ্রষ্টদেরকে ও ইবলিসের বাহিনীকে উল্টোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে, যে জাহান্নামে কলিজা পর্যন্ত দগ্ধকারী 'হুতামা' রয়েছে, যে জাহান্নামে কাউকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় না, যে জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, সেই জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান। আর তা 'নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।' এখানে 'বিশ্রামাগার' শব্দটির প্রয়োগ নিতান্তই বিদ্রূপাত্মক। এতো আত্মাভিমান আর অহংকার প্রদর্শনের পর যার বিশ্রামের জায়গা জাহান্নাম হয় তার মতো শোচনীয় দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য আর কার হতে পারে?

প্রকৃত মোমেনের পরিচয়

এ হচ্ছে এক ধরনের মানুষ। এর ঠিক বিপরীত মেরুতে রয়েছে আরেক ধরনের মানুষ, যার বর্ণনা রয়েছে পরবর্তী ২০৯ নং আয়াতে

'মানুষের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছে যে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিক্রী করে দেয়। আল্লাহ তাঁর এ ধরনের বান্দাদের প্রতি স্নেহময়।'

অর্থাৎ নিজেকে পুরোপুরিভাবে বিক্রি তথা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয়। কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। আর এই বিক্রির বিনিময়ে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না। এটাই হচ্ছে পূর্ণাংগ, শর্তহীন, অকুণ্ঠ বায়াত, যার বিনিময়ে কোনো মূল্য লাভের আশা করা হয় না। আপন সত্ত্বাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করা হয় আল্লাহর কাছে। ফলে গায়রুল্লাহর জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখা হয় না। আয়াতটির আরো একটা ব্যাখ্যা সম্ভব এবং তারও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একই থাকে। 'সেটি এই যে, এমন মানুষও অনেক রয়েছে যে নিজেকে সকল পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়, যাতে সে নিজেকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে পারে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এই শেষোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।

ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ জানান যে, এই আয়াত রোম থেকে আগত হযরত সোহায়ব বিন সিনান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর যখন মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন মক্কাবাসী তাকে জানিয়ে দিলো যে, তুমি তোমার ধন সম্পদ নিয়ে হিজরত করতে পারবে না। ধন সম্পদ মক্কায় রেখে যদি যেতে চাও, তবে যেতে পারো।'

সোহায়ব সমস্ত ধন সম্পদ তাদেরকে দিয়ে হিজরত করলেন। হযরত ওমর (রা.) ও একদল সাহাবী তাকে হাররা নামক স্থানের প্রান্ত ভাগে অভ্যর্থনা জানালেন।

তারা বললেন, সোহায়ব, বাণিজ্য খুবই লাভজনক হয়েছে।

সোহায়ব বললেন, আপনাদের বাণিজ্যও আল্লাহ যেন অলাভজনক না করেন, কিন্তু এ কথা আপনারা কি জন্যে বলছেন?

তখন সকলে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং রসূল (স.)-ই বলেছিলেন যে, সোহায়ব লাভজনক ব্যবসাই করেছে।

ইবনে মারদুইয়ায় বর্ণিত হাদীসে হযরত সোহায়ব বলেন, 'আমি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে রসূল (স.)-এর কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন কোরায়শের লোকেরা বললো, 'হে সোহায়ব, তুমি যখন আমাদের দেশে এসেছিলে, তখন তোমার কোনো ধনসম্পদ ছিলো না। এখন তুমি তোমার সহায় সম্পদসহ যেতে চাও নাকি? আল্লাহর কসম, সেটা কখনো হবে না।

আমি বললাম, আচ্ছা, আমি যদি আমার সমস্ত সহায় সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তাহলে তোমরা আমাকে যেতে দেবে তো?

তারা বললো, হাঁ। অতপর আমি আমার যাবতীয় সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিলাম।

তারপর আমি মদীনায় চলে গেলাম। আমার পুরো ঘটনা শুনে রসূল (স.) বললেন, সোহায়ব লাভবান হয়েছে। সোহায়ব লাভবান হয়েছে।

আয়াতটি এই ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়ে থাক অথবা একে এই ঘটনার ওপর প্রযোজ্য সাব্যস্ত করা হোক উভয় অবস্থাতেই এটি কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ও নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমিত নয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের মানুষের ছবি তুলে ধরে ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। এ ধরনের মানুষ যুগে যুগে স্থানে স্থানে দেখা যায়।

প্রথমোক্ত চিত্রটি প্রত্যেক বাকপটু, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদনকারী, বদরাগী, নিষ্ঠুর, কুচক্রী, কট্টর ও উগ্র স্বভাবসম্পন্ন বিকৃতমনা ও মোনাফেক তথা কপট ও ভন্ডদের বেলায় প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় চিত্রটি প্রত্যেক খালেস নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠ মোমেনের ওপর প্রযোজ্য যে দুনিয়ার সহায় সম্পদের লালসা থেকে মুক্ত। উল্লেখিত দুটি নমুনা বা মডেল মানব সমাজে বিদ্যমান। এ দুটি মডেলকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিস্ময়কর রং তুলি দিয়ে যেভাবে চিত্রিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করলে পাঠক তার মধ্যে কোরআনের মোজেযা খুঁজে পাবেন, সেই সাথে খুঁজে পাবেন মোনাফেকী ও ঈমানের মাঝে এতো বড়ো পার্থক্য এবং এমন বিপরীতমুখী চরিত্রসম্পন্ন দুই ধরনের মানুষ সৃষ্টিতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মোজেযা।

এ থেকে মানুষের শিক্ষণীয় এই যে, দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ও ধোপদুরস্ত চালচলনে প্রতারিত হওয়া চাই না, কৃত্রিম ভদ্রজনোচিত কথাবার্তা ও আচরণের ভেতরে সারবত্তা কতোটুকু। ভন্ডামি, লোক দেখানো সৎ কাজ ও বকধার্মিকতার অন্তরালে কী আছে, তা সুক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, ঈমানের মানদন্ডে সততা ও মূল্যবোধের যাচাই কিভাবে হয়ে থাকে।

একদিকে রয়েছে ঘোর পাপাচারযুক্ত মোনাফেকী ও ভন্ডামীর নমুনা। অপরদিকে রয়েছে একনিষ্ঠ ঈমানের নমুনা। এই দুই প্রতীকী চরিত্রকে সামনে রেখে কোরআন মুসলিম জনতাকে তাদের সুপরিচিত ঈমানের নামে আহবান জানাচ্ছে যে, তারা যেন পুরোপুরিভাবে ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করে, শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করে এবং ঈমানের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়ার পর আর যাতে পদস্খলন না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্ক হয়।

২০৮ ও ২০৯ নং আয়াত লক্ষ্য করুন,

'হে মোমেন ব্যক্তিরা, ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।'

এখানে 'হে মোমেন ব্যক্তিরা' বলে ঈমানের নাম নিয়েই মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এটাই তাদের প্রিয়তম বৈশিষ্ট্য। এ সম্বোধন তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে ও চিহ্নিত করে। এটা তাদের আহবায়ক আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে। এভাবে সম্বোধন করে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করার আহবান জানানো হয়েছে।

এ আহবানের সর্বপ্রথম মর্ম হলো, মোমেনরা যেন তাদের গোটা সত্ত্বা ও জীবনকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং তাদের জীবনের ছোট বড় সকল বিষয়ে তারা যেন এমনভাবে আত্মসমর্পণ করে যে, তারপর চিন্তায়, কর্মে, ধ্যান ধারণায়, চেতনা অনুভূতিতে এবং অনুরাগে ও বিরাগে এক কথায়, জীবনের আর কোনো ক্ষেত্রে ও কোনো অবস্থায় আর যেন কোনো অবাধ্যতা প্রদর্শন না করা হয়। আল্লাহর ফয়সালায় ও তার ভাগ্য বন্টনে যেন বিন্দুমাত্রও অসন্তোষ প্রকাশ না করা হয়। বরং পূর্ণ আত্মতৃপ্তি ও আস্থা সহকারে যেন আত্মসমর্পণ করা হয়। কেননা এ আত্মসমর্পণ সেই মহান আল্লাহর সামনে করা হয়, যিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তাঁর ব্যাপারে তারা পূর্ণ আস্থাশীল থাকে যে তিনি তাদের জন্যে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ কামনা করেন। পথ ও গন্তব্য উভয়টি সম্পর্কে তারা নিশ্চিত থাকে, চাই তা দুনিয়া ও আখেরাত যেখানেই হোক না কেন।

পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বা ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে মোমেনদেরকে এ আহবান জানানো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে এমন কিছু ব্যক্তি নিশ্চয়ই ছিলো, যারা গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বাত্মক আনুগত্য প্রকাশে কিছু না কিছু কুণ্ঠা ও সংকোচ বোধ করতো। মুসলিম সমাজে পূর্ণ আত্মতৃপ্তি আস্থা ও সন্তোষ সহকারে আনুগত্যকারী লোকদের পাশাপাশি এ ধরনের কিছু লোক থাকা খুবই স্বাভাবিক। একনিষ্ঠ নির্ভেজাল ও সর্বাত্মক আনুগত্য, আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালার সাথে নিজের ইচ্ছা ও ফয়সালাকে একমত ও একমুখীকরণ এবং আল্লাহর নবী ও আল্লাহর দ্বীন যে পথে নিয়ে যায় সেই পথে স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে ও অকুণ্ঠচিত্তে চলার মানসিকতা পোষণের আহবান মোমেনদের কাছে সব সময়ই পেশ করা হয়ে থাকে।

মুসলমান যখন এই আহবান গ্রহণ করে তখন সে এমন এক জগতে প্রবেশ করে যা শান্তি ও নিরাপত্তায় কানায় কানায় পূর্ণ। সে জগতের সর্বত্র সন্তোষ ও তৃপ্তি। সর্বত্র আস্থা ও স্থিতি। কোথাও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও পেরেশানীর নাম নিশানাও সেখানে নেই। কোনো ভ্রষ্টতা ও বিদ্রোহের অবকাশ নেই। সেখানে সর্বত্র কেবল শান্তি বিরাজ করে। প্রবৃত্তি ও বিবেকের সাথে শান্তি! বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে শান্তি। মানুষ ও অন্য সকল প্রাণীর সাথে শান্তি। সকল সৃষ্টি ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি। সকলের হৃদয়ে শান্তি। সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে শান্তি। আকাশে ও পৃথিবীতে শান্তি। সর্বত্র কেবল শান্তিই শান্তি বিরাজ করে।

এই সর্বব্যাপী শান্তির প্রথম উৎস হলো মানুষের প্রভূ ও মনিব বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তার নির্ভুল স্বচ্ছ পূর্ণাংগ ও স্পষ্ট ধারণা। তিনি এক ও অদ্বিতীয় 'ইলাহ'। মুসলমান একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে তার প্রতি মনোনিবেশ করে। ফলে তার জীবন যাপনের পথও থাকে মাত্র একটি। তার পথ বিভিন্ন ও একাধিক হয় না এবং বিভিন্ন মনিব তাকে তার আনুগত্য প্রকাশের জন্যে এখান

থেকে ওখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় না, যেমন বেড়াতো প্রাগৈসলামিক পৌত্তলিকতার যুগে। মুসলমান পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস, তৃপ্তি, সন্তোষ, একনিষ্ঠতা, ও আন্তরিকতা নিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে এক আল্লাহর অনুগত থাকে।

তিনি সর্বোচ্চ শক্তিধর। পরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিমান মা'বুদ। কাজেই কোনো মুসলমান যখন তার প্রতি অনুগত হয়, তখন একমাত্র যথার্থ পরাশক্তিরই অনুগত হয় এবং অন্য সকল ভুয়া ও মিথ্যা শক্তির কর্তৃত্ব থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়। কাউকে বা কোনো কিছুকে আর সে ভয় পায় না বা তোয়াক্কা করে না। কেননা সে সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ পরাক্রান্ত মহাপ্রভুর এবাদাত ও আনুগত্য করে। কাজেই তার কোনো কিছু হারানোর বা খোয়ানোর আশংকা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন আর কেউ নেই যার কাউকে কিছু দেয়ার বা বঞ্চিত করার ক্ষমতা আছে। তাই তিনি ছাড়া এমন কেউ কোথাও নেই যার কাছে সে কিছু পাওয়ার আশা বা ছিনিয়ে নেয়ার আশংকা করতে পারে।

তিনি একমাত্র ন্যায়পরায়ন ও মহাজ্ঞানী ইলাহ। তার শক্তি ও ক্ষমতা যে কোনো যুলুম ও শোষণ নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র গ্যারান্টি। প্রবৃত্তির লালসা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে তিনিই একমাত্র কার্যকর নিরাপত্তাদাতা। তিনি পৌত্তলিকতা ও জাহেলীয়াতের উপাস্য দেবদেবীর মতো প্রবৃত্তির লালসায় জর্জরিত নন। তাই মুসলমান যখন তার মনিবের কাছে আশ্রয় নেয়, তখন এক সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নেয়। যেখানে তার জন্যে পূর্ণ ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত রয়েছে।

তিনি পরম দয়ালু, মহানুভব, দাতা, গুনাহ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী প্রতিপালক। কোনো বিপন্ন ব্যক্তি যখন তার কাছে সাহায্যের জন্যে ফরিয়াদ জানায় তখন তিনি তাতে সাড়া দেন ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। সুতরাং মুসলমান তার কাছে নিরাপদ, তার দয়া ও করুণার পাত্র, যখন সে দুর্বল হয় তখন তার কৃপা ও অনুকম্পা লাভ করে, আর যখন তাওবা করে তখন সে ক্ষমা লাভ করে।

এভাবেই একজন মুসলমান তার প্রভু ও মনিব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতিটি গুণ দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। ইসলাম তাকে এই গুণগুলোর সাথে পরিচিত করে। সে প্রতিটি গুণের ভেতরে নিজের মনের সান্ত্বনা ও আত্মার শান্তি খুঁজে পায়। খুঁজে পায় শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, দয়া, করুণা, সম্মান, মর্যাদা ও স্থীতিশীলতা।

মুসলমানের হৃদয়ে শান্তির অমিয় ধারা বর্ষণের আরেকটি উৎস হলো বান্দা ও প্রভুর মাঝে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে এবং সৃষ্টি ও মানুষের মাঝে বিরাজমান সম্পর্ক সংক্রান্ত সঠিক ধারণা। আল্লাহ এই জগতকে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন পরিমিত ও পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সুক্ষ্মজ্ঞান, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্যে সৃজিত। তাকে দায়িত্বহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি। সমগ্র প্রাকৃতিক ও জাগতিক পরিবেশ তার জীবন যাপনের যোগ্য করেই তৈরী করা হয়েছে। পৃথিবীর সব কিছুকে তার অনুগত ও আয়ত্তাধীন করে দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর পরম আদরের সৃষ্টি, সে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি। আর এই প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তিনি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তার চার পাশের প্রকৃতি তার সহযোগী ও বন্ধুপ্রতিম। উভয়ে যখন আল্লাহর আনুগত্য করে তখন উভয়ে একই প্রেরণায় উজ্জীবিত থাকে। আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে আল্লাহর যে সৃষ্টির মেলা বসেছে, সেখানে সে যাতে সকল সৃষ্টির সাথে পরিচিত হতে পারে। সে জন্যে তাকে আহবান জানানো হয়েছে। এই বিশাল বিশ্বজগতে প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে তাকে

আহবান জানানো হয়েছে। এই সৃষ্টির মেলায় আগত অন্য সবাইও তারই মতো আহূত এবং তার বন্ধু। সকলেই এই মেলার পরিচিত আপনজন।

যে আদর্শ মোমেনকে একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের ব্যাপারেও এরূপ বিশ্বাসে উজ্জীবিত করে যে, সে তাকে পানি সিঞ্চন করে পিপাসা নিবৃত্ত করলে, তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করলে এবং তাকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে মুক্ত করলে পুরস্কৃত হবে, তা শুধু যে অতি সুন্দর ও মহৎ আদর্শ তাই নয়, অধিকন্তু সে আদর্শ তার অন্তরাত্মায় এনে দেয় অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তি। তাকে প্রস্তুত করে সকল সৃষ্টিকে বুকে টেনে নেয়ার জন্যে এবং তার আশপাশের সকল সৃষ্টিকে শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালোবাসা বিতরণের জন্যে।

আর আখেরাতবিশ্বাস মোমেনের অন্তরাত্মায় শান্তি বর্ষণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এটা তার হৃদয় থেকে উদ্বেগ, ক্ষোভ ও হতাশা দূর করে। এটা তাকে উপলব্ধি করায় যে, চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ ও প্রতিদান এই জগতে নয়। বরং পরকালে সম্পন্ন হবে। সেখানেই পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং কোনো ভালো কাজ করে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করে যদি পৃথিবীতে তার সুফল ও শুভ প্রতিদান পাওয়া না যায়, তবে তাতে হতাশার সৃষ্টি হবে না। আর প্রতিদান যদি দুনিয়ার প্রচলিত মানদন্ড অনুযায়ী না হয়, তাহলেও তা কোনো মানসিক পীড়ার কারণ হবে না। কেননা অচিরেই আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় মেপে তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অনাকাংখিত ও অপছন্দনীয় লোকদের মধ্যে সৌভাগ্য বণ্টিত হতে দেখলেও হতাশা আসবে না। কেননা ন্যায়বিচার একদিন পাওয়া যাবেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করতে ইচ্ছুক নন।

হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে এবং মূল্যবোধকে পদদলিত করে নির্লজ্জ ও বল্গাহীনভাবে দুনিয়ার সুখ আহরণের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার পথে আখেরাত বিশ্বাসও অন্তরায়। আখেরাতে রয়েছে পর্যাপ্ত প্রাপ্তি। রয়েছে বঞ্চনাজনিত ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা। এই বিশ্বাস প্রতিযোগিতার ময়দানে শান্তি বহাল রাখতে সাহায্য করে। প্রতিযোগীদের কর্মকান্ডে সৌন্দর্য ও শালীনতা বজায় রাখে। আর দুনিয়ার সীমিত ও সংক্ষিপ্ত জীবনে যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায় সেটুকুই একমাত্র সুযোগ এই ধারণা থেকে স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে।

প্রত্যেক মোমেন জানে যে, মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর এবাদাত করা। এ কথা জানার ফলে তার চেতনা ও বিবেক এবং তার সকল তৎপরতা ও কর্মকান্ডের মান সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। তার উপায়-উপকরণ শালীন ও পরিচ্ছন্ন হয়। তাই সে তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ দ্বারাও আল্লাহর এবাদাত করতে চায়। তারা আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমেও আল্লাহর এবাদাত করতে চায়। পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফাতের দায়িত্ব পালন এবং আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও আল্লাহর এবাদাত করতে চায়। সুতরাং তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে আল্লাহর সাথে গাদ্দারী, অবাধ্যতা, ধোঁকাবাজী ও অসদাচরণ থেকে সে বিরত থাকবে এবং অহংকারী ও স্বৈরাচারী হবে না।

সে কখনো নিজের মহান লক্ষ্য অর্জনে নোংরা ও অসৎ উপায় অবলম্বন করবে না। সে লক্ষ্য অর্জনের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী স্তরগুলো অতিক্রম করতে তাড়াহুড়া করবে না। জীবন পথে চলতে গিয়ে সে উগ্র পন্থা অবলম্বন করবে না। বিনা প্রয়োজনে সহজ পন্থা পরিহার করে কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না। কেননা খালেস নিয়ত, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে এবাদাত করলে ও সাধ্যমত একনাগাড়ে সৎকাজ চালিয়ে গেলে প্রত্যেক মোমেনই সাফল্য লাভ করতে পারে। তবে

র্সবক্ষেত্রেই তাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তার অন্তরে মাত্রাতিরিক্ত আশা কিংবা ভীতি মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে এবং অতি মাত্রায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় যেন সে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে। তার মনে রাখা উচিত যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি তৎপরতার মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর দিকে আরোহন করছে, প্রতিটি পদক্ষেপে সে আল্লাহর এবাদাত করছে এবং প্রতিটি বিপজ্জনক মুহূর্তে সে আল্লাহর বিধানের ওপর বহাল থেকে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করছে।

মোমেন অনুভব করে যে, তার জীবন একমাত্র আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারেই চলছে, তাঁর আনুগত্যের মধ্য দিয়েই চলছে এবং তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হচ্ছে। তার এই অনুভূতি তার অন্তরাত্মায় এনে দেয় এক অনাবিল শান্তি। তৃপ্তি ও স্থীতি। তাই তার পথ যতো বন্ধুর ও দুর্গম হোক না কেন, কোনো অসন্তোষ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছাড়াই আপন যাত্রা অব্যাহত রাখে। আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে তার মনে কোনো হতাশাও বিরাজ করে না। আপন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া কিংবা প্রতিদান বিনষ্ট ও বৃথা হওয়ার ভীতিও তার থাকে না। তাই সে যখন নিজের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তখনও সে নিজের অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করে। কেননা সে তো লড়াই করছে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে, আল্লাহরই পথে এবং আল্লাহর বিধানকেই বিজয়ী করার লক্ষ্যে। সে তো কোনো ব্যক্তিগত পদমর্যাদা, দুনিয়াবী স্বার্থ বা আবেগ উত্তেজনার বশে লড়াই করছে না।

মোমেন এও অনুভব করে যে, গোটা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধান চালু রয়েছে, সে নিজেও তার অধীন। গোটা বিশ্বজগত যে আইন মেনে চলছে, সে নিজেও সেই আইন মেনে চলছে। সমগ্র বিশ্ব চরাচর যে মহাপ্রভুর কর্তৃত্বাধীন, সে নিজেও তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং সৃষ্টিজগতের সাথে তার কোনো সংঘর্ষ নেই, নেই কোনো বিরোধ। কোনো বিরোধ ও সংঘর্ষ না থাকায় কারো চেষ্টা বৃথা যায় না এবং কারো শক্তি অপচয় ও বিশৃংখলার শিকার হয় না। গোটা বিশ্বজগতের শক্তি মোমেনের শক্তির সাথে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর শক্তিতে পরিণত হয়। মোমেন যে আলো দ্বারা পথের সন্ধান পায়, গোটা সৃষ্টিজগতও সেই আলোতেই পথ খুঁজে পায়। উভয়ে একই সাথে আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত হয়।

ইসলাম যেসব কর্তব্য ও দায়িত্ব তাকে অর্পন করে, তার সবই তার স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটিও তার ক্ষমতা বহির্ভূত নয়। তার স্বভাব মেযাজ এবং তার দেহ ও মন যেসব উপাদান নিয়ে গঠিত, তাকে উপক্ষো করে এগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। তার সত্ত্বায় যে সব শক্তি ও ক্ষমতা নিহিত রয়েছে, তার একটিকেও অবজ্ঞা ও অবহেলা করে তার ওপর কর্তব্যের বোঝা চাপানো হয়নি। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে একটিও এমন নেই, যা তার সমুদয় শক্তি ও প্রতিভাকে গঠন উন্নয়ন ও কর্মের হাতিয়ারে পরিণত করে না। এ গুলো তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির একটি প্রয়োজনকেও অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে না এবং এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে একটিও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না যা তার দৈহিক ও আত্মিক চাহিদাগুলোকে সহজভাবে, উদারভাবে ও পরিপূর্ণভাবে পূরণ করে না। এ কারণেই সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর মুখোমুখী হয়ে ঘাবড়ে যায় না বা পেরেশান হয় না। বরঞ্চ নিজের সাধ্যে যতোটা কুলায়, পালন করে এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের পথে শান্তভাবে ও ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

ইসলামী সমাজের চিত্র

যে সমাজ আল্লাহর এই আইন ও বিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, এই নির্মল ও উদার আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বারা এ সমাজে জান মাল ও ইযযতের রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তার সবই কেবল শান্তি ও নিরাপত্তার প্রচার ও প্রসারেই নিয়োজিত।

পারস্পরিক সহানুভূতি, মমত্ববোধ, প্রতিরক্ষা, একাত্মতা, নিরাপত্তা ও সমন্বয় ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ভূষণ। সর্বাধিক উন্নত, উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত আকারে ইসলাম এ ধরনের একটি সমাজ একবার গড়ে তুলেছিলো। তারপর শত শত বছর ধরে বিভিন্ন আকারে তার বাস্তবায়ন ও বিস্তার অব্যাহত রেখেছে। পরবর্তীকালে এ সমাজের উৎকর্ষের মানে যদিও তারতম্য ঘটেছে, তথাপি সামগ্রিকভাবে তা প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলীয়াতের গড়া যে কোনো সমাজের চাইতে সব সময়ই উত্তম থেকেছে। জাহেলী চিন্তাধারা ও জাহেলীয়াতের ভোগবাদী বিধিব্যবস্থা দ্বারা কলংকিত যে কোনো সমাজ অপেক্ষা তা সর্বকালেই মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর।

এই সমাজ একটিমাত্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সেটি হচ্ছে আকীদা ও আদর্শের বন্ধন। ফলে এ সমাজে বংশীয় বন্ধন, বাসস্থান বা জন্মস্থানের বন্ধন, ভাষা ও বর্ণের বন্ধন– এক কথায়, মূল মানব সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন যাবতীয় বাহ্যিক বন্ধন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইসলামী সমাজ আল্লাহর এই বাণীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, 'মোমেনরা ভাই ভাই ছাড়া আর কিছুই নয়।' (আয়াত ১০ সুরা আল হুজুরাত) এ আয়াতের ব্যাখ্যা রসূল (স.) যেভাবে দিয়েছেন তা হলো, মোমেনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্র ও সহমর্মিতার উদাহরণ এরূপ যেন একটি দেহ। দেহের একটি অংগ আহত বা রোগাক্রান্ত হলে সমগ্র শরীর এর যন্ত্রণায় ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।' (আহমদ ও মুসলিম)

এ সমাজের আচরণবিধি নিম্নের আয়াতগুলোতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে,

'যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা অন্তত সমমানের অভিবাদন জানাও।' (সূরা আননিসা ৮৬)

'মানুষের সাথে মুখ বিকৃত করো না এবং মাটির ওপর অহংকারের সাথে চলো না, আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান ১৮)

'উত্তম ব্যবহার দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ করো। দেখবে, যার সাথে তোমার শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরংগ বন্ধু হয়ে গেছে।' (সূরা হামীম আস্-সাজদাহ ৩৪)

'হে মোমেনরা! তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। হয়তো অচিরেই তারা তাদের (উপহাসকারীদের) চেয়ে ভালো হয়ে যাবে। নারীরাও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। হতে পারে তারা তাদের (উপহাসকারিনীদের) চেয়ে ভালো হয়ে যাবে। একে অপরকে অযথা দোষারোপ করো না এবং খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না। ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গুনাহ। আর যে এ সব থেকে তাওবা না করে তারাই হচ্ছে অত্যাচারী।' (সূরা আল হুজুরাত ১১)

'তোমরা পরস্পরের গীবত (অসাক্ষাতে নিন্দা) করো না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা একে ঘৃণা করেছো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু' (সূরা আল হুজুরাত ১২)

যে নিরাপত্তামূলক বিধি ব্যবস্থা দ্বারা এই সমাজ বিধিবদ্ধ, তা হলো,

'হে মোমেনরা! তোমাদের কাছে যদি কোনো অসৎ লোক কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যাসত্য যাচাই ও তদন্ত করো। যাতে নিজেদের অজান্তে কোনো গোষ্ঠীকে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত করে না বসো এবং তারপর নিজেদের করা কর্মের জন্যে লজ্জিত না হও।' (সূরা আল হুজুরাত ৬)

'হে মোমেনরা! ধারণা ও অনুমান করা থেকে বেশী করে সংযম অবলম্বন করো। কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ। আর অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িও না। (সূরা আল হুজুরাত ১২)

'হে মোমেনরা! তোমরা অপরের বাড়ীতে অগ্রিম সংবাদ না দিয়ে ও তার অধিবাসীদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।' (সূরা আন নূর ২৭)

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অন্য মুসলমানের জান মাল ও ইযযত সম্মানার্হ।' সহীহ আল বোখারী, সহীহ মুসলিম ও মোয়াত্তায়ে ইমাম মালেক)

এই পরিচ্ছন্ন পাপাচারমুক্ত সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রচলন থাকে না। খারাপ কাজের উস্কানী ও প্রলোভনের হাতছানি থাকে না। অরাজকতা, বিশৃংখলা ও নির্যাতন নিপীড়ন চলে না। বেপর্দা চালচলনের প্রসার ঘটে না। কারো চোখ কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর ওপর পড়ে না। অবৈধ যৌন চর্চা হয় না। আর আধুনিক ও প্রাচীন জাহেলী সমাজগুলোর মতো এ সমাজে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, ঢলাঢলী এবং রক্তমাংসের ব্যবসাও চলে না। আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে পরিচালিত এ সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্ক যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তা মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহে বিধৃত,

'মোমেনদের সমাজে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রসার ঘটুক এটা যারা পছন্দ করে, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ সব কিছু জানেন। তোমরা জানো না।' (সূরা আন নূর আয়াত ১৯)

'ব্যভিচারীনী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কে একশো ঘা বেত মারো। আল্লাহর দ্বীনের নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যেন তাদের প্রতি দয়ার উদ্রেক না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর তাদের এই শাস্তি যেন মোমেনদের একটি দল প্রত্যক্ষ করে।' (সূরা আন নূর আয়াত ২)

'আর যারা বিবাহিত নারীদের বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) দুর্নাম রটায় এবং তারপর চারজন সাক্ষী হাযির করতে না পারে, তাদেরকে আশীটি বেত্রাঘাত করো এবং আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। তারাই হচ্ছে পাপিষ্ঠ।' (সূরা আন নূর আয়াত ৪)

'তুমি মোমেন পুরুষদেরকে বলো তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম পন্থা। আর তোমরা যা- করো, তা আল্লাহ ভালো ভাবেই অবগত। আর তুমি মোমেন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জস্থানগুলোকে হেফাযত করে। আর তাদের সৌন্দর্যকে যেন প্রকাশ না করে– তবে যেটুকু আপনা থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার কথা আলাদা। আর (মোমেনা ললনাদেরকে আরো বলে দাও) তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বুক মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয় এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, অধীনস্থদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা

প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মোমেন ব্যক্তিরা! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা আন নূর আয়াত ৩০-৩১)

সেকালের পবিত্রতম পরিবেশে পবিত্রতম পরিবারে পবিত্রতম সময়ে পবিত্রতম স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

'হে নবী পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি খোদাভীরু হও, তাহলে বেগানা পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হবে। তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলো। আর তোমরা তোমাদের বাড়ীতে অবস্থান করো এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না। তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তায়ালা তো শুধু তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে ও তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।' (সূরা আল-আহযাব আয়াত ৩২ ও ৩৩)

বস্তুত এ ধরনের সমাজেই স্ত্রী সম্পর্কে স্বামী এবং স্বামী সম্পর্কে স্ত্রী সংশয়মুক্ত ও নিরুদ্বেগ থাকে, অভিভাবকরা পরিবারের মান সম্ভ্রম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে এবং সকলের স্নায়ু ও মনমগয থাকে নিরাপদ ও উদ্বেগ মুক্ত। সেখানে চোখ মেললে এমন কোনো বস্তুর ওপর দৃষ্টি পড়ে না যা অবৈধ আকর্ষণ ও আসক্তির জন্ম দেয় এবং চোখ কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে না। এ অবাঞ্ছিত সুযোগ যে সমাজে উন্মুক্ত থাকে, সেখানে হয় নরনারী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়, নচেৎ সুপ্ত কামনা চেপে রাখতে গিয়ে মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ইসলামী সমাজ এ সব পাপাসক্তি থেকে মুক্ত থাকার কারণে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ থাকে এবং তাতে অনাবিল শান্তি ও নিশ্চিন্ততা বিরাজ করে।

পরিশেষে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, এটাই একমাত্র সমাজ, যা প্রত্যেক সক্ষম মানুষকে কর্ম ও জীবিকার নিশ্চয়তা দেয়, প্রত্যেক অক্ষমকে সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা দেয় এবং সতিত্ব ও পবিত্রতাকামীদেরকে দেয় সতী সাধবী স্ত্রী লাভের গ্যারান্টি। এ সমাজে কোনো মানুষ না খেয়ে মারা গেলে সমগ্র মহল্লাবাসীকে ফৌজদারী অপরাধের জন্যে দায়ী করা হয়। এমনকি মুসলিম ফকীহদের কেউ কেউ সমগ্র মহল্লাবাসীর ওপর আর্থিক জরিমানা ধার্য করার পক্ষেও মত দিয়ে থাকেন।

এটা সেই সমাজ, যা মানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা, সম্মান ও মর্যাদা এবং জান মালের নিরাপত্তা আইনগতভাবে নিশ্চিত করেছে, আর তা সর্বজন মান্য খোদায়ী নির্দেশের দ্বারাই নিশ্চিত করেছে। তাই এখানে কাউকে নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে ধরপাকড় করা হয় না। কাউকে নিজ বাড়ীতে অন্তরীন বা গৃহবন্দী করা হয় না। কারো ওপর গোয়েন্দাগিরি চালানো হয় না। এখানে কোনো ব্যক্তি বিচার থেকে অব্যাহতি পায় না। কেননা খুনের বদলে খুনের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অনুরূপভাবে কারো সম্পদ চুরি বা লুণ্ঠনের শিকার হলে তারও বিচার অনিবার্য। কেননা ইসলামী ফৌজদারী দন্ডবিধি 'হুদুদ' কার্যকর রয়েছে।

এ সমাজ চলে পারস্পরিক পরামর্শ, সহযোগিতা ও হীত কামনার ভিত্তিতে। এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে সাম্য ও পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের ভিত্তির ওপর। এ সমাজের প্রতিটি সদস্য জানে যে, তার অধিকার স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ বলে কার্যকর রয়েছে। কোনো শাসকের ইচ্ছা, কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির আত্মীয়তা বা কোনো পরিষদবর্গের কামনা বাসনার ওপর তা নির্ভরশীল নয়।

সকল মানবীয় সমাজসমূহের মধ্যে এটাই একমাত্র সমাজ। যেখানে কোনো মানুষ অপর মানুষের আনুগত্য করে না, বরং শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত থাকে। শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সবাই একযোগে আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়িত করে। তাই এখানেই প্রকৃত সাম্য বিরাজ করে। এ সমাজে সবাই বিশ্বপ্রভু ও সকল শাসকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শাসক মহান আল্লাহর সামনে নিশ্চিন্ত মনে, পরম আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সত্যিকার সাম্যের অবস্থান গ্রহণ করে।

আলোচ্য ২০৯ নং আয়াতে যে 'সিল্‌ম' অর্থাৎ ইসলামের উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভেতরে পরিপূর্ণভাবে ও সর্বাত্মক প্রবেশ করার জন্যে মোমেনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার কিছু তাৎপর্য ওপরে বর্ণনা করা হলো। এই ইসলামে মোমেনদেরকে সর্বতোভাবে প্রবেশ করার আহবান জানানো হয়েছে, যাতে তার সত্ত্বার কিছুমাত্র এর বাইরে না থাকে এবং সমগ্র সত্ত্বাই আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য, বশ্যতা ও অধীনতা মেনে নেয়।

যে সমাজের লোকেরা ইসলাম কী তা জানে না, অথবা জানার পরও তা মানে না এবং যুগে যুগে নানা রকমের শিরোনামে পরিচিত জাহেলীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, সেই সমাজের ঈমানবিহীন মানুষের মনে কিভাবে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত হয়, তা না জানলে এই 'সিল্‌মের' প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই বস্তুগত প্রাচুর্য ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সত্তেও এবং জাহেলীয়াতের ভ্রান্ত ও ভারসাম্যহীন পরিভাষা অনুসারে উন্নতি ও সমৃদ্ধির সকল বৈশিষ্ট্য তার হস্তগত হওয়া সত্তেও তা একটা ভাগ্যাহত ও দিশাহারা সমাজ।

এ ব্যাপারে বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত ইউরোপীয় দেশ সুইডেনের একটি উদাহরণ দেয়া যথেষ্ট মনে করছি। সেখানে জাতীয় আয় থেকে মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ পাঁচশ' পাউন্ড। উপরন্তু প্রত্যেক নাগরিক স্বাস্থ্য বীমার অংশ ও রোগ নিরাময়ের সাহায্য বাবদ নগদ অর্থ পায় এবং হাসপাতালে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে। সেখানে সকল স্তরে শিক্ষা লাভ করা যায় বিনা ব্যয়ে। অধিকন্তু শিক্ষার্থীরা পোশাক বাবদ আর্থিক সাহায্যও পেয়ে থাকে। এমনকি উচ্চতর শিক্ষার্থীরা ঋণও পায়। এ ছাড়া বিয়ে উপলক্ষে গৃহে আসবাবপত্র খরিদ করার জন্যে তিনশো পাউন্ড সাহায্যও দেয়া হয়। এ ধরনের আরো অনেক বিস্ময়কর বস্তুগত সুখ ও সমৃদ্ধি সেখানে বিদ্যমান। (স্মরণ রাখা প্রয়োজন এটা হচ্ছে ৪০ বছর আগের প্রদত্ব পরিসংখ্যান। সাম্প্রতিককালের কোনো ঘটনা নয়। বর্তমান পরিসংখ্যান আরো জঘন্য।)

কিন্তু এই বস্তুগত সুখ সমৃদ্ধি ও অন্তরের ঈমান শূন্যতার অন্তরালে কী রয়েছে?

সুইডিশ জাতি আজ বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। বেপরোয়া মেলামেশার কারণে এ জাতির লোকসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচারের বিস্তৃতি ও প্রণয়ের আধিক্যের কারণে প্রতি ৬টি বিয়ের একটি তালাকে পর্যবসিত হয়। নতুন প্রজন্ম একেবারেই বখাটে হয়ে মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে চলেছে। আত্মার ঈমান শূন্যতা এবং আকীদা ও আদর্শের তৃপ্তি থেকে হৃদয়ের শূন্যতা– এই দুই শূন্যতা পূরণের জন্যে তারা নেশার পথ ধরেছে। এ ছাড়া মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধি এবং নানারকমের বিরল ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। তদুপরি রয়েছে আত্মহত্যা এবং আরো কতো কী। আমেরিকার অবস্থাও একই রকম। রাশিয়ার অবস্থা আরো বিভৎস ও শোচনীয়।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মিশ্রণ!

বস্তুত ঈমান ও আকীদা শূন্য মানুষের জন্যে এই দুর্ভাগ্য এক অনিবার্য কপালের লিখন। এ ধরনের লোকেরা সেই 'সিল্‌ম,' বা ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না যার ভেতরে মোমেনদেরকে সর্বাত্মকভাবে প্রবেশ করার আহবান জানানো হয়েছে।

মোমেনদেরকে ইসলামে সর্বাত্মকভাবে প্রবেশের আহবান জানানোর পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শয়তানের আনুগত্য থেকে সাবধান করেছেন। বস্তুত দুটো পথই মানুষের সামনে খোলা রয়েছে। হয় সে ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করবে, নচেত শয়তানের অনুসরণ করবে। হয় সুপথ প্রাপ্ত হবে, নচেত গোমরাহ ও বিপথগামী হবে। হয় ইসলামের অনুসারী হবে, নতুবা জাহেলীয়াতের অনুগামী হবে। হয় আল্লাহর পথের পথিক হবে, নচেত শয়তানের পথের যাত্রী হবে। হয় আল্লাহর হেদায়াত গ্রহণ করবে, নতুবা শয়তানের গোমরাহী। এই দুটি পথের যে কোনো একটি মুসলমানকে গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই এবং এই দুই পথের মাঝখানে দোদুল্যমানতা ও সংকোচেরও কোনো কারণ নেই।

মোমেনের সামনে অনেকগুলো পথ খোলা নেই যে, তার যে কোনো একটা সে গ্রহণ করবে কিংবা একটার সাথে আরেকটা মিশিয়ে ফেলবে। যে ব্যক্তি ইসলামের ভেতরে সর্বাত্মকভাবে প্রবেশ করে না, নিজের সমগ্র সত্ত্বাকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বিধান ও শরীয়তের নির্দেশের কাছে সমর্পণ করবে না এবং ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোনো চিন্তাধারা, যে কোনো আদর্শ এবং যে কোনো বিধানকে বর্জন করবে না, সে শয়তানের পথের পথিক এবং শয়তানের পদাংক অনুসারী।

উক্ত দুই পথের মাঝখানে কোনো পথ নেই। অর্ধেক আল্লাহর বিধান থেকে এবং অর্ধেক শয়তানের কাছ থেকে গ্রহণ করার কোনোই অবকাশ নেই। দুটোর একটি হক, অপরটি বাতিল। একটি গোমরাহী, অপরটি হেদায়াত। একটি ইসলাম, অপরটি জাহেলীয়াত। একটি আল্লাহর ন্যায়ানুগ পথ অপরটি শয়তানের কূপথ। আল্লাহ তায়ালা প্রথমটিতে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশের জন্যে মোমেনদেরকে আহবান জানিয়েছেন এবং দ্বিতীয়টি থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাদের আবেগ ও চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন এবং শয়তানের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যা কোনো অচেতন ও উদাসীন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। আর ঈমানের সাথে উদাসীনতার সহাবস্থান অসম্ভব।

এরপর ২১০ নং আয়াতে পদস্খলন তথা বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসে যাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং মহা বিজ্ঞানী।'

আল্লাহ 'পরাক্রমশালী' (আযীয) এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর অপরিসীম শক্তি ও প্রতাপের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা। এর দ্বারা প্রকারান্তরে বুঝানো হয় যে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করা আসলে আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার শামিল। আর তিনি হাকীম বা মহাবিজ্ঞানী, এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এ কথা বুঝানো যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে যে কাজের আদেশ দেন তা তাদের জন্যে কল্যাণের এবং যা করতে নিষেধ করেন তা ক্ষতিকর। আর তারা যখন আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করে না এবং যা নিষেধ করা হয় তা থেকে বিরত হয় না, তখন তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং আয়াতটির শেষাংশ দ্বারা হুমকি ও হুশিয়ারী দুটোই বুঝানো হয়েছে।

এরপর ২১১ নং আয়াতে নতুন বাচনভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামে পরিপূর্ণভাবে, সর্বাত্মকভাবে প্রবেশ না করা ও শয়তানের অনুসরণ করার পরিণতি মধ্যম পুরুষের পরিবর্তে নামপুরুষ সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যথা–

'তারা কি এ ছাড়া আর কোনো জিনিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেশতারা মেঘের ছায়ার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে আসবেন? বস্তুত সব কিছুরই ফয়সালা হয়ে গেছে এবং আল্লাহর দিকেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।'

এ আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা আসলে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশে কুণ্ঠিত ও দ্বিধান্বিত লোকদের দ্বিধা সংকোচের কারণ কি, তা বুঝানোর জন্যেই করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তারা এভাবেই পুরো জীবনটা হেলায় কাটিয়ে দেবে এবং মেঘের আড়ালের ভেতর দিয়ে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ ও ফেরেশতাদের আগমন না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই অবস্থান করবে। অন্য কথায় বলা যায়, কেয়ামতের ভয়াবহ প্রতিশ্রুত দিনটি না আসা পর্যন্ত কি তারা অপেক্ষা করবে! সেই দিন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, তিনি সেদিন মেঘের ছায়ার ভেতর দিয়ে আসবেন এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। যাকে আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন এবং যে সঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ তখন কথা বলতে পারবে না।

আমরা যখন উপরোক্ত হুমকি মিশ্রিত প্রশ্নের সম্মুখীন, তখন সহসাই দেখতে পাই যে, সেই ভয়াবহ দিন সমাগত, সব কিছুর যেন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং সমগ্র মানব জাতি সেই প্রতিশ্রুত ঘটনার সম্মুখীন।

'বস্তুত সবকিছুরই ফয়সালা হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ সময় ফুরিয়ে গেছে। অবকাশ শেষ হয়ে গেছে। নাজাত ও মুক্তির জন্যে হা-পিত্তেস শুরু হয়ে গেছে। সমগ্র মানবজাতি বিশ্বপ্রভু আল্লাহর সামনে উপস্থিত এবং তাঁরই কাছে সকল বিচার্য বিষয় উপস্থাপিত।

'আল্লাহর কাছেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।'

এটা কোরআনের বিস্ময়কর বাচনভংগী। অন্য সকল বাচনভংগী থেকে এটা স্বতন্ত্র। এ বাচনভংগী-সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও দৃশ্যকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সামনে উপস্থিত করে। ফলে পাঠক ও শ্রোতার কাছে মনে হতে থাকে যেন সে সংশ্লিষ্ট ঘটনা স্বচক্ষেই দেখছে, নিজ কানেই শুনছে এবং তার ভেতরে যা কিছু উপভোগ্য, তা যেন উপভোগ করছে। আয়াতটিতে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে যে, কেয়ামতের এই বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনা যখন তাদের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে, বরং সেটা ঘনিয়ে আসছে, তখন ইসলামের ভেতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে তারা আর কতো বিলম্ব করবে? ইসলাম তো তাদের অতি নিকটে এবং একেবারেই নাগালের ভেতরে। দুনিয়াতে ইসলাম তাদের কাছে উপস্থাপিত। আর আখেরাতেও ইসলাম তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যেদিন আকাশ তার মেঘমালাসহ ফেটে পড়বে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে, যেদিন আত্মা ও ফেরেশতারা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে সঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না, যেদিন সকল বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে, সেদিন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর উপায়ন্তর থাকবে না। বস্তুত ফয়সালা হয়েই গেছে যে আল্লাহর কাছেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

ইহুদী জাতির ধ্বংসের কারণ

এর পরেই কোরআন দৃষ্টি ফেরাচ্ছে অন্যদিকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে দ্বিধা সংকোচ দেখিয়ে যে বনী ইসরাইল জাতি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং তাদের ইতিহাস ইতিপূর্বে বিশদভাবে এই সূরাতেই আলোচিত হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কতো নিদর্শন দিয়েছেন এবং তা সত্তেও তারা আল্লাহর আহবানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে কি না? আর কিভাবে তারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ ইসলাম ও ঈমানকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করে ফেলেছে? ২০১ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

'বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করো, আমি তাদেরকে কতো উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত আসার পরও তাকে বিকৃত করেছে, (সে যেন জেনে রাখে যে,) আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।'

এখানে বনী ইসরাইলের প্রসংগটির পুনরুত্থাপন স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। কেননা ইসলামের পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন তথা আল্লাহর কাছে সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পনে দ্বিধাসংকোচ, অহংকারবশে এ কর্তব্য পালনে বিরত থাকা ও অব্যাহতভাবে অস্বীকার করে একগুয়েমি প্রদর্শন এবং অলৌকিক কর্মকান্ডের দাবী উত্থাপন– এসব ছিলো মূলত বনী ইসরাইলেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করা হয়েছে। যাতে তারাও বনী ইসরাইলের শোচনীয় পরিণতির শিকার না হয়।

'বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করো, কতো উজ্জ্বল নিদর্শন তাদেরকে দিয়েছি।'

এখানে সত্যি সত্যি জিজ্ঞাসা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে মনে করা জরুরী নয়। এটা এক ধরনের বাচনভংগী। বনী ইসরাইলকে যে আল্লাহ তায়ালা প্রচুরসংখ্যক নিদর্শন দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে এই বাচনভংগী প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের জন্যে অনেক অলৌকিক ঘটনাবলীও ঘটানো হয়েছিলো। কখনো তা তাদের দাবী অনুসারে ঘটানো হয়েছিলো, আবার কখনো তা আল্লাহ তায়ালা আপনা থেকেই ঘটিয়েছিলেন। তার প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে আল্লাহর কোনো না কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা সক্রিয় থাকতো। কিন্তু এতো বিপুল সংখ্যক মোজেযা দেখার পরও তারা আল্লাহর দ্বীনকে সার্বিক ও পূর্ণাংগভাবে বাস্তবায়নে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। অতপর সাধারণ মন্তব্য করা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতকে বিকৃত করে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তিদাতা।'

এখানে আল্লাহর যে নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ইসলাম অথবা ঈমান। মূলত এই দুটোই সমার্থক। আর এই নেয়ামতকে বিকৃত করার বিরুদ্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তারও প্রথম বাস্তব উদাহরণ ছিলো বনী ইসরাইলের পরিণতি। আল্লাহর আদেশের স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য অস্বীকার করে তারা যে আল্লাহর মহান নেয়ামত ইসলামের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলো, সেটাই নেয়ামতের বিকৃতি। আর এর শাস্তি হিসাবে তারা শান্তি সমৃদ্ধি ও স্থীতিশীলতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। তারা সব সময় সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত থাকতো। পদে পদে ও কথায় কথায় তারা আলৌকিক ঘটনা ঘটানোর মাধ্যমে প্রমাণ দর্শানোর দাবী করতো।

অথচ অলৌকিক ঘটনা বা মোজেযা সংঘটিত হওয়ার পর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো না এবং আল্লাহর হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হতো না। আল্লাহর কঠিন শাস্তির হুমকি

প্রথমে কার্যকর হয়েছিলো বনী ইসরাইলের ওপর। তারপর প্রত্যেক যুগের এমন প্রতিটি জাতির ওপর তা কার্যকর হবে, যারা তাদের ন্যায় আল্লাহর এই নেয়ামতকে বিকৃত করেছে।

মানব জাতি যখনই এই নেয়ামতকে বিকৃত করেছে, তখনই এই দুনিয়ার জীবনেই কঠিন শাস্তির শিকার হয়েছে। পরকালীন শাস্তির আগেই আজকের সারা বিশ্বের মানব জাতি এই শাস্তির শিকার হয়ে এক বিভৎস উৎকণ্ঠিত জীবন যাপন করছে। কোথাও এক জাতি অপর জাতিকে শোষণ করছে। কোথাও ব্যক্তি নিজেই নানাভাবে নিজের সর্বনাশ করছে। নানারকমের অজানা ভাবমূর্তির পেছনে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ ছুটে চলেছে। এক মারাত্মক ধরনের শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে সভ্যতার ধ্বজাধারীরা নানারকম মাদকদ্রব্য সেবন করে সেই শূন্যতাকে ভরে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। আবার কখনো এমন উদভ্রান্ত ও লক্ষহীন কর্মকান্ড চালাচ্ছে, যা দেখে একজন সুস্থ দর্শকের মনে হবে যেন তারা কোনো অদৃশ্য ভাবমূর্তির প্রভাবে তাড়িত হয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে ছুটে পালাচ্ছে।

এ সব বিকৃত রুচিসম্পন্ন মানুষকে নানা জায়গায় নানারকমের কৃত্রিম আকৃতি ও উদ্ভট বেশভূশা ধারণ করতে দেখা যাবে। কোথাও দেখা যাবে এক নারী মাথা নুইয়ে, অথবা বক্ষ নগ্ন করে, অথবা পোশাকের নিম্নাংশ ওপরে তুলে অথবা পশু আকৃতির আজগুবী টুপি মাথায় দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত। আবার কোথাও দেখা যাবে হাতি কিংবা বন্য ছাগলের প্রতিমূর্তি অংকিত নেকটাই গলায় পরে অথবা সিংহ কিংবা ভালুকের প্রতিমূর্তি আঁকা শার্ট পরে এক তরুন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও দেখা যাবে উম্মুক্ত নাচ নেচে, উত্তেজনাপূর্ণ গান গেয়ে, কৃত্রিম রংঢং করে, আজগুবী পোশাক পরে সভাসমিতি ও উৎসবাদি মুখর করে তুলেছে একটি দল। কোথাও দেখা যাবে বিরল ধরনের সাজগোজ ও অশোভন চালচলন দ্বারা দর্শক শ্রোতার চিত্ত জয়ের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে কোনো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। কখনো দেখা যাবে এক ঋতু থেকে আর এক ঋতু পর্যন্ত, এমনকি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ত্বরিত গতিতে প্রেমপ্রণয়ে, দম্পতিতে, বন্ধুত্বে ও পোশাকে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন!

এ সব দৃশ্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, একটি বিরাট মানব গোষ্ঠী আজ এক শোচনীয় অস্থিরতায় যেন দিশাহারা। এক দুঃসহ যন্ত্রণায় তারা যেন ছটফট করছে। কোনো কিছুতেই তারা শান্তি ও তৃপ্তি পাচ্ছে না। এক অবর্ণনীয় ক্লান্তি থেকে এবং নিজেদের শূন্য অন্তরাত্মা ও অশান্ত সত্ত্বা ছেড়ে তারা যেন ভুতপ্রেত তাড়িত ব্যক্তির মতো পালাবার চেষ্টা করছে।

এ সব আল্লাহর শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। যারা তাঁর বিধানকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁর 'সর্বাত্মকভাবে ইসলামের ভেতর প্রবেশ করো এই দাওয়াতকে গ্রহণ করে না, তাদের এই শাস্তি থেকে নিস্তার নেই। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর নেয়ামত তথা তাঁর বিধানের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ওই নেয়ামতকে বিকৃত করেনি বলে তারা উপরোক্ত শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে উক্ত বিকৃতির শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

কাফের ও মোমেনদের বিপরিতমুখী দৃষ্টিভংগী

আল্লাহর দ্বীনকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণের দাওয়াত মেনে নিতে দ্বিধাসংকোচ করার মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতকে বিকৃত করা ও প্রত্যাখ্যান করার বিরুদ্ধে ওপরে যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, তারই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে কাফের ও মোমেনদের পরস্পর বিরোধী অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং উভয় গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত মানদন্ডের পার্থক্য তুলে ধরছেন।

২১২ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

'যারা আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের পার্থিব জীবনকে তাদের কাছে সুশোভিত ও উপভোগ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মোমেনদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে থাকে। অথচ কেয়ামতের দিন সৎ লোকেরাই তাদের ওপরে থাকবে। আর আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন, বিনা হিসাবে জীবিকা দান করেন।'

পার্থিব জীবনের মান খুবই নিচু ও নিকৃষ্ট হওয়া সত্তেও তাকে কাফেরদের কাছে মনোরম ও চমকপ্রদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা এই সংকীর্ণ জীবনের গন্ডী অতিক্রম করতে পারে না, তাদের দৃষ্টি এর উর্ধে ওঠে না এবং পার্থিব বস্তুবাদী মূল্যবোধ ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবোধের সাথে তাদের পরিচয় থাকে না। নিছক দুনিয়াবী জীবনের চৌহদ্দীতে যার অবস্থান সীমিত, সে মোমেনের ন্যায় উচ্চতর ও প্রশস্ততর চিন্তা ও দৃষ্টির অধিকারী হতে পারে না। মোমেন যে দুনিয়ার যাবতীয় সহায় সম্পদকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিলের দৃষ্টিতে দেখে, তার কারণ এটা নয় যে, সে ওইসব সহায় সম্পদের তুলনায় ক্ষুদ্র, অথবা দুর্বল, অথবা নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীর কারণে সে দুনিয়াকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার মনোভাব পোষণ করে না, বরং এর কারণ এই যে, সে এই দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন, এর পুরো অবকাঠামো ও সভ্যতার গঠন ও উন্নয়ন এবং এতে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি আনয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা সত্তেও সে অনেক উর্ধ থেকে এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ফলে সে এই দুনিয়ার সহায় সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, উৎকৃষ্টতর অধিকতর মূল্যবান সহায় সম্পদের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে।

তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে পৃথিবীতে এমন একটা জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এবং মানব জাতিকে এমন একটা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতে, যা পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাংগ। সে চায় পৃথিবীতে আল্লাহর পতাকাকে সব কিছুর উর্ধে তুলে ধরতে, যাতে মানবজাতি সেই উচ্চতর স্থানে আরোহন করে পৃথিবীর এই সংকীর্ন ও নিম্ন অবস্থানের বাইরে দৃষ্টি দিতে পারে। কেননা এই নিম্ন ও সংকীর্ণ অবস্থান তো কেবল সেই দুর্ভাগা মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট, যে ঈমান না আনার কারণে মোমেনের ন্যায় লক্ষ্যের উচ্চতা, দৃষ্টির প্রশস্ততা ও হৃদয়ের বিশালতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পক্ষান্তরে পৃথিবীর পাপ পংকে নিমজ্জিত ও তুচ্ছ পার্থিব ভোগলালসার গোলামীতে লিপ্ত সংকীর্ণমনা কাফেররা মোমেনদের দিকে তাকিয়ে দেখে, তারা তাদেরকে তাদের নোংরা ক্লেদময় অবস্থানে ও নিম্নমানের জীবনোপকরনের মধ্যে রেখে বেপরোয়াভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যাতে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। সেই বৃহত্তর লক্ষ্য শুধু মোমেনদের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং গোটা মানব জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সেই বৃহত্তর লক্ষ্য শুধু মোমেনদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে জড়িত নয় বরং তাদের আকীদা ও আদর্শের সাথে জড়িত। তারা দেখতে পায় যে, মোমেনরা তাদের সেই মহত্তর লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় অনেক দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করছে এবং নিজেদেরকে এমন সব স্বাদ ও আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করছে, যাকে কাফেররা দুনিয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি বলে গন্য করে থাকে। এইসব রুচিবিকৃত বেঈমানরা মোমেনদের অবস্থা দেখেও যখন তাদের উচ্চতর চেষ্টাসাধনার রহস্য কিছুই বুঝতে পারে না, তখনই তাদেরকে বিদ্রূপ উপহাস করে। তাদের অবস্থা, তাদের আদর্শ এবং তাদের মহৎ ও পুন্যময় জীবন যাপন পদ্ধতিকে তারা বিদ্রূপ করে।

কিন্তু যে মানদণ্ডে বিচার-বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে কাফেররা মোমেনদেরকে বিদ্রূপ উপহাস করে, সেটা প্রকৃত মানদন্ড নয়। ওটা হচ্ছে কুফুরীর মানদন্ড, জাহেলীয়াতের মানদন্ড। সত্য ন্যায়ের মানদন্ড রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি এই মানদন্ডে ওযন দিয়ে মোমেনদের প্রকৃত মূল্যমান নিরূপণ করে থাকেন। আর সে জন্যেই কেয়ামতের দিন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মোমেনদের মর্যাদা কাফেরদের উপরে উন্নীত করবেন বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

এ হচ্ছে আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত মানদন্ড। এই মানদন্ড অনুসারে মোমেনদের নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা নিরূপণ করা উচিত এবং আপন কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। নির্বোধদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ মূল্যায়ন উপহাসকারীদের উপহাস এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের বিচার বিবেচনার পরোয়া করা উচিৎ নয়। কেননা মোমেনরা কেয়ামতের দিন কাফেরদের চেয়ে বেশী মর্যাদা পাবে। শেষ ও চূড়ান্ত মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠতম বিচারকের বিচারে এবং প্রকৃত ও সার্বিক মর্যাদা নিরূপণে মোমেনরাই বিবেচিত হবে শ্রেষ্ঠ।

আর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে যা অধিকতর কল্যাণকর, যা প্রশস্ততর ও বৃহত্তর জীবিকা, তা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ায় অথবা আখেরাতে যেখানে ভালো মনে করেন সেখানেই তিনি তা দেবেন, অথবা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই দেবেন, যদি সেটা তার বিবেচনায় অধিকতর কল্যাণকর হয়। এ কথাই বলা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে,

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে জীবিকা দান করেন।'

বস্তুত তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠতম দাতা। যাকে ইচ্ছা দেন এবং যাকে ইচ্ছা দেননা। তাঁর দান তদারক করার জন্যে কোনো কোষাধ্যক্ষও নেই, কোনো প্রহরীও নেই। তিনি কখনো কখনো নিজের কোনো মহত্তর উদ্দেশ্যে কাফেরদেরকে দুনিয়ার বিত্ত বৈভব ও সুখ ঐশ্বর্য দান করে থাকেন। এই দান পাওয়ায় কাফেরদের কোনো কৃতিত্ব নেই। তাঁর নির্বাচিত ও মনোনীত বান্দাদেরকে তিনি যা খুশী, যতো খুশী, দুনিয়ায় বা আখেরাতে দেন। সকল দান তার পক্ষ থেকেই দেয়া হয়। আর সেই দানের শ্রেষ্ঠ প্রাপক কে, সে সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তই সর্বোচ্চ, চিরস্থায়ী ও চূড়ান্ত।

এই দুই ধরনের মানুষ চিরদিনই চিহ্নিত থাকবে। মোমেনরা চিহ্নিত থাকবে এভাবে যে, তারা তাদের যাবতীয় ধ্যান ধারণা, মতবাদ, মতাদর্শ ও মূল্যবোধ কেবলমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করে। এর ফলে তাদের মর্যাদা দুনিয়ার জীবনের সকল নিকৃষ্ট সহায় সম্পদের উর্ধে উঠে যায়। দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততা তাদের কাছে ক্ষুদ্র ও হীন মনে হতে থাকে। এতে করে তারা তাদের মনুষ্যত্বকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়। ফলে তারা দুনিয়ার গোলাম হওয়ার পরিবর্তে মনিব হয়। পক্ষান্তরে যাদের কাছে দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত মোহনীয় ও মনোমুগ্ধকর মনে হয় দুনিয়ার চাহিদা ও লালসা তাদেরকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, তারা মাটির সাথেই যুক্ত থাকে এবং কখনো উর্ধে মাথা তুলতে সক্ষম হয়না।

মোমেনরা তাদের উচ্চতর অবস্থান থেকে সব নীচের লোকদের দিকে তাকায়। এই নীচাশয় দুনিয়ার গোলামরা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মোমেনদেরকে বঞ্চিত মনে করে এবং নিজেদেরকে মনে করে ভাগ্যবান। ফলে কখনো তাদের দিকে তাকায় করুণার দৃষ্টিতে আবার কখনো করে ব্যংগ বিদ্রূপ। অথচ করুণা ও বিলাপের অধিকতর যোগ্য যদি কেউ থেকে থাকে তবে সে দুনিয়ার মোহান্ধ ওই নিকৃষ্ট ও হীন গোলামরাই রয়েছে।

মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার মূলনীতি

উপরোক্ত আয়াতে মূল্যবোধ ও মানদন্ড, মোমেনদের সম্পর্কে কাফেরদের ধারণা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে এই উভয় শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত অবস্থান আলোচনা করার পর পরবর্তী আয়াতে আলোচনার ধারা ভিন্নতর বিষয়ের দিকে মোড় নেয়। মানব সমাজের ভেতরে আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের বিভিন্নতা, মূল্যবোধ ও মানদন্ডের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মতভেদকারীদের মতের বিভিন্নতা ঘুচাতে যে মূলনীতির আশ্রয় নেয়া উচিত এবং মতভেদ নিরসরণে যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মানদন্ড অনুসরণ করা উচিত, তারই বিবরণ রয়েছে পরবর্তী ২১৩ নং আয়াতে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

(এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, (পরে এরা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো) তখন আল্লাহ তায়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর গুনাগহারদের জন্যে আযাবের সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠালেন। তিনি (তাদের সাথে সত্য) গ্রন্থও নাযিল করেছেন, যেন তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমূহের চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারে যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করে। সে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করতো তা-সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা করেছে। এরা পরস্পর বিদ্রোহেরও আচরণ করে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান- তাকে তিনি সঠিক পথ দেখান।

বস্তুত এটাই প্রকৃত ঘটনা। শুরুতে মানব জাতি একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি ছিলো। তাদের নীতি ছিলো একই, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগী ছিলো একই। সম্ভবত এ দ্বারা হযরত আদম (আ.) বিবি হাওয়া ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দ্বারা গঠিত সেই ক্ষুদ্র পরিবারটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যা তখনো আকীদা বিশ্বাস ও মতাদর্শের ব্যাপারে বিভেদে আক্রান্ত হয়নি। কোরআন বলছে যে, একটি উৎস থেকেই মানব জাতির উৎপত্তি হয়েছে এবং তারা হযরত আদম ও হাওয়ার প্রথম পরিবারের সন্তান। একটি ক্ষুদ্র একক পরিবার থেকে মানব জাতির জন্ম হোক-এটাই আল্লাহ্ তায়ালা চেয়েছিলেন, যাতে মানব জাতি স্বীয় জীবনে তাদের সেই প্রথম পরিবারটির আদর্শ ও নীতি বাস্তবায়িত করে এবং সেই প্রথম পরিবারটাকেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

অতীতে এমন এক যুগ ছিলো, যখন তারা একই পরিবারের সদস্য, একই চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীর অধিকারী এবং একই পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারপর ক্রমে তাদের বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটে এবং সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং তাদের মধ্যে বহুমুখী সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। সেইসব রকমারি যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভার মূলে তাদের যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত ছিলো এবং তার পেছনে আল্লাহর যে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দূরদর্শিতা সক্রিয় ছিলো, তা জেনেই আল্লাহ তাদের মধ্যে এসব জিনিস সৃষ্টি করেছিলেন।

এ কারণেই মানব জাতির আদর্শ, দৃষ্টিভংগী, জীবন যাপনের পন্থা ও পদ্ধতি এবং আকীদা বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। আর এ কারণে আল্লাহ তায়ালা সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন।

'তিনি তাদের কাছে সত্য বিধান সহকারে কেতাবও নাযিল করেছেন যাতে তারা যে মতভেদে লিপ্ত তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মহাসত্য উদঘাটিত হয় যে, মতভেদ মানুষের সহজাত ও স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। কেননা এই মতভেদ তাদের সৃষ্টির মৌল নীতিমালার অন্যতম মূলনীতি। এই মূলনীতিই পৃথিবীতে এই প্রাণীকে আল্লাহর খলীফা ও প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করার মহত্তম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

বস্তুত এই প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফত রকমারি দায়িত্ব কর্তব্য এবং বহুসংখ্যক যোগ্যতা ও ক্ষমতার দাবী জানায়, যাতে এগুলো পরস্পরের পরিপূরক হয়, পরস্পরের সমন্বয় সাধন করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সামাজিক পরিকল্পনার আলোকে খেলাফত ও গঠনমূলক কাজে নিজের সার্বিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্নতার মোকাবেলায় যোগ্যতা ও প্রতিভার বিভিন্নতা অপরিহার্য। আর রকমারি চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণার্থে রকমারি ক্ষমতাও অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা তাই অন্যত্র বলেছেন,

'মানুষ চিরকালই মতভেদে লিপ্ত থাকবে কেবল আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন তারা ছাড়া। বস্তুত এ জন্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

যোগ্যতা ও দায়িত্বের এই বিভিন্নতার কারণে আপনা আপনিই মতবাদ, মতাদর্শ, ধ্যানধারণা ও জীবন যাপন প্রণালীতেও বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। তবে এই সমস্ত কাংখিত ও বাস্তব মতভেদ সুস্থ ও ন্যায়সংগত হোক এবং তা একটা প্রশস্ত ও সুপরিসর গন্ডীর মধ্যে সীমিত থাকুক-এটাই আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। এই প্রশস্ত গন্ডীটি হলো বিশুদ্ধ ঈমানের গন্ডী। এই গন্ডী এতটা প্রশস্ত যে বহু রকমের যোগ্যতা, প্রতিভা ও ক্ষমতা এর আওতায় এসে যায়। এই সীমাবদ্ধতা ওইসব যোগ্যতা ও প্রতিভাকে নষ্টও করে না, ওগুলোর টুটিও চেপে ধরে না। তবে ওগুলোকে সুশৃংখল ও সুসমন্বিত করে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করে।

এ জন্যে এমন একটা শাশ্বত মানদন্ড ও মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন, যার কাছে মতভেদকারীরা আশ্রয় নিতে পারে। এমন একজন ন্যায়পরায়ণ শালিসের প্রয়োজন যার কাছে সবাই একত্রিত হতে পারে। যার ন্যায়সংগত মীমাংসার সাহায্য বিবদমান লোকেরা নিতে পারে এবং এমন একটা চূড়ান্ত সর্বশেষ, অকাট্য ও অবিসংবাদিত বাণী আবশ্যক, যার কাছে গিয়ে সকল বিরোধের অবসান ঘটে এবং সকল সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস জন্মে। সেই শাশ্বত ও নির্ভুল মাপকাঠি হলো আল্লাহর নবী ও তার কেতাব,

'অতপর তিনি পাঠাবেন নবীদেরকে সুসংবাদবাহক ও সতর্ককারী হিসাবে এবং তাদের কাছে সত্য সহকারে কেতাব নাযিল করলেন..... ।'

এখানে 'সত্য সহকারে' আল্লাহর এই উক্তিটির কাছে এসে আমাদের একটু থামতে হবে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। এ কথাটা এই মর্মে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ফয়সালা যে, আল্লাহর কেতাব যে বক্তব্য নিয়ে এসেছে, সেটাই একমাত্র সত্য। এই সত্যবাণী এ জন্যেই নাযিল হয়েছে যেন এই কেতাব ছাড়াও তার বাইরে যা কিছু আছে, যতো মানবরচিত কথা, ধ্যান ধারণা, মতবাদ ও মতাদর্শ, মূল্যবোধ ও মানদন্ড আছে তার ব্যাপারে তা ন্যায়সংগত শালিস ও চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণীতে পরিণত হয়। এ কেতাব ছাড়া এ কেতাবের পরে এবং এ কেতাবের বাইরে আর কোথাও কোনো সত্য নির্ভুল, ন্যায়সংগত ও বিশুদ্ধ কথা নেই, কখনো ছিলো না এবং কখনো থাকবে না।

এই একমাত্র অকাট্য মহাসত্য কে মানব জাতির সকল বিরোধ ও বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তিতে শালিস মানা এবং তার রায় নির্বিবাদে ও অকুণ্ঠ চিত্তে চূড়ান্তভাবে ও সর্বতোভাবে গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জীবন সুষ্ঠু নিখুঁত ও নিরুপদ্রব হতে পারে না। এছাড়া মানব জাতির বিপদ বিসম্বাদের নিরসন হতে পারে না। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং মানব জাতি কোনোমতেই পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না।

এই সত্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, তা মানুষের আইন, বিধান ও আদর্শের উৎসকে চিহ্নিত করে দেয়। সেই উৎসের কাছে মানুষ তার যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে ছুটে যায়। সেই একমাত্র উৎস থেকেই এই কেতাব পরম ও অকাট্য মহাসত্য সহকারে নাযিল হয়েছে, যাতে মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদ ও সন্দেহ-সংশয়ের চূড়ান্ত নিরসন ও নিষ্পত্তি ঘটে।

আপন প্রকৃতি ও মূলনীতির দিক দিয়ে এ কেতাব যে যুগে যে নামেই আসুক না কেন, তা একই কেতাব। সকল নবী ও রসূল এই একমাত্র কেতাবই নিয়ে এসেছেন। আর এই কেতাবে বিধৃত বিধানও একই জীবন বিধান। মৌলিক তত্ত্বের দিক থেকে এর বক্তব্য একই মানুষের মালিক ও শাসক মাত্র একজন। প্রভু ও প্রতিপালক মাত্র একজন, উপাস্য ও মা'বুদ মাত্র একজন এবং সমগ্র মানবজাতির আইন ও বিধানদাতা মাত্র একজন। এরপর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রজন্ম ও বিভিন্ন জাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তার খুঁটিনাটি বিধিমালা বিবিধ রকমের হয়ে এসেছে। বিবিধ রকমের জীবন যাপন প্রণালী ও বিচিত্র রকমের সম্পর্ক-সম্বন্ধের আলোকে তার বিধিবিধান বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে এসেছে।

অবশেষে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে ইসলাম সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এক বিরাট, বিশাল ও বিস্তীর্ণ পরিমন্ডলে নির্বিঘ্নে বিকশিত হওয়ার জন্যে মানব জীবনকে খোলামেলাভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই উন্মুক্ত সুপরিসর পরিমন্ডলে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনা, তাঁর আইন ও বিধান এবং তাঁর শাশ্বত ও পরিমার্জিত শরীয়ত ছাড়া তার বিকাশের পথে আর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। সকল আসমানী কেতাবের উপস্থাপিত যে বিষয়টিকে কোরআন সত্য ও অকাট্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যুগ যুগ কালজয়ী প্রচারিত যে ধর্ম বিশ্বাসটি মনোনীত করেছে, তা হচ্ছে নির্ভুল ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও মতাদর্শ। প্রত্যেক নবী মূলত এই একমাত্র ধর্মই প্রচার করেছেন। এর মূলনীতি একই এবং তা হচ্ছে আল্লাহর একত্ব ও একাধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব।

এরপর প্রত্যেক নবী রসূল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিকৃতি ও বিভ্রান্তি এসেছে, অপসংস্কৃতি ও কল্পকাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মানব জাতি সেই মহান সত্যের উৎস থেকে দূরে সরে গেছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নতুন নবী ও রসূল এসে মূল আকীদা ও আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তাকে অপসংস্কৃতি ও কল্পকাহিনীর মিশ্রণ থেকে রক্ষা করেছেন এবং এর পাশাপাশি সমসাময়িক জনতা যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের সম্মুখীন, খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। অনুকরণ ও অনুসরণের ক্ষেত্রে এই সত্য ও নির্ভুল আদর্শ সেইসব অমুসলিম গবেষকদের মতবাদগুলোর চেয়ে বহুগুণ বেশী অগ্রগণ্য। যারা বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে থাকেন এবং যাদের গবেষণালব্ধ মতবাদ দ্বারা অনেক মুসলিম গবেষকও অবচেতনভাবে প্রভাবিত হয়ে যান। এই প্রভাবের কারণে তারা উক্ত অমুসলিম গবেষকদের গবেষণাকে মতবাদ ও মতাদর্শের মূলতত্ত্বের বিবর্তন হিসাবে মূল্যায়ন করেন। প্রাচ্যবাদী গবেষকরা ও তাদের সমমনা মুর্খ পশ্চিমা গবেষকরা এ রকমই বলে থাকেন।

পক্ষান্তরে ইসলামী মতাদর্শের মূলতত্ত্ব চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। ইসলামী মতাদর্শের এই স্থীতিশীলতা আল্লাহর নাযিল করা আসমানী কেতাবের ভূমিকার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা প্রাচীনকাল থেকেই মানব জাতি যে সব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থেকেছে। তার নিষ্পত্তি ও মীমাংসার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রসূলের মাধ্যমে শাশ্বত সত্য বিধান সহকারে এই কেতাব নাযিল করেছেন।

এমন একটা অটল মানদন্ড অপরিহার্য ছিলো এবং এমন একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত বাণী অত্যাবশ্যক ছিলো। যার কাছে মানবজাতি নির্বিবাদে নতি স্বীকার করবে। সেই সাথে এটাও অনিবার্য ছিলো যে, উক্ত মানদন্ড যেন মানবীয় উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে উৎসারিত হয় এবং উক্ত অকাট্য বাণীটি যেন এমন একজন ন্যায় পরায়ণ শাসক কর্তৃক রচিত হয় যিনি কোনো মানবীয় ভাবাবেগ, অক্ষমতা ও অজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হন না।

এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠার জন্যে সীমাহীন জ্ঞানের প্রয়োজন, যে জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুর ওপর বিস্তৃত, যে জ্ঞান জানা, অজানা, আন্দাজ অনুমান সব কিছুকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। যে জ্ঞান দৃশ্য ও অদৃশ্য, অনুভূত ও অনুভূতি বহির্ভূত এবং দূরের ও নিকটের সকল স্থানের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠা কেবল সেই বিশ্বপ্রভুর পক্ষেই সম্ভব, যিনি নিজের সৃজিত যাবতীয় জড় ও জীবের ব্যাপারে অবহিত এবং যিনি নিজের পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সব কিছুর ব্যাপারে ওয়াকেফহাল।

এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠায় এও জরুরী যে, যিনি তা করবেন তিনি যেন সকল পার্থিব চাহিদা ও প্রয়োজন, অক্ষমতা ও দুর্বলতা, ধ্বংস ও মৃত্যু, লোভ লিপ্সা ও কামনা বাসনা–এক কথায় দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের উর্ধে থাকেন। এমন সত্ত্বা শুধু সেই বিশ্ব প্রভুরই হতে পারে যিনি সকল ভোগ-বাসনা, লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত এবং সকল অক্ষমতা ও দুর্বলতার অতীত।

মানবীয় বিবেক বুদ্ধির সাধ্য কেবল এতটুকুই যে, সে যখন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি পরিবেশ ও নিত্য-নতুন চাহিদা ও প্রয়োজনের মুখোমুখি হবে, তখন তার সাথে চলমান কাল ও বিদ্যমান পরিবেশের আলোকে মানুষের সমন্বয় সাধন করবে। তবে সর্বদাই তার কাছে একটা স্থায়ী মানদন্ড থাকতে হবে, যা তার সিদ্ধান্ত ভালো হলো না খারাপ হলো, ভুল হলো না নির্ভুল হলো এবং হক হলো না বাতিল হলো, তা বলে দেবে। এই মানদন্ডের সাহায্যেই জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হতে ও চলমান থাকতে পারে এবং মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তার পরিচালক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা–অন্য কেউ নয়।

কোরআন যে সত্য ও সঠিক বিধান নিয়ে এসেছে তার অর্থ এ নয় যে, যোগ্যতা, ক্ষমতা, প্রতিভা, কর্মনীতি ও উপায় উপকরণের দিক দিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে বাস্তব ও স্বভাবগত পার্থক্য রয়েছে, তা সে মিটিয়ে দিতে চায়। কোরআনের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, মানুষের মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দেয়, তখন যেন সকল বিবদমান পক্ষ কেবল তারই শরণাপন্ন হয় অন্য কিছুর নয়।

আর এই সত্য থেকে অন্য একটি সত্য প্রতিভাত হয়। যার ভিত্তিতে ইসলামের ঐতিহাসিক মতাদর্শ গড়ে ওঠে। সেটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে কেতাবকে সত্য বিধান সহকারে নাযিল করেছেন ইসলাম তাকে মানুষের মতভেদ নিরসনকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ কেতাবের কাজ হলো মানুষের জীবন যাপনের জন্যে শুধু একটা মূলনীতি দান করা। তারপর জীবন আপন গতিতে

চলতে থাকে। যতোক্ষণ ওই মূলনীতির সাথে সংগতি ও সমন্বয় রেখে চলবে, ততক্ষণ তা হক ও ন্যায়ের অনুসারী থাকবে। আর যখন তা ওই মূলনীতির সাথে সংগতিহীন হবে এবং অন্যান্য মূলনীতির ভিত্তিতে চলবে, তখন তা হবে বাতিল ও ভ্রান্ত। সারা দুনিয়ার মানুষও ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে যদি তাতে খুশী থাকে, তবুও তা বাতিল ও ভ্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। মানুষ হক ও বাতিল নির্ণয়ের ক্ষমতা ও অধিকার রাখে না এবং মানুষ যা নির্ধারণ করে তা হক বা সত্য জীবন বিধান হবার যোগ্য হয় না। ইসলামী মতাদর্শের গোড়ার কথা এই যে, মানুষ যাই করুক, যাই বলুক এবং যে জিনিসকেই জীবন যাপনের ভিত্তি ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করুক, তা যদি কোরআনের বিরোধী হয়, তবে শুধু মানুষের বলা, করা বা গ্রহণ করার কারণে তা হক বা ন্যায় হয়ে যায় না। তা তার ধর্ম বা জীবন বিধানের মূলনীতি হয়ে যায় না কিংবা ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তব ব্যাখ্যা হিসাবেও তা মেনে নেয়ার যোগ্য হয় না। যুগ যুগ কাল ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা মেনে এসেছে বলেই তা ন্যায় সংগত হতে পারে না।

এ সত্য সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। কেননা ইসলামী মূলনীতিগুলোতে মানুষ যেসব অন্যায় ও অসত্যের মিশ্রণ ঘটায় তা থেকে তাকে ভেজালমুক্ত করতে হলে উপরোক্ত সত্য মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলামের ইতিহাসে বেশ কিছু বিকৃতি ঘটেছে। সেই বিকৃতি ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। তাই বলে বলা যাবেনা যে, বিকৃতি যখন ঘটে গেছে এবং জনগণ তা মেনেই নিয়েছে, তখন তাকে ইসলামের বাস্তব রূপ হিসাবেই বিবেচনা করা হোক। কক্ষনো নয়। ইসলাম এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত। যে জিনিস ভুলবশত ও বিকৃতিবশত চালু হয়ে এসেছে, তা যুক্তি প্রমাণ ও নযীর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন চায়, তার পক্ষে এইসব ভ্রান্তি ও বিকৃতিকে বাতিল ও বিলোপ করা ছাড়া উপায় নেই। তাকে সেই কেতাবের দিকে ফিরে আসতেই হবে যাকে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত সত্যসহ নাযিল করেছেন। যাতে সে মানুষের বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়ে দিতে পারে।

আধুনিক ফেরকাবাজির কারণ

এ কথা সুবিদিত সত্য যে, কোরআন নাযিল হওয়ার পরও মানুষ নানারকমের আবেগে তাড়িত হয়ে এখান থেকে ওখানে ভেসে গেছে। নানারকমের লোভ লালসা, ভয়ভীতি ও বিভ্রান্তি মানুষকে আল্লাহর কেতাবের নির্দেশ গ্রহণে বাধা দিয়েছে এবং এর নির্ভুল ও অকাট্য সত্য বিধানের কাছে ফিরে আসতে দেয়নি। এ বিষয়টাই আল্লাহ এভাবে বলেছেন,

'আল্লাহর বিধান নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে তারাই যারা আল্লাহর কেতাব পেয়েছে এবং তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণসমূহ এসে যাওয়ার পরই মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। কারণ তারা নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে।'

এই বাড়াবাড়িটা কি ধরনের? হিংসাজনিত বাড়াবাড়ি, লোভ-লালসাজনিত বাড়াবাড়ি কিংবা আবেগ ও প্রবৃত্তির বাসনাজনিত বাড়াবাড়ি। এসব বাড়াবাড়িই মানুষকে ইসলামের মূল আদর্শ ও জীবনবিধান সম্পর্কে মতভেদ, ও দ্বিধা সংশয়ে নিমজ্জিত রেখেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা, একগুঁয়েমি ও কলহ কোন্দল করতে প্ররোচিত করেছে।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আল্লাহর কেতাবের অকাট্য অভ্রান্তি ও মৌল বিধানের ব্যাপারে দু'জন ব্যক্তিও যদি মতভেদে লিপ্ত হয়, তবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তাদের একজন অথবা উভয়ের মনে সীমাতিক্রমের মনোভাব ও আবেগের বাড়াবাড়ি অবশ্যই রয়েছে। যদি নির্ভেজাল ঈমান থাকতো তবে মতৈক্য সৃষ্টি না হয়ে পারতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'অতপর ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তাদের মতভেদের বিষয়ের মধ্যে যেটি সত্য ও সঠিক তার সন্ধান দিয়েছেন আপন ইচ্ছাক্রমে।'

অর্থাৎ ঈমানদারদের হৃদয়ে যে সচ্ছতা, তাদের আত্মায় যে ঔজ্জ্বল্য এবং তাদের মনে যে সত্যানুসন্ধিৎসা থাকে, তার বদৌলতেই তাদেরকে সত্যের সন্ধান দিয়ে থাকেন। আর এ সময়ে তাদের সত্যের নাগাল পাওয়া এবং সত্যের নাগাল পাওয়ার পর তার ওপর অবিচল থাকা একেবারেই সহজ হয়ে যায়। কেননা,

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।'

এই সরল ও সঠিক পথ হচ্ছে আল্লাহর কেতাবেরই দেখানো পথ। এ হচ্ছে একমাত্র সত্য ও নির্ভুল লক্ষ্যের অনুসারী মত ও পথ। এ মত ও পথ আবেগ ও প্রকৃতির লালসা তাড়িত নয় এবং ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার ফসলও নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইচ্ছা করেন এবং যাদেরকে সরল ও সঠিক পথে চলার ও টিকে থাকার যোগ্য মনে করেন তাদেরকে এই সরল ও সঠিক পথ দেখান, তারাই ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে থাকে এবং তারাই সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী ও ভাগ্যবান, যদিও আল্লাহর মানদন্ডে পরিমাপ করতে যারা অভ্যস্ত নয় তারা তাদেরকে বঞ্চিত মনে করে এবং উপহাস করে, যেমন কাফেররা মোমেনদেরকে উপহাস করে থাকে।

মুসলিম সমাজ ও সংগঠনের সদস্যদের মনে একটি সুস্পষ্ট ও মযবুত ঈমানী চিন্তাধারা গড়ে তোলার মানসে এসব নির্দেশ দেয়ার কারণ ছিলো এই যে, তারা বাস্তবিক পক্ষে তাদের শত্রু ভাবাপন্ন মোশরেক ও আহলে কেতাবের সাথে এক সুতীব্র মতবিরোধে লিপ্ত ছিলেন এবং তার ফলে নানারকমের দুঃখ কষ্ট, বিপদ মুসিবত ও যুদ্ধ বিগ্রহে জর্জরিত হচ্ছিলেন।

জান্নাতের কন্টকাকীর্ণ পথ

এরপর তাদেরকে নতুন এক দিকনির্দেশনা শোনানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এ সব সংঘাত সংঘর্ষ ও বিপদ মসিবত নতুন কোনো ব্যাপার নয়—এগুলো আল্লাহর প্রাচীন রীতি। এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে যাচাই বাছাই ও সংশোধন করতে চান, যাতে তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে এবং তার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এখানে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ইসলামী আদর্শে যারা বিশ্বাসী, তাদেরকেই এ আদর্শের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুঃখকষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হবে। কখনো জয়, কখনো পরাজয়ের ভাগ্য বরণ করতে হবে। সব প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে যখন তারা তাদের আকীদা ও আদর্শে অবিচলতার পরিচয় দেবে এবং কোনো দুঃখ ভয় ভীতি ও যুলুম নির্যাতনে যখন তারা ঘাবড়াবে না বা টলবে না, তখনই তারা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হবে। কেননা তখন তারা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর দ্বীনের বিশ্বস্ত আমানতদার সুযোগ্য রক্ষক বিবেচিত হবে। তারা তখন বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হবে। কেননা তাদের আত্মা ভয়ভীতি, লাঞ্ছনা, দুনিয়ার লোভ-লালসা ও আরাম আয়েশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বেহেশতের কাছাকাছি ও পৃথিবীর হীনতা থেকে অনেক দূরে চলে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা তাই ২১৪ নং আয়াতে বলেছেন,

'তোমরা কি ভেবেছো যে, বেহেশতে চলে যাবে, অথচ এখনো তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো দুঃখ-দুর্দশা এলো না? তাদের ওপরে তো এতো দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নির্যাতন

এসেছে যে, তারা প্রকম্পিত হয়েছে, এমনকি রসূল ও তার সহযোগী মোমেনরা বলে উঠেছে যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে! হাঁ, শুনে রাখো, সাহায্য আসন্ন!'

আল্লাহ তায়ালা প্রথম মুসলিম সংগঠনটিকে এভাবেই সম্বোধন করেছেন। তিনি তাদের পূর্ববর্তী মোমেন দলগুলোর অভিজ্ঞতার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর প্রিয় বান্দাদের নির্বাচন ও বাছাই করতে কী নিয়ম অনুসরণ করে থাকেন, তাও জানিয়ে দিয়েছেন। যে বান্দাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পতাকা সমর্পণ করেন এবং যাদের কাছে নিজের দ্বীন ও শরীয়তকে আমানত রাখেন, তাদেরকে তিনি এভাবেই যাচাই-বাছাই করে থাকেন। আর এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে যারা মনোনীত হয়, তাদেরকে এভাবে সম্বোধন করা আল্লাহর চিরাচরিত রীতি।

বস্তুত এটা একটা গভীর, মহান ও ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। জানা কথা যে, আল্লাহর রসূল আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে থাকেন। তা সত্তেও আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সাথী মোমেনদের পক্ষ থেকে 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' এ প্রশ্ন উত্থাপন থেকে বুঝা যায় যে, দুঃখ নির্যাতন এতো চরমভাবে আঘাত হানে যে, আল্লাহঘনিষ্ঠ হৃদয়গুলোকেও কাঁপিয়ে তোলে, তাহলে তখন তা কী সাংঘাতিক ধরনের হয়ে থাকে? সে নির্যাতন কখনো ভাষায় বর্ণনার যোগ্য হতে পারে না। সে নির্যাতন ওইসব মহৎ হৃদয়গুলোর ওপর এমন প্রভাব ফেলে যে, তা থেকে এই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন স্বতস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে! 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?'

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ লোমহর্ষক নির্যাতনের ওপর প্রবোধ দেয়া হয় এবং সেই সময়ই আল্লাহর সাহায্য নাযিলের মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। 'হাঁ, শুনে রাখো আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।'

বস্তুত আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যে সঞ্চিত ও গচ্ছিত রয়েছে যারা তার যোগ্যতা অর্জন করে। যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকতে পারে কেবল তারাই এর যোগ্যতা অর্জন করে। সকল দুঃখ কষ্ট ও যুলুম নিপীড়ন হাসিমুখে বরদাশত করে। নির্যাতনের শত ঝড় তুফানেও মাথা নোয়ায় না। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোনো কার্যকর সাহায্য নেই এবং তা কেবল আল্লাহর ইচ্ছামতোই এসে থাকে, আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নির্যাতনের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেও তারা কেবল আল্লাহর সাহায্যেরই প্রতীক্ষা করতে থাকে, অন্য কোনো সাহায্য বা সমাধানের অপেক্ষা করে না।

একমাত্র এই গুণবৈশিষ্ট্যের কারণেই মোমেনরা বেহেশতে যায়। জেহাদ, নির্যাতনের অগ্নিপরীক্ষা, ধৈর্য সহিষ্ণুতা, আল্লাহর জন্যে নির্ভেজাল আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, একমাত্র তার প্রতি নিবিষ্ট হওয়া এবং তিনি ছাড়া আর সব কিছুর প্রতি উদাসীনতা–এই গুণাবলীর বদৌলতেই তারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।

বস্তুত যুলুম-নিপীড়ন ও সংঘাত সংঘর্ষের ওপর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অবিচলতাই মানুষের মনকে এমন বল, দৃঢ়তা, তেজস্বীতা, এত উচ্চতা, এত পবিত্রতা, এত ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা দান করে। আর মোমেনের বিশ্বাস ও আদর্শকে এত গভীরতা, সজীবতা ও অনমনীয়তা দান করে যে, তা তাদের শত্রুদের চোখেও চক্চকে ও জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে ওঠে। আর এর ফলেই তারা

একপর্যায়ে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং সত্য মিথ্যার সংঘাতের প্রতিটি ঘটনায় এরূপ ঘটে থাকে। প্রথম প্রথম তাদেরকে দুঃসহ যুলুম নির্যাতন সইতে হয়। অবশেষে এমন এক সময়ও আসে, যখন মোমেনরা সংঘাতে লিপ্ত জেনেও মোমেনদের সত্যনিষ্ঠা ও অবিচলতা দেখে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এক সময়কার কট্টর দুশমন পরম সহযোগী ও অন্তরংগ বন্ধুতে পরিণত হয়।

কিন্তু এই আপাত সাফল্য যদি নাও আসে, তথাপি এর চেয়েও বড় সাফল্য তাদের জন্যে অবধারিত। সেটি এই যে, ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীরা পৃথিবীর সকল শক্তির ক্ষতিকর প্রভাব ও তাদের পাতা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়ার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ শান্তি, লোভ লালসা এমনকি শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার জীবনের লালসার গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে। এই মুক্তি সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক দুর্লভ প্রাপ্তি। আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করে যারা এটা অর্জন করে তাদের জন্যে এটা একটা বিরাট সাফল্য। এ সাফল্য মোমেনদের সকল দুঃখ-কষ্ট ও যুলুম নিপীড়নের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত রক্ষার যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তা রক্ষায় তারা সফলকাম হয়ে থাকে। আর এই সাফল্য ও মুক্তি প্রকৃতপক্ষে বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি, এটাই বেহেশতের পথ। সর্বকালের সকল প্রজন্মের মুসলমানদের জন্যে এই চেষ্টা সাধনা, এই জেহাদ ও ঈমানী দৃঢ়তা, এই যুলুম নির্যাতন, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা—এগুলোই বেহেশতের পথ। এ সব বিষয়ে সাফল্য লাভের পরই আসে আল্লাহর সাহায্য এবং আল্লাহর অগাধ ও অসীম নেয়ামত।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ

فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ

تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ

فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ۙ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ

২১৫. তারা তোমার কাছে জানতে চাইবে তারা কি (কি খাতে) খরচ করবে, তুমি (তাদের) বলে দাও, যা কিছুই তোমরা তোমাদের পিতামাতার জন্যে, আত্মীয় স্বজনদের জন্যে, এতীম অসহায় মেসকীনদের জন্যে এবং মোসাফেরের জন্যে খরচ করবে (তাই আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন); যা ভালো কাজ তোমরা করবে আল্লাহ তায়ালা তা অবশ্যই জানতে পারবেন। ২১৬. (ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর এটাই তোমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু (তোমাদের জেনে রাখা উচিত,) এমনও তো হতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, কিন্তু (পরিণামে) তা হবে তোমাদের জন্যে (খুবই) ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

রুকু ২৭

২১৭. সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা অনেক বড়ো গুনাহর কথা; (কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বড়ো গুনাহ হচ্ছে), আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া, আর (আল্লাহদ্রোহিতার) ফেতনা ফাসাদ হত্যাকান্ডের চাইতেও অনেক বড়ো (অন্যায়; এ কারণেই) এরা তোমাদের সাথে (এ মাসসমূহে) লড়াই বন্ধ করে দেবে বলে (তুমি) ভেবো না, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (ইসলামী) জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে;

يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا اُولٰٓئِكَ
يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط
قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۵ قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط
قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায়, অতপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমন অবস্থায় যে, সে (সুস্পষ্ট) কাফের ছিলো, তাহলে তারাই হবে সে লোক যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ২১৮. যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভের আশা করতে পারে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু! ২১৯. (হে নবী,) এরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; তুমি (তাদের) বলে দাও, এ দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড়ো ধরনের পাপ রয়েছে, (যদিও) মানুষের জন্যে (এতে) কিছু (ব্যবসায়িক) উপকারিতাও রয়েছে; কিন্তু এ উভয়ের (ধ্বংসকারী) গুনাহ তার (ব্যবসায়িক) উপকারিতার চাইতে অনেক বেশী; তারা তোমাকে (এও) জিজ্ঞেস করে, তারা (নেক কাজে) কি কি খরচ করবে; তুমি তাদের বলো, (দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পর) যা অতিরিক্ত (তাই); আল্লাহ তায়ালা এভাবে তোমাদের জন্যে (তাঁর) আয়াতসমূহ খুলে খুলে বলে দেন, যাতে করে তোমরা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারো, ২২০. (এ নির্দেশ তোমাদের) ইহকাল ও পরকালের (কল্যাণের) জন্যেই; তোমাকে তারা এতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো, তাদের জন্যে (গৃহীত সব পন্থাই) উত্তম; যদি তোমরা (তোমাদের ধন সম্পদ) তাদের সাথে মিশিয়ে ফেলো (তাতে কোনো দোষ নেই, কারণ), তারা তো তোমাদেরই ভাই; আর আল্লাহ তায়ালা (এটা) ভালো করেই জানেন, (কে) ন্যায়ানুগ (পন্থায় আছে আর কে) ফাসাদী (স্বভাবের লোক), আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এ ব্যাপারে) আরো অধিক কড়াকড়ি আরোপ করতে পারতেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহান ক্ষমতাবান কুশলী।

তাফসীর

আয়াত-২১৫-২২০

সূরা আল বাকারার এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শরীয়তের কতিপয় বিধি ও মাসয়ালা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা। ইতিপূর্বে আমি চাঁদ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বলে এসেছি যে, এই বৈশিষ্ট্যটি তৎকালীন মুসলমান সমাজের আদর্শ সচেতনতা, মুসলিম সমাজের মনের ওপর ইসলামী আদর্শের প্রাধান্য এবং তাদের যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর হুকুম জানার আগ্রহ কতো প্রবল ছিলো, তা নির্দেশ করে। এ আগ্রহের কারণ ছিলো এই যে, তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম যেন তাদের আকীদা ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সে জন্যে তারা অত্যন্ত ব্যাকুল ও সতর্ক থাকতো। আর এই ব্যাকুলতা ও সতর্কতাই হলো মুসলমানিত্বের আলামত। মুসলমানের লক্ষণ হলো, সে প্রত্যেক ছোট বড়ো ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি তা জানার জন্যে ব্যগ্র থাকবে। সে কোনো কাজের ব্যাপারে ইসলামের বিধান না জানা পর্যন্ত সেদিকে পা-ই বাড়াবে না। ইসলাম যেটুকু অনুমোদন করে সেটুকুই হবে তার আইন ও সংবিধান। আর যেটুকু অনুমোদন করবে না সেটুকু হবে তার জন্যে নিষিদ্ধ ও হারাম। এই সচেতনতা ও সংবেদনশীলতাই এই আকীদা ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের আলামত বা চিহ্ন।

কিছু কিছু প্রশ্ন ইহুদী ও মোনাফেকদের ষড়যন্ত্রমূলক প্ররোচনার কারণেও করা হতো। কিছু কিছু প্রশ্নের পেছনে মোশরেকদের প্ররোচনারও হাত থাকতো। এ সব প্ররোচনার প্রভাবে মুসলমানরা প্রশ্নগুলো করতে উদ্বুদ্ধ হতো। কখনো তাদের উদ্দেশ্য থাকতো এসব বিধির প্রকৃত স্বরূপ ও তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, কখনো ওইসব অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্ররোচনা ও অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের মনে এসব প্রশ্নের জন্ম হতো। কোরআন এসব প্রশ্নের অকাট্য জবাব দিয়ে একদিকে যেমন মুসলমানদের বিশ্বাসকে আরো মযবুত ও আরো দৃঢ় করতো, অপরদিকে তেমনি ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রকেও নস্যাত করে দিতো।

এইসব প্রশ্নের উত্তর থেকে একথাও জানা যেতো যে, কোরআন মোমেনদের মনকে সংশয়মুক্ত এবং তাদের সমাজকে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র মুক্ত করতে কিভাবে সংগ্রাম চালাতো। সূরার এ অংশটিতে যে প্রশ্নগুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অর্থ ব্যয়ের স্থান, পরিমাণ ও ব্যয়যোগ্য অর্থের প্রকৃতি ও ধরণ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী। তা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ, মদ ও জুয়া এবং এতিমদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এসব প্রশ্নের কারণও আমরা ইতিপূর্বে যে সব কারণ বিশ্লেষণ করেছি তার অনুরূপ। আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার সময়ে এ সব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করবো।

উত্তম সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা

২১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কী ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও যে, তোমরা যা কিছু উত্তম সম্পদ ব্যয় করো, তা পিতামাতার জন্যে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্যে, এতীমদের জন্যে, দরিদ্রদের জন্যে এবং পথিকের জন্যে। আর তোমরা যা কিছু ভালো কাজ করো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।'

এই প্রশ্নের আগেও দান সদকা করা সম্পর্কে বহু আয়াত নাযিল হয়েছিলো। বস্তুত ইসলাম যে পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং মুসলিম সমাজকে যে কঠিন বিপদ মুসিবত ও যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তার প্রেক্ষাপটে অর্থসম্পদ ব্যয় ও দান করা মুসলমানদের সামষ্টিক

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিলো। অন্য একটি দিক দিয়ে এটি জরুরী ছিলো। সেটি হলো, মুসলিম সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক একাত্মতা, সংহতি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান এবং পারস্পরিক মানসিক ব্যবধান ঘুচানোর স্বার্থে এটি অত্যাবশ্যক ছিলো। এই অর্থ ব্যয় দ্বারা ব্যবধান না ঘুচালে মুসলমানদের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারতো না যে, তারা পরস্পরে একই দেহের অংগের মতো। তাদের কেউ একে অপরের কাছে পর নয় এবং কেউ কাউকে প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত নয়। এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করা সচেতনভাবে সমাজ গড়ে তোলার জন্যে অত্যাবশ্যক ছিলো। অনুরূপভাবে প্রত্যেকের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করা কার্যকরভাবে সমাজ গড়ে তোলার জন্যে জরুরী।

মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, 'তারা কী ব্যয় করবে?' এ প্রশ্ন আসলে ব্যয়যোগ্য অর্থের প্রকৃতি সংক্রান্ত। এর যে জবাব দেয়া হয়েছে, তাতে ব্যয়ের প্রকৃতি এবং কাদেরকে দানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'যা কিছু উত্তম সম্পদ তোমরা ব্যয় করে থাকো।'

আয়াতের এ অংশটুকুতে দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত যা ব্যয় করা হয় তা উত্তম ও কল্যাণকর। দাতার জন্যেও কল্যাণকর, গ্রহীতার জন্যেও কল্যাণকর, সমাজের জন্যেও কল্যাণকর এবং মূলতই তা কল্যাণকরই বটে। বস্তুত অর্থ ব্যয় করা বা দান করা একটা মহৎ কাজ, মহানুভবতার কাজ, পরোপকারমূলক কাজ। দ্বিতীয়ত, দানকারীকে ভেবে দেখতে হবে যে, তার কাছে সর্বোত্তম সম্পদ কী আছে, অতপর তা থেকে দান করতে হবে। তার কাছে যে সর্বোত্তম সম্পদ আছে, তাতে অন্যদেরকে শরীক করবে। বস্তুত অভাবী মানুষকে দান করলে মন পবিত্র হয়, প্রবৃত্তি সংশোধিত হয় এবং সেই সাথে পরোপকারও সাধিত হয়। বিশেষত পবিত্র ও উত্তম সম্পদ দান করলে মনের পবিত্রতা ও প্রভৃতির সংশোধন আরো উত্তমভাবে কার্যকর হয়। আর এতে বাড়তি যে মহত্ব দেখানো হয় তা হলো নিজের সর্বোত্তম সম্পদে অন্যকে অংশীদার করার ত্যাগ ও কোরবানী করা হয়।

দান সদকা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ

মানুষকে আল্লাহর পথে সর্বোত্তম সম্পদই দান করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিজের মালিকানাভুক্ত মধ্যম ধরনের সম্পদ থেকে দান করা উচিত, নিকৃষ্টতম সম্পদ থেকেও নয়, সবচেয়ে দামী সম্পদ থেকেও নয়। তবে এ আয়াতে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, মনকে সর্বোত্তম সম্পদও দান করতে প্রস্তুত করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। মানসিক প্রশিক্ষণের কোরআনী রীতির লক্ষ্য হলো, প্রিয়তম সম্পদ দান করা যেন মোমেনের পছন্দনীয় কাজে পরিণত হয়। ব্যয়ের ধরন বর্ণনা করার পর ব্যয় করার পন্থা এবং কাকে কাকে দেয়া উচিত তার বিবরণ আসবে। বলা হচ্ছে,

'পিতামাতার জন্যে, নিকট আত্মীয়দের জন্যে, এতীমদের জন্যে, দরিদ্রদের জন্যে এবং পথিকদের জন্যে।'

এ বাক্যটিতে দানকে মানুষের কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক ও বন্ধন স্থাপনের মাধ্যম রূপে দেখানো হচ্ছে। এর কোনো শ্রেণীর সাথে রয়েছে দাতার বংশীয় সম্পর্ক, কোনো শ্রেণীর সাথে রক্তের সম্পর্ক, কোনোটির সাথে দয়া-দাক্ষিণ্য ও স্নেহ মমতার সম্পর্ক এবং কোনোটির সাথে বৃহত্তর মানবতার সম্পর্ক। তবে সব সম্পর্কই যে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের নির্দেশেই মযবুত করতে চাওয়া হচ্ছে, তা সুস্পষ্ট। একটিমাত্র আয়াতেই এদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পিতামাতা, নিকট আত্মীয়, এতীম, মেসকীন (দরিদ্র) ও পথিক এরা সবাই ইসলামী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে একাত্ম ও একসূত্রে গ্রোথিত হয়েছে।

তবে এ আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে দান গ্রহীতাদের যে ধারাবাহিকতা দেখা যায়, বিভিন্ন হাদীসে একে আরো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) এক ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি নিজেকে দিয়ে দান করা শুরু করো। আগে নিজেকে দান করো। তারপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা তোমার আত্মীয়দের, তারপর যদি কিছু কিছু বাঁচে তবে তা এভাবে এভাবে .....'

এই ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মনকে নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণ দানে ইসলাম কত সহজ সরল ও বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। মানুষকে সে তার যাবতীয় স্বভাবসুলভ আবেগ অনুভূতি, ঝোঁক প্রবণতা এবং ক্ষমতা ও যোগ্যতা সহকারে গ্রহণ করে। অতপর তাকে তার নিজস্ব অবদান থেকে একটু একটু করে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে নিয়ে যায় অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে।

তাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে, তার স্বভাবসুলভ ঝোঁক, আবেগ ও চাহিদা পূরণ করে, তার জীবনকে স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে দিয়ে এমনভাবে তাকে উর্ধে আরোহন করায় যে, সে কোনো অস্বাভাবিক দুঃখ ও ক্লেশ অনুভব করে না, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গলায় শেকল পরানো হয়না। তার স্বভাবগত আবেগ ও শক্তিগুলোকে দাবিয়ে দেয়া ও ক্ষুণ্ন করা হয় না। তাকে টেনে হেঁচড়ে তোলা হয় না, বরং অত্যন্ত সহজভাবে ও কোমলভাবে তাকে টেনে তোলা হয়। তবে পা থাকে মাটিতে দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে, হৃদয় থাকে উর্ধজগতের দিকে নিবিষ্ট এবং আত্মা থাকে মহান আল্লাহর সাথে নিবদ্ধ। এরূপ অবস্থায় তাকে ওপরের দিকে আরোহন করানো হয়।

আল্লাহর ভালোভাবেই জানা আছে যে, মানুষ নিজেকে খুবই ভালোবাসে। তাই তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্যকে দান করার আগে সে যেন নিজের চাহিদা পূরণ করে। তাই তিনি তার জন্যে মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা ও দাম্ভিকতা পরিহার সাপেক্ষে পর্যাপ্ত হালাল জীবিকা উপার্জন ও ভোগের উৎসাহ দিয়েছেন। নিজের চাহিদা পূরণের আগে অন্যকে দান সদকা করার কাজ শুরুই হতে পারে না। রসূল (স.) বলেছেন, যে দান নিজের প্রয়োজন পূরণের পর শুরু হয়, সেটাই সর্বোত্তম দান। ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভাল। তুমি যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্বশীল, তাদের দিয়ে দান শুরু করো। (মুসলিম)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ডিম্বাকৃতির এক খন্ড স্বর্ণ নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, একটি খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি। এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই। এটা নিন। এটি আমার পক্ষ থেকে সদকা। রসূল (স.) তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। তারপর সে আবার ডান দিক থেকে তাঁর সামনে এলো এবং আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তিনি আবার ঘুরে বসলেন। তারপর সে আবার বাম দিক থেকে তাঁর সামনে এলো এবং আগে যে কথা বলেছিলো তার পুনরাবৃত্তি করলো। তারপর সে পুনরায় তাঁর পেছন দিক এসে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। এবার রসূল (স.) সেটা হাতে নিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলেন যে, তার গায়ে লাগলে সে ব্যথা পেতো। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ কেউ এরূপ যে, তার যা কিছু আছে তাই নিয়ে এসে বলে যে, এই নিন সদকা। তারপর সে মানুষের কাছে হাত পাতে। নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর যে সদকা দেয়া হয় সেটাই উৎকৃষ্ট সদকা।' (আবু দাউদ)

আল্লাহর এও জানা আছে যে, মানুষ অন্য সকলের চেয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে বিশেষত আপন জনদেরকে, নিজের ওপর নির্ভরশীলদেরকে এবং পিতামাতাকে বেশী ভালোবাসে। তাই তিনি তাকে তার নিজ সত্ত্বার পরই এক কদম এগিয়ে নিয়ে তার এইসব প্রিয় ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে যান, যাতে সে তাদেরকে সানন্দে দান করতে পারে। এতে করে তার একটা স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হয়। এ চাহিদা সম্পূর্ণ নির্দোষ তো বটেই, উপরন্তু এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও গভীর প্রাজ্ঞতা। একই সাথে সে নিজের নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতম লোকদের অভাব ও চাহিদা পূরণ করার সুযোগ পায়। এসব লোক শুধু যে তার আত্মীয় তা নয়, তারা জাতিরও একটা অংশ। তাদেরকে যদি দান না করা হয় তবে তারা পরমুখাপেক্ষী হবে। আপনজনদের কাছ থেকে দান-দাক্ষিণ্য গ্রহণ করা তাদের জন্যে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করা অপেক্ষা সম্মানজনক। সেই সাথে এতে আপনজনদের মধ্যে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটে এবং বৃহত্তর মানবতার ভিত্তি হিসাবে আল্লাহ তায়ালা যে পরিবারকে গড়ে তুলতে চান, তাকে মযবুত করা সম্ভব হয়।

আল্লাহ তায়ালা আরো জানতেন যে, মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের পর শ্রেণীভেদে ও স্তর ভেদে সকল আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিজের প্রীতি ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করে থাকে। এটাও দোষণীয় কিছু নয়। তারা সকলেই সমাজ ও জাতির অংশ। তাই ইসলাম তার নিকটাত্মীয়দের পরে সকল পর্যায়ের আত্মীয়কে দান করতে তাকে উৎসাহিত করেছে। এতেও তার স্বভাবসূলভ আবেগ ও ভালোবাসার স্ফূরণ ঘটে এবং ওই সকল আত্মীয়ের অভাবও পূরণ হয়। এভাবে দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথেও সম্পর্ক মযবুত হয় এবং মুসলিম সমাজের ঐক্য দৃঢ় হয়।

মানুষের সম্পদের কিছু অংশ এইসব আপনজনদের বিতরণ করার পর এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের পর ইসলাম তাকে বৃহত্তর মানব সমাজের কতিপয় শ্রেণীর কাছে নিয়ে যায়, তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা তার মধ্যে দয়া ও করুণার উদ্রেক করে এবং তাদের দুঃখ কষ্টকে ভাগ করে নেয়ার মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। এ শ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে দুর্বল, এতিম শিশু, অতপর সেইসব অভাবী মানুষ, যাদের ভরণপোষণের উপযোগী সম্পদ নেই অথচ তারা আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার খাতিরে চাইতেও পারে না। তারপর রয়েছে সেইসব পথিক, যাদের হয়তো অর্থ সম্পদ আছে কিন্তু প্রবাসে থাকায় তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং তাদের সেই সম্পদ ব্যবহার করার পথে বিস্তর বাধা রয়েছে। মদীনার মুসলিম সমাজে এমন অনেকে ছিলো, যারা মক্কায় তাদের যথাসর্বস্ব ফেলে হিজরত করে এসেছে। তারা সবাই সমাজের সদস্য।

ইসলাম সচ্ছল লোকদেরকে আহবান জানায় তাদের ভরণ পোষণে সাহায্য করার এবং এজন্যে তাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। এভাবে সে অতি সহজে তার সকল উদ্দেশ্য সফল করে। প্রথমে সে সচ্ছল লোকদের মনকে পবিত্র করে ও প্রস্তুত করে, যাতে সে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অভাবীদেরকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করতে সম্মত হয়। তারপর সে কার্যকরভাবে এইসব অভাবী লোকদেরকে দান করতে ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। অতপর সে সমগ্র সমাজকে সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তার মনোভাবে উজ্জীবিত করে আর তা করে কেবল সমাজের কোনো ক্ষয়ক্ষতি সাধন না করে এবং তার ওপর কোনো কড়াকড়ি ও বল প্রয়োগ না করেই। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলকভাবে সে এই কল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে।

অতপর এই সমগ্র জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে সে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে। সকল দান দাক্ষিণ্য ও দয়া-সহানুভূতিকে সে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। এ কথাই আয়াতের শেষাংশে এভাবে বলা হয়েছে,

'তোমরা যা কিছু কল্যাণমূলক কাজ করো, আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।'

অর্থাৎ এই কাজ সম্পর্কেও তিনি অবহিত, এই কাজের পেছনে যে সৎ নিয়ত সদুদ্দেশ্য ও উদার মনোভাব সক্রিয় রয়েছে, তাও তিনি জানেন। তাই এ সব দান দাক্ষিণ্য বিফলে যায় না। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ সবের হিসাব রাখেন ও সংরক্ষণ করেন। কাজেই তার কাছে কোনো সৎ কাজ বিফল হতে পারে না। তিনি মানুষের কোনো ক্ষতি বা তার ওপর কোনো যুলুম করেন না। আবার কেউ তাকে প্রদর্শনী বা রিয়াকারীর মাধ্যমে ধোঁকাও দিতে পারে না।

এভাবে মানুষের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করা হয়। আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ করা হয় সবাইকে। অত্যন্ত সহজে ও অকৃত্রিমভাবে এ কাজ করা হয়। এ হচ্ছে মহাজ্ঞানী আল্লাহর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং এর ভিত্তিতেই ইসলাম তার সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে এত উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, যেখানে মানব জাতি আর কখনো পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। আর সেই উচ্চতম লক্ষ্যে সে কেবল এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই পৌঁছতে পারে।

ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব

আর এই প্রশিক্ষণের পথ ধরেই ইসলাম মানুষকে জেহাদের ফরয আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যে তার আলোচনা আল্লাহর পথে ব্যয়ের পরপরই এসেছে।

২১৬ নং আয়াত লক্ষ্য করুন,

'তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। কখনো কখনো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করে থাক অথচ তা তোমাদের জন্যে ভালো। আবার কখনো কখনো তোমরা কোনো জিনিস পছন্দ করে থাকো অথচ তা তোমাদের জন্যে মন্দ। বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা খুবই কষ্টকর একটা ফরয কাজ। কিন্তু কষ্টকর হলেও তা অবশ্য করনীয় ফরয। কেননা তাতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে, মুসলমান সমাজের জন্যে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এবং স্বয়ং সত্য ও ন্যায়ের জন্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।

ইসলাম যেহেতু স্বভাব ও প্রকৃতির বিধান। তাই এই ফরয আদায় করা যে স্বাভাবিকভাবেই কষ্টকর, তা অস্বীকার করে না এবং তাকে খাটো করেও দেখে না। আর মানুষের মন যে এই কাজটিকে স্বভাবতই কঠিন মনে করে ও অপছন্দ করে, সেটাও সে অগ্রাহ্য করে না। স্বভাব ও প্রকৃতির দাবী সম্পর্কে ইসলাম কোনো বিতর্কে লিপ্ত হয় না, তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি যেহেতু অনস্বীকার্য তাই তাকে সে নিষিদ্ধও করে না।

কিন্তু সে অন্যভাবে তার চিকিৎসা করে তাকে সে নতুন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে। সে বলে যে, কিছু কিছু ফরয কাজ এমন আছে, যা পালন করা কষ্টকর এবং তাই অপছন্দনীয়। তবে তার পেছনে এমন মহৎ উদ্দেশ্য এবং প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কল্যাণকারিতা রয়েছে, যা তার কষ্টকে লাঘব করে দেয়। তা দ্বারা এমন প্রচ্ছন্ন কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে, যা মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা নাও পড়তে পারে। এরপর সে মানুষের মনে একটা জানালা খুলে দেয়, যার ভেতর দিয়ে সে ওই ফরয কাজটিকে অন্যভাবে দেখতে পায়। সে এখন বুঝতে পারে যে, অপছন্দনীয় ও কষ্টকর কাজের মধ্যেও কল্যাণ থাকতে পারে এবং পছন্দনীয় কাজেও অকল্যাণ থাকতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী, পরিণামদর্শী ও অদৃশ্য আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন, অথচ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

এভাবে যখন সে আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং বিশ্বাস ও সন্তোষের মধ্য দিয়ে কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয়। তখন সকল কঠিন কাজই তার কাছে সহজ হয়ে যায়।

এভাবেই ইসলাম স্বভাব ও প্রকৃতিকে জয় করে। স্বভাবসুলভ আবেগ ও চাহিদাকে সে অস্বীকারও করে না। আবার কেবল গায়ের জোরেও কঠিন কাজের আদেশ চাপিয়ে দেয় না। সে মানুষকে আনুগত্যের প্রশিক্ষণ দেয়, তাকে কল্যাণকর কাজের জন্যে ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করতে সম্মত করে। মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা সম্পর্কে তাকে সচেতন বানায়। যিনি তার দুর্বল স্থানগুলো চেনেন এবং তার ফরয করা কাজ সম্পাদনে কেমন কষ্ট হয় তা বুঝেন। ফলে তার অক্ষমতায় তাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ও সাহায্য করেন।

এভাবেই ইসলাম মানব প্রকৃতিকেও বিকশিত করে। ফলে দায়িত্বের মুখোমুখি হয়ে মানুষ ঘাবড়ে যায় না। কষ্ট দেখে সে কাপুরুষের মতো পলায়নপর হয় না। সে বরং আল্লাহর সাহায্যের ওপর আশাবাদী ও আস্থাশীল হয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কষ্ট ও পরিশ্রমের ওপর অবিচল থাকে। কেননা সে জানে যে, কষ্টের পর শান্তি ও কল্যাণ আসতে পারে। সে কেবল আরাম আয়েশের জন্যে লালায়িত হয় না। কেননা আরাম আয়েশের পেছনে অনুশোচনা ও ব্যর্থতা লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়। প্রিয় জিনিসের পেছনে অপ্রিয় জিনিস এবং লোভনীয় জিনিসের ভেতরে ধ্বংস লুকিয়ে থাকতে পারে।

বস্তুত এটা একটা বিস্ময়কর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। সহজ সরল অথচ গভীর পদ্ধতি। মানব মনের অভ্যন্তরে যে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল গ্রন্থি রয়েছে, তা এখানে খোলাখুলিভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কোনো রাখঢাক করা হয়নি কিংবা কোনো মিথ্যা আশ্বাসও দেয়া হয়নি। বস্তুত স্থুল দৃষ্টিসম্পন্ন দুর্বল মানুষ যে কখনো কখনো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করে থাকে অথচ তা আগাগোড়াই কল্যাণকর হয়ে থাকে, সে কথা অকাট্য সত্য। আবার এমন অনেক জিনিস রয়েছে যাকে মানুষ খুবই ভালোবাসে এবং তার জন্যে মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে, অথচ তা তার জন্যে ঘোরতর অকল্যাণকর। প্রকৃত সত্য যে একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং মানুষ তা জানে না সে কথা অনস্বীকার্য। মানুষ কি করে জানবে কিসের পরিণাম কী এবং কিসের আড়ালে কী লুকিয়ে আছে? আবেগ, অজ্ঞতা ও স্থুল দৃষ্টিতে যে সত্য ধরা পড়ে না, সে সত্যকে মানুষ কি করে আয়ত্তে আনবে?

মানুষের মন সম্পর্কে অন্তর্যামী আল্লাহর এই বিশ্লেষণ তার সামনে একটা আলাদা জগতের দ্বার উন্মোচন করে। সে জগত তার চর্মচক্ষুর দেখা বর্তমান সীমাবদ্ধ জগত থেকে ভিন্ন। এ বিশ্লেষণ তার সামনে এমন কতগুলো কার্যকারণ প্রকাশ করে দেয়, যা বিশ্ব চরাচরের অভ্যন্তরে সক্রিয় রয়েছে, যা তার ধারণা ও আকাংখার বিপরীত ফলাফল জন্ম দেয় এবং পরিস্থিতিকে ওলট পালট করে দেয়। মানুষের মন যখন আল্লাহর উক্ত বিশ্লেষণকে মেনে নেয় এবং ভাগ্যের ফয়সালার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়। সে কাজ করে কাজের সুফলের আশা করে আবার অজানা আশংকায় শংকিতও থাকে। কিন্তু সর্বাবস্থায় সে যাবতীয় বিষয়কে মহাজ্ঞানী আল্লাহর সুদক্ষ সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হাত এবং সর্বব্যাপী নির্ভুল জ্ঞানের আওতাধীন করে দিয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। ব্যাপকতর অর্থে এটাই ইসলামের পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার শামিল।

বস্তুত মানুষের মন যতক্ষণ এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল না হবে যে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত এবং আল্লাহকে কোনোরূপ যাচাই পরীক্ষা না করে ও তার কাছে কোনো রূপ যুক্তি প্রমাণ না চেয়ে নির্বিবাদে ও অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর আনুগত্য করাতেই মানুষের সার্বিক ও পরিপূর্ণ কল্যাণ নিহিত, ততোক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি কি জিনিস তা উপলব্ধি করতে পারে না।

অচল অটল বিশ্বাস ও আস্থা, প্রশান্ত ও দৃঢ় আশা এবং সুনিশ্চিত লক্ষ্যে চেষ্টা সাধনা এ তিনটি জিনিসই হচ্ছে ইসলামের ও শান্তির দরজা। এই দরজা দিয়ে সর্বতোভাবে প্রবেশ করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে আহবান জানান। আর এখানে প্রবেশ করার জন্যে তিনি তাদেরকে এরূপ সহজ সরল, গভীর ও বিস্ময়কর পন্থায় পথ প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত কোমলভাবে ও প্রশান্তভাবে পথ প্রদর্শন করেন। এমনকি তিনি যখন সশস্ত্র জেহাদ বা কেতাল ফরয করেন তখনও এই পদ্ধতিতেই শান্তির দিকে পথ প্রদর্শন করেন। কেননা প্রকৃত শান্তি হলো আত্মা ও বিবেকের শান্তি, চাই তা যুদ্ধের ময়দানেই হোক না কেন।

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতে বিধৃত এই নির্দেশনা শুধুমাত্র জেহাদের ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কেননা জেহাদ তো এমন একটা জিনিস, যাকে মানব মন অপছন্দ করে কিন্তু তার পশ্চাতে থাকে বৃহত্তর কল্যাণ। তাই এ নির্দেশনা মোমেনের সমগ্র জীবন জুড়ে বিস্তৃত। জীবনের সকল ঘটনা ও কর্মকান্ডে তা প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের কোথায় কল্যাণ আর কোথায় অকল্যাণ তা সে জানে না। বদরের যুদ্ধের দিন মোমেনদের যে দল যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে পড়েছিলো, তারা মক্কা থেকে আসা উত্তেজিত ও সশস্ত্র লড়াকু কোরায়শ সেনাদলের মুখোমুখী হতে চাননি। তারা চেয়েছিলেন সিরিয়া থেকে ফিরে আসা কোরায়শ বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে।

শত্রুর যে দলটিকে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের পদানত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই দলটি তাদের বাণিজ্যিক দল হোক এটাই তারা কামনা করছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বাণিজ্যিক কাফেলাকে পালানোর সুযোগ করে দিলেন এবং তাদেরকে কোরায়শের লড়াকু দলটির মুখোমুখী করলেন। এর ফলে সেই মহাবিজয় সংঘটিত হলো যার তূর্যনিনাদ সমগ্র আরব উপদ্বীপে বেজে উঠলো এবং যা ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করলো। মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিজয় নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। বাণিজ্যিক কাফেলাকে জয় করলে এ মহাবিজয় কোথা থেকে আসতো? আর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে সাফল্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, মোমেনদের ইপ্সিত সাফল্য কেমন করে তার সমকক্ষ হতো? না, তা কিছুতেই হতো না। কেননা মানুষ অজ্ঞ আর আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

হযরত মূসা (আ.)-এর সহযাত্রী ছেলেটি তাদের উভয়ের আহারের জন্যে রান্না করা মাছটি পথিমধ্যে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিলো। মাছটি তাদের সেই বিশ্রামের জায়গা থেকে জ্যান্ত হয়ে নদীতে ভেসে গেলো। এর পরবর্তী ঘটনা সূরা কাহফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'বিশ্রামের স্থান অতিক্রম করে কিছুদূর যাওয়ার পর মূসা (আ.) তার সহচর ছেলেটিকে বললো, আমাদের খাবার নিয়ে এসো। এই সফরে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছি। সে বললো, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, সেই পাথরটির ওপর যখন আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটি ভুলে রেখে এসেছি? শয়তান ছাড়া আর কেউ আমাকে তার কথা ভুলায়নি। তারপর বিস্ময়করভাবে মাছটি সমুদ্রের পথে চলে গেলো। মূসা বললো,

'ওই তো! ওটাই তো আমরা খুঁজছি।' তারপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে পেছনের দিকে ফিরে গেলো। তারপর আমার এক বান্দার সাক্ষাত পেলো। ......'

আর এই সাক্ষাতের জন্যেই মূসা (আ.) বেরিয়েছিলেন। মাছের ঘটনাটা না ঘটলে তারা ফিরতেন না এবং তাদের গোটা সফরের উদ্দেশ্যই পন্ড হয়ে যেতো।

প্রত্যেক মানুষই চিন্তাভাবনা করলে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় ও জীবনে এমন বহু অবাঞ্ছিত ও অপছন্দনীয় জিনিসের সন্ধান পেতে পারে, যার পশ্চাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আবার এমন অনেক আনন্দময় জিনিসেরও সন্ধান পেতে পারে, যার পেছনে ভয়ংকর বিপদ ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। অনেক কাংখিত জিনিস হারিয়ে মানুষ প্রথমে মর্মাহত হয়। কিন্তু কিছু সময় পরে তার কাছে প্রতিভাত হয় যে, ওই জিনিসটি থেকে ওই সময়ে তাকে বঞ্চিত করে আল্লাহ তায়ালা তাকে আসলে বিরাট অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করেছেন। আবার কখনো কখনো এমন নিদারুণ দুঃখকষ্ট বা নির্যাতন ভোগ করে যে, তার ভয়াবহতায় তাৎক্ষণিকভাবে সে প্রায় ধ্বংসের মুখে চলে যায়। অতপর কিছুকাল পরেই সে দেখতে পায় যে, ওই দুঃখ তার জীবনে এমন শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছে যে, দীর্ঘ সুখ শান্তিও তার জীবনে অনুরূপ কল্যাণ বয়ে আনতে পারতো না।

এরূপ ঘটনাবলীর পর এ প্রশ্নই জাগে যে, মানুষ যখন অজ্ঞ এবং আল্লাহ তায়ালা যখন একাই সর্বজ্ঞ তখন সেই সর্বজ্ঞ প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার অসুবিধা কোথায়? এটাই হলো কোরআনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এ দ্বারা সে মানুষের মনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায় যে, সে পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করে নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হবে এবং প্রকাশ্য চেষ্টা সাধনার ক্ষেত্রে সাধ্যমত চেষ্টা-তদবীর করার পর অজানা ও অদৃশ্য বিষয় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবে।

সম্মানিত মাসের বিশেষ বিধান ও তাৎপর্য

সমাজকে শান্তির দিকে পরিচালিত করার মানসেই পরবর্তী ২১৭ ও ২১৮ নং আয়াতে নিম্নোক্ত প্রশ্ন ও তার জবাব দেয়া হয়েছে,

সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে মানুষরা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি এদের বলে দাও- এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ কাটাকাটি করা অনেক বড় ধরনের গুনাহ (কিন্তু মনে রেখো) আল্লাহর দৃষ্টিতে এরচেয়েও জঘন্য রকমের গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা- (মালিক ও প্রভু হিসেবে) আল্লাহকে অস্বীকার করা- (আল্লাহর এবাদাতের কেন্দ্রবিন্দু) খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া, (আর খোদাদ্রোহিতার) ফেৎনা ফাসাদ, হত্যাকান্ডের চেয়ে অনেক বেশী অন্যায়, (তাই সম্মানিত মাসের অজুহাত দিয়ে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার সুযোগ নেই) এই (আল্লাহ বিদ্রোহী) ব্যক্তিরা (কিন্তু) তোমাদের সাথে (এসব) লড়াই ও সংঘর্ষ বন্ধ করে দেবে বলে (তুমি) ভেবো না, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের ইসলামী জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে।

(তবে একথাও তোমরা জেনে রেখো যে) যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং এ অবস্থায়ই যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে সে সুস্পষ্টত কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করবে, তার যাবতীয় কর্মকান্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর যাদের কর্মকান্ড বিফলে যাবে তারা সবাই হবে (এক একজন) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাদের নিবাস হবে চিরস্থায়ী।

(অপরদিকে) যারা (এসব কোনো অন্যায় অনাচারে লিপ্ত না হয়ে) ইসলামী জীবন বিধানের ওপর ঈমান এনেছে (সে দ্বীনের খাতিরে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে) অন্য দেশে হিজরত করেছে- (সর্বোপরি এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে- তারা আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ পাবার আশা করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা (তার এসব বান্দার) ভুলত্রুটি মাফ করে দেবেন- তিনি অত্যন্ত দয়ালু!

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এ দুটি আয়াত হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের নেতৃত্বাধানী সেনাদল সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। রসূল (স.) তাঁকে ৮জন মোহাজেরের একটি দলসহ পাঠান। এই দলে কোনো আনসার ছিলো না। তাঁর সাথে তিনি খামে বদ্ধ করা একটি চিঠি দিয়ে দেন এবং আদেশ দেন যে, দুই রাত অতিক্রম না করা পর্যন্ত এই চিঠি খুলবে না। যখন চিঠি খুললেন, দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে,

'আমার এই চিঠি পড়ার পর তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী বাতনে নাখলায় চলে যাবে। সেখানে বসে কোরায়শদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের খবর আমাকে জানাবে। তোমার সাথীদের কেউ তোমার সাথে যেতে চাইলে তাতে আপত্তি করবে না।'

এ ঘটনা ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিলো। চিঠি পড়া মাত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ বললেন, 'রসূল (স.)-এর আদেশ শীরোধার্য।'

অতপর তিনি নিজের সাথীদেরকে বললেন, 'রসূল (স.) আমাকে বাতনে নাখলায় গিয়ে কোরায়শদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের খবর জানাতে আদেশ দিয়েছেন। তোমাদের কেউ যেতে চাইলে তাতে আপত্তি করতে আমাকে নিষেধ করেছেন। তোমাদের কেউ যদি শহীদ হতে ইচ্ছুক ও আগ্রহী থাকে তবে সে যেন আমার সাথে রওনা হয়। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করে, সে যেন মদীনায় ফিরে যায়। কেননা আমি রসূল (স.)-এর আদেশ পালন করতে নাখলায় চলে যাচ্ছি।'

অতপর তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং তার সাথে তার সাথীদের সবাই গেলো। কেউ পিছিয়ে থাকলো না। সেনাদলটি হেজাজের পথ ধরে চলতে লাগলো। কিছু দূর গেলেই তার দুই সাথী সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ও উত্‌বা বিন গাজওয়ান (রা.)-এর উট হারিয়ে গেলো। উট খুঁজতে গিয়ে তারা উভয়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশের দল থেকে পেছনে পড়ে রইলেন এবং বাকী ছয়জন তার সাথে চলতে থাকলো। তারা বাতনে নাখলায় পৌঁছার পর কোরায়শদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ওই এলাকা অতিক্রম করতে দেখলেন। ওই কাফেলায় আমর ইবনুল হাদরামী ও আরো তিনজন ছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বাধীন সেনাদল আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা করলো। দুইজনকে বন্দী করলো এবং চতুর্থজন পালিয়ে গেলো। কাফেলার সমস্ত সহায় সম্পদ আটক করা হলো। সেদল ওই দিনটিকে জমাদিউসসানীর শেষ দিন মনে করেছিলো, কিন্তু পরে জানা গেলো যে, দিনটি ছিলো পয়লা রজব। রজব একটি নিষিদ্ধ মাস। নিষিদ্ধ মাসগুলোকে আরবরা খুবই গুরুত্ব দিতো ও মর্যাদাবান মনে করতো। ইসলামও এ মাসগুলোর মর্যাদা দিয়েছে এবং এগুলোকে নিষিদ্ধ ও পবিত্র মাস হিসাবে বহাল রেখেছে।

পরে যখন তারা বন্দীদ্বয়কে ও তাদের বাণিজ্য বহরকে রসূল (স.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন, তখন রসূল (স.) বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি।' এই বলে বাণিজ্যবহর ও বন্দীদ্বয়কে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। রসূল (স.) এ কথা বলার পর সেনাদলটি ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলো। তারা ভাবলো, তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। সাধারণ মুসলমানরাও তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো। অপরদিকে কোরায়শ বলতে লাগলো যে, মোহাম্মাদ ও তার সাথীরা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল করে নিয়েছে। নিষিদ্ধ মাসে তারা রক্তপাত করেছে। অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে এবং লোকজনকে বন্দী করেছে।

ইহুদীরা বললো, মোহাম্মাদ এর আগামী দিনের কর্মকান্ড কী হতে যাচ্ছে, সে সংক্রান্ত পূর্বাভাস এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যেতে পারে। আমর ইবনুল হাদরামীকে ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ হত্যা করেছে।

'আমর' শব্দের পূর্বাভাস হচ্ছে 'উম্মিরাতিল হারব।' অর্থাৎ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। 'হাদরামী' শব্দের পূর্বাভাস হচ্ছে 'হুদ্দিরাতিল হরব' অর্থাৎ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয়ে গেছে। আর 'ওয়াকিদ বিন আবদল্লাহ' শব্দের পূর্বাভাস হচ্ছে 'উক্কিদাতিল হারব' অর্থাৎ যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে।

এরপর এই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ ও কুচক্রী কথাবার্তায় মুখরিত হয়ে আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। মোহাম্মাদ (স.) ও তার সাথীদেরকে আগ্রাসী, সীমা অতিক্রমকারী, আরবের পবিত্র জিনিসগুলোকে পদদলনকারী এবং স্বার্থের তাগিদে পবিত্র জিনিসগুলোর পবিত্রতা অমান্যকারী ইত্যাকার বিশেষণে ভূষিত করা হতে লাগলো।

অবশেষে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়ে সকল অপপ্রচারের দাঁতভাংগা জবাব দিয়ে দিলো এবং প্রকৃত সত্য ব্যাখ্যা করলো। অতপর রসূল (স.) উভয় বন্দীকে ও বাণিজ্য বহরের আটককৃত সম্পদকে গ্রহণ করলেন। আয়াতে নিষিদ্ধ মাসের নিষিদ্ধতা ও পবিত্রতা মেনে নেয়া হলো এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ যে একটা মারাত্মক অন্যায় কাজ, তা স্বীকার করা হলো, কিন্তু 'আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে জোর করে ফেরানো আল্লাহর অবাধ্যতা, মাসজিদুল হারামের অবমাননা ও তার অধিবাসীদেরকে তার ভেতর থেকে বহিষ্কার করা আরো মারাত্মক পাপের কাজ। আর যুলুম অরাজকতা ও বল প্রয়োগ হত্যার চেয়েও তা নিকৃষ্ট।'

সবাই জানে যে, মুসলমানরা যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করেনি। আগ্রাসী কর্মকান্ডও তারা প্রথমে করেনি। **আল্লাহর পথ** থেকে মানুষকে জোরপূর্বক ফেরানো, আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান এবং মাসজিদুল **হারামের অবমাননা** ইত্যাকার কার্যকলাপ মোশরেকদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। মানুষকে **আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে** তারা কোনো অপকর্মই করতে বাদ রাখেনি। নিজেরাও আল্লাহর প্রতি কুফুরী করেছে এবং **জনগণকেও** কুফুরী করতে বাধ্য করেছে।

তারা মাসজিদুল হারামের পবিত্রতা লংঘন করেছে। সেখানে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছে এবং তাদেরকে ধর্মচ্যূত করতে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে। হিজরতের আগে দীর্ঘ ১৩ বছর ব্যাপী এসব কাজে তারা লিপ্ত থেকেছে। অবশেষে তার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেছে। মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ তায়ালা নিরাপদ স্থান বানিয়েছেন। তার পবিত্রতার প্রতি তারা সম্মান দেখায়নি।

নিষিদ্ধ মাসে লড়াই করার চেয়েও আল্লাহর দৃষ্টিতে মাসজিদুল হারামের এলাকাবাসীকে বহিষ্কার করা গুরুতর পাপ। আল্লাহর কাছে মানুষকে অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মচ্যুত করা হত্যার চেয়েও সাংঘাতিক খারাপ কাজ। মোশরেকরা এই উভয় মারাত্মক অপকর্ম সংঘটিত করেছে। তাই নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা, আল্লাহর ঘরের পবিত্রতার দোহাই দেয়ার অধিকার তাদের নেই। যারা কোনো কিছুর পবিত্রতার তোয়াক্কা করে না। সেই আগ্রাসী মোশরেকদের প্রতিরোধের ব্যাপারে মুসলমানদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। তা এখানে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

মোশরেকরা যখন ইচ্ছা আল্লাহর ঘর ও নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতার দোহাই দেবে। আবার যখন ইচ্ছা তার পবিত্রতাকে পদদলিত করবে, এ অবস্থা মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না। সীমা অতিক্রমকারী, যাবতীয় নৈতিক নীতিমালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ওই নরাধম মোশরেকদেরকে

যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য ছিলো। কেননা তারা কোনো কিছুর পবিত্রতার প্রতি সম্মান দেখায় না এবং সংযত হয় না, আর যে পবিত্র জিনিসের প্রতি তাদের নিজেদের মনে কোনো মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধাবোধ নেই,তার পবিত্রতার দোহাই পেড়ে আত্মরক্ষার অধিকার মুসলমানরা তাদেরকে দিতে পারে না।

নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা সম্পর্কে তারা যে বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছিলো, নীতিগতভাবে তা সত্য ও ন্যায়সংগত কথাই ছিলো বটে। তবে তা ছিলো অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। নিষিদ্ধ মাসের দোহাই পাড়া তাদের জন্যে নিছক আত্মরক্ষা ও মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপকৌশল ছিলো। কুৎসা রটিয়ে তারা মুসলমানদেরকে আগ্রাসী ও সীমালংঘনকারী রূপে চিহ্নিত করতে চাইছিলো। অথচ তারাই প্রথম সীমালংঘন করেছিলো এবং তারাই প্রথম আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা লংঘন করেছিলো।

ইসলাম মানব জীবনের জন্যে একটা বাস্তব জীবন পদ্ধতি। এর ভিত্তি নিছক কল্পনাসর্বস্ব অবাস্তব তাত্ত্বিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানব জীবনে যতো বাধাবিপত্তি বা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যতো বাস্তব সুবিধা অসুবিধা তার সাথে জড়িত রয়েছে, তার সব কিছুসহ ইসলাম তার মুখোমুখী হয়, যাতে সে তাকে বাস্তবসম্মতভাবে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তার বাস্তব সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধান দিতে পারে এবং নিছক স্বপ্নের জগতে তাকে এমনভাবে ভেসে বেড়াতে না হয়, যা বাস্তব জীবনে কোনো কাজে আসে না।

মোশরেকরা মূলতই সীমা অতিক্রমকারী, সত্যদ্রোহী ও আগ্রাসী। কোনো পবিত্র জিনিসের জন্যে তাদের মনে কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই, কোনো গুরুত্ব নেই এবং কোনো নিষিদ্ধ জিনিস বা স্থানের কাছে গিয়ে তারা সংযত হয় না। ধর্ম, নৈতিকতা, আকীদা বিশ্বাস ইত্যাকার যা কিছুই মানব সমাজের কাছে আবহমানকাল ধরে ভক্তি শ্রদ্ধার বিষয় ছিলো, তাকে তারা পদদলিত করতে অভ্যস্ত। সত্যের সামনে তারা চিরকালই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষকে সত্য থেকে দূরে হটিয়ে দেয়। মোমেনদের ওপর তারা অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে চাপ দেয়। যে পবিত্র শহরে জীবজন্তু ও কীটপতংগ পর্যন্ত নিরাপদ, সেই শহর থেকে তারা মোমেনদেরকে বহিষ্কার করে। এরপরও তারা নিষিদ্ধ মাসের দোহাই দিয়ে তার আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালায় এবং নিষিদ্ধ ও পবিত্র বস্তুসমূহের নামে দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর সোচ্চার অপপ্রচার চালায় যে, দেখো, মোহাম্মাদ ও তার সংগীরা নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করছে।

ইসলাম কিভাবে তাদের মোকাবেলা করবে? সে কি বায়বীয় তাত্তিক সমাধান দিয়ে এর মোকাবেলা করবে? তা যদি করে, তবে সে ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র ছেড়ে দেবে। অথচ তাদের নিকৃষ্টতম দুরাচারী শত্রুরা সকল ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করবে এবং কোনো অস্ত্র ব্যবহারেই তারা পিছপা হচ্ছে না। এটা কক্ষনো হতে পারে না। ইসলাম এরূপ করতে পারে না, কেননা সে বাস্তবতার সম্মুখীন, বাস্তব জিনিসকে সে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে চায়। অন্যায় অসত্যকে সে নির্মূল ও উচ্ছেদ করতে চায়। বাতিল ও গোমরাহীর বিষদাঁত ও বিষ নখর সে উপড়ে ফেলতে চায়। সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক শক্তির কাছে সে পৃথিবীর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চায়। দুনিয়ার নেতৃত্বকে সে সৎ ও ন্যায়পরায়ন লোকদের কাছে সমর্পণ করতে চায়। তাই সে নিষিদ্ধ ও পবিত্র

জিনিসগুলোকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, সত্যদ্রোহী বাতিল শক্তির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে দিতে প্রস্তুত নয় যে, সেখানে নিরাপদে বসে তারা সৎ ও ন্যায়পরায়ন লোকদেরকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়বে এবং সুরক্ষিত দূর্গে বসে নিজেরা পাল্টা আক্রমণের শিকার হবে না।

ইসলাম কেবল তাদের জন্যে নিষিদ্ধ বস্তুর মর্যাদা রক্ষা করবে এবং কঠোরভাবেই করবে যারা স্বয়ং ওগুলোর মর্যাদা রক্ষা করে, কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তুর পবিত্রতাকে অপরাধী চক্রের রক্ষাব্যূহ ও রক্ষাকবচ হতে কখনো দেবে না। মোমেনদের, সৎ লোকদের ও নেককার লোকদের ওপর যুলুম নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে এবং সকল রকমের অপরাধ ও অপকর্ম চালিয়ে তার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পবিত্র স্থান ও সময়সমূহের আড়ালে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ সে কাউকে দেবে না।

ইসলাম সকল ব্যাপারেই এই নীতি অনুসরণ করে। সে গীবত অর্থাৎ অ-সাক্ষাতে নিন্দা করাকে হারাম ঘোষণা করে। কিন্তু ফাসেকের গীবতে কোনো দোষ নেই। যে ফাসেক প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, তার পাপে উত্যক্ত সমাজ তার গীবত থেকে বিরত থাকতে বাধ্য নয়। উচ্চস্বরে কারো কুৎসা রটাতে ইসলাম নিষেধ করে। কিন্তু 'মযলুম' ব্যক্তির জন্যে তা নিষিদ্ধ নয়। যে তার ওপর যুলুম করে, তার বিরুদ্ধে নিন্দায় সোচ্চার হওয়ার অধিকার তার রয়েছে। এটা তার ন্যায়সংগত অধিকার। যুলুম সম্পর্কে নীরবতা পালনে যালেমের ধৃষ্টতা বেড়ে যায় এবং সে বড় বড় নীতিবাক্যের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ লাভ করে। অথচ এ সুযোগ লাভ করার কোনো অধিকার তার নেই।

এতদসত্ত্বেও ইসলাম তার উচ্চমান বজায় রেখেছে এবং ইসলাম বিরোধী দুর্বৃত্তদের স্তরে কখনো নামেনি। তাদের মতো ঘৃণ্য অস্ত্র ও নোংরা ফন্দি-ফিকির কখনো অবলম্বন করেনি। মুসলমানদেরকে সে শুধু দুর্বৃত্তদের আক্রমণোদ্যত হাতে আঘাত করতে, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে ও সামাজিক পরিবেশকে তাদের অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করতে নির্দেশ দেয়। আর এ কাজটিও সে করতে বলে প্রকাশ্য দিবালোকে।

এভাবে নেতৃত্ব যখন সৎ ও পরিচ্ছন্ন মোমেনদের হাতে চলে যাবে এবং যারা পবিত্র স্থান, সময় ও জিনিসসমূহের অবমাননা করে তাদের কবল থেকে ভূপৃষ্ঠ মুক্ত ও পবিত্র হবে, কেবল তখনই আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক পবিত্র জিনিসসমূহের পবিত্রতা ও মর্যাদা যথাযথভাবে সুরক্ষিত হবে।

এই হচ্ছে ইসলাম ও তার স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, অনমনীয় ও আপোসহীন ভূমিকা। এতে কোনো ঘোরপ্যাচ বা বক্রতা নেই, আর যারা বক্রতা ও ঘোরপ্যাচের পক্ষপাতী তাদের জন্যেও সে কোনো সুযোগ রাখে না।

আর এই হচ্ছে কোরআনের ভূমিকা। মুসলমানদেরকে সে চোরাবালিতে নয় বরং এমন শক্ত মাটির ওপর দাঁড় করায়। যেখানে তাদের পা বিন্দুমাত্রও ডগমগ করে না, বরং পৃথিবীকে অন্যায়, যুলুম নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা থেকে পবিত্র করার লক্ষ্যে দৃঢ় পায়ে তারা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে পারে । কোরআন তাদের বিবেককে কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং শয়তানী কুপ্ররোচনায় জর্জরিত হতে দেয় না। যা অন্যায়, অসত্য, বাতিল ও খোদাদ্রোহিতা, তার কোনো মর্যাদাও টিকে থাকার অধিকার তার দৃষ্টিতে নেই। পবিত্র স্থান বা সময়ের দোহাই দিয়ে ও তার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে সে অন্যান্য পবিত্র জিনিসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে, সে অধিকার ইসলাম তাকে দেয় না। মুসলমানদের কর্তব্য হলো তার যা করণীয় তা নির্দ্বিধায়, অকুণ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তির পূর্ণ আশ্বাস সহকারে করে যাওয়া।

আগ্রাসনের সময় মুসলমানদের কর্তব্য

উপরোক্ত তত্ত্ব ও ইসলামের অকাট্য বিধি বর্ণনা এবং মুসলমানদের আবেগ ও পদক্ষেপ সমর্থন করার পর আয়াতটির পরবর্তী অংশে তাদের শত্রুদের মনে হিংসা বিদ্বেষ কতো গভীর এবং তাদের ইচ্ছায় ও তৎপরতায় আগ্রাসী মনোভাব কতোটা মজ্জাগত, তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তারা তাদের সাধ্যে কুলালে তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে।'

মহাজ্ঞানী ও পরম সত্যবাদী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই স্পষ্টোক্তি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই সত্য উন্মোচন করে দিচ্ছে যে, ইসলামের দুশমনরা অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অত্যন্ত জঘন্যভাবে তাদের অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করার জন্যে নির্যাতনের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে যেতে থাকে। এটা মুসলমানদের শত্রুদের চিরস্থায়ী লক্ষ্য। মুসলমানদের দুশমনরা যে যুগের ও যে দেশের মানুষই হোক না কেন, তাদের এ লক্ষ্য সব সময়ই অপরিবর্তিত থাকে। আসলে পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্বই ইসলামের ও মুসলমানদের শত্রুদের ক্রোধ, আক্রোশ ও ভয় ভীতির চিরন্তন উৎস। ইসলামের অস্তিত্বই তাদেরকে কষ্ট দেয়, ক্ষিপ্ত করে ও ভীত সন্ত্রস্ত করে।

ইসলামের শক্তি, তেজ ও প্রতাপ দেখে যে কোনো বাতিলপন্থী ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তি বা দল ঘাবড়ে যায় এবং যে কোনো নৈরাজ্যবাদী ও দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি তাকে অপছন্দ করে। নিজস্ব অকাট্য সত্য বক্তব্য, ভারসাম্যপূর্ণ বিধান ও নিখুঁত বিধিব্যবস্থার কারণে ইসলাম স্বয়ং বাতিল, খোদাদ্রোহিতা ও অন্যায় অরাজকতার বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। এ জন্যে খোদাদ্রোহী, দুর্নীতিবাজ ও নৈরাজ্যবাদী বাতিল শক্তি তাকে বরদাশতই করতে পারে না। তাই ইসলামের সৈনিকদেরকে তারা নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালিয়ে ধর্মচ্যুত করতে এবং কোনো না কোনো পর্যায়ের কুফুরীতে লিপ্ত করতে পারে কিনা, তার সুযোগ ও উপায় খুঁজতে থাকে। কারণ পৃথিবীতে যতো দিন একটি মানব গোষ্ঠীও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী ও তার বাস্তব অনুসারী থাকে, ততোদিন তারা তাদের বাতিল আদর্শ, খোদাদ্রোহিতা ও দুর্নীতিকে নিরাপদ মনে করে না।

মুসলিম জাতির ওপর তাদের এই শত্রুদের আক্রমণ ও আগ্রাসনের উপায়-উপকরণে সময়ে সময়ে পরিবর্তন ও বৈচিত্র আসে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সব সময় অভিন্ন ও অপরিবর্তিত থাকে। সেটি হচ্ছে, নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে যদি পারা যায় মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত করা। এ জন্যে তাদের হাতের একটি অস্ত্র বা একটি সরঞ্জাম যদি ভেংগে যায় বা অকার্যকর হয়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তারা অন্য একটি অস্ত্র হস্তগত করে। এরূপ ক্ষেত্রে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা আগেভাগেই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে তাদেরকে বাতিল শক্তির সাথে আপোষ করা থেকে সতর্ক করেছেন এবং চক্রান্ত ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করার আহবান জানিয়েছেন। কেননা ধৈর্য অবলম্বন করতে না পারলে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সেই ক্ষতির উল্লেখ রয়েছে আয়াতের শেষাংশে,

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হবে ও কাফের অবস্থায় মারা যাবে, তার যাবতীয় সৎ কাজ দুনিয়া ও আখেরাতে বৃথা ও বাতিল হয়ে যাবে এবং এ ধরনের লোকেরা চিরদিনের জন্যে দোযখবাসী হবে।'

এখানে মূল আয়াতে যে 'হাবিতাত' শব্দটি রয়েছে, তার মূল ধাতু-রূপ হচ্ছে 'হুবত।' কোনো উটনী যখন বিষাক্ত ঘাস খাওয়ার কারণে তার সমস্ত শরীর ফুলে ফেঁপে শেষ পর্যন্ত উটনীটি মারা যেতো, তখন বলা হতো 'হাবিতাতিন নাকাতু' অর্থাৎ 'উটনীটি পেট ফেঁপে মারা গেছে।' কোরআন

এই শব্দটি সৎ কাজ বাতিল হওয়ার অর্থে ব্যবহার করে বুঝাতে চেয়েছে যে, উটনী যেমন ফুলে ফেঁপে বৃহদাকার ধারণ করে অবশেষে মারা যেতো, তেমনি মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত ব্যক্তির কাজ যতো বেশী ও বড় হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা নিষ্ফল ও বৃথা যাবে।

অত্যাচার ও নির্যাতন যতোই বেশী হোক না কেন। ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়া ও তার স্বাদ গ্রহণের পর যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করবে। তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই পরিণামই নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তার সকল কাজ দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করবে।

যে হৃদয় একবার ইসলামের সাথে পরিচিত হয়েছে ও তার স্বাদ গ্রহণ করেছে, তা কখনো সত্যিকার অর্থে মুরতাদ ও ধর্মচ্যুত হতে পারে না। অবশ্য কোনো মুসলমান যখন এতো বিকারগ্রস্ত হয়ে যায় যে সংশোধনেরযোগ্য থাকে না তখন তার পক্ষে মুরতাদ হওয়া সম্ভব। তবে অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে কেউ যদি নিজের ধর্মবিশ্বাস বা আকীদাকে লুকানোর লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুফুরীবোধক বাক্য উচ্চারণ করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় দয়ালু। তিনি মুসলমানকে অনুমতি দিয়েছেন যে, নির্যাতন ধৈর্যের বাইরে গেলে আত্মরক্ষার্থে লোক দেখানোভাবে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করা যাবে,তবে সেই সাথে মনকে ইসলামের ওপর অবিচল ও ইসলামী আকীদার প্রতি অটুট আনুগত্য ও আস্থা বজায় রাখতে হবে। কোনো অবস্থায়ই সে সত্যিকার কাফের ও মুরতাদ হওয়া এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা পানাহ দিন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই হুশিয়ারী কেয়ামত পর্যন্ত বহাল রয়েছে। যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে আপন ধর্ম ও বিশ্বাসকে অন্তর থেকে পরিত্যক্ত করার পক্ষে কিংবা গা বাচানো বা শ্রেফ রাজনৈতিক ময়দানে টিকে থাকার সার্থে কিংবা ক্ষমতার হাতছানিতে লোভ সামাল দিতে না পেরে এই ধরনের কুফুরী করার ব্যাপারে কোনো মুসলমানের কোনো ওযরই গ্রহণযোগ্য নয়। মনে রাখতে হবে এটা কখনো ইসলামী মুলনীতি হতে পারে না, দলীয়ভাবে এই ধরনের কুফুরী সিদ্ধান্ত কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় এটা শুধু ব্যক্তিপর্যায়ে অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে তখনই গ্রহণযোগ্য, তবে তখনো মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে সত্যের ওপর অবিচল থাকলে সেটাই হবে উত্তম। নির্যাতনে ধৈর্যধারণকারী মোমেন বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কখনো পরিত্যাগ করেন না। তাদেরকে দুইটি উত্তম প্রতিদানের যে কোনো একটি অবশ্যই দিয়ে থাকেন বিজয় অথবা শাহাদাত।

আর আল্লাহর পথে যারা নির্যাতন ভোগ করে, তাদের জন্যে রহমতের আশা রয়েছে। ঈমানের বলে বলিয়ান মোমেনের মনে এ ব্যাপারে কখনো হতাশা আসতে পারে না।

২১৮ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

'যারা ঈমান এনেছে, এবং আল্লাহর পথে হিজরত ও জেহাদ করেছে তারা আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে।'

বস্তুত মোমেনের আর কিছু না হোক, আল্লাহর রহমত লাভের আশাকে আল্লাহ তায়ালা কখনো ব্যর্থ করেন না। হিজরতকারী মোমেনরা আল্লাহর এই অকাট্য প্রতিশ্রুতি শুনে জেহাদ ও সবর করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিশ্রুতিকে বিজয় কিংবা শাহাদাত দিয়ে পূরণ করেছিলেন। আর এ দুটোই হচ্ছে কল্যাণ এবং রহমত। তারা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা দুটোই লাভ করেছিলেন।

মদ জুয়া নিষিদ্ধ করণে প্রথম কর্মসূচী

এরপর ২১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে মদ ও জুয়া সংক্রান্ত বিধান ঘোষণা করেন। এ দুটোই ছিলো তৎকালীন আরবদের ঘোরতর নেশা। এ নেশায় তারা অষ্টপ্রহর ডুবে থাকতো। কেননা সে সময় তাদের হাতে অন্য এমন কোনো মহৎ ও সম্মানজনক কাজ ছিলো না, যার ভেতরে তারা তাদের তৎপরতা, সময় ও আবেগ অনুভূতি নিয়োগ করতে পারতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, এই দুটি জিনিসে বিরাট পাপ রয়েছে, আবার মানুষের জন্যে কিছু উপকারিতাও এতে আছে। তবে এর উপকারিতার চেয়ে পাপই বড়।'

এই সময় পর্যন্ত মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ করে কোনো বিধি নাযিল হয়নি। তবে সমগ্র কোরআনের কোথাও এ দুটিকে হালাল ঘোষণা করেও কোনো স্পষ্টোক্তি ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা এই নবাগত মুসলিম জাতিকে হাত ধরে পর্যায়ক্রমে নিজের ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার জন্যে যে দায়িত্ব ও ভূমিকা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন, তার জন্যে তাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছিলেন। মদ ও জুয়ার মধ্যে যে সম্পদের অপচয়, আয়ু ও সময়ের বিনাশ, বুদ্ধি ও সময়ের বিনাশ ও ক্ষতি সংঘটিত হয় তাতে ওই দুটো নেশার সাথে মুসলিম জাতির উক্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কোনোই সংগতি নেই।

বস্তুত এ দুটি জিনিস হলো নিষ্ক্রীয় লোকদের অর্থহীন ব্যস্ততা। বেকার লোকেরা বলগাহীন ভোগের আনন্দে মেতে থাকতে ভালবাসে। কারো কারো নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মশূন্যতা তাদেরকে ক্রমাগত তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। অবশেষে মদ ও জুয়ার নেশায় নিমজ্জিত করে। কেউ কেউ নিজের জীবন থেকেই পলায়নপর হয়ে মদ ও জুয়ায় ডুবে যায়। আধুনিক ও প্রাচীন জাহেলীয়াতের অধীন জীবন যাপনকারীদের প্রত্যেকেরই এই দশা। তবে ইসলাম মানুষের মানসিক প্রশিক্ষণে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাতে সে এত সহজে ও উদারভাবে তাকে গড়ে তোলে যে, তাকে কখনো এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় না।

আলোচ্য আয়াত ছিলো মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তার মোদ্দাকথা এই যে, কোনো জিনিস বা কাজ কখনো সার্বিকভাবে খারাপ হয় না। পৃথিবীতে ভালোর সাথে মন্দ ও মন্দের সাথে ভালো মিশ্রিত থাকেই। হালাল বা হারাম হওয়া নির্ভুল করে সংশ্লিষ্ট জিনিস বা কাজের বেশীরভাগ উপাদান ভালো না খারাপ তার ওপর। মদ ও জুয়ায় যেহেতু উপকারিতার চেয়ে ক্ষতি ও পাপের মাত্রাই বেশী, তাই এ কারণেই তা হারাম ও নিষিদ্ধ, যদিও এখানে স্পষ্টভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

এখানে ইসলামের বিধান সম্মত ও প্রাজ্ঞ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি দিক আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। সেটি এই যে, যখন কোনো আদেশ বা নিষেধ কোনো মৌলিক আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তখন সে ব্যাপারে ইসলাম প্রথম মুহূর্ত থেকেই চূড়ান্ত ও অকাট্য রায় ঘোষণা করে, কিন্তু যখন তা কোনো আদত অভ্যাস বা রসম রেওয়াযের সাথে অথবা কোনো জটিল সামাজিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন ইসলাম তার ব্যাপারে উদার পন্থা অবলম্বন করে এবং নম্র, কোমল ও পর্যায়ক্রমিক পন্থায় তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়। এরূপ নির্দেশের বেলায় সে বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশকে তার উপযোগী বানায়, যাতে উক্ত নির্দেশের পালন ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়। ইসলামের বহুসংখ্যক বিধিতে এই নীতি অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে। এখানে মদ ও জুয়া সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে একটি বিধান তুলে ধরছি। যখন আদেশ বা নিষেধ তাওহীদ বা শেরেক সংক্রান্ত হয়, তখন তাকে সে প্রথম মুহূর্ত থেকেই চূড়ান্তভাবে ও একবারেই

বাস্তবায়িত করে। এতে সে কোনো রাখ ঢাক, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সৌজন্য বা দরকষাকষির অবকাশ রাখে না। কেননা এখানে আকীদা বিশ্বাসগত এমন এক মৌলিক বিধি জড়িত, যা ছাড়া ঈমান ও ইসলাম শুদ্ধ হতে পারে না।

তবে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ছিলো অভ্যাসের সাথে জড়িত। অভ্যাস বদলাতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এ জন্যে কোরআন মুসলমানদের মনে এই মর্মে ধর্মীয় উদ্দীপনা ও শরীয়তসম্মত যুক্তির অবতারণা করে যে, মদ ও জুয়ায় যে ক্ষতি ও পাপ নিহিত রয়েছে, তা তার উপকারিতার তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। এ থেকে বুঝানো হয়েছে যে, এ দুটো জিনিস বর্জন করাই ভালো।

এরপর সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়,

'হে মোমেন ব্যক্তিরা! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ না তোমাদের মুখ দিয়ে কি বলছো, তা বুঝতে পারে না।'

জানা কথা যে, নামায দৈনিক পাঁচবার পড়তে হয় এবং তার অধিকাংশ পরস্পরের এত কাছাকাছি যে, তার মাঝে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আবার সুস্থ হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। এভাবে মদ খাওয়ার সুযোগকে সংকীর্ণ করে দিয়ে মদের অভ্যাস চালু রাখাকে কার্যত অসুবিধাজনক করে দেয়া হয়েছে। এতে করে মদ খাওয়ার অভ্যাসটাকেও দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা মদ খাওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় থাকতে হয়। যে কোনো মাদক দ্রব্য সেবনকারী যে নির্দিষ্ট সময়ে মাদক সেবনে অভ্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই তার প্রয়োজন অনুভব করে। ওই সময় অতিক্রান্ত হলে এবং এরূপ বার বার অতিক্রান্ত হতে থাকলে অভ্যাসের তীব্রতা নষ্ট হয় এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সম্ভব হয়। এভাবে এই দুটো পদক্ষেপ সম্পন্ন হবার পর মদ ও জুয়া চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করার বিধান এলো,

'মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর, ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (আল মায়েদা ৯০)

উদাহরণস্বরূপ দাসত্বের বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়। দাসত্বের প্রথাটা ছিলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিণতি। সেকালে যুদ্ধবন্দীদের দাসদাসীতে পরিণত করা এবং দাস দাসীকে কাজে নিয়োগ করা সারা দুনিয়ার স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি ছিলো, জটিল সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের বাহ্যিক লক্ষণ ও ফলাফল পরিবর্তন করার আগে তার আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও উপাদানকে পরিবর্তন সংশোধন করা অপরিহার্য, আর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতিপ্রথা বদলাতে হলে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক ও সামাজিক চুক্তি প্রয়োজন।

ইসলাম নিজে কখনো মানুষকে দাস দাসীতে পরিণত করার আদেশ দেয়নি। যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করার ব্যাপারে কোরআনে কোনো নির্দেশনা নেই, কিন্তু কোরআন যখন নাযিল হয়, তখন দেখতে পায় যে দাসত্ব একটা আন্তর্জাতিক প্রথা হিসাবে চালু রয়েছে এবং তা বিশ্ব অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সে দেখতে পায় যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করা একটা আন্তর্জাতিক রেওয়ায হিসাবে প্রচলিত রয়েছে এবং যুদ্ধরত সকল পক্ষই তা নির্বিবাদে মেনে চলছে। সুতরাং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক বিশ্বব্যবস্থার সাথে ওই প্রথাটিকে বহাল রাখা ছাড়া উপায়ন্তর ছিলো না।

এতদসত্ত্বেও ইসলাম দাসত্ব প্রথার উৎসগুলোকে এমনভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গোটা প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ তার ফলে সমাজ ব্যবস্থায় এমন কোনো ঝাঁকুনি লাগেনি, যার ওপর নিয়ন্ত্রণও রাখা যায় না কিংবা বিকল্প কোনো পথও

প্রদর্শন করা যায় না। দাসত্ব প্রথাকে সরাসরি বাতিল না করেও ইসলাম এভাবে তার উচ্ছেদ সাধন করেছে। আর যতোদিন তা চালু ছিলো, সেই সময়েও সে দাস দাসীদের মানবোচিত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধান এবং ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে মানবীয় মর্যাদা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা করেছে।

শুরুতে সে যুদ্ধবন্দী এবং দাসদাসীদের সন্তান সন্ততি ব্যতীত অন্য সকল মানুষের দাসদাসীতে পরিণত করা বা হওয়ার পথ বন্ধ করেছে। যুদ্ধবন্দী ও দাস দাসীদের সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কারণ এই যে, অমুসলিম সমাজ ও জাতিগুলো তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুসলমান যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করতো। সকল অমুসলিম জাতিগুলোকে উক্ত প্রচলিত প্রথা লংঘনে বাধ্য করবে এমন ক্ষমতা তখন ইসলামের ছিলো না। কেননা তৎকালে ওই প্রথার ওপর সারাবিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সে যদি যুদ্ধবন্দীদের দাসত্ব প্রথাকে বাতিল করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতো, তবে তা হতো তার একতরফা সিদ্ধান্ত এবং তার সুফল ভোগ করতো শুধুমাত্র মুসলমানদের হাতে আটক যুদ্ধবন্দীরা।

অন্যদিকে মুসলিম যুদ্ধবন্দীরা তাদের অমুসলিম মনিবদের হাতে যথারীতি গোলামীর নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতে থাকতো। এতে ইসলামের দুশমনদের মুসলমানদেরকে দাস দাসী হিসাবে পাওয়ার লোভ আরো বেড়ে যেতো। আর সে যদি মুসলিম রাষ্ট্রের ও তার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুসংহত করার আগে বিদ্যমান দাস দাসীর বংশধরকে স্বাধীন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতো। তাহলে এইসব দাস দাসীকে সে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিতো যে, তাদের কোনো প্রকার জীবিকার উৎস এবং কোনো ভরণপোষণকারী থাকতো না। আর তাদের এমন কোনো নিকটাত্মীয়ও ওই সমাজে থাকতো না যারা তাদেরকে দারিদ্র থেকে এবং সম্ভাব্য নৈতিক অধপতন থেকে রক্ষা করতে পারে।

ফলে সদ্য প্রসূত মুসলিম জাতির সামষ্টিক জীবন ও সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত ও বিকারগ্রস্ত হওয়ার কবল থেকে রেহাই দেয়া সম্ভব হতো না। বিদ্যমান এই পরিস্থিতির কারণে কোরআন একদিকে যেমন যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বাঁদী হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে কোনো কথা বলেনি, বরং সে তাদের ব্যাপারে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছে।

'কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের মোকাবেলা হবে, তখন তাদেরকে হত্যা করো। যখন তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে নির্মূল করে ফেলবে, তখন তাদেরকে বন্দী করো। তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, নতুবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও।' (সূরা মোহাম্মাদ)

অপরদিকে তেমনি সে তাদেরকে গোলাম বাঁদী হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধও করেনি। ইসলামী রাষ্ট্রকে সে বন্দীদের সাথে বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। তাদেরকে সে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তই করুক, বন্দী বিনিময়ই করুক অথবা গোলাম বাঁদী হিসাবেই গ্রহণ করুক- তার সামরিক প্রতিপক্ষের সাথে দ্বিপক্ষীয়ভাবে ও বাস্তব অবস্থার দাবী অনুসারেই তা করবে।

আর যেহেতু দাসত্বের অন্যান্য কারণ ছিলো বহুবিধ, তাই ওই সকল কারণ দূর করার পর দাস দাসীর সংখ্যা হ্রাস পায়। আর এই মুষ্টিমেয়সংখ্যক দাসদাসীকেও ইসলাম অতি সহজে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। শত্রুপক্ষের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই সে এ ধরনের গোলাম বাঁদীকে মুক্তি দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, মনিব কর্তৃক ধার্য করা মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়ার আবেদন জানাতে যে কোনো গোলাম বাঁদীকে ইসলাম পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। যে মুহূর্তে সে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা করবে, সেই মুহূর্ত থেকেই সে যে কোনো চাকুরী, ব্যবসায় বা বৃত্তিমূলক কাজে আত্মনিয়োগের,

অর্থোপার্জনের এবং উপার্জিত সম্পদের মালিক হওয়ার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এই সময়ে সে নিজের পারিশ্রমিকের নিজেই মালিক হবে এবং মুক্তিপণ উপার্জন করে আনার জন্যে সে নিজের মনিব ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির চাকুরী করতে পারবে। অর্থাৎ সে একজন স্বাধীন মানুষে পরিণত হয় এবং কার্যত একজন মুক্ত মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হয়।

এরপর মুসলমানদের বাইতুলমাল বা সরকারী কোষাগারেও তার অংশ প্রাপ্য হয়ে যায়। তার স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করাও সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বিভিন্ন রকমের কাফফারার প্রয়োজনে গোলাম মুক্ত করার বাধ্যবাধকতা তো আছেই। যেমন অনিচ্ছাবশত কাউকে খুন করে ফেলা, কসম ভংগ করা ও যেহার (স্ত্রীর সাথে মা বা সহোদর বোনের দৈহিক সাদৃশ্য সংক্রান্ত উক্তি করা) এর কাফফারা। এ সব ব্যবস্থার মাধ্যমে কালক্রমে স্বাভাবিকভাবে দাসত্বের বিলোপ ঘটে। অথচ এককালীন বাতিল ঘোষণায় সমাজ একটা নিষ্প্রয়োজন ধাক্কা খেতো এবং এমন এক বিশৃংখলার শিকার হতো, যার ঝুঁকি না নিলেও চলে।

কিন্তু এতো সব ব্যবস্থা চালু করার পর মুসলিম সমাজে পরবর্তী কালে যে দাস দাসীর ছড়াছড়ি দেখা যায়, তার কারণ ইসলামী বিধান থেকে ক্রমাগত বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা এ জন্যে কিছুমাত্র দায়ী নয়। মুসলমানরা বিভিন্ন যুগে কম বেশী ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার দরুন ইসলাম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তাই এর দায়দায়িত্ব ইসলামের ওপর বর্তায় না। ইসলামের যে ঐতিহাসিক মতাদর্শের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা তুলে ধরেছি। তদানুসারে মুসলমানদের বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তির কারণে সমাজে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ইসলামের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলা যায় না এবং ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও অধ্যায় বলেও আখ্যায়িত করা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কখনো পরিবর্তিত হয়নি এবং তার নীতি ও আদর্শে নতুন কোনো নীতি ও আদর্শ যুক্ত হয়নি। যা পরিবর্তিত হয়েছে তা হচ্ছে মানুষ। মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে তাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক থাকেনি এবং তারা ইসলামের ইতিহাসের কোনো অধ্যায় রূপেও গণ্য হয়নি।

যখন কেউ নতুন করে ইসলামী জীবন যাপন শুরু করতে চাইবে, তখন তাকে ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠীগুলো যে পর্যায়ে এসে ইসলামের সাথে আপন সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, এই পর্যায় থেকে শুরু করলে চলবে না। তাকে এ কাজ সেই স্থান থেকে শুরু করতে হবে, যেখান থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ মূলনীতিসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।

এই সত্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলামী আকীদা ও বিধানের তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের দিক দিয়েই হোক, অথবা আন্দোলনগত অগ্রগতির দিক দিয়েই হোক এ বিষয়টিকে আমরা এই পারায় উল্লেখিত প্রসংগে পুনরুল্লেখ করছি। কেননা ইসলামের ঐতিহাসিক মতবাদ ও মতাদর্শ বুঝতে এবং ইসলামের বাস্তব ইতিহাসকে বুঝতে মারাত্মক ভ্রান্তি ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অনুরূপভাবে প্রকৃত ইসলামী জীবনধারা ও বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতেও ভুল করা হচ্ছে। বিশেষত পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবাদী পন্ডিতরা এবং তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগী দ্বারা যারা প্রভাবিত, তারা ইসলামের ইতিহাস বুঝতে মারাত্মক ভুল করেছে। বলা বাহুল্য যে, কতক প্রতারিত নিষ্ঠাবান লোকও এদের মধ্যে রয়েছে।

দান সদকার পরিমাণ ও মাত্রা

এরপর পুনরায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ইসলামী বিধান ও নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের কোন্ সম্পদ দান করা উচিত? তুমি বলো যে, যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাই। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা নিদর্শনাবলীকে তোমাদের জন্যে বিশ্লেষণ করেন। যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করতে পারো।'

এর আগে তারা জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, তারা কী জিনিস দান করবে? সে প্রশ্নের জবাব দ্বারা সম্পদের ধরন ও প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে পরিমাণ ও মাত্রা। 'আল আফ্উ' শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত। মধ্যম মানের ব্যক্তিগত জীবন যাপনে যা ব্যয় হয় তার অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত সম্পদ দানযোগ্য। প্রথমে নিকটতম ব্যক্তিকে, তারপর পরবর্তী নিকটতম ব্যক্তিকে দান করতে হবে। অতপর পর্যায়ক্রমে অন্যদেরকে দেয়া হবে। শুধুমাত্র যাকাত দেয়া যথেষ্ট নয়। আমার মতে এ আয়াত যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিতও হয়নি, সংশোধিতও হয়নি। যাকাত দ্বারা কেবল ফরয দানের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এরপর দানের নির্দেশ যথারীতি বহাল থাকে।

যাকাত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারের প্রাপ্য। আল্লাহর শরীয়তকে বাস্তবায়নকারী সরকার তা আদায় করবে এবং তার নির্দিষ্ট প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করবে কিন্তু তারপরেও মুসলমানের কাছে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অবশিষ্ট থেকে যায়। উদ্বৃত্ত সকল সম্পদ যাকাত হিসাবে দেয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। অথচ এ আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, উদ্বৃত্ত সম্পদের পুরোটাই দানযোগ্য।

তাছাড়া রসূল (স.) বলেছেন, যাকাত ছাড়াও সম্পদে অন্যের প্রাপ্য আছে। (আহকামুল কোরআন) এই উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা যায়। এটাই উৎকৃষ্টতম ও মহত্তর পন্থা, কিন্তু কেউ যদি তা দান না করে এবং আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী সরকার যদি তার প্রয়োজন বোধ করে, তবে সে উক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ আদায় করে মুসলিম জনগণের কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করতে পারে। যাতে তা অন্যায় বিলাসিতায় নষ্ট না হয় অথবা উৎপাদনমূলক খাতে ব্যয়িত না হয়ে নিছক নিষ্ক্রিয় পুঁজি হিসাবে পড়ে না থাকে।

'এভাবে আল্লাহ তায়ালা নিদর্শনগুলোকে বিশ্লেষণ করেন যাতে তোমরা (দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করো।'

এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা কেবলমাত্র দুনিয়া সংক্রান্ত চিন্তা মানুষের মন ও বিবেককে মানব সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য এবং মানব জীবনের দায়দায়িত্ব ও কর্মকান্ড সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাংগ ধারণা দেয় না। এতে পরিস্থিতি, পরিবেশ ও মূল্যবোধেরও সার্থক ধারণা পাওয়া যায় না। বস্তুত দুনিয়ার জীবন হচ্ছে মানব জীবনের নিকৃষ্টতর ও ক্ষুদ্রতর অংশ মাত্র। আর জীবনের শুধু এ ক্ষুদ্র অংশের চাহিদা অনুসারে চিন্তা চেতনা ও আচরণ গড়ে তুললে তা কখনো বিশুদ্ধ চিন্তা ও ন্যায়সংগত সঠিক আচরণ শিক্ষা দিতে পারে না।

বিশেষত সম্পদ দান করার বিষয়টি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের চাহিদা ও দাবী অনুসারে বিবেচ্য। কেননা দান দ্বারা মানুষের সম্পদ যেটুকু হ্রাস পায়, তা তার মনের পবিত্রতা আনয়ন করে এবং তার চেতনা ও আবেগকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। অনুরূপভাবে যে সমাজে সে বাস করে, দান সদকার কল্যাণে সে সমাজে আসে অনাবিল শান্তি ও সুস্থতা। তবে এ সব জিনিস সব মানুষের কাছে ধরা পড়ে না। সে ক্ষেত্রে আখেরাত ও তার প্রতিদানের অনুভূতি দানের পাল্লাকে ভারী করে দেয় এবং মনে শান্তি আনে। এর মাধ্যমে দানকারীর মূল্যবোধে চেতনার ভারসাম্য আসে। ফলে অন্য কোনো কৃত্রিম অথচ চকচকে মূল্যবোধ দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না।

এতীমদের অধিকার সংরক্ষণ

এরপর ২২০ নং আয়াতটির শেষাংশ লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ওরা তোমার কাছে এতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও যে, তাদের জন্যে যা কিছু কল্যাণকর তার ব্যবস্থা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদেরকে নিজেদের সাথে মিলিয়ে নাও, তাহলে তারাও তো তোমাদের ভাই। কে কল্যাণকামী আর কে অমংগলকামী তা আল্লাহ তায়ালাই

জানেন। আর আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তোমাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলতেন। নিশ্চয় তিনি মহাপ্রতাপশালী মহাজ্ঞানী।'

বস্তুত সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে ইসলামী সমাজের ভিত্তি। মুসলিম সমাজ ও জনগণ তাদের ভেতরে যারা দুর্বল ও দরিদ্র রয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর এতীমদের অবস্থা তো আরো করুণ। কারণ তারা একে পিতৃহারা, তদুপরি অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তাই তাদের যত্ন নেয়া ও তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব সমাজের ওপর আরো বেশী। তাদের জান ও মাল উভয়েরই সংরক্ষণের দায়িত্ব সমাজকে বহন করতে হবে। সে সময়ে কোনো কোনো অভিভাবক এতীমদের খাবার নিজেদের সাথেই খাওয়াতো এবং যৌথভাবে ব্যবসায়ে খাটানোর জন্যে তাদের ধনসম্পদও নিজেদের ধনসম্পদের সাথে মিশ্রিত করতো।

কিন্তু এর ফলে কখনো কখনো এতীমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ কারণে এতীমের মাল আত্মসাৎ করার ব্যাপারে কঠোর ও ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী সম্বলিত বেশ কিছু আয়াত নাযিল হয়। ফলে কোনো কোনো অভিভাবক খুবই ভীত হয়ে পড়ে এবং তাদের খাওয়া দাওয়ারও আলাদা বন্দোবস্ত করে। এর পরিণতিতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, যে ব্যক্তির কাছে কোনো এতীম লালিত পালিত হতো, সে উক্ত এতীমের নিজের সম্পদ থেকে তার জন্যে আলাদা খাবার তৈরী করে দিতো। তারপর সেই খাবারের কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা পরবর্তী সময়ে পুনরায় খাওয়ার জন্যে রেখে দিতো। খাবার নষ্ট হলে ফেলে দেয়া হতো। এটি একটি মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি ছিলো, যা ইসলামের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলো না। উপরন্তু এতে সময় সময় এতীমেরই আর্থিক ক্ষতি হতো।

এই পরিস্থিতি দেখে কোরআন মুসলমানদেরকে মধ্যমপন্থী ও উদার নীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এতীমদের কল্যাণ ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাদেরকে উদার ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। এ জন্যেই বলেছে যে, এতীমদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আসল কাজ, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা নয়। তাদের ধন সম্পদের সাথে অভিভাবকদের ধন সম্পদ মিশ্রিত হওয়ায় যদি এতীমদের কল্যাণ হয় তাহলে এই মিশ্রনে কোনো আপত্তি নেই। কেননা এতীমরা তো অভিভাবকদের ভাই ছাড়া আর কিছু নয়। তারা সকলে দ্বীনী ও ইসলামী ভাই। সবাই বৃহত্তর মুসলিম পরিবারের অর্থাৎ মুসলিম সমাজের সদস্য। প্রকৃত কল্যাণকামী কে এবং অকল্যাণকামী কে, সেটা তো আল্লাহর অজানা নয়। সুতরাং বাহ্যিক কর্মকান্ড ও তার দৃশ্যমান রূপ কোনো মাপকাঠি নয়।

আসল মাপকাঠি হলো কর্মকান্ডের ফলাফল কী দাঁড়ায় এবং তার পেছনে কী ধরনের মনোভাব ও ইচ্ছা কার্যকর ছিলো। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ওপর কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত করে তাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। ইচ্ছা করলে তো কষ্ট দিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি দিতে ইচ্ছুক নন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। কাজেই তিনি যা চান, তা করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি মহাজ্ঞানী বিধায় শুধুমাত্র কল্যাণ, মহানুভবতা ও উদারতাই চান, অন্য কিছু নয়।

এভাবে পুরো বিষয়টাকে মহান আল্লাহর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা তাঁকে কেন্দ্র করেই ইসলামী বিধান ও আকীদা কেন্দ্রীভূত এবং তাঁর ওপরই গোটা মানব জীবন নির্ভরশীল। আর এটাই হলো ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য, এ আইনের বাস্তবায়ন বাইরে থেকে নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়, যদি অন্তরের গভীরতম প্রকোষ্ঠ থেকে তার প্রতি আনুগত্য ও তা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা না দেয়া হয়।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ

اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا

اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى

الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ

اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ

حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا

২২১. তোমরা (কখনো) কোনো মোশরেক নারীকে বিয়ে করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে, মনে রেখো, একজন মুসলমান দাসীও একজন (ঐতিহ্যবাহী) মোশরেক নারীর চাইতে উত্তম, যদিও এ (মোশরেক) নারীটি তোমাদের বেশী ভালো লাগে, (হে মুসলিম মহিলারা), তোমরা কখনো কোনো মোশরেক পুরুষদের বিয়ে করো না যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে; (কেননা) একজন ঈমানদার দাসও (একজন উঁচু খান্দানের) মোশরেক ব্যক্তির চাইতে ভালো, যদিও এ মোশরেক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে; (আসলে) এরা তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) দিকেই ডাকবে, আর আল্লাহ তায়ালা হামেশাই তাঁর মোমেন বান্দাদের তাঁর আদেশবলে জান্নাত ও ক্ষমার দিকেই আহ্বান জানান এবং (এ জন্যে) তিনি তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

রুকু ২৮

২২২. (হে নবী,) তারা তোমার কাছ থেকে (মহিলাদের মাসিক) ঋতুকাল (ও এ সময় তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে জানতে চাইবে; তুমি (তাদের) বলো, (আসলে মহিলাদের) এ (সময়টা) হচ্ছে একটা (অপবিত্র ও) কষ্টকর অবস্থা, কাজেই ঋতুস্রাবকালে তাদের সংগ বর্জন করবে এবং তোমরা (দৈহিক মিলনের জন্যে) তাদের কাছে যেও না, যতোক্ষণ না তারা (পুনরায়) পবিত্র হয়, অতপর তারা যখন পুরো পাক সাফ হয়ে যায় তখন তোমরা তাদের কাছে যাও– (দৈহিক মিলনের) যে পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে এবং যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে। ২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসল ক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসল ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো, তোমরা (সময় থাকতে) নিজেদের জন্যে কিছু অগ্রিম নেক আমল পাঠিয়ে দাও; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, জেনে রেখো, একদিন অবশ্যই

اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً

لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا

كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ

تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا

الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ

قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ

يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ

তোমাদের সবাইকে তাঁর সামনাসামনি হতে হবে। মোমেনদের তুমি (পুরস্কারের) সুসংবাদ দান করো। ২২৪. তোমরা তোমাদের (এমন) শপথের জন্যে আল্লাহর নামকে কখনো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে না, (যার মাধ্যমে) ভালো কাজ করা, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কিছুই শোনেন এবং সব কথাই তিনি জানেন। ২২৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্যে কখনো পাকড়াও করবেন না, তবে তিনি অবশ্যই সে সব শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্পের সাথে সম্পন্ন করো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। ২২৬. যেসব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে, তাদের (এ ব্যাপারে মনস্থির করার জন্যে) চার মাসের অবকাশ রয়েছে, (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের কসম থেকে) ফিরে আসে (তাহলে জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ২২৭. (আর) তারা যদি (এ সময়ের ভেতর) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তায়ালা সব শোনেন জানেন। ২২৮. তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু (অথবা ঋতু থেকে পবিত্র থাকার তিনটি মুদ্দত) পর্যন্ত নিজেদের (পুনরায় বিয়ের বন্ধন) থেকে দূরে রাখে; তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা কোনো অবস্থায়ই তাদের পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না, যদি তারা আল্লাহর ওপর এবং পরকালের ওপর ঈমান আনে; এ সময়ের ভেতর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীরা অবশ্য বেশী অধিকারী, যদি তারা উভয়ে পরস্পর মিলে

أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّآ

اٰتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَّخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُودُ

اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ

মিশে চলতে চায়; পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (পারিবারিক ভরণ পোষণের দায়িত্বের কারণে) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক মাত্রা বেশী রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বিপুল ক্ষমতার মালিক, (তিনি পরম) কুশলী।

রুকু ২৯

২২৯. তালাক দু'বার (মাত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে, তৃতীয় বারের আগেই) হয় সম্মান মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা সহৃদয়তার সাথে তাকে চলে যেতে দেবে; তোমাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে, তবে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না– এমন আশংকা যদি দেখা দেয় (তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উত্তম, এমন অবস্থায়) যদি তোমাদের ভয় হয় যে, এরা আল্লাহর বিধানের গন্ডির ভেতর থাকতে পারবে না; তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয়), তাহলে তাদের উভয়ের ওপর এটা কোন দূষণীয় (বিষয়) হবে না, (জেনে রাখো) এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনো অতিক্রম করো না, আর যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করে, তারা হচ্ছে সুস্পষ্ট যালেম। ২৩০. যদি সে তাকে তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্যে (আর) বৈধ হবে না, (হাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মমাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তারা যদি (সত্যিই) মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে

حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ
هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসাতে তাদের ওপর কোন দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা, যারা (এ সম্পর্কে) অবগত আছে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন। ২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা যখন তাদের অপেক্ষার সময় (ইদ্দত) পূর্ণ করে নেয়, তখন (হয়) মর্যাদার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনো, নতুবা ভালোভাবে তাদের বিদায় করে দাও, শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে কখনো তাদের আটকে রেখো না, এতে তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাই লংঘন করবে, আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে (প্রকারান্তরে) নিজের ওপরই যুলুম করে; (সাবধান) আল্লাহর নির্দেশসমূহকে কখনো হাসি তামাশার বস্তু মনে করো না, স্মরণ করো (তোমরা ছিলে অজ্ঞ), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (হেদায়াতের বাণী পাঠিয়ে) নেয়ামত দান করেছেন, (শুধু তাই নয়) তিনি তোমাদের জন্যে জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কেতাব নাযিল করেছেন, যা তোমাদের (দৈনন্দিন জীবনের) নিয়ম (কানুন) বাতলে দেয়; (অতএব) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

রুকু ৩০

২৩২. যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, অতপর (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীরাও তাদের নির্ধারিত অপেক্ষার সময় (ইদ্দত পালন) শেষ করে নেয়, তখন তোমরা তাদের (পছন্দমতো) স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা দিয়ো না, যদি তারা (বিয়ের জন্যে) সম্মানজনকভাবে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছে থাকে; তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের এ আদেশই দেয়া যাচ্ছে; (মূলত) এটা তোমাদের জন্যে অধিক সম্মানের এবং অনেক পবিত্র (কর্মধারা, কারণ); আল্লাহ তায়ালা জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৩. মায়েরা পুরো দুটো বছরই (সন্তানকে) বুকের দুধ খাওয়াবে (এ নিয়ম তার জন্যে), যে ব্যক্তি চায় (সন্তানের) দুধ খাওয়ানোটা পুরোপুরি আদায় করুক; সন্তানের পিতা (দুধ খাওয়ানোর) জন্যে মায়েদের (সম্মানজনক) ভরণ পোষণ (সুনিশ্চিত) করবে; কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না, (পিতার সংগতির কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে,) মায়েরাও যেন (আবার) নিজ সন্তান নিয়ে (বেশী) কষ্টে না পড়ে যায় এবং পিতাকেও যেন সন্তান (জন্ম দেয়ার) কারণে (অযথা) কষ্টে পড়ে যেতে না হয়, (সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের পিতার অবর্তমানে) তার উত্তরাধিকারীদের ওপর সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অধিকার এভাবেই বহাল থাকবে, (তবে কোনো পর্যায়ে) পিতামাতা যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগে ভাগেই সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও তাদের ওপর কোনো দোষের কিছু নেই; তোমরা যদি নিজেদের বদলে অন্য কাউকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়োগ করতে চাও এবং যদি দুগ্ধদাত্রীর পাওনা যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তাতেও কোনো গুনাহ নেই; (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখতে পান। ২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তারা (যদি তাদের) স্ত্রীদের (জীবিত) রেখে যায় (সে অবস্থায় স্ত্রীরা যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে), তারা তাদের নিজেদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সময় বিয়ে থেকে বিরত রাখবে, (অপেক্ষার) এ সময়টুকু যখন তারা পূরণ করে নেবে, তখন নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে তারা ন্যায়ানুগ পন্থায় (যা ইচ্ছা তাই) করতে পারবে এবং এ বিষয়টিতে তাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই; (মূলত) তোমরা যে যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা (তার পুরোপুরি) খবর রাখেন।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

২৩৫. (এমন কি সে অপেক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগেও) তোমরা কেউ যদি তাকে বিয়ে করার (জন্যে) পয়গাম পাঠাও, কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা যদি তোমরা নিজেদের মনের ভেতর লুকিয়েও রাখো, (তাতেও) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই; কেননা আল্লাহ তায়ালা এটা ভালো করেই জানেন, তাদের কথা অবশ্যই তোমরা বার বার মনে করবে, কিন্তু (সাবধান আড়ালে আবডালে থেকে) গোপনে তাদের বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ো না, তাদের সাথে কখনো তোমাদের কথা বলতে হলে তা বলবে সম্মানজনক পন্থায়; তার ইদ্দত (অপেক্ষার শরীয়তসম্মত সময়) শেষ হবার আগে কখনো তার সাথে বিয়ের সংকল্প করো না; জেনে রেখো, তোমাদের মনের সব (ইচ্ছা অভিসন্ধির) কথা কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁর থেকেই সতর্ক হও (এবং একথাও জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, মহান ক্ষমাশীল!

রুকু ৩১

২৩৬. স্ত্রীদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্যে মোহরের কোনো অংক নির্ধারণের আগেই যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাতে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই, (এ পরিস্থিতিতে মোহরের কোনো অংক নির্ধারিত না হলেও) তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় কিছু পরিমাণ (অর্থ) আদায় করে দেবে, ধনী ব্যক্তির ওপর (এটা হবে তার) নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর (হবে) তার সংগতি অনুযায়ী, (এটা) নেককার লোকদের ওপর (আরোপিত) স্ত্রীদের একটি অধিকার বটে।

২৩৭. যদি (এমন হয়,) তোমরা তাদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করোনি, কিন্তু মোহরের অংক নির্ধারিত করে নিয়েছো, এমতাবস্থায় যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাহলে

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ
خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

তাদের জন্যে (থাকবে) নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পরিমাণ, (যা) আদায় করে দিতে হবে, (হাঁ) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী নিজের থেকে যদি তোমাদের তা মাফ করে দেয় কিংবা যে (স্বামীর) হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে যদি (স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দিয়ে) অনুগ্রহ দেখাতে চায় (সেটা ভিন্ন কথা)। (তবে) তোমরা যদি অনুগ্রহ করো (তাহলে) তা হবে আল্লাহভীতির একান্ত কাছাকাছি; কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা (কে) কি কাজ করো, তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। ২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের ওপর (গভীরভাবে) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামায এবং তোমরা আল্লাহর জন্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যেও। ২৩৯. অতপর যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (তখন প্রয়োজনে তোমরা নামায পড়বে) পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়, তারপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে (স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে), তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্মরণ করার (নিয়ম) শিখিয়েছেন, যার কিছুই তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। ২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সে বিধবা স্ত্রীদের রেখে যায়, (তার উত্তরসুরিদের জন্যে তার) ওসিয়ত থাকবে যেন তারা এক বছর পর্যন্ত তাদের স্ত্রীদের ব্যয়ভার বহন করে, (কোনো অবস্থায় যেন তার ভিটেমাটি থেকে) তাকে বের করে না দেয়, (এ সময় পূরণ হবার আগে) যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে কোনো সম্মানজনক ব্যবস্থা করে নেয়; তাহলে এ জন্যে তোমাদের ওপর কোনো দোষ পড়বে না; আল্লাহ তায়ালা (সবার ওপর) পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ কুশলীও!

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ

لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪১. (স্বামীদের ওপর) তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যে ন্যায়সংগত ভরণ পোষণ পাবার অধিকার থাকবে; আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে এটা তাদের ওপর (আরোপিত) (মহিলাদের) অধিকার। ২৪২. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।

তাফসীর
আয়াত ২২১-২৪২

সূরা বাকারার এই অংশে আমরা কিছু পারিবারিক বিধির সাক্ষাত পাই। ইসলামী সমাজ ও সংগঠনের ভিত্তি ও স্তম্ভ হলো পরিবার। সেই পরিবারকে সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যেই এই বিধিমালা নাযিল হয়েছে। ইসলাম এই ভিত্তির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি ও গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে সুসংহত, সুশৃংখল এবং জাহেলিয়াতের নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা থেকে পবিত্র করেছে। কোরআনের একাধিক সূরায় এই বিধিসমূহকে আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান দেখতে পাই। ইসলামী সমাজের এই সর্ববৃহৎ স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যতো মালমশলার প্রয়োজন, এই বিধিগুলোতে তার সবই রয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মূলত একটি পারিবারিক ব্যবস্থা। কেননা, এটা মানুষের জন্যে আল্লাহর মনোনীত বিধান। এতে মানুষের যাবতীয় সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং তার স্বভাব প্রকৃতির যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামের পারিবারিক বিধান প্রকৃতি ও সৃষ্টির আদি উৎস থেকে উৎসারিত। সকল প্রাণী ও সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের প্রথম ভিত্তিমূল থেকেই এর উদ্ভব হয়েছে। এ বিষয়টি নিম্নের দুটি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় 'আমি প্রত্যেক জিনিস থেকে দুটি জোড়া সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো।' (সূরা আয্ যারিয়াত) 'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি সকল জোড়াকে মাটি থেকে, মানুষের আপন সত্ত্বা থেকে এবং তাদের অজানা বহু বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইয়াসীন)

সৃষ্টি জগতের প্রতি এই সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপের পর ইসলাম দৃষ্টি দেয় মানুষের প্রতি। সে প্রথম মানুষটির স্মৃতি চারণ করে, যার মধ্য থেকে এক জোড়া নরনারীর উদ্ভব হয়। তারপর তা থেকে তার বংশধর এবং তারপর সমগ্র মানব জাতির আবির্ভাব ঘটে। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলেন– 'হে মানব জাতি! তোমাদের সেই প্রতিপালক সম্পর্কে সতর্ক হও, যিনি তোমাদেরকে একটি মানব সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং সেই দুইজন থেকে বিপুলসংখ্যক নরনারী সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকো এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন।' আর সূরা আল হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বহুসংখ্যক জাতিতে ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো।'

অতপর ইসলাম নরনারীর মধ্যে সহজাত আকর্ষনে বিদ্যমান থাকার কথা ব্যক্ত করেছে। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারীর সাথে মিলিত হোক। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ পরিবার গড়ে তুলুক ও ঘরমুখী হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'এও আল্লাহর একটা নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই ভেতর থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে বসবাস করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও স্নেহমমতার সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রোম)

'নারীরা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।' (আল বাকারা)

'তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র বিশেষ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে চাও আগমন করো এবং নিজেদের জন্যে আগে ভাগে কিছু করে নাও, আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেই হবে। মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।' (সূরা আল বাকারা)

'আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরকে বসবাসের স্থান বানিয়েছেন।' (সূরা আন নাহল)

এখানে মানুষের স্বভাবসুলভ দাবী ও চাহিদা সক্রিয় রয়েছে। আর সৃষ্টির আদিতে ও মানুষের সত্ত্বার গভীরে বিদ্যমান স্বভাব ও প্রকৃতির এই দাবীকে পরিবারই পূরণ করে থাকে। এ জন্যে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থাটা অবিকল আদি মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে তা বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টির আদি প্রক্রিয়া থেকে জন্ম নিয়েছে। যে বিশ্বজগতের একটি অংশ এই মানুষ, সেই বিশ্বজগতকে গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তার সাথে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সংযোগ ও সমন্বয় রয়েছে। এই সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে ইসলামী বিধান অনুসারে।

পরিবার হচ্ছে মানব শিশুর সংরক্ষণ, প্রতিপালন, তার দেহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মার পরিবর্ধন ও বিকাশ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই পরিবারের তত্ত্বাবধানেই সে দয়া, ভালোবাসা ও পারস্পরিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা লাভ করে। পরিবারের তদারকীতেই সে এমন স্বভাব লাভ করে যা সারা জীবনই বহাল থাকে। পরিবারেরই আদর্শে ও প্রশিক্ষণে সে জীবনে বিকশিত হয়, জীবনকে সেই অনুসারে বিশ্লেষণ করে এবং জীবনের সাথে তদনুসারে আচরণ করে।

মানব শিশু সকল প্রাণী অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী শৈশবের অধিকারী। অন্য যে কোনো প্রাণীর চেয়ে সে বেশী দিন শিশু হিসাবে কাটায়। এর কারণ এই যে, প্রত্যেক প্রাণীর কাছ থেকে পরবর্তী জীবনে যে কাজ ও ভূমিকার আশা করা হয়, তার মধ্যে সেই ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের জন্যেই শৈশবের স্তরটি নির্ধারিত হয়। আর যেহেতু মানুষের দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পৃথিবীতে তার ভূমিকা সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাপূর্ণ, তাই তার শৈশবকাল সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী, যাতে ভবিষ্যতের জন্যে তার প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ সুন্দর ও নিখুঁত হয়। এই জন্যে অন্য কোনো প্রাণীর শিশুর তুলনায় মানব শিশুর আপন পিতামাতার সাহায্যের প্রয়োজন অধিকতর ও তীব্রতর। আর এ কারণেই স্থীতিশীল ও শান্ত পরিবার মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার জন্যে অধিকতর প্রয়োজনীয়, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি, তার গঠন ও পার্থিব জীবনে তার যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টির জন্যে অধিকতর অনুকূল।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমানিত হয়েছে যে, উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে পরিবারের কোনো বিকল্প তো নেইই, উপরন্তু শিশুর গঠন ও লালনে অন্য কোনো ব্যবস্থার সাহায্য নেয়া ক্ষতিকর। অধুনা কিছু কিছু অস্বাভাবিক ও নিপীড়ণমূলক চিন্তাধারার অনুসারী মহল পরিবারের বিকল্প এক

ধরনের শিশু সদন উদ্ভাবনে উদ্যোগী হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি করা স্বাভাবিক, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা যে ভ্রান্ত ও অরুচিকর সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করে, তারই ফসল এইসব শিশু সদন।

তাছাড়া পাশ্চাত্যের ধর্মদ্রোহী জাহেলিয়াত কর্তৃক সংঘটিত বর্বরোচিত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন বিপুলসংখ্যক শিশু হস্তগত হওয়ায় কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশ এ জাতীয় শিশু সদন স্থাপনে বাধ্য হয়। পাশ্চাত্য জাহেলিয়াত আজকাল যে পাশবিক মূর্তি নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তা যুদ্ধরত সৈনিক ও নিরীহ বেসামরিক লোকজনের কোনো ভেদাভেদ ও বাছবিচার করে না। ফলে এ ধরনের পরিবারচ্যুত শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তাদের জন্যে শিশু সদন গড়তে হচ্ছে। শিশু সদনের প্রয়োজনীয়তা আরো একটা কারণেও সৃষ্টি হচ্ছে। সেটি হলো, এক ধরনের অবাঞ্ছিত সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়ে বিপুলসংখ্যক মহিলা চাকুরী করতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষের জন্যে কোন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর উপযোগী সে সম্পর্কে ইসলাম বিরোধী ধ্যান ধারণা এইসব কর্মজীবী মহিলার দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার জন্যে দায়ী।

এই অভিশপ্ত সমাজ ব্যবস্থা মানব শিশুকে মাতৃস্নেহ থেকে এবং পারিবারিক পরিবেশে মায়ের আদরযত্ন থেকে বঞ্চিত করছে। তাই ওইসব অসহায় শিশুকে বাধ্য হয়ে শিশু সদনে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। অথচ পরিতাপের বিষয় যে, এইসব শিশু সদনের সার্বিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ শিশুর স্বভাব প্রকৃতি এবং তার মানসিক গঠন ও বিকাশের অনুকূল নয়। ফলে তাদের মন নানারকমের অস্থিরতা ও সমস্যার শিকারে পরিণত হয়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার বিকৃতি এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, সমকালীন এক দল লোক মহিলাদের চাকুরী করাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে নারীদের মুক্তি লাভ এবং নারী স্বাধীনতা ও প্রগতিশীলতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ এই অভিশপ্ত ব্যবস্থাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে, আর এই শিশু হচ্ছে পৃথিবীর বুকে মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ এবং মানব জাতির ভবিষ্যতের সর্বোত্তম পুঁজি। অথচ এর বিনিময়ে সে কী পায়? এর বিনিময়ে বড়জোর পরিবারের উপার্জন একটু বাড়ে অথবা মায়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়। আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাহেলী সভ্যতা এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতি এত নিম্নস্তরে উপনীত হয়েছে যে, যে নারী পৃথিবীর সেরা সম্পদ মানব শিশুর লালনে আপন শ্রম ব্যয় করে এবং অন্য কোনো চাকুরীতে নিয়োজিত হয় না, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দেয়।(১)

---

(১) শিশু সদনের অভিজ্ঞতা থেকে সর্বপ্রথম যে তত্ত্বটি জানা যায় তা এই যে, জীবনের প্রথম দু'বছরে প্রত্যেক শিশুর সহজাত মনস্তাত্বিক চাহিদা হচ্ছে একান্তভাবে তার পিতামাতার সাথে থাকবে। বিশেষতঃ মায়ের সাথে একান্ত বসবাস এবং সেই সময়ে অন্য কোনো শিশু যেনো তার সাথে অংশীদার না হয় এটা সে খেয়াল করে, আর দু'বছরের পর সহজাতভাবে সে এরূপ অনুভব করে যে, তার দু'জন পিতামাতা আছে, যারা দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং সে তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা তাদের সন্তান। প্রথমোক্ত তত্ত্বটি শিশু সদনগুলোতে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। দ্বিতীয়টি পরিবেশে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ দু'টি চাহিদার যে কোনো একটি থেকে বঞ্চিত হলে শিশু বিপথগামী হওয়া এবং কোনো না কোনো পর্যায়ে মানসিক ব্যধিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

যখন দুর্ঘটনাক্রমে শিশু উক্ত দু'টো চাহিদার কোনো একটি থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার জীবনে ভীষণ এক বিপর্যয় নেমে আসে। আধুনিক জাহেলী সভ্যতা কি সকল শিশুর জীবনে এই বিপর্যয় টেনে আনতে চায়? তারপরও কি আল্লাহর দেয়া পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি থেকে যারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে, তারা এই দাবীই করতে থাকবে যে, এটাই অগ্রগতি, সভ্যতা ও নারী স্বাধীনতা? (দেখুন, 'আল ইনসানু বাইনাল মাদ্দিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম' এবং শোবাহাতুন হাওলাল ইসলাম'—গ্রন্থকার) শেষোক্ত গ্রন্থটি 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।—সম্পাদক

এ জন্যে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পরিবারের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এবং পরিবারের ওপর সে এতো গুরুত্ব দেয়, যা তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ইসলামের এই সমাজ ব্যবস্থার বদৌলতেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে শান্তির মধ্যে প্রবেশ করাতে চান এবং তার আওতাধীন শান্তির অংশীদার করতে চান। এ কারণেই কোরআনের বিভিন্ন সূরায় উক্ত পরিবার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। আলোচ্য সূরা বাকারাও ওইসব সূরার অন্যতম।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক বিধি

আলোচ্য সূরার কিছু আয়াতে বিয়ে, দাম্পত্য আচরণ, তালাক, ইলা, ইদ্দত, খোরপোশ, শিশুকে দুধ খাওয়ানো, শিশুর লালন পালন ও সামাজিক সম্পর্কজনিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

তবে ফেকহ ও আইনের পুস্তকে যে রূপ এসব বিধি আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া যায় এখানে সেভাবে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ এখানে এসব বিধি এক ভিন্নতর পরিমন্ডলে আলোচিত হয়েছে। এই পরিমন্ডলে মানুষের মনে এরূপ অনুভূতির সঞ্চার হয় যে, মানব জীবনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান রচনা করেছেন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যেন তার সামনে উপস্থিত। যে মহান আকীদা বিশ্বাস থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যেন তার সামনে উপস্থাপিত।

আর এই মূলনীতি যেহেতু সরাসরি মহান আল্লাহর সাথে, মানবজাতি সংক্রান্ত আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার সাথে এবং মানুষের জীবনকে গঠন করার লক্ষ্যে আল্লাহর পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই সে উপলব্ধি করে যে, সে নিজেও আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষ এবং পুরস্কার ও শাস্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সাথে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচকভাবে কার্যত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

আর প্রথম মুহূর্ত থেকেই মানুষ আল্লাহর এই বিধানের গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতাকে উপলব্ধি করে। সে অনুধাবন করে যে, এর প্রতিটি ছোট বড় বিধি আল্লাহর প্রত্যক্ষ মনোযোগ ও তত্ত্বাবধানে রচিত এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি বিধি আল্লাহর মানদন্ডে এক বিরাট ও মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সে আরো অনুভব করে যে, এ বিধান দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জীবনকে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন এবং বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা তিনি নির্ধারণ করেছেন তার উপযুক্ত করে তাকে গড়ে তুলতে চান। সুতরাং এ বিধানের ওপর হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষের উদ্রেক করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি অবধারিত করে তোলে।

শরীয়তের এই বিধিসমূহ অত্যন্ত নিপুণভাবে ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি বিধি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় আলোচনা সম্পন্ন হওয়ার আগে অপরটির আলোচনা শুরু করা হয়নি। অতপর প্রত্যেক বিধির শেষে এবং কখনো কখনো মাঝখানে উক্ত বিধির সামগ্রিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করা হয়েছে। এ সব মন্তব্য দ্বারা মানুষের বিবেককে জাগ্রত ও সচেতন করা হয়েছে, বিশেষত সেইসব নির্দেশের বেলায়, যার সাথে অন্তরের খোদাভীতি ও বিবেকের সচেতনতার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এই জাগরণ ও চেতনা সৃষ্টিকারী শাণিত মন্তব্য না করা হলে কোরআনের বিধিসমূহকে পাশ কাটানোর কৌশল উদ্ভাবন করা সম্ভবপর নয়।

এ সব বিধির মধ্যে প্রথমটিতে মুসলমান পুরুষের সাথে মোশরেক নারীর এবং মোশরেক পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এই বিধি ঘোষণা করার পর মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে,

'ওরা (অর্থাৎ মোশরেক বর ও কনেরা) দোযখের দিকে আহবান করে। আর আল্লাহ তায়ালা আহবান করেন বেহেশত ও তাঁর অনুমোদনকৃত ক্ষমার দিকে, আর তিনি নিজের আয়াতগুলোকে মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তারা শিক্ষা লাভ করে।'

দ্বিতীয় বিধিটি ঋতু চলাকালে স্ত্রী সহবাসের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত। এ বিধি বর্ণনা করার পর একাদিক্রমে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করা হয়েছে ।এতে সহবাসকে ও নর নারীর সম্পর্ককে নিছক ক্ষণস্থায়ী দৈহিক কামনা চরিতার্থ করার উপায় নয় বরং সেই তাৎক্ষণিক কামবাসনার চেয়ে অনেক উচ্চতর মানবিক ও মহত্তর উদ্দেশ্য সম্পন্ন একটা মানবিক কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এমনকি এ কাজকে নিছক মানুষের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর্যায়েও গণ্য করা হয়নি, বরং তার চেয়ে অনেক উচ্চতর কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরআনের বক্তব্য অনুসারে এটা আল্লাহর এবাদাত ও তাকওয়ার মাধ্যমে মোমেনের চরিত্র নির্মল, পবিত্র ও কলুষমুক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'স্ত্রীরা যখন ঋতু থেকে পবিত্র হবে, তখন তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেইভাবে এসো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীকে ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্য ক্ষেত। কাজেই যেমন ইচ্ছা তোমাদের শস্য ক্ষেতে এসো এবং নিজেদের জন্যে কিছু করে নাও। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমাদের তাঁর সাথে সাক্ষাত অবধারিত। মোমেনদেরকে সুখবর দিয়ে দাও।'

তৃতীয় বিধিটি হচ্ছে সাধারণভাবে শপথ করা বা কসম করা সংক্রান্ত। এ বিধিকে ইলা (স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকার শপথ) ও তালাকের বিধানের ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধিকেও আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর ভয়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অতপর এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে!

'আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয় অবগত এবং সবকিছু শোনেন।' অন্যত্র মন্তব্য করা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও সহনশীল।'

চতুর্থ বিধিটি 'ইলা' সংক্রান্ত, আর এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়েছে,

'শপথকারীরা যদি শপথ প্রত্যাহার করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দিতে সংকল্প নেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন।'

পঞ্চম বিধিটি হলো তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত সংক্রান্ত। আর এর শেষে একাধিক মন্তব্য করা হয়েছে। যথা,

'তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্যে তাদের গর্ভে আল্লাহ তায়ালা যে সন্তান সৃষ্টি করেছেন তা লুকানো বৈধ নয়, যদি তারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকে' এবং 'আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।'

ষষ্ঠ বিধিটি হলো তালাকের সংখ্যা এবং যাকে তালাক দেয়া হলো তার কাছ থেকে দেনমোহর ও খোরপোষ বাবদ দেয়া কোনো কিছু ফেরত নেয়া যায় কিনা– সে সংক্রান্ত। এ বিধির শেষে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা হলো,

'তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছো তার কোনো কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়। তবে দম্পতি আল্লাহর সীমা বহাল রাখতে পারবে না বলে আশংকা করলে সে কথা স্বতন্ত্র। তোমরা যদি আশংকা করো যে, তারা উভয়ে আল্লাহর সীমা বহাল রাখতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী

'তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা প্রথা মোতাবেক ভরণ পোষণ পাওয়ার অধিকারী। খোদাভীরুদের কাছে এটা অবশ্য প্রাপ্য।'

আর সকল বিধির সাধারণ উপসংহার টানা হয়েছে এই বলে,

'এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তার আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করেন যেন তোমরা বুঝতে পারো।'

মূলকথা এই যে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানা উচিৎ। বিয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানা, সহবাস ও সন্তান প্রজননে আল্লাহর হুকুম মানা। তালাক ও বিচ্ছেদে আল্লাহর হুকুম মানা, ইদ্দত পালন ও তালাক প্রত্যাহারে আল্লাহর আনুগত্য, ভরণ পোষণ প্রদানে আল্লাহর আনুগত্য, সদাচার ও সৌজন্যের সাথে স্ত্রীকে রাখা ও ন্যায়সংগতভাবে বিদায় করাতেও আল্লাহর হুকুম মানা, পণ বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে তালাক দেয়ায় আল্লাহর হুকুম মানা, শিশুকে দুধ খাওয়ানো ও দুধ ছাড়ানোতে আল্লাহর হুকুম মানা। মোটকথা প্রতিটি কাজে আল্লাহর হুকুম মানা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর এবাদাত ও দাসত্ব করা হচ্ছে এইসব বিধানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ জন্যেই এ সব বিধির মাঝে ভীতিজনক অবস্থা ও শান্তিকালীন অবস্থার নামাযের বিধিও এসে গেছে। বলা হয়েছে,

'সকল নামায সংরক্ষণ করো এবং মধ্যবর্তী নামাযকেও সংরক্ষণ করো। আর আল্লাহর কাছে দোয়াকারী হিসাবে দাঁড়াও। যদি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকো তাহলে পদব্রজে অথবা যানবাহনে চলন্ত অবস্থায় নামায পড়ো। যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেমন তিনি তোমাদের অজানা বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছেন।'

এ বিধিটি পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনসংক্রান্ত বিধিমালার মাঝখানে এসেছে। এভাবে নামাযের এবাদাতকে বাস্তব জীবনের এবাদাতের সাথে একাকার করে ফেলা হয়েছে। এই একাকার করাটা ইসলামের স্বভাব-প্রকৃতি অনুসারেই হয়েছে। ইসলামী মতাদর্শে মানুষের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেই অনুসারেই সম্পন্ন হয়েছে। আয়াতগুলোতে প্রকারান্তরে সুক্ষ্মভাবে এ কথাই বলা হয়েছে যে, এই সবই এবাদাত। এইসব কাজ কর্মে আল্লাহর হুকুম মানা আর নামাযে আল্লাহর হুকুম মানা একইরকম এবাদাত। মানুষের জীবন একটা একক ও অবিভাজ্য জিনিস এবং এর যে অংশেই আল্লাহর আনুগত্য করা হোক, তা সার্বিক ও সর্বাত্মক আনুগত্য। সকল আদেশ বা হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। আর আল্লাহর হুকুমই মানব জীবনের জন্যে মনোনীত আল্লাহর বিধান।(১)

---

(১) কোরআন শরীফের এই বিস্ময়কর আয়াতটির প্রকৃত রহস্য ও মর্ম আমি বেশ কিছুকাল যাবত উদ্ধার করতে পারিনি। তাই প্রথম সংস্করণে আমি বলেছিলাম, আমি স্বীকার করছি যে, এই জায়গাটিকে আমি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও এর মর্ম উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই বলে জোড়া তালি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই না, আর কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে যে, পারিবারিক বিধির মাঝখানে নামাযের আলোচনার অবতারণা দ্বারা নামাযের আদেশের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমি বলেছি, তবে আমি সরল মনেই বলছি যে, যেটুকু মর্ম উপলবিদ্ধ করেছি তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। অন্য কোনো মর্ম উদ্ধার করতে পারলে দ্বিতীয় সংস্করণে তা বর্ণনা করবো। আর কোনো পাঠক যদি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন তবে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

তখন যে মর্ম উপলব্ধি করেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট এবং এতে আমি পথের সন্ধান পেয়েছি। এ জন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।—গ্রন্থকার

এ বিধিসমূহের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তা একদিকে যখন আল্লাহর এবাদাতের নমুনা তুলে ধরে, এবাদাতের পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টি করে। তখন তারই পাশাপাশি তা বাস্তব জীবনের কোনো দিক ও বিভাগ সম্পর্কেও উদাসীন হয় না, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির দাবী ও চাহিদাকে অবহেলা করে না এবং এই পার্থিব জীবনের কোনো বাস্তব প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করে না, অপূর্ণও রাখে না।

ইসলাম মানুষের জন্যেই আইন রচনা করে ফেরেশতার জন্যে নয়, কোনো স্বপ্নের জগতের বাসিন্দাদের জন্যেও নয়। তাই সে তার আদেশ নিষেধ ও বিধিবিধান দ্বারা তাকে যত উচ্চ এবাদাতের অংগনে উন্নীত করুক না কেন, সে যে মানুষ, সে কথা সে কখনো ভোলে না। সে এ কথাও ভোলে না যে, তার এবাদাত মানুষের উপযুক্ত এবাদাতই হবে- অন্য কিছু নয়। মানুষের মধ্যে নানারকমের আবেগ, উচ্ছ্বাস, আকর্ষণ ও টান রয়েছে। তার ভেতরে নানা দুর্বলতা ও অক্ষমতা থাকবে। তাদের ভেতরে নানারকমের প্রয়োজন ও চাহিদা, প্রতিক্রিয়া, আবেগ উদ্দীপনা, পরিচ্ছন্নতা ও মলীনতা ইত্যাদি থাকবে। ইসলাম এইসব কিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং এইসব কিছুকে সে সামগ্রিকভাবে এবাদাতের পরিচ্ছন্ন পথে টেনে নিয়ে যায়। কোনো বলপ্রয়োগ ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে তাকে আলোর পথে নিয়ে যায় না। ইসলাম তার সমগ্র জীবন পদ্ধতি মানুষকে মানুষ বিবেচনা করেই গড়ে তোলে।

এ জন্যে ইসলাম 'ইলাকে' বৈধ করেছে। 'ইলা' অর্থ একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে স্ত্রী সহবাস না করার শপথযুক্ত প্রতিজ্ঞা। অবশ্য এটিকে বৈধকরণেও এর মেয়াদকে অনধিক চার মাসের মধ্যে সীমিত করেছে। ইসলাম তালাকেরও অনুমতি দেয় এবং তার জন্যে আইন ও বিধি রচনা করে। এর পাশাপাশি সে দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কে দৃঢ় ও অটুট করার এবং এই সম্পর্ককে এবাদাতের পর্যায়ে উন্নীত করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। এই ভারসাম্য ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত মহৎ এবং মানবীয় শক্তি সামর্থের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ ব্যবস্থায় পরিণত করে। আর এর উদ্দেশ্যও একমাত্র মানুষেরই কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

এ বিধান মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজের পক্ষে সহজতর। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মতভাবে সহজ। পরিবারের ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যখন সাফল্যের মুখ দেখলো না এবং সমাজের এই প্রাথমিক কোষটি যখন স্থীতিশীল হতে পারলো না, তখন সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা, যিনি মানুষের জ্ঞানের অগোচরে যা কিছু রয়েছে, তার সবই জানেন, তিনি চাননি যে এই নরনারীর মধ্যকার এই সম্পর্ক একটা কারাগারে পরিণত হয়ে যাক এবং তার মধ্যে তারা যতোই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কষ্ট পাক, যতোই তা কন্টকময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ খাঁচার রূপ নিক, তবু তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায়ই অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন পরিবার যেন একটা শান্তির নীড় হয়ে টিকে থাকে। কিন্তু সে লক্ষ্য যখন অর্জিত হলো না এবং একেবারেই স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত কারণে দাম্পত্য জীবনে বনিবনা হলো না। তখন তাদের উভয়ের বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পুনরায় অনুরূপ চেষ্টা চালানোই সর্বোত্তম পন্থা বিবেচিত হতে পারে। আর এই চরম ও সর্বশেষ ব্যবস্থাটিও গৃহীত হয় এই সম্মানিত প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচানোর অন্য সকল উপায় উপকরণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর। এই সাথে এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় আইনানুগ রক্ষাকবচ উদ্ভাবন করা হয়েছে যাতে স্বামী, স্ত্রী, দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা গর্ভস্থ সন্তান এদের কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বস্তুত এ হচ্ছে মানুষের জন্যে আল্লাহর রচিত ও প্রবর্তিত ব্যবস্থা।

মানব জাতির জন্যে আল্লাহর মনোনীত এই বিধানের মূলনীতিসমূহ এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠিত এই শান্তিপূর্ণ সমাজের সাথে যখন কোনো ব্যক্তি তৎকালীন অন্যান্য মানব সমাজ ও তাদের

সামাজিক রীতিনীতির তুলনা করে, তখন সে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান দেখতে পায়। অনুরূপ বিস্তর ব্যবধান সে দেখতে পায় যখন পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে প্রগতির ধ্বজাধারী আধুনিক জাহেলিয়াতকে উক্ত ইসলামী বিধানের সাথে তুলনা করে। এরূপ তুলনা করার পর সে অনুভব করতে পারে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্যে এই বিধান মনোনীত করার সময় তাদেরকে কতো সম্মান, মর্যাদা ও সুখ-শান্তি দিতে চেয়েছেন। বিশেষত নারীরা বুঝতে পারে এ বিধানে তাদের জন্যে কতো সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষন করা হয়েছে। ইসলামের বিধানে নারীকে দেয়া এই সুস্পষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করার পর যে কোনো সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন নারীর মন স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর ভালোবাসায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কের এই সাধারণ আলোচনার পর এবার আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করবো। মোশরেকদের মেয়েদের বিবাহ করা হারাম। ২২১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তোমরা কখনো কোনো মোশরেক নারীদের বিয়ে করো না, (হাঁ) তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের ওপর ঈমান আনে (তবে বিয়ে করতে পারো, মনে রাখবে) ....তিনি তার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনাও করেন, যাতে করে তারা এ থেকে নিজেদের জন্যে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

ইসলামে বিবাহের বিধান

বিয়ে হচ্ছে দু'জন মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এবং দু'জন মানুষের মাঝে যে ব্যাপকতর ভাবের আদান প্রদান হয়ে থাকে, তার সংরক্ষণকারী গভীরতম, দৃঢ়তম ও স্থায়ী বন্ধন। এ জন্যে উভয়ের হৃদয়ের এমন একটা গ্রন্থীতে মিলিত হওয়া চাই, যা কখনো খোলে না বা বিচ্ছিন্ন হয় না। আর উভয়ের হৃদয়ের মিলিত হওয়া ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে এমন একটি মত ও পথ অপরিহার্য, যার ওপর উভয়ের মনের বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মে। এ ধরনের মত ও পথ ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কেননা ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের মন জয়কারী, মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী, তার ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণকারী, তার অন্তরের আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট রূপদানকারী সবচেয়ে প্রশস্ত ও সবচেয়ে গভীর মত ও পথ।

ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস মানুষের সমগ্র জীবনের পথ নির্ণয় করে দেয়। এ কথা সত্য যে, আকীদা বিশ্বাস মানব মনে সুপ্ত থাকায় এবং তার কোনো গতিবিধি বা নড়াচড়া দৃশ্যমান না হওয়ায় অনেকে প্রতারিত হয়ে থাকে। তারা এরূপ ভুল ধারণায় আক্রান্ত হয় যে, আকীদা বিশ্বাস একটা সাময়িক অনুভূতি মাত্র, যার বিকল্প হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক মতবাদকে গ্রহণ করে নিলে তার আর প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের মনের প্রকৃত স্বরূপ ও তার বাস্তব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কম থাকা এবং মানুষের মন ও তার স্বভাব প্রকৃতির বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করার কারণেই এ ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মুসলিম জাতির যে প্রথম প্রজন্মটি মক্কায় অবস্থান করছিলো, তাদের মন-মগযে আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তার দিক দিয়ে যেরূপ আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো এবং মক্কার মুসলিম সমাজ থেকে তাদের চিন্তাগত দিক দিয়ে যেরূপ বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়েছিলো। মক্কায় সেরূপ পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা সামাজিকভাবে অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সেখানকার পরিবেশ তাদেরকে এর সুযোগ দিচ্ছিলো না। কেননা সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুকূল হতে যথেষ্ট সময় লাগে এবং এ জন্যে দীর্ঘস্থায়ী সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

পরে যখন আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সংগঠনের জন্যে মদীনায় স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং তাদের চিন্তাগত ও আদর্শগত স্বাতন্ত্র যেমন অর্জিত হয়েছে, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্রও দান করার ইচ্ছা করলেন। তখন এই লক্ষ্যে নতুন করে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড শুরু হলো এবং এ আয়াত নাযিল হলো।

এ আয়াত নাযিল হয়ে মুসলমান ও মোশরেকের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করে দিলো। তবে ইতিমধ্যে যেসব বিয়ে সংঘটিত হয়েছিলো, তা ষষ্ঠ হিজরীতে 'হোদায়বিয়াতে' সূরা আল মোমতাহেনার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত বৈধ ছিলো। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ওগুলোও বাতিল হয়ে যায়, 'হে মোমেন ব্যক্তিরা! তোমাদের কাছে যখন মোমেন নারীরা হিজরত করে চলে আসবে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করবে। যদি নিশ্চিত হও যে তারা মোমেন, তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। মোমেন নারীরা এখন আর তাদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফের পুরুষরাও এখন আর মোমেন নারীদের জন্যে বৈধ নয়।

'আর তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।'

মুসলিম পুরুষ কর্তৃক মোশরেক নারীকে এবং মোশরেক পুরুষ কর্তৃক মুসলিম নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, যে দুটি মন একই আকীদা ও আদর্শে বিশ্বাসী নয়, সে দুটি মনকে বিয়ে দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বিয়ে একটা দুর্বল ও অচল বন্ধন হয়ে পড়ে। এই দুটি হৃদয় আল্লাহর ব্যাপারে একমত নয় এবং তার বিধানের ব্যাপারেও তাদের জীবনের মিল নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্মানিত জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ইতর প্রাণীর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, তাই তাঁর ইচ্ছা যে, এই বন্ধন নিছক জৈবিক কামনা ও কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বন্ধনে পরিণত না হোক। তিনি চেয়েছেন যে, এ বন্ধনটি এতো উচ্চস্তরের হোক যেন তা আল্লাহর সাথে এর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এই বন্ধনের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা ও আল্লাহর বিধানকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে জীবনের অগ্রগতি ও পবিত্রতা নিশ্চিত করে।

এ জন্যেই অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে মোশরেক নারীদেরকে বিয়ে করার বিরুদ্ধে, যতক্ষণ তারা মোমেন না হয়। মোমেন হয়ে গেলে ব্যবধানটি ঘুচে যায়। অন্তর দুটি আল্লাহর সাথে মিলিত হয় এবং দু'জন মানব মানবীর মধ্যকার সম্পর্ক নিখুঁত নিষ্কলুষ ও বিপদমুক্ত হয়। ইসলাম গ্রহণের নতুন চুক্তি দ্বারা ওই চুক্তি মযবুত ও শক্তিশালী হয়। বলা হয়েছে,

'মোমেন দাসী (সম্ভ্রান্ত) মোশরেক নারী অপেক্ষা অনেক ভালো, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।'

নিছক জৈবিক কামনা থেকে যে মুগ্ধতা জন্মে, তাতে উচ্চতর মানবীয় আবেগ অনুভূতির স্থান থাকে না এবং তা দেহ ও স্নায়ুর সিদ্ধান্তের চেয়ে উন্নত ও মহৎ কিছু নয়। আসলে দেহের সৌন্দর্যের চেয়ে মনের সৌন্দর্য অধিকতর মূল্যবান ও তার প্রভাব অধিকতর গভীর। এমনকি মুসলিম নারী যদি বাঁদীও হয় তথাপি ইসলামের সাথে সম্পর্কের কারণে সে সম্ভ্রান্ত মোশরেক নারীর চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে। কেননা এ সম্পর্ক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়ায় তা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হয়। এরপর বলা হয়েছে,

'মোশরেক পুরুষদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা মোমেন হয়। একজন মোমেন ভৃত্য (বনেদী) মোশরেক পুরুষের চেয়ে অনেক উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে থাকে।'

এখানে একই বক্তব্য ভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রথমোক্ত বক্তব্যকে আরো দৃঢ় করা। উভয় নিষেধাজ্ঞার কারণ একই। আর তা হচ্ছে,

'ওরা দোযখের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ তায়ালা ডাকেন বেহেশত ও ক্ষমার দিকে।'

বস্তুত এ দুটি পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী। দুটি ডাক বা আহবানও পরস্পর বিরোধী। কাজেই যে পরিবারের ওপর গোটা জীবন নির্ভরশীল, তাতে এই পরস্পর বিরোধী দুটি পক্ষ কিভাবে মিলিত হতে পারে। মোশরেক নারী ও পুরুষদের পথ দোযখ অভিমুখী। তাদের আহবানও দোযখ অভিমুখী। আর মোমেন নারী ও পুরুষদের পথ আল্লাহ তায়ালা অভিমুখী। আর আল্লাহ তায়ালা ডাকেন বেহেশত ও ক্ষমার দিকে। সুতরাং তাদের আহবান আর আল্লাহর আহবানে আকাশ আর পাতালের ব্যবধান।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মোশরেক নারী ও পুরুষরা কি বাস্তবিকই দোযখের দিকে ডাকে? আসলে এটাই বাস্তব সত্য এবং আয়াতের বর্ণনায় এটিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। শুরু থেকেই কুফুর ও শেরেককে দোযখের দিকে আহবান হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, কেননা এর পরিণতি দোযখ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংসাত্মক আহবান থেকে সতর্ক করে থাকেন। তিনি তার আয়াতগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, যাতে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং কাফেরদের আহবানে সাড়া দেয়, সেই নিন্দিত ও ধিকৃত।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আকীদার পার্থক্য সত্তেও আল্লাহ তায়ালা মুসলমান পুরুষের ওপর ইহুদী বা খৃষ্টান নারীর বিয়ে হারাম করেননি। কারণ মোশরেক ও আহলে কেতাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মূল আকীদা বিশ্বাসে মুসলমান ও ইহুদী খৃষ্টানরা একমত। কেবলমাত্র বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে যে খৃষ্টান বা ইহুদী নারী ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং হযরত ঈসাকে বা হযরত ওযায়েরকে আল্লাহ তায়ালা বা আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে, তার ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। সে নিষিদ্ধ মোশরেক নারী, না কেতাবধারী নারী বলে গণ্য হবে, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। যদি কেতাবধারী নারী বলে গণ্য হয় তাহলে 'সূরা মায়েদার' সংশ্লিষ্ট আয়াত 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের পূর্বে কেতাবপ্রাপ্ত সতী নারীরা বৈধ হলো। তদঅনুসারে তাকে বিয়ে করা বৈধ হবে। অধিকাংশ ফকীহদের মতে এ ধরনের কেতাবী নারীও বৈধ। কিন্তু আমি এ ধরনের নারীকে বিয়ে করা সম্পর্কে যারা অবৈধ বলেন, তাদের বক্তব্যকেই অগ্রগণ্য মনে করি। ইমাম বোখারী বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'হযরত ঈসাকে 'রব' বা খোদা বলার চেয়ে বড় কোনো শেরেক আছে বলে আমার জানা নেই।'

তবে কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান পুরুষ কর্তৃক কোনো মুসলিম মহিলার বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা এ ব্যাপারটা বাস্তবতার দিক দিয়ে মুসলমান পুরুষ কর্তৃক অ-মোশরেক ইহুদী বা খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করার থেকে ভিন্ন ধরনের। এ জন্যে এর বিধানও ভিন্ন। ইসলামী শরীয়ত অনুসারে সন্তানরা তাদের পিতার নামে পরিচিত হয়ে থাকে এবং একমাত্র স্ত্রীই স্বামীর সংসারে ও তার যৌথ পরিবারে এবং তার যমীতে স্থানান্তরত হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো মুসলমান কোনো কেতাবধারী (অ-মোশরেক) নারীকে বিয়ে করলে সে স্বামীর পরিবারে চলে যায় এবং ওই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানরা সেই স্বামীর নামেই পরিচিত হয়। তাই এক্ষেত্রে ইসলামই দাম্পত্য সম্পর্কে প্রাধান্য বিস্তার করে। পক্ষান্তরে কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে হলে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। মহিলা নিজ পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করে। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থান

ও দুর্বলতার কারণে সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তার ছেলে মেয়েরা তার স্বামীর নামেই পরিচিত ও তার ধর্মেই দীক্ষিত হবে। অথচ সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রাধান্য বজায় রাখা জরুরী।

এ ছাড়া এমন কিছু বাস্তব সমস্যাও থাকতে পারে, যার দরুন মুসলিম পুরুষের কেতাবধারী (ইহুদী বা খৃষ্টান) নারীর সাথে বিয়ে মূলত বৈধ হওয়া সত্তেও মাকরূহ হয়ে যাবে। হযরত ওমর (রা.) এরূপ পরিস্থিতিতে এ কাজ অপছন্দ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে বলেছেন, 'আবু জাফর ইবনে জরীর (র.) বলেছেন যে, কেতাবী নারীদের বিয়ে সর্বসম্মতভাবে (এজমা) বৈধ হওয়া সত্তেও হযরত ওমর (রা.) তা অপছন্দ করতেন। কেননা এতে মুসলিম পুরুষরা মুসলিম নারীদেরকে এড়িয়ে চলার প্রবণতায় আক্রান্ত হতে পারে কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকর ফলাফল দেখা দিতে পারে।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত হোযায়ফা এক কেতাবী মহিলাকে বিয়ে করলে হযরত ওমর (রা.) তাকে লিখলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও। হযরত হোযায়ফা তাকে জবাবে লিখলেন, আপনি কি মনে করেন যে, সে আমার জন্যে নিষিদ্ধ, তাহলে তাকে ছেড়ে দেবো?' হযরত ওমর (রা.) জবাব দিলেন, 'তাকে নিষিদ্ধ মনে করি না, কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা এভাবে মোমেন নারীদেরকে তাদের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলবে।'

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'মুসলিম পুরুষ খৃষ্টান নারীকে বিয়ে করলে মুসলিম নারীর কী হবে?'

আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ জাতীয় বিয়েগুলো মুসলিম পরিবারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইহুদী, খৃষ্টান বা ধর্মহীনা স্ত্রী স্বীয় পরিবার ও সন্তানদের ওপর নিজের ছাপ রাখে এবং এমন একটা বংশধর জন্ম দেয়, যা ইসলামের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক বজায় রাখে। বিশেষত আমাদের বর্তমান সময়কার জাহেলী সমাজে এটা আরো বেশী বিপজ্জনক। এ সমাজকে ইসলামী সমাজ নামে আখ্যায়িত করাও প্রকৃতপক্ষে এই নামের অপপ্রয়োগের পর্যায়ে পড়ে। এ সমাজ ইসলামের সাথে নিছক বাহ্যিক সম্পর্ক রাখে। এর ওপর যদি ইহুদী বা খৃষ্টান কোনো মহিলা বৌ হয়ে আসে তাহলে সে এ টুকুও শেষ করে দেবে।

যৌন জীবন ও তার কিছু নীতিমালা

এরপর ২২২ ও ২২৩ নং আয়াতে স্বামী স্ত্রীর যৌন জীবন সম্পর্কে কিছু নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে।

হে নবী, লোকেরা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবে (মহিলাদের মাসিক) ঋতু কালীন সময়ে (তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে তুমি তাদের বলো, (আসলে) এই (সময়টা) হচ্ছে একটি অসুস্থ অপবিত্র ও অসুবিধাজনক অবস্থা, কাজেই ....

(প্রতিটি কাজের ব্যাপারেই ভালো করে এ কথাটা) জেনে রাখবে যে, (জীবনের শেষে একদিন) তোমাদের সবাইকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। (হাঁ যারা যারা এই সাক্ষাতের দিনকে বিশ্বাস করেছে এমন সব) বিশ্বাসীদের তুমি (আমার পক্ষ থেকে অগণিত পুরস্কারের) সুসংবাদ দান করো। আয়াত ২২২-২২৩

দাম্পত্য সম্পর্ককে উন্নততর ও মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যে এটি আর একটি মনোযোগ আকর্ষণীয় বক্তব্য। দাম্পত্য সম্পর্কের যে অংশটি দেহের সাথে সবচেয়ে প্রবল সম্পর্ক রাখে, সেই

অংশের অর্থাৎ সহবাসের শারীরিক আনন্দকে নিছক শারীরিক আনন্দের পর্যায়ে না রেখে এ আয়াতে তাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

বস্তুত দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন সংগম চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। জীবনের সম্প্রসারণ ও বংশধর বৃদ্ধি এর অন্যতম লক্ষ্য। আর এরপর এইসব কিছুকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। ঋতুকালে সংগম পাশবিক আনন্দ হয়তো দিতে পারে, তবে এই সময় সংগম নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি অনিবার্য– এবং এ দ্বারা বৃহত্তর লক্ষ্য ও অর্জিত হয় না। উপরন্তু ওই সময়ে মানুষের পরিচ্ছন্ন জন্মগত স্বভাব সংগমবিমুখ থাকে। কেননা জন্মগত স্বভাব সব সময় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করেই চলে। এই নিয়ম স্বভাবতই মানুষকে এমন অবস্থায় সংগম করতে নিষেধ করে। পবিত্রাবস্থায় সংগম স্বাভাবিক আনন্দও দেয়, আবার তাতে প্রাকৃতিক লক্ষ্যও অর্জিত হয়। এ জন্যে প্রশ্নের জবাবে এ কাজটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

‘স্ত্রীরা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেও না।’

এ নিষেধাজ্ঞার পর আর এ ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের অবকাশ থাকে না, অবকাশ থাকে না লাগামহীন প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার ও বিকৃতির। ব্যাপারটা পুরোপুরি আল্লাহর বিধানের আওতায় এসে যায়। তাই এটি আল্লাহর বিধান ও তার নির্দেশিত সীমারেখার অধীন। বলা হয়েছে–

‘অতপর যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে তাদের কাছে এসো।’

অর্থাৎ যখন সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন অবস্থা আসবে, তখনই এসো। কেননা নিছক কাম লালসা চরিতার্থ করা দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার ঘটানো এবং আল্লাহর বরাদ্দকৃত সন্তান লাভে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহ তায়ালা সকল ধরনের সুন্দর, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন জিনিষকে হালাল করেন। এই হালাল জিনিস উপার্জন করাই মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শুধুমাত্র নিজের মনে যা চায়, তাই উপার্জন করা তার কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেন, তা তাদেরকে পবিত্র করার জন্যেই করেন। আর তিনি ভুল করার পর তাওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে পছন্দ করেন। তাই বলা হয়েছে,

‘আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারীদের পছন্দ করেন এবং পবিত্রতাকামীদেরকেও পছন্দ করেন।’

এই পূতপবিত্র প্রেক্ষাপটে দাম্পত্য সম্পর্কের এমন একটি দিকের ছবি অংকন করা হয়েছে, যা উক্ত প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত, বলা হয়েছে–

‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত। তাই তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আসো।’

এই সুক্ষ্ম বক্তবের মধ্য দিয়ে এই মর্মে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক এই দিক দিয়ে একটা প্রাকৃতিক সম্পর্ক। সেই সাথে এ সম্পর্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হাঁ, তাই বলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের সকল দিক এর আওতাভুক্ত নয়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের অন্যান্য দিক কোরআনের অন্যান্য জায়গায় পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সংগতি রেখে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ‘সূরা বাকারায়’ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে,

‘স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক।’

আবার সূরা রূমে আছে– 'আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে বসবাস করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে প্রেমপ্রীতি ও মায়ামমতা সৃষ্টি করেছেন।'

এই সমস্ত বক্তব্যই দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিককে যথাস্থানে ফুটিয়ে তুলেছে। এখানে যে প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি এসেছে, তার সাথে শস্য ক্ষেতের উপমাই সংগতিপূর্ণ। কেননা এখানকার প্রেক্ষাপট হচ্ছে সন্তান প্রজননের প্রেক্ষাপট। যতক্ষণ তা শস্যক্ষেত থাকবে অর্থাৎ সন্তান প্রজননের যোগ্য থাকবে, ততক্ষণ যে পদ্ধতিতে তার কাছে আসতে চাও আসো। তবে অবশ্যই যে স্থানে সন্তান প্রজননের মতো উর্বরতা আছে সেই স্থানে আসো, যাতে শস্যক্ষেতের উদ্দেশ্য সফল হয়। এটাই এই বাক্যটির মর্ম,

'সুতরাং তোমাদের শস্য ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আসো।'

পরবর্তী বাক্যটিতে বলা হচ্ছে যে, এই সাথে তোমাদের জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও পরিণতির কথা স্মরণ করো। আল্লাহর দিকে তাকওয়া ও এবাদাত সহকারে মনোনিবেশ করো। তাহলে তোমাদের দাম্পত্য জীবনের এই সন্তান প্রজননের কাজটিও একটি নেক কাজে পরিণত হবে যা নিজেদের পুঁজি হিসাবে তোমরা আগাম করে রাখবে। আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো, যিনি তোমাদের কৃতকর্মের ফলাফল দেবেন। বলা হয়েছে,

'নিজেদের জন্যে আগাম কিছু সঞ্চয় করে রাখো। আল্লাহকে ভয় করো এবং মনে রেখো যে, তার সাথে তোমাদের সাক্ষাত অবধারিত।'

অতপর আল্লাহর সাক্ষাতের সময় মোমেনরা সকল সৎ কাজের ন্যায় সন্তান প্রজননের কাজটিরও উত্তম প্রতিদান পাবে- এই মর্মে সুসংবাদ দিয়ে আয়াতের উপসংহার টানা হয়েছে। বস্তুত মোমেন যে কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে, তা সৎ কাজে পরিণত হবে। আয়াতের শেষ বাক্যটি হলো, 'মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।'

এখানে আমরা ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতার সাক্ষাত পাই। সে মানুষকে তার যাবতীয় স্বভাবসুলভ আবেগ উচ্ছ্বাস ও চাহিদাসহ গ্রহণ করে। পুণ্যময়তা ও পবিত্রতার নামে তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে সে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে না এবং তার যে সব প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও চাহিদাকে সে নিজে তৈরী করেনি বরং শুধুমাত্র তার পার্থিব জীবনের বিকাশ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের স্বার্থে তা পূরণে বাধ্য হয়, সেগুলোকে ইসলাম নোংরামি ও মলিনতা আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞা করে না। ইসলাম শুধু তার মনুষত্বকে বহাল রাখে, তার মান উন্নয়ন করে এবং তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। আবার সেই সাথে তার দৈহিক চাহিদাও পূরণ করে। তবে ইসলাম প্রথমে চেষ্টা করে যেন তার দৈহিক চাহিদাগুলোর সাথে মানবিক চেতনা ও অনুভূতির মিশ্রণ ঘটে এবং সর্বশেষে চেষ্টা করে যেন তার সাথে ধর্মীয় চেতনা মিশ্রিত ও যুক্ত থাকে।

এভাবে সাময়িক দৈহিক চাহিদা, স্থায়ী মানবিক লক্ষ্য ও মূল্যবোধ এবং পবিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার মধ্যে একই সাথে মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটায়। এই মিশ্রণ ও সমন্বয়ের পেছনে তার একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। আল্লাহর খলীফা হিসাবে মানুষের সত্ত্বায় এই জিনিসগুলোর মিশ্রণ ও সমন্বয় আগে থেকেই বিদ্যমান। তার সত্ত্বায় ও প্রকৃতিতে যে সব শক্তি ও ক্ষমতা নিহিত রয়েছে, তার কল্যাণেই সে এই খেলাফাতের যোগ্য হয়েছে। মানুষের সাথে আচরণের এই খোদায়ী বিধান তার স্বভাব প্রকৃতির যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন মেটায়। কেননা যিনি উক্ত স্বভাব প্রকৃতির স্রষ্টা, এই বিধান তাঁরই রচিত। এছাড়া অন্য সকল বিধানই মানুষের স্বভাব প্রকৃতির কম

বা বেশী পরিপন্থী হবেই। প্রকৃতির সাথে তার সংঘাত আর সংঘাতের পরিণামে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। ফলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে দুঃখ দুর্দশায় ভুগতেই থাকবে। আর এ বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পুরোপুরি অবগত। মানুষ এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না।

শপথের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করার পর এখান থেকে 'ইলার' বিধান সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়েছে। 'ইলা' অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে একত্রে বসবাস ও সহবাস না করার শপথ গ্রহণ। এখানে ইলা নিয়ে আলোচনা করার আগে খোদ শপথের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২২৪, ২২৫, ২২৬ ও ২২৭ নং আয়াতে তাই বলা হয়েছে,

'তোমরা সৎ কাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকবে- এই মর্মে শপথের জন্যে আল্লাহর নামকে অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করো না। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন। তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু যে শপথ তোমরা আন্তরিকভাবেই করো সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবশ্যই দায়ী করবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাপরায়ণ ও ধৈর্যশীল। যারা স্ত্রীর সাথে সংগম না করার শপথ করে তাদের মনস্থির করার জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে। তারপর তারা যদি কসম থেকে প্রত্যাবর্তন করে তবে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সংকল্প গ্রহণ করে তবে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'

'আল্লাহর নামকে শপথের জন্যে অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করো না'...

আল্লাহর এই উক্তি সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো, তোমরা ভালো কাজ করবে না বলে শপথ করো না। শপথ করে থাকলে তা ভংগ করে কাফফারা দাও এবং ভালো কাজ করো। ইমাম ইবনে কাসীর এই একই তাফসীর মাসরুক, শা'বী, ইবরাহীম নাখয়ী' মোজাহেদ, তাউস, সাঈদ বিন জুবাইর, আতা, ইকরামা, মাকহুল, যুহরী, হাসান, কাতাদা, মাকাতেল ইবনে হাইয়ান, রবী বিন আনাস, যেহাক, আতা খুরাসানী ও সুদ্দী (রহ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে উল্লেখিত তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। সে হাদীসটি এই যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে শপথ করে, অতপর তার বিপরীত করাই কল্যাণজনক মনে হয়, সে যেন শপথের কাফফারা দেয় এবং ভালো কাজটি করে।'

সহীহ বোখারীতে হযরত আবু হোরায়রার বর্ণিত অপর একটি হাদীসও এর সমর্থন করে। যথা- রসূল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শপথ করার কারণে পরিবারের অধিকার খর্ব করে আল্লাহর কাছে গুনাহগার হতে থাকে তাহলে সে যেন অবশ্যই কসম ভেংগে কসমের কাফফারা দিয়ে দেয়।

সুতরাং এ তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম দাঁড়ালো এই যে, 'আল্লাহর নামে শপথ করাকে তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও সমাজে শান্তি স্থাপনের বিপক্ষে অজুহাত হিসেবে দাড় করিও না। যদি আশংকা করো যে, শপথ করার কারণে ওই কাজ করতে পারবে না, তাহলে শপথ ভাংগার কাফফারা দাও এবং শপথ ভংগ করে কাজটি করো। কেননা, ভালো কাজ করা, আত্ম সংযমের কাজ করা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা শপথ রক্ষা করার চেয়ে উত্তম ও অপরিহার্য।

এর উদাহরণস্বরূপ হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তাঁর নিকটাত্মীয় মিসতাহ যখন হযরত আয়শা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় অংশ নিলো, তখন তিনি শপথ করলেন যে, মিসতাহর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি আর বহন করবেন না। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাত সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন,

'তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ও সচ্ছল, তারা যেন আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান করবে না বলে শপথ না করে এবং তাদেরকে যেন ক্ষমা করে ও তাদের অপরাধ ভুলে যায়। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন?' (সূরা নূর, আয়াত ২২)।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) তার শপথ প্রত্যাহার করেন ও কাফফারা দেন। এই সাথে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি এত অনুকম্পাশীল যে, শপথকারী ভেবে চিন্তে ইচ্ছাপূর্বক যে শপথ করে, তাতে ছাড়া কাফফারার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। অনিচ্ছাবশত নেহাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া অর্থহীন শপথের জন্যে কাফফারা আরোপ করেননি, বরং তা মাফ করে দিয়েছেন।

২২৪ নং আয়াতে 'তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করেন না...' বলে উপরোক্ত বিধিই বর্ণনা করা হয়েছে। আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'অর্থহীন শপথ এই যে, কেউ নিজের ঘরে বসে বললো, 'আল্লাহর কসম কক্ষণো না' অথবা 'আল্লাহর কসম সত্য বলছি।'

ইবনে জরীরও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অর্থহীন শপথ হলো, 'আল্লাহর কসম, তা নয়' এবং 'আল্লাহর কসম, এ কথা সত্য' এরূপ বলা।

হযরত হাসান বিন আবুল হাসান বলেন, 'একবার রসূল (স.) জনৈক সাহাবীকে সাথে নিয়ে যাওয়ার সময় একদল তীর নিক্ষেপকারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এই সময় তাদের একজন বললো, 'আল্লাহর কসম, আমি লক্ষ্য ভেদ করেছি। আল্লাহর কসম, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।'

এ কথা শুনে রসূল (স.)-এর সহযাত্রী বললো, 'হে রসূল (স.)! এই লোকটি শপথ ভংগ করেছে।' রসূল (স.) বললেন, 'কখনো না! তীর নিক্ষেপকারীদের কসম গুরুত্বহীন ও অর্থহীন। এতে কাফফারাও দিতে হয় না, শাস্তিও হয় না।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় শপথ করলে তা অর্থহীন শপথ।' অপর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি বলেছেন। 'আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস হালাল রেখেছেন তাকে শপথপূর্বক হারাম করা অর্থহীন শপথ। এতে কোনো কাফফারা দিতে হয় না।'

হযরত সাঈদ ইবনুল মোসায়ব বর্ণনা করেন যে, আনসারদের মধ্যে দুই ভাই উত্তরাধিকার সূত্রে একটা সম্পত্তির অধিকারী হন। এক ভাই অপর ভাইয়ের সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হবে জিজ্ঞাসা করলেন। ভাইটি জবাব দিলেন, 'তুমি যদি পুনরায় বন্টনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো, তাহলে আমার সকল সম্পত্তি কাবা শরীফের দুয়ারে উৎসর্গ করবো।

এ কথা হযরত ওমরের কানে এলে তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন, 'তোমার সম্পত্তিতে কাবা শরীফের কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার শপথের জন্যে কাফফারা দাও এবং তোমার ভাই এর সাথে কথা বলো। আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো শপথ করলে বা মান্নত মানলে এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ও মালিকানা বহির্ভূত সম্পদ সম্পর্কে কোনো শপথ করলে তা বৈধ হবে না।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যায় যে, যে শপথের পেছনে কোনো নিয়ত বা সংকল্প সক্রিয় নেই, তা নিতান্ত মুখ ফসকে বেরুনো অর্থহীন শপথ। এ ধরনের শপথে কাফফারা দিতে হয় না। আর যে শপথে শপথকারী কোনো জিনিস করা বা কোনো জিনিস বর্জন করার নিয়ত তথা সংকল্প করবে, সেটাই ইচ্ছাকৃত বা ধর্তব্য শপথ। এ শপথ ভংগ করলে কাফফারা দেয়া ওয়াজেব। আর এ ধরনের শপথ যদি কোনো ভালো কাজ বর্জনের বা খারাপ কাজ করার জন্যে করা হয়, তবে সেই শপথ ভংগ করা ওয়াজেব এবং সে জন্যে কাফফারা দিতে হবে। আর যদি কেউ জেনে শুনে মিথ্যা কসম খায়। তাহলে কারো কারো মত এই যে, এতে কোনো কাফফারা চলবে না।

অর্থাৎ কোনো কাফফারা দ্বারা এর গুনাহ মাফ হবে না। ইমাম মালেক স্বীয় গ্রন্থ মোয়াত্তায় বলেছেন, কসম সম্পর্কে আমি যে উৎকৃষ্টতম কথা শুনেছি তা হলো, কেউ নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে একটি কথা বললো, কিন্তু পরে দেখা গেলো যে, ব্যাপারটা তার বিপরীত, এটি অর্থহীন শপথ। এতে কাফফারার প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে, অথচ সে জানে যে, সে এ বক্তব্যে মিথ্যাবাদী ও গুনাহগার এবং শুধুমাত্র কাউকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো আর্থিক লাভের জন্যে এরূপ বলে, সে এত বড় পাপ কাজ করে যে, তার কোনো কাফফারাই গ্রহণযোগ্য নয়।

শপথ করা সত্তেও যে কাজ ভাল ও কল্যাণকর, তা করার আদেশ দিয়ে উপসংহারে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।' এ দ্বারা মানুষকে তিনি বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কথা শোনেন এবং কিসে কল্যাণ হবে তাও জানেন। এ জন্যেই তিনি এই বিধি জারী করেছেন।

অতপর অর্থহীন শপথ এবং ইচ্ছাকৃত ও সংকল্পে উজ্জীবিত শপথ সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।' এ দ্বারা মোমেনদের মনকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাদের মুখ ফসকে বেরুনো কথাবার্তার কৈফিয়ত তলব করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহনশীল এবং অন্যায় কাজের ইচ্ছা পোষণ করায় তাদের মনের যে গুনাহ হয়, তা তাওবা করলে তিনি মাফ করে দেন।

উক্ত দু'টি উপসংহার দ্বারা শপথের গোটা বিষয়কে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি কথা ও কাজে অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করা হয়েছে।

'ইলা'ঃ বাখ্যা ও বিধান

শপথ সংক্রান্ত মৌলিক বিধি বর্ণনা শেষে পরবর্তী আয়াতে 'ইলা' সংক্রান্ত শপথের বিধি বর্ণনা শুরু হয়েছে। 'ইলা' হলো নির্দিষ্ট কিংবা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্বামী কর্তৃক আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করা।

২২৬ ও ২২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'যারা আপন স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে) তাদের চার মাস পর্যন্ত অবকাশ রয়েছে। এরপর যদি তারা 'ইলা' প্রত্যাহার করে, তাহলে তারা যেন মনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর তারা যদি তালাক দেয়ার সংকল্প করে ফেলে, তাহলে তারা যেন ভুলে না যায় আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'

দাম্পত্য জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহে কোনো না কোনো কারণে সময়ে সময়ে স্বামীদের এরূপ মানসিক ভাবান্তর ঘটে থাকে যে, তারা স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে না বলে শপথ করে বসে। সম্পর্কের এই বিরতি যদি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের চেয়ে দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়, তাহলে তাতে স্ত্রীর

মানসিক নির্যাতন, স্নায়বিক ও মানসিক ক্ষতি, নারী হিসাবে তার অবমাননা। দাম্পত্য জীবনের অচলাবস্থা। সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা এবং পরিবারের ভিত্তি ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

'ইলাকে' ইসলাম সূচনাতেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। কেননা এটা কখনো কখনো দাম্ভিক স্ত্রীর জন্যে কার্যকর চিকিৎসা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যে সব নারী নিজের মোহনীয় রূপ, ছলনাময়ী স্বভাব এবং পুরুষের মন জয় করার ক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে অহংকার ও আত্মভিমানের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাদের জন্যে 'ইলা' একটা মন্বন্তরী ওষুধ প্রমাণিত হতে পারে। অনুরূপভাবে দাম্পত্য জীবনে কোনো সাময়িক তিক্ততা অবসাদ কিংবা আকস্মিক ক্রোধজনিত উত্তেজনায় শ্বাশরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হলে 'ইলা' দ্বারা তা থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। এরপর দাম্পত্য জীবন আগের চেয়ে শক্তিশালী গতিশীল ও সচ্ছন্দ সাবলীল হয়ে থাকে।

কিন্তু ইসলাম সে পুরুষকেও স্বেচ্ছাচারী হতে দেয়নি। কেননা সে কখনো কখনো বাড়াবাড়িও করতে পারে এবং স্ত্রীকে কষ্ট দিতে, অপমান করতে, কিংবা নির্যাতন করে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিতে পারে। ফলে সে তার সাথেও দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারে না এবং অন্য কারো সাথে দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্যে তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতেও পারে না।

তাই বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান এবং জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধানের লক্ষ্যে ইসলাম 'ইলা'র জন্যে সর্বোচ্চ চার মাসের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছে। এই সর্বোচ্চ মেয়াদ মেয়েদের ধৈর্যের শেষ সীমা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই সীমার মধ্যে সমস্যার একটা সমাধান হলে স্ত্রীর মন ভাংবে না এবং নিজের স্বাভাবিক জৈব চাহিদার চাপে তার স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আকৃষ্টও হবে না। বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রা.) গোপনে জনগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবার মানসে গভীর রাতে ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সহসা তার কানে এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সে নিম্নের কবিতাটি সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করছিলো,

'এই রাত অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে এবং চারদিক কালো হয়ে গেছে।
অথচ আমি আমোদ ফূর্তি করতে কোনো বন্ধু না পেয়ে কাতরাচ্ছি।
আল্লাহর শপথ, এমন যদি না হতো যে আমি আল্লাহকে স্মরণ করছি,
তাহলে এই খাট চারপাশ থেকে অবশ্যই দুলে উঠতো।

এ ঘটনার হযরত ওমর (রা.) তার কন্যা হযরত হাফসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে সর্বোচ্চ কতো দিন ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে?' তিনি বললেন, 'ছয় মাস অথবা চার মাস।'

তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, এখন থেকে আমি আর কোনো সৈনিককে এই মেয়াদের চেয়ে বেশীদিন প্রবাসে থাকতে বাধ্য করবো না। তিনি স্থির করলেন যে, মোজাহেদরা এই মেয়াদের চেয়ে বেশীদিন বাইরে কাটাবে না।

একথা সত্য যে, এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের স্বভাব প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। তবে একজন পুরুষ কর্তৃক নিজের মন ও ভাবাবেগকে পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্যে চার মাস যথেষ্ট সময়। এই সময়ের মধ্যে হয় সে নিজের সুস্থ ও স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন পুনরায় শুরু করবে এবং নিজের স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে, নচেত তার ঘৃণা ও অনাগ্রহ অব্যাহত রাখবে। এমতাবস্থায় এই বন্ধন ছিন্ন করে ফেলা এবং স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়াই সমীচীন। হয় স্বামী তাকে তালাক দেবে, নতুবা আদালত হস্তক্ষেপ করে তালাকের ব্যবস্থা করে দেবে, যাতে তাদের উভয়ে নতুন মানুষের

সাথে নতুন করে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারে। এটা স্ত্রীর সতিত্ব রক্ষার জন্যে যেমন অধিকতর সহায়ক এবং তার জন্যে অধিকতর সম্মানজনক, তেমনি স্বামীর জন্যেও অধিকতর শান্তিদায়ক ও কল্যাণকর ব্যবস্থা। আর যেহেতু দাম্পত্য সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য, তাকে স্থবির করে দেয়া তাঁর কাম্য নয়, তাই এর গুরুত্ব বিবেচনায়ও এ ব্যবস্থা সর্বোত্তম এবং সাধারণ ন্যায় বিচারের নিকটতম।

একান্তই যদি বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়

ইলা ও অন্যান্য প্রসংগের আলোচনা তালাকের পর্যায়ে এসে থেমে যাওয়ার পর এবার তালাক সংক্রান্ত বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধির বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে ইদ্দত, খোলা, খোরপোশ ও তালাক প্রাপ্তাকে দেয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত বিধি।

আলোচনার সর্বপ্রথমে এসেছে ইদ্দত ও তালাকে রজয়ী সংক্রান্ত বিধি। ২২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যে সব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু অথবা ঋতু থেকে পবিত্র তিনটি মুদ্দত পর্যন্ত........পুরুষদের ওপর নারীদের ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, যেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (অবশ্য) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা একমাত্রা বেশী রয়েছে। (তবে সব ক্ষমতার উর্ধ্বে হচ্ছেন) বিশ্ব জাহানের মালিক) আল্লাহ তায়ালা। সর্বাধিক ক্ষমতার মালিক তিনিই সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী, সব বিচারকের বড় বিচারকও তিনি। (আয়াত ২২৮)

আয়াতে যে 'ছালাছাতা কুরু' শব্দটি রয়েছে, তার অর্থ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এর অর্থ তিনটি ঋতুকাল, আবার কারো মতে, তিনটি ঋতুমুক্ত পবিত্রতার কাল।

'প্রতীক্ষায় থাকবে' এই চমৎকার বাক্যটিতে একটি সুক্ষ্ম মনস্তাত্তিক অবস্থার চিত্র অংকন করা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে তা এই যে, তাদেরকে তিনটি ঋতু কাল অতিক্রম বা তিনটি ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নতুন কোনো বিয়ে না করে অপেক্ষা করতে হবে। তবে কোরআনের এই বর্ণনাভংগীতে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ছাড়াও আরো একটি বিষয়ে ইংগিত দেয়া হয়েছে। সে বিষয়টি এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মনে নতুন করে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ উজ্জীবিত রাখাই এর উদ্দেশ্য। মনের এই আগ্রহই তাকে দাম্পত্য নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করার অপেক্ষা করতে ও নিজেকে সংযত রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

বলা বাহুল্য, অপেক্ষা করার মধ্যেই এই প্রস্তুতির আয়োজন নিহিত। এটা একটা স্বাভাবিক অবস্থা। স্ত্রীর নিজের অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতা যে তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার জন্যে দায়ী নয় এবং সে যে আর একটি পুরুষকে বরণ করে নিতে সক্ষম, এ কথা প্রমাণ করার সুপ্ত আগ্রহই তাকে এই প্রতীক্ষার তথা ইদ্দত পালনে বাধ্য করে। এ আগ্রহ স্বভাবতই স্বামীর মধ্যে থাকার কথা নয়। কেননা সে তালাক দিয়েছে। এ আগ্রহ স্ত্রীর মনে তীব্রভাবে বিদ্যমান থাকে কেননা সে তালাকপ্রাপ্ত। এভাবেই কোরআন স্বীয় বাচনভংগী দ্বারা মনস্তাত্তিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। আর এই মনস্তাত্তিক অবস্থাকে সে যথেষ্ট মর্যাদাও দিয়ে থাকে।

তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা এই সময়টুকু অপেক্ষা করবে এ জন্যে যে, এতে করে তারা নতুন বিয়ের আগে প্রমাণ করতে পারবে যে, তাদের গর্ভ তাদের পূর্ববর্তী দাম্পত্য সম্পর্কের কোনো রকম দায়দায়িত্ব বহন করছে না। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্যে বৈধ নয়।' অর্থাৎ তাদের গর্ভে সন্তানের ভ্রূণ থাক কিংবা ঋতুস্রাব থাক, গোপন করা যাবে না। আর এই সাথে উক্ত

নারীদের মনে গর্ভস্থ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর স্মৃতি জাগিয়ে তোলা হয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মাতৃগর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন না করার জন্যে ঈমানের শর্ত আরোপ করেছে। আর বিশেষভাবে আখেরাতের উল্লেখ করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এখানে। কেননা সেখানে রয়েছে কর্মফল। তিন ঋতুকাল অপেক্ষা করার কারণে যদি কোনো ক্ষতি হয়, তবে সে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে আখেরাতে। আর গর্ভে কী আছে, তা গোপন করলে যে শাস্তি হবে, তাও হবে আখেরাতে। মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জানেন। কেননা তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তাঁর কাছ থেকে কিছুই গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং কোনো কামনা বাসনা, কোনো স্বার্থ বা কোনো আকাংখা'র প্রভাবে তা গোপন করা বৈধ নয়। তা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। আর প্রকাশ করার জন্যেই এই অপেক্ষা তথা ইদ্দত পালন।

এ হচ্ছে ইদ্দত পালনের এই বিধির একটি দিক। এর অপর দিকটি এই যে, স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটার পর তারা যাতে নিজেদের মনের অবস্থা ও আবেগ কোন পর্যায়ে আছে, তা পরখ করতে পারে, সে জন্যে কিছুটা অবকাশ প্রয়োজন। এমনও তো হতে পারে যে, উভয়ের হৃদয়ে এখনো ছিটেফোঁটা ভালোবাসা সুপ্ত রয়েছে, যাকে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে, এমন কিছু আবেগ অনুভূতি ও প্রেমপ্রীতি রয়েছে, যার ওপর ভুল বুঝাবুঝি, অহংকার বা উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছে এবং সেই চাপা পড়া আবেগ অনুভূতিকে পুনরুজ্জীবিত করার এখনো সুযোগ রয়েছে। ক্রোধ যখন প্রশমিত হবে, হঠকারিতা যখন স্তিমিত হবে এবং অন্তর যখন উত্তেজনামুক্ত হবে, তখন যে কারণগুলো উভয়কে বিচ্ছেদের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো তা হয়তো নিতান্ত তুচ্ছ মনে হবে। নতুন ধ্যানধারণা ও বিবেচনার উজ্জীবন ঘটবে এবং মায়ামমতার বশে উভয়ে দাম্পত্য জীবন পুনরারম্ভ করা কিংবা দায়িত্ব সচেতনতার বশে জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করার তাগিদ অনুভব করতে পারে।

যেহেতু বৈধ জিনিসগুলোর মধ্যে তালাক হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণীত জিনিস। এটি একটি চরম ব্যবস্থা। শুধুমাত্র অন্য সকল ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার পরই এর আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। তালাকের পূর্বে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার বিবরণ কোরআনের অন্যান্য জায়গায় দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধি রয়েছে যে, সহবাস করা হয়নি এমন ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া উচিত। এই বিধি অনুসৃত হলে প্রায় ক্ষেত্রে তালাকের সংকল্প কার্যকর করার মাঝে পুনর্বিবেচনার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে স্বামীকে স্ত্রীর ঋতুমুক্ত অবস্থা ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হয় এবং হতে পারে এই সময়ের মধ্যে মনের রাগ পড়ে গেলে সে এই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরেও আসতে পারে।

প্রথম তালাক দ্বারা যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তাতে স্বামী স্ত্রী উভয়ে নিজেদের ভাবাবেগ সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে। ইদ্দতকালে যখন উভয়ে বুঝতে পারে যে, দাম্পত্য জীবন পুনরারম্ভ করা সম্ভব, তখন সে পথ উন্মুক্ত থাকে। এ কথাই আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে বলা হয়েছে,

'তাদের স্বামীরা তাদেরকে ওই সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়ার বেশী হকদার যদি তারা আপোষ রফায় ইচ্ছুক হয়ে থাকে।'

'ঐ সময়ের মধ্যে' অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে। 'যদি আপোষ রফায় ইচ্ছুক হয়' অর্থাৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য যদি দাম্পত্য শান্তি পুনর্বহাল করা হয় এবং স্ত্রীকে নির্যাতন করা, সাবেক বিড়ম্বনাময় জীবনের শেকলে তাকে পুনরায় আবদ্ধ করে প্রতিশোধ নেয়া, অহংকার ও বড়াই করা এবং অন্য বিয়ে করার পথ রুদ্ধ করা তার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে।

'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।'

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তাদের যেমন কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি তাদের কিছু অধিকারও রয়েছে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে অপেক্ষা করা তথা ইদ্দত পালন করা এবং তাদের গর্ভাশয়ে কোনো সন্তান আছে কিনা তা গোপন না করা। আর তাদের স্বামীদের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে স্ত্রীকে ফেরত দেয়ার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য যেন সৎ থাকে, নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাইবে না, তেমনি স্ত্রীরও ক্ষতি করবে না। অনুরূপভাবে ইদ্দতকালীন খোরপোশ প্রদান এবং অন্য যেসব কর্তব্যের কথা আগামিতে আলোচিত হবে, সে সবও তাকে মেনে চলতে হবে।

'নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।'

আমার মতে কোরআনের এই উক্তিতে স্ত্রীকে ইদ্দতকালে স্বামীর তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই অধিকার স্বামীকে দেয়ার কারণ এই যে, স্বামীই তালাক দিয়েছে। স্বামী তালাক দেবে আর প্রত্যাহারের অধিকার দেয়া হবে স্ত্রীকে এবং সে গিয়ে স্বামীকে নিজের তত্ত্বাবধানে নেবে- এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুত স্বামীর এই অগ্রাধিকার পরিস্থিতির স্বাভাবিক দাবী। এটা শুধুমাত্র ইদ্দতকালের সীমিত অগ্রাধিকার। এটা কোনো শর্তহীন ও সীমাহীন অধিকার নয় যেমন অনেকে মনে করে থাকে এবং অন্যান্য স্থানেও উদাহরণ হিসাবে পেশ করে থাকে।

অতপর আয়াতের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।' এ মন্তব্যের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এই বিধিসমূহ জারী করার ব্যাপারে যেমন ক্ষমতাশীল, তেমনি প্রজ্ঞাময় ও কৌশলী। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সমস্যার প্রভাবে মানুষের মনে যে বিভ্রান্তি ও বিভিন্ন ধরনের জীবন ব্যবস্থার কুপ্রভাব পড়ে, তা এই উক্তি দ্বারা দূর করা সম্ভব।

প্রসংগ তালাক ও মোহর

পরবর্তী বিধি তালাকের সংখ্যা, মোহরানার ওপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার। এবং তালাক দেয়ার সময় তাকে ইতিপূর্বে দেয়া কোনো জিনিস ফেরত নেয়ার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত। কেবল একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। সেটি এই যে, বর্তমান স্বামীকে অপছন্দকারী স্ত্রী যদি আশংকা করে যে, এই অবাঞ্ছিত বিয়ে বহাল থাকলে সে কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীকে কিছু দিয়ে নিজের স্বাধীনতা ক্রয় করে নিতে পারে। একে খোলা বলা হয়।

২২৯ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

'তালাক দু'বার। এরপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিতে হবে, নচেত সদয়ভাবে মুক্ত করে দিতে হবে।'

অর্থাৎ যে তালাকের পর দাম্পত্য জীবন পুনরারম্ভ করা যায়, তা দু'বারে সীমাবদ্ধ। এই সীমা যে ব্যক্তি অতিক্রম করে, তার পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত শর্ত ব্যতীত স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার আর কোনো উপায় নেই। সেই শর্ত হলো, অন্য একটি বিয়ে করতে হবে। অতপর স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবে কোনো কারণে সে তালাক দেবে এবং তা আর প্রত্যাহার করবে না। এভাবে সে 'তালাকে বায়েন' প্রাপ্ত হবে। কেবল তখনই প্রথম স্বামীর জন্যে তাকে পুন বিয়ে করা বৈধ হবে, যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রী তাকে নতুন করে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়।

এই কড়াকড়ি আরোপের কারণ এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সীমাহীন সংখ্যক তালাক দেয়ার রেওয়ায ছিলো। স্বামী তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাহার করতো, আবার তালাক দিতো ও প্রত্যাহার করতো। এভাবে যতোবার ইচ্ছা হতো করতো। তাছাড়া আনসারদের এক

ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে তার ওপর ক্রোধ চেপে রেখে বললো, 'তোমাকে রাখবোও না, বিদায়ও করবো না।'

স্ত্রী বললো, সেটা কি রকম? স্বামী বললো, 'আমি তোমাকে তালাক দেবো। তারপর যেই ইদ্দত ফুরিয়ে আসবে, অমনি তা প্রত্যাহার করবো। স্ত্রী রসূল (স.) কে এ কথা জানালো।'

তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'তালাক দু'বার। অতপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখতে হবে, নচেত সদয়ভাবে বিদায় করতে হবে।'

আল্লাহ তায়ালা আপন বিধান নাযিল করার ব্যাপারে যে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা এই যে, যখন যে বিধির প্রয়োজন দেখা দিতো, তখন তা নাযিল করতেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল মৌলিক বিধি নাযিল হয়। বাকী ছিলো শুধু খুঁটিনাটি বিধি। এগুলো পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে উক্ত মৌল বিধিসমূহের আলোকে রচিত হতো।

আলোচ্য আয়াতে যে কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাতে তালাককে সীমিত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়। এতে নারীর জীবন নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী ছিনিমিনি খেলার অবকাশ রাখা হয়নি। প্রথম তালাক সংঘটিত হওয়ার পর স্বামীর জন্যে এই অবকাশ রাখা হয় যে, সে অন্য কোনো ব্যবস্থার আশ্রয় না নিয়েই ইদ্দতকালের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করতে পারবে। কিন্তু যখন ইদ্দত পার হয়ে যাওয়া সত্তেও প্রত্যাহার করবে না, তখন 'তালাক বায়েন' হয়ে যাবে।

অর্থাৎ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। নতুন করে মোহরানা নির্ধারণ পূর্বক নতুনভাবে বিয়ে না করা পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেরত নেয়া যাবে না। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে কিংবা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর নতুন করে বিয়ে সম্পন্ন করলে সে আর একটি তালাক দেয়ার অধিকার লাভ করবে। এই তালাকের যাবতীয় বিধান হবে অবিকল প্রথম তালাকের মতো। এভাবে যখন তৃতীয় তালাক দেবে, তখন স্বামী স্ত্রীতে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। এরপর ইদ্দতের মধ্যে বা পরে তালাক প্রত্যাহারের আর কোনো অবকাশ থাকবে না। দ্বিতীয় কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে অতপর স্বাভাবিক কারণে তার কাছ থেকে তালাক প্রাপ্তি এবং সেই স্বামী কর্তৃক ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করায় বা চূড়ান্তসংখ্যক তালাক দেয়ায় বিচ্ছেদ ঘটার পরই শুধু তার পক্ষে প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহ বৈধ হবে।

আগেই বলেছি যে, প্রথম তালাক হচ্ছে প্রথম অভিজ্ঞতা। আর দ্বিতীয় তালাক দ্বিতীয় ও শেষ অভিজ্ঞতা। এরপর যদি সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় তাহলে ভালো কথা। নচেত এরপর তৃতীয় তালাক সংঘটিত হবে এবং তা দ্বারা বুঝা যাবে যে, দাম্পত্য জীবনে এমন কোনো মৌলিক বিকৃতি ঘটেছে, যার কারণে তা আর পুনর্বহাল করার সম্ভাবনা নেই।

মোদ্দাকথা এই যে, তালাক শুধু সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবেই অবলম্বন করা যায়- যখন তালাক ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না এবং কোনো বিকল্প ব্যবস্থায় লাভ হয় না। তারপর যখন দুটো তালাক সংঘটিত হবে। তখন স্বাভাবিকভাবে ও বিধিসম্মতভাবে স্ত্রীকে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া এবং নতুনভাবে উভয়ের গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক পন্থায় দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করা যাবে, অথবা কোনো কষ্ট না দিয়ে ভদ্র ও সদয়ভাবে বিদায় করে দেয়া যাবে। এই বিদায় পর্ব হচ্ছে তৃতীয় তালাক। এরপর স্ত্রী জীবনের এক নতুন সীমারেখায় গিয়ে অবস্থান করে।

এ হচ্ছে ইসলামের বস্তুনিষ্ঠ বিধান, যা বাস্তব সমস্যাবলীর কার্যকর ও বস্তুনিষ্ঠ সমাধান দেয়। বাস্তব সমস্যাকে ইসলাম অস্বীকার করে না। কেননা অস্বীকার করাতে কোনো ফায়দা নেই। আর আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাছাড়া তাকে অন্য কোনোভাবে নতুন করে সৃষ্টি

করা যাবে না। মানুষের এ সব বাস্তব সমস্যাকে ইসলাম অস্বীকার যেমন করে না, তেমনি তাকে অবহেলাও করে না। কেননা অবহেলা করাতে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই।

বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার

দাম্পত্য জীবন যাপন কালে স্বামী স্ত্রীকে কখনো মোহরানা বাবদ বা খোরপোশ বাবদ যা কিছু দিয়ে থাক, বনিবনা না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বিদায় করার সময় তার কোনো কিছু ফেরত নেয়া স্বামীর পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য স্ত্রী নিজে যদি অনুভব করে যে, স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা ও বিরাগ এত তীব্র যে, সে কিছুতেই তার ঘর করতে সক্ষম হবে না এবং এও বুঝতে পারে যে, স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা ও বিরাগ তার জন্যে আল্লাহর বিধান অনুসারে স্বামীর আনুগত্য, তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কিংবা সতিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব করে তুলবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর কাছে তালাকের আবেদন জানানো বৈধ।

এরূপ ক্ষেত্রে যেহেতু স্বামী তার ঘর ভাংতে ইচ্ছুক নয় তাই স্ত্রী তাকে এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে মোহরানা বা খোরপোশ বাবদ ইতিপূর্বে সে যা কিছু দিয়েছে, তা সার্বিক বা আংশিক ফেরত দেবে। এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, সে যেন আল্লাহর নাফরমানী ও সীমালংঘন এবং নিজের ওপর ও অন্যের ওপর যুলুম করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। এভাবে ইসলাম মানুষ যে বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে, তার দিকে লক্ষ্য রাখে, যে সব মানুষের মন খুবই শক্ত ও একগুয়ে, তাদের ভাবাবেগের প্রতিও লক্ষ্য রাখে। যে দাম্পত্য জীবনকে স্ত্রী ঘৃণা করে, তার অধীনে থাকতে তাকে বাধ্য করে না এবং একই সাথে স্বামী এই স্ত্রীর পেছনে যে অর্থসম্পদ ব্যয় করেছে, তাও নষ্ট করে না। কেননা সে তো এখানে নির্দোষ।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এই বিধান কতোদূর প্রাণবন্ত ও কল্যাণকর ছিলো, তা উপলব্ধি করার সুবিধার্থে রসূলুল্লাহ (স.)-এর আমলে সংঘটিত একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মহান আল্লাহর অতুলনীয় ও অমোঘ বিধানে কতো ন্যায়বিচার, কতো ভারসাম্য, এবং কতো সূক্ষ্ম পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তা কতো আপোষহীন।

ইমাম মালেক স্বীয় হাদীস গ্রন্থ মোয়াত্তায় বলেন, হাবীবা বিনতে সাহল আনসারী সাবেত বিন কায়স বিন শাম্মাসের স্ত্রী ছিলেন। রসূল (স.) প্রত্যুষে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখেন হাবীবা তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

রসূল (স.) বললেন, মহিলাটি কে? তিনি বলেছিলেন, আমি হাবীবা বিনতে সাহল। রসূল (স.) বললেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমিও আমার স্বামীর জন্যে নই, আর সাবেত বিন কায়সও তার স্ত্রীর জন্যে নয়। এরপর তার স্বামী এলে রসূল (স.) বললেন, এই যে হাবীবা বিনতে সাহল। সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে যা বলার ছিলো বলেছে।

হাবীবা বললেন, হে রসূল (স.), সাবেত আমাকে যা যা দিয়েছে, সবই আমার কাছে আছে।

রসূল (স.) সাবেতকে বললেন, ওইসব জিনিস কিছু নিয়ে নাও। সাবেত নিয়ে নিলেন এবং হাবীবা তার পিতৃগৃহে থেকে গেলেন।

বোখারীতে বর্ণিত আছে যে, সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের স্ত্রী রসূল (স.)-এর কাছে এলো এবং বললো, হে রসূল (স.)! আমি তার চরিত্র বা ধর্ম সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করছি না। তবে ইসলামের অভ্যন্তরে কুফুরকে আমি অপছন্দ করি। রসূল (স.) বললেন, তুমি ওর বাগানটি ফেরত দেবে তো? (সাবেত তাকে মোহরানা বাবদ একটা বাগান দিয়েছিলো) সে বললো, হাঁ। রসূল (স.) সাবেতকে বললেন, বাগানটি ফেরত নিয়ে ওকে তালাক দাও।

আর একটি হাদীসে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবু জারীর ইকরামাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, খোলার কি কোনো ভিত্তি আছে? তিনি জবাব দিলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, 'ইসলামে প্রথম খোলার ঘটনা ঘটে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর বোনকে নিয়ে। সে রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললো, 'হে রসূল (স.)! আমাকে ও আমার স্বামীকে আর কোনো কিছুই একত্রে রাখতে পারবে না। আমি তাঁবুর এক পাশ উঁচু করে দেখলাম, সে কয়েক ব্যক্তির সাথে ঢুকছে। পরে দেখলাম, সে সবার চেয়ে কালো, সবার চেয়ে খাটো এবং সবার চেয়ে কুৎসিত।

তার স্বামী বললো, হে রসূল (স.)! আমি ওকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করেছি। সেটি হচ্ছে আমার বাগান। ও যদি আমার বাগানটা আমাকে ফেরত দেয় তাহলে আমি ওর দাবী মেনে নেবো। রসূল (স.) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বক্তব্য কী? সে বললো, বাগান ফেরত দেবো। সে চাইলে আরো কিছু দিতেও রাযি আছি। এরপর রসূল (স.) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়ে দিলেন।

এই রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা সেই মনস্তাত্তিক অবস্থাটা বুঝা যায়, যাকে রসূল (স.) মেনে নিয়েছিলেন এবং এ কথা বুঝেই মেনে নিয়েছিলেন যে, ওটা একটা অনিবার্য ও সংকটজনক অবস্থা, যাকে অস্বীকার বা অপছন্দ করে কোনো লাভ নেই, এবং স্ত্রীকে এ পরিস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য করায়ও কোনো ফায়দা নেই। তাই তিনি এ সব সমস্যার সমাধানে আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা এই ব্যবস্থা সে বাস্তবানুগ ও কার্যকর উপায়ে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজের মোকাবেলা করে এবং অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত ও বিবেক সম্মত পন্থায় তার সাথে আচরণ করে।

আর যেহেতু এসব পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা ও তার শাস্তির ভয়ই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে বহাল রাখতে পারে তাই আল্লাহর বেধে দেয়া সীমা লংঘনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে,

'এ হচ্ছে আল্লাহর সীমা রেখা। তোমরা একে লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা লংঘন করে তারা হচ্ছে যালেম।'

এখানে আমরা কোরআনী বাচনভংগীর একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখে ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়াই। পার্থক্য সত্তেও এই দুটো বাচনভংগী একই অর্থবোধক। কেবল পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট দুটো ভিন্ন রকমের। এই সূরায় ইতিপূর্বে একস্থানে রোযা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে উপসংহার টানা হয়েছে এভাবে,

'এই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা এর কাছেও যেও না।'

আর এখানে উপসংহার টানা হয়েছে,

'এই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা একে অতিক্রম করো না।'

প্রথমটিতে সীমা রেখার নিকটবর্তী হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে সতর্ক করা হয়েছে সীমারেখা অতিক্রম করার বিরুদ্ধে।

প্রথম সতর্কবাণীতে এমন সব জিনিসের আলোচনা করা হয়েছিলো, যা নিষিদ্ধ হলেও আকর্ষণীয় ও লোভনীয়। যেমন,

'তোমাদের জন্যে রোযার রাত্রে স্ত্রীদের সাথে সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্যে পোশাক আর তোমরা তাদের জন্যে পোশাক। ....এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা এই সীমারেখার নিকটবর্তী হয়ো না।'

পানাহার ও যৌনতা সংক্রান্ত নিষিদ্ধ জিনিস প্রবলভাবে মানুষদের আকর্ষণ করে। তাই এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর সীমা রেখার ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা নিরাপদ ও কল্যাণকর। তাই মানুষ যখন এসব জিনিসের কাছাকাছি যাবে, তখন এগুলোর আকর্ষণের সামনে যাতে ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতাজনিত পদস্খলন এড়ানো যায়, সে জন্যে তাকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বলা হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপট ভিন্নরকমের। এখানকার প্রেক্ষাপট হচ্ছে, অপছন্দনীয় অবাঞ্ছিত, সংঘাতময় ও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রেক্ষাপট। তাই এখানে আশংকা রয়েছে সীমা অতিক্রমের। তাই সীমার নিকটবর্তী হতে নয় বরং সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রেক্ষাপটের পার্থক্যের জন্যেই নিষেধাজ্ঞার এই পার্থক্য, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের দাবীও যে বিভিন্ন হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে এই বাচনভংগী বিস্ময়করভাবে শাণিত, নিপুণ ও নিখুত।

তালাক সম্পর্কে দু একটি মৌলিক কথা

এরপর তালাকের আরো বিশদ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

২৩০-নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

অতপর যদি স্বামী (তৃতীয়বার) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তারপর এই স্ত্রী তার জন্যে কোনো অবস্থায় বৈধ হবে না, (হাঁ) যদি তাকে অপর স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়ম মাফিক) তালাক দেয় এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তারা যদি সত্যিই) মনে করে যে, তারা (এখন থেকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে) আল্লাহর সীমা রেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে তাদের (মধ্যে) পুনরায় (বিয়ের বন্ধনে) ফিরে আসতে কোনো দোষ নাই। এই হচ্ছে আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা, যারা (এর ভালো মন্দ সম্পর্কে সম্যক) অবগত আছে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এই নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন।

আগেই বলেছি যে, তৃতীয় তালাক স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, দাম্পত্য জীবনে কোনো মৌলিক বিকৃতি বিদ্যমান এবং তা অদূর ভবিষ্যতে শোধরানোর কোনো উপায় নেই। স্বামী যখন তৃতীয় তালাক দিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক থাকে, তখন স্বভাবতই এই বিকৃতি প্রমাণিত হয়। এরূপ অবস্থায় উভয়ের জন্যে নতুন জীবন সংগী অনুসন্ধান করা উত্তম। এই তিনটি তালাক যদি একেবারেই বিনা কারণে, কিংবা তাড়াহুড়োর কারণে কিংবা গোয়ার্তুমির কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে তালাক দেয়ার অধিকারটির এই অপব্যবহার বন্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কেননা এ অধিকারটি কেবল একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতার আচরণ করা কখনো সমীচীন হতে পারে না। তাই এমতাবস্থায় এমন দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটাই কল্যাণকর, যা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ন্যূনতম সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় না।

কেউ বলতে পারে যে, একজন অবিবেচক পুরুষের মুখ ফসকে একটা কথা বেরুনোর দরুন একজন নারীর জীবন, তার নিরাপত্তা ও স্থীতি বিপন্ন হবে কেন? তার কী দোষ? এর জবাব এই যে, আমরা আসলেই একটা বাস্তব মানবিক সমস্যার সম্মুখীন। এ সমস্যার এই সমাধান যদি আমরা গ্রহণ না করি, তাহলে এর সমাধান কিভাবে হবে? এই পুরুষটি তার স্ত্রীকে ও তার সাথে তার সম্পর্ককে বিন্দুমাত্রও মর্যাদা না দেয়া সত্ত্বেও তাকে কি আমরা ওই স্ত্রীকে নিয়ে জীবন যাপনে বাধ্য করতে পারি? তাকে কি আমরা বলতে পারি যে, তুমি তালাক দিয়েছো তাতে কী হয়েছে, ওই তালাক আমরা মানিও না, স্বীকারও করি না, বহালও রাখি না। এই রইলো তোমার স্ত্রী তোমার দায়িত্বে। ওকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখো।

কক্ষণো নয়। এরূপ করলে স্ত্রীর ও তার দাম্পত্য সম্পর্কের অবমাননা হবে। ইসলাম এই অবমাননা পছন্দ করে না। ইসলাম তো নারীকে সম্মান করে, দাম্পত্য সম্পর্ককে শ্রদ্ধা জানায় এবং তাকে আল্লাহর এবাদাতের পর্যায়ে উন্নীত করে। এ ধরনের স্বামীর উপযুক্ত শাস্তি এটাই হবে যে, তাকে আমরা তার ওই স্ত্রী থেকে বঞ্চিত করবো, যার সাথে তার বিরাজমান সম্পর্ককে সে অপমান করেছে। এও তার উপযুক্ত শাস্তি যে, তাকে আমরা প্রথম দুই তালাকে ইদ্দতের মধ্যে আপোষ না করায় সম্পূর্ণ নতুন আক্দ ও নতুন মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করতে বাধ্য করবো। আর তৃতীয় তালাক দিলে ওই স্ত্রীকে তার ওপর চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করবো যতক্ষণ সে অন্য স্বামীর ঘর করে না আসে। এমতাবস্থায় মোহরানা ও খোরপোশের কোনো কিছুই সে ফেরত পাবে না। আসল কথা এই যে, আমাদেরকে মানুষের মনস্তাত্তিক বাস্তবতাকে এবং জীবনের বাস্তবতাকে দেখতে ও বুঝতে হবে। নিছক স্বপ্নের জগতে উড়ে বেড়ালে চলবে না।

জীবন যখন স্বাভাবিক গতিতে ধাবমান হবে, স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তারপর সেই স্বামী তাকে তালাক দেবে, তখন তার ও তার পূর্ববর্তী স্বামীর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা নেই। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর সীমা রক্ষিত হওয়ার বিষয়ে তাদের উভয়ের আস্থা থাকা চাই।

কেননা এখানে নিছক লালসা চরিতার্থ করাটাই আসল ব্যাপার নয় এবং তাদের মিলনে বা বিচ্ছেদে তাদের আশা ও বাসনা পূর্ণ হলো কি হলো না, সেটাই দেখার বিষয় নয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো আল্লাহর সীমারেখা রক্ষিত হবে কিনা তা নিশ্চিত করা। এটাই জীবনের আসল বৈশিষ্ট্য। এটা হারালে তাদের দু'জনের জীবনই আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

'আর এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি জ্ঞানী লোকদেরকে জানিয়ে দেন।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর সীমারেখা তথা তাঁর আদেশ ও নিষেধ কিছুমাত্র অস্পষ্ট রাখেননি, এটা তার বান্দাদের ওপর তাঁর অতি বড় অনুগ্রহ। এসব সীমারেখা তিনি জ্ঞানী লোকদের জন্যে কোরআনে বর্ণনা করেন। যারা যথার্থ জ্ঞানী তারা এগুলো জানে এবং এসব সীমারেখার ওপর এসে থমকে দাঁড়ায়। যারা এটা জানেও না, মানেও না, তারা অন্ধ এবং ঘোর জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত।

এরপর ২৩১ ও ২৩২ নং আয়াতে তালাক দাতা স্বামীদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আসছে। সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল অবস্থায় তালাকের পর কী করণীয়, এই নির্দেশ তা বিশ্লেষণ করেছে। আয়াত দুটি লক্ষ্য করুন,

'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে এবং তারা ইদ্দত পালন সম্পন্ন করবে, তখন তাদেরকে হয় ভালোভাবে রেখে দাও, নচেত ভালোভাবে বিদায় করে দাও। আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু জানেন। তোমরা জানো না।'

জীবনে মিলন বা বিচ্ছেদ যাই ঘটুক না কেন, ভদ্রতা, সদাশয়তা ও মহানুভবতা সর্বক্ষেত্রে জীবনের প্রধান ভূষণ হওয়া উচিত। মানুষকে কষ্ট দেয়া ও নির্যাতন করার অসদুদ্দেশ্য কারো থাকা উচিত নয়। বিচ্ছেদ বা তালাকের সময় মানুষের অবস্থা এত উত্তেজনাপূর্ণ ও সংকটাপন্ন হয় যে, তখন এই উচ্চাংগের সদাচার ও মহানুভবতার পরিচয় একমাত্র তারাই দিতে পারে, যাদের মনমেযাজ পার্থিব সংকীর্ণতা ও পার্থিব পরিবেশ ও পরিস্থিতির স্পর্শ থেকে অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করে, যাদের মন হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থাকে এবং যাদের অন্তর এত প্রশস্ত থাকে যে, পার্থিব সংকীর্ণতা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না।

মনের এই মহত্ব, উচ্চতা ও প্রশস্ততা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান, শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত ঈমানসহ স্বাস্থ্য, জীবিকা ও অন্য সকল রকমের নেয়ামতকে স্মরণ করা, সব সময় খোদাভীতিকে এবং ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন ও নিষ্ফল খোরপোশের বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে উজ্জীবিত রাখার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। দাম্পত্য জীবনে মিলন বা বিচ্ছেদ যাই ঘটুক, সর্বাবস্থায় সদাশয়তা, মহানুভবতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উপদেশ আলোচ্য আয়াত দুটির অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

জাহেলী যুগে নারী ছিলো সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার। এ নির্যাতন ছিলো জাহেলিয়াতের নিষ্ঠুর ও বিকৃত স্বভাবের ফসল ও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্ষুদ্র মেয়ে শিশুও নির্যাতন থেকে রেহাই পেতো না। কখনো তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। কখনো সে চরম অবমাননা লাঞ্ছনা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হতো। এমনকি স্বামীর ঘর করাও নারী নির্যাতন থেকে বাদ পড়তো না। তাকে বিবেচনা করা হতো গৃহস্থী আসবাবপত্রের মতো এবং উটনী ও ঘোড়াও ছিলো তার চেয়ে বেশী দামী ও সম্মানার্হ। এমনকি তালাক পেয়ে তার যুলুমের অবসান ঘটতো না। তাকে অচল করে রাখা হতো এবং তালাক দানকারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে বিয়ে করতেও পারতো না।

কখনো কখনো তালাকপ্রাপ্তার পিতৃ পরিবারও তাকে তালাক দানকারী প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফেরত না পাঠিয়ে বিয়ে দিতো না। তারা ভাবতো যে, প্রাক্তন স্বামী আবার আপোষ রফা করতেও চাইতে পারে। সাধারণভাবে নারীর প্রতি অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো হতো। শুধু আরবে নয়, তৎকালে সারা বিশ্বের সকল সমাজেই এই একই ধরনের জাহেলিয়াত বিরাজ করতো এবং সর্বত্রই নারীর প্রতি চলতো একই রকম নিপীড়ন।

এরপর এলো ইসলাম। ইসলাম এসে নারীর জীবনের ওপর বইয়ে দিলো মহত্ব ও উদারতার স্নিগ্ধ সমিরণ। এখানে আমরা সেই স্নিগ্ধ সমিরণের কিছু নমুনা দেখতে পাচ্ছি। ইসলাম নারীর প্রতি আরো সম্মানজনক দৃষ্টি দিলো। সে ঘোষণা করলো যে, নারী ও পুরুষ একই প্রাণ থেকে এবং একই আল্লাহর সৃষ্টি। সদাচার ও ন্যায়পরায়নতা থাকলে দাম্পত্য সম্পর্কও তার চোখে আল্লাহর এবাদাতের সমতুল্য। জাহেলিয়াতের যুগের নারী এসব মহৎ আচরণের দাবী করা দূরে থাক, এসব তাদের জানাও ছিলো না। জাহেলিয়াতের পুরুষ ও এসব চায়নি। কেননা এগুলোকে সে কল্পনাও করতে পারতো না। এই মহত্ব ও মহানুভবতা ছিলো নারী পুরুষ উভয়ের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত রহমত। এ রহমত বর্ষিত হয়েছিলো সমগ্র মানব জাতির ওপর।

২৩১ নং আয়াতের প্রথমাংশটি লক্ষ্য করুন,

'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও অতপর তারা তাদের মেয়াদের কাছে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে হয় ভালোভাবে রেখে দাও, নতুবা ভালোভাবে বিদায় করে দাও তাদের ক্ষতি করার জন্যে আটকে রেখো না।'

'মেয়াদের কাছে পৌঁছে যাওয়া'র অর্থ হলা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত ইদ্দতের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসা। ইদ্দত ফুরিয়ে আসলে হয় সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ও সদ্ব্যবহার সহকারে স্ত্রীকে ফেরত নিতে হবে। এটাই হলো ভালোভাবে রেখে দেয়া। নয়তো ইদ্দত ফুরিয়ে যেতে হবে। ফুরিয়ে গেলে স্ত্রীর 'বায়েন তালাক' হবে। এটাই ভালোভাবে বিদায় করে দেয়া। কোনো রকম কষ্ট দেয়া যাবে না। স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো পণও চাওয়া যাবে না। তাকে যার সাথে ইচ্ছা হয় বিয়ে করতেও বাধা দেয়া যাবে না।

'তাদের ক্ষতি করার জন্যে আটকে রেখো না।'

এই ক্ষতির উদাহরণ ইতিপূর্বে জনৈক আনসারী সাহাবীর ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি ছাড়বোও না, আশ্রয়ও দেবো না।' এ হলো অসদুদ্দেশ্যে আটকে রাখা। ক্ষতির উদ্দেশ্যে আটকে রাখা। ইসলামের উদার ও মহান নীতি একে সমর্থন করে না। কোরআনে একাধিকবার একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাগ-ইসলামিক আরব সমাজে এ রীতি প্রচলিত ছিলো। ইসলামের সংস্কার ও মর্যাদায় গৌরবান্বিত হতে পারেনি এমন যে কোনো সমাজে এ রীতি প্রচলিত থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়।

এখানে কোরআন মহত্ম ও উদারতম মনোভাব জাগিয়ে তোলে। একই সাথে জাগিয়ে তোলে আল্লাহকে ভয় করা ও লজ্জা করার মনোবৃত্তি। এই সকল বৈশিষ্ট জাগিয়ে তুলে অন্তরকে জাহেলিয়াতের সকল লক্ষণ ও মলিনতা থেকে মুক্ত করা ও সম্মানজনক আসনে আসীন করার জন্যে। এ জন্যেই বলা হয়েছে–

'যে ব্যক্তি এটা করবে, সে নিজের ওপর যুলুম করবে। তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাসের বিষয় রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে স্মরণ করো আর স্মরণ করো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে কেতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন তাকে। এ দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তায়ালা সকল জিনিস সম্পর্কে অবগত।'

যে ব্যক্তি তালাক দেয়া স্ত্রীকে যুলুম ও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আটক রাখবে, সে নিজের ওপর যুলুম করবে। কেননা ওই মহিলা তো এখন তার বোন। তার ওপর যুলুম করা নিজের ওপর যুলুম করার সমার্থক। তাছাড়া নিজেকে আল্লাহর নাফরমানির জায়গায় নিয়ে আসার মাধ্যমেও সে নিজের ওপর যুলুম করে। নিজেকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিয়েও নিজের ওপর যুলুম করে। এ হচ্ছে চেতনা ও প্রেরণা উজ্জীবনের প্রথম প্রয়াস।

আর যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দাম্পত্য সম্পর্ক ও তালাকের বর্ণনা দিয়েছেন, তা সুস্পষ্ট, সরল ও দ্ব্যর্থহীন, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবন ও সমাজকে প্রতিষ্ঠাই ওই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য। তাই মানুষ যখন শরিয়তের এইসব বিধিকে নারী নির্যাতন ও নারীর ক্ষতি সাধনের জন্যে অপপ্রয়োগ করে, যে সুযোগ ও অধিকারকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে দেয়া হয়েছে, তাকে তারা তামাশায় পরিণত করে, এবং তালাক প্রত্যাহারের যে অধিকারটি দাম্পত্য জীবনের পুনর্বহাল ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে, তাকে তারা নারীর ক্ষতি ও পেরেশানীবৃদ্ধির কাজে লাগায়।

এখন সে নিসন্দেহে এগুলোর প্রতি উপহাস করে। এর একটি উদাহরণ আমাদের সমকালীন তথাকথিত মুসলিম সমাজে প্রচলিত দেখতে পাই। এটি হচ্ছে, ইসলামী শরিয়তে যে সব উদার বিধি রয়েছে, সেগুলোকে হিলা বাহানা করা, কষ্ট দেয়া ও দুর্নীতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রথা। এমনকি তালাকের অধিকারকেও জঘন্যতম কায়দায় অপপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ হচ্ছে আল্লাহর আয়াতের সাথে সবচেয়ে নির্লজ্জ উপহাস এবং এ উপহাসকারীর জন্যে আল্লাহ তায়ালা ভয়াবহ পরিণাম নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত এবং আল্লাহর উপদেশের উৎস কেতাব ও হেকমত তথা সুক্ষ্ম জ্ঞানের কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে। এ দ্বারা লজ্জা ও আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি দানের মনোভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেকালে মুসলমানদের আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করতো।

আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো যে নেয়ামতের কথা তাদের মনে পড়তো, তা হলো তাদের একটি বিশ্বজোড়া জাতি বা উম্মাহ হিসাবে অবস্থান। ইসলামের আগে তো আরবরা এবং আরবের বেদুইনরা কোনো উল্লেখ করার মতো জাতিই ছিলো না। পৃথিবী তাদেরকে চিনতো না, তাদের অস্তিত্বও অনুভব করতো না। তারা ছিলো মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন কতগুলো গোষ্ঠী, উপদল ও উপজাতি। তাদের কাছে এমন কোনো জিনিসই ছিলো না যা তারা মানব জাতিকে উপহার দিতে পারতো এবং তার ওসিলায় সারা বিশ্ব তাদেরকে চিনতে পারতো। এমনকি তাদের নিজ জনগণকে দেয়ার মতো এমন কোনো জিনিসও তাদের কাছে ছিলো না, যা দ্বারা তারা স্বনির্ভর হতে পারতো এবং অন্যের কাছে তাদের হাত পাততে হতো না। তাদের কাছে আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত কিছুই ছিলো না। তাদের অধিকাংশই ছিলো নিঃস্ব দরিদ্র। কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক ছিলো ধনী ও বিলাসী। সেই বিলাসিতাও ছিলো অত্যন্ত নোংরা ধরনের। তারা শুধু সম্পদের দিক দিয়েই দরিদ্র ছিলো না। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মার দিক দিয়েও দরিদ্র ছিলো। তাদের আকীদা বিশ্বাস উপজাতীয় ও সীমাবদ্ধ। তাদের সামাজিক তৎপরতা বলতে আকস্মিক চোরাগোপ্তা হামলা, লুটতরাজ, প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ, খেলাধূলা, মদ ও জুয়া ইত্যাদির বাইরে কিছুই ছিলো না। সর্বাবস্থায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস ছিলো তাদের মনোযোগের বিষয়।

ইসলাম তাদেরকে এই অমানুষিক অবস্থা থেকে মুক্ত করে। বরং তাদেরকে নতুন জীবন দান করে। তাদেরকে এক বিশাল জাতিতে পরিণত করে, যাকে সমগ্র বিশ্ব চেনে।

মানব জাতিকে সে এক মহান আকীদা ও আদর্শ উপহার দিয়েছে, যা বিশ্ব প্রকৃতির অজানা রহস্য এত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে যে, ইতিপূর্বে আর কখনো তেমন ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই আদর্শ মুসলিম জাতিকে সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দানের যোগ্য বানায়। অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত ও মহৎ নেতৃত্বের যোগ্য বানায়। এই আকীদার বদৌলতেই ইসলাম এই জাতিকে সারা বিশ্বে একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে। এর আগে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য অস্তিত্বই ছিলো না।

ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে এমন শক্তি ও প্রতাপ দিয়েছে, যার জন্যে সারা বিশ্ব তাকে শুধু চেনে, তা নয় বরং তাকে হিসাব করে ও গুরুত্ব দেয়। এর আগে তারা ছিলো আশপাশের সাম্রাজ্যগুলোর ভৃত্য অথবা অজানা অচেনা মানুষ। তাদেরকে চার দিক থেকে বিপুল সম্পদও দান করেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাদেরকে সে মনের শান্তি, সামাজিক শান্তি ও পরিবারিক শান্তি দান করেছে। দান করেছে হৃদয়ের তৃপ্তি, বিবেকের প্রশান্তি জীবন যাপন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা। তাদেরকে আরো দিয়েছে উচ্চ ও প্রশস্ত দৃষ্টি, যা দিয়ে তারা সারা বিশ্বের জাহেলী সমাজগুলোকে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা আর কাউকে দেননি।

আল্লাহ তায়ালা যখন এখানে তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়েছেন, তখন তার দ্বারা মুসলিম উম্মাহর পার্থিব জীবনে বিরাজমান নেয়ামতকেই বুঝিয়েছেন, যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তারা জাহেলিয়াত ও ইসলামে একই প্রজন্মের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। অথচ তাদের জীবনে তারা এতো বড় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে, যা মানবীয় কল্পনার বহির্ভূত এক অলৌকিক ব্যাপার। তাদেরকে যে নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর নাযিল করা বিধানও তার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন তার ভাষায় বলেছে,

'যে কেতাব ও হেকমত তথা জ্ঞান বিজ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন।'

অর্থাৎ সম্বোধনসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছে। এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে কোরআনের শ্রোতা আরব মুসলমানদেরকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের বিরাটত্ব ও বিশালত্ব অনুভব করার সুযোগ দান। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর নাযিল করা এই কেতাবের মধ্যেই রয়েছে গোটা জীবনের ভিত্তিমূল পারিবারিক জীবনের বিধানসম্মত আলোচ্য আয়াতসমূহ।

এরপর আয়াতের শেষাংশে সর্বশেষ প্রেরণা উজ্জীবক বাণী দিয়ে মুসলমানদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তিনি যে সব বিষয়ে অবহিত, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ সব কিছুই জানেন।'

এভাবে লজ্জা ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব জাগিয়ে তোলার পর ভীতি ও সতর্কতার চেতনা উজ্জীবিত করা হয়েছে এবং মোমেনকে উদারতা কোমলতা ও সৌজন্যের পথে পরিচালিত করার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং এভাবে যখন তারা তাদের অপেক্ষার সময় ইদ্দত পালনের মাধ্যমে শেষ করে নেয়, তখন তাদেরকে তাদের পছন্দমতো স্বামীদের সংগে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করতে তোমরা বাধা দেবে না।

ইমাম তিরমিযী হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি তার বোনকে একজন মুসলমানের কাছে বিয়ে দেন। বোন স্বামীর সংগে কিছু কাল কাটান। অতপর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। তা থেকে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেননি। এ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তার বোনের স্বামী স্ত্রী একে অপরকে কামনা করে। অতপর স্ত্রীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। হযরত মা'কাল স্বামীকে বললেন, হে নরাধম! বোনকে দিয়ে আমি তোমাকে সম্মানিত করেছিলাম, তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে, খোদার কসম, যতোদিন তুমি বেঁচে থাকবে, সে আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসবে না। তিনি বলেন, আল্লাহ স্বামীর জন্যে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জন্যে স্বামীর প্রয়োজন জেনে নিলেন এবং এহেন পরিস্থিতিতে এ আয়াতটি আল্লাহ নাযিল করলেন। হযরত মা'কাল তা শুনে বললেন, আমি পালনকর্তার নির্দেশ শুনলাম এবং মেনে নিলাম। অতপর তিনি স্বামীকে ডেকে বললেন, বোনকে তোমার কাছে বিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে সম্মানিত করছি।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্তরের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সাড়া দান করলেন, যার সত্যতা সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। এর দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি তাঁর রহমত প্রকাশ পায়। অবশ্য আয়াত থেকে সাধারণভাবে একটা ব্যবস্থাকে সহজ করার কথাও প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্যে সব সময়ই চান। কোরআনী জীবন বিধানে মুসলিম মিল্লাতের জন্যে যে প্রশিক্ষণ উপস্থাপন করো, এ সুস্থ-সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম মিল্লাতকে যে নেয়ামতে ধন্য করেছেন, মানব জীবনের সর্বাবস্থায় যা মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে স্থায়ী সমাধান দিতে পারে তা এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

তেমনিভাবে এখানে নিষেধাজ্ঞা আর ভয়-ভীতি প্রদর্শনের পর মানুষের বিবেক আর অনুভূতিকে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করা হয়েছে,

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এ দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটা তোমাদের জন্যে অতি পরিশুদ্ধ এবং অতি পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'

আল্লাহ তায়ালা, আর পরকালের প্রতি ঈমান এমন একটা বস্তু যা এ উপদেশ আর সাবধান বাণীকে অন্তরে বদ্ধমূল করে। তখন মানব হৃদয় সম্পর্ক স্থাপন করে এ বিশ্ব জাহানের চেয়েও বিশাল-বিস্তীর্ণ এক জগতের সংগে। তেমন এক মানব হৃদয় যে কোনো বিষয় গ্রহণ কিংবা বর্জনের সময় সর্বপ্রথমআল্লাহ এবং তাঁর সন্তুষ্টির প্রতিই লক্ষ্য আরোপ করে। তখন মানব মনে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, মানুষের জন্যে যা পূত-পবিত্র, তাদের জন্যে যা নিতান্ত পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাই চান। আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে মোমেনকে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করাই আল্লাহর কাজ। এটাই তাঁর শান, মোমেন তার নিজের এবং আশপাশের সমাজ আর পরিবেশের জন্যে পূত-পবিত্র বস্তুকেই গনীমত মনে করবে, মহামূল্যবান বস্তু মনে করবে। মোমেনের অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে এ জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন, মানুষ যা জানে না, সে আল্লাহ তায়ারা তা জানেন। আল্লাহর আহবানে তাঁর সন্তুষ্টিতে তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়াই হচ্ছে মোমেনের কাজ। মোমেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঈমান এভাবে সব কিছুকে এবাদাতের স্তরে স্থান দেয়। আল্লাহর রজ্জুর সংগে সবকিছুর সম্পর্ক স্থাপন করে। তাকে পবিত্র করে বিশ্বের যাবতীয় কালিমা থেকে, যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। বাঁধন কষণ আর আকর্ষণ বিকর্ষণের নিয়ম-নীতি থেকেও তাকে মুক্ত ও পবিত্র করে, তালাক আর বিচ্ছেদের ব্যাপারে যা একান্ত অপরিহার্য।

তালাক পরবর্তি সমস্যা ও তার সমাধান

তালাক দেয়ার পর দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধপান সম্পর্কে নিম্নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাকের পরও যে সম্পর্ক ছিন্ন হয় না, পারিবারিক বিধানে সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা অপরিহার্য। এ এমন এক সম্পর্ক, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমান অংশীদার। এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নবাগত সন্তানের পাশাপাশি উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। যখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন কচি শিশুর জন্যে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত নিরাপত্তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন এ ব্যবস্থা যা সর্বাবস্থায় যথেষ্ট হতে পারে।

'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। যদি কেউ তার সন্তানের দুধ পান করাবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত তারা করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার কর্তব্য হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী সেসব নারীর খোর- পোষের দায়িত্ব পালন করা। কাউকে তার সামর্থের অতীত চাপ দেয়া যাবে না। সন্তানের কারণে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর সন্তানের কারণে পিতাকেও ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারেসের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। পারস্পরিক সম্মতি আর পরামর্শক্রমে পিতামাতা উভয়ে যদি দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতে তাদের কোনো দোষ নেই। আর তোমরা যদি কোনো ধাত্রী দ্বারা নিজেদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চাও, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই; যদি তোমরা যথারীতি তার বিনিময় দিয়ে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং জেনে রাখবে যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভালো করেই জানেন।'

দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার উপর এ কর্তব্য ফরয করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ এ দায়িত্ব ব্যাহত করতে পারে না। মাতা তার প্রকৃতি আর প্রবৃত্তির কারণে এ দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারে না, পারে না নিজের সন্তানকে পরিত্যাগ করতে। এমনটি করলে ছোট শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তায়ারা এ ছোট শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর

সন্তানের মাতার উপর ফরয করেছেন সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। আর আল্লাহ তায়ারা মানুষের নিজেদের চেয়েও তাদের বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি সন্তানের পিতামাতার চেয়েও বেশী দয়াবান, বেশী কল্যাণকামী। নবজাত শিশুকে দু'বছর দুধ পান করানো তিনি শিশুর মাতার উপর ফরয করে দিয়েছেন। এ দুধ পান করাতে হবে পূর্ণ দু'বছর। কারণ, মহান আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, শারীরিক মানসিক সব দিক থেকে এ সময়টি শিশুর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিধান তার জন্যে, যে দুধ পান করাবার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আর মনস্তাত্তিক গবেষণা প্রমাণ করে যে, শারীরিক আর মানসিক উভয় দিক থেকে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে শিশুকে পূর্ণ দু'বৎসর দুধ পান করানো আবশ্যক। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত যে, কোনোরকম গবেষণা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই তারা এটা জানতে পেরেছে। এতো দীর্ঘ সময় ধরে অজ্ঞতা তাদের গ্রাস করবে, তা মানব প্রকৃতি মেনে নিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা তো তাঁর বান্দার প্রতি অতি দয়াবান। বিশেষ করে এসব দুর্বল ছোট শিশুদের প্রতি, যারা দয়া-অনুগ্রহের বেশী মুখাপেক্ষী।

শিশুর মাতার প্রতি আল্লাহ তায়ালা যে কর্তব্য ফরয করে দিয়েছেন, তার বিপরীতে পিতারও কিছু কর্তব্য রয়েছে। পিতার কর্তব্য হচ্ছে যথারীতি ভালোভাবে শিশুর মাতার খোরপোষের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে উভয়ই সমান দায়িত্বশীল। উভয়ে সমান অংশীদার। এ ছোট্ট দুধের শিশু সম্পর্কে তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মাতা দুগ্ধপান করানো আর প্রতিপালন দ্বারা শিশুকে সহায়তা দান করবে, আর পিতা খাদ্য আর পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে। তাকে এটা করতে হবে শিশুর প্রতি কর্তব্য পালনের স্বার্থেই। পিতামাতা উভয়ে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থের সীমার মধ্যে থেকে এ দায়িত্ব পালন করবে।

'কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়া যাবে না। পিতামাতার কোনো একজন সন্তানের অজুহাতে অপরকে কষ্ট দিতে পারবে না।'

সন্তানের কারণে মাতাকে কষ্ট দেয়া যাবে না, কষ্ট দেয়া যাবে না সন্তানের কারণে তার পিতাকে। সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা আর মমত্ববোধ প্রকাশে পিতা অন্তরায় হতে পারবে না, পারবে না অহেতুক হস্তক্ষেপ করতে; এ ব্যাপারে তাকে হুমকী ধমকী দিতে পারবে না। কোনো বিনিময় ছাড়া শিশুকে দুধ পান করাবার জন্যে মাতাকে বাধ্যও করতে পারে না। সন্তানের জন্যে পিতার ভালবাসা প্রকাশে মাতাও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, পারে না তার ঘাড়ে এমন বোঝা চাপাতে, এমন দাবী উত্থাপন করতে, যাতে তার কোমর ভেংগে যায়। পিতার অবর্তমানে বা তার মৃত্যুর পর তার উপর অর্পিত দায়িত্ব তার বৈধ উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাবে।

আর ওয়ারেসের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব অর্পিত হবে। দুগ্ধ দায়িনী মাতার ভরণ-পোষণের যথাবিহিত ব্যবস্থা করা এবং দায়িত্ব সূচারুরূপে আঞ্জাম দেয়া তার কর্তব্য। এতে পারিবারিক দায়িত্বের একটা দিক উত্তরাধিকারের ফলে প্রমাণিত হয়, অপর একটা দিক প্রমাণিত হয় ওয়ারেসের দায়িত্ব বহন করার কারণে। এভাবে পিতা মারা গেলেও শিশু সন্তান ধ্বংস হবে না। সন্তান এবং তার মাতার অধিকার সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে। এরপর আলোচনার ধারা চলে গেছে দুগ্ধদান বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে।

'তারা উভয়ে যদি পারস্পরিক সম্মতি আর পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে এতে তাদের কোনো দোষ নেই।' পিতা-মাতা বা মাতা এবং ওয়ারেস যদি দু'বছর হওয়ার পূর্বেই দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তারা তা করতে পারে। কারণ এভাবে দুধ ছাড়ানোতে তারা শিশুর জন্যে কল্যাণ নিহিত

রয়েছে মনে করে, স্বাস্থ্যগত বা অন্য কোনো কারণে তারা তা করতে পারে, তাতে কোনো দোষ, কোনো পাপ হবে না। অবশ্য এটা হতে হবে উভয়ের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে। অথবা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এটা করতে হবে। শিশুর কল্যাণের প্রতি নযর দেয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণে সার্বিক তত্ত্বাবধান করা তাদের ওপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। তেমনিভাবে পিতা যদি আগ্রহী হয় যে, তিনি শিশুকে দুধ পান করাবার জন্যে টাকার বিনিময়ে ধাত্রী নিয়োগ করবেন, এটা তিনি তখন করতে পারেন, যখন দেখেন যে এভাবে দুধ পান করানোতে শিশুর জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ জন্যে শর্ত হচ্ছে তাকে ধাত্রীর বিনিময় পুরোপুরি দিতে হবে এবং তার দাবী দাওয়া সুন্দরভাবে পূরণ করতে হবে।

'আর তোমরা যদি চাও যে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করাবে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই, তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি তোমরা যথারীতি বিনিময় প্রদান করো।' এটা শিশুর নিরাপত্তা গ্যারান্টি। এভাবেই শিশুর স্বার্থ রক্ষিত হয়। সবশেষে গোটা ব্যাপারটি খোদায়ী সংযোগ তথা তাকওয়ার সংগে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এভাবে জাগ্রত করে তোলা হয় এক সূক্ষ্ম এবং গভীর অনুভূতি, যা ছাড়া এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং জেনে রাখবে যে, তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা সম্যক অবলোকন করছেন।' তাছাড়া বড় কথা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টির বিষয়টি। আর এটা হচ্ছে একমাত্র সে রক্ষাকবচ।

বিধবা নারীর প্রতি ইসলামের উদারতা

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিধান এবং তালাকের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পর যে স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। তার ইদ্দত এবং ইদ্দত পালন শেষে তার প্রতি বিয়ের প্রস্তাব দেয়া ইদ্দত পালন কালে ইশারা-ইংগিতে তাকে বিয়ে করার কথা বলা ইত্যাদি বিধান সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, যেসব স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে রাখবে নিজেদেরকে। .... আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা করবে না। আর জেনে রাখবে যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। সুতরাং তাঁকে ভয় করে চলবে। এবং আরো জেনে রাখবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।'

যে নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, পরিবারের সদস্যবর্গ, স্বামীর নিকটবর্তী লোকজন এবং সমাজের অনেকের পক্ষ থেকে তাকে অনেক গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হয়। আর আরবদের মধ্যে এ প্রচলন ছিলো যে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে বসবাসের অযোগ্য একটা ঘরে স্থান দেয়া হতো। তাকে নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করতে হতো। সুগন্ধী ইত্যাদি দ্রব্য সে এক বৎসর পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারতো না। এক বৎসর পর সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। এখানেও তাকে জাহেলী যুগের কতিপয় নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। জাহেলী যুগের এসব প্রথা-পার্বনের মধ্যে ছিলো জন্তু জানোয়ারের বিষ্ঠা তুলে আনা আর তা ছুঁড়ে মারা, গাধা খচ্চর জাতীয় জন্তু জানোয়ারের পৃষ্টে আরোহন করানো ইত্যাদি। ইসলাম নারীর এ অমানবিক কষ্ট লাঘব করেছে এবং নারীর জীবন থেকে এ বোঝা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে আর পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে গঞ্জনা-নির্যাতন সইতে হয় না। ভদ্র জীবন যাপনের লক্ষ্যে ইসলাম নারীপক্ষের প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করেছে। নারীকে দিয়েছে নিরাপদ পারিবারিক জীবনের নিশ্চয়তা। ইসলাম

এ ধরনের স্ত্রীর ইদ্দত নির্ধারণ করে দিয়েছে চার মাস দশ দিন। যদি সে নারী অন্তস্বত্তা না হয়ে থাকে। অন্তস্বত্তা হয়ে থাকলে তার ইদ্দত হচ্ছে গর্ভখালাস পর্যন্ত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত এটার চেয়ে অনেক কম। এ সময় সে গর্ভে যা কিছু আছে, তা থেকে মুক্ত হবে। এ সময় স্বামীর স্বজনরা তাকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে তার ব্যক্তিত্বকে আহত করতে পারবে না। এ সময় সে ভদ্রজনোচিত পোশাক পরিধান করতে পারবে, কিন্তু বিয়ের পয়গামের আশায় সাজ সজ্জা করতে পারবে না। অবশ্য এ ইদ্দত পালন করার পর কেউ আর তাকে ত্যাক্ত বিরক্ত করতে পারবে না। আল্লাহর বিধানের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে ভদ্রজনোচিত আচার আচরণ অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে। মুসলিম নারীর জন্যে বৈধ সাজ সজ্জা আর শোভা সৌন্দর্য সে গ্রহণ করতে পারে। এ সময় সে বিয়ের পয়গাম প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারে। কোনো প্রাচীন প্রথা তার পক্ষে অন্তরায় হতে পারবে না, কোন তথাকথিত কৌলিন্য আভিজাত্যের অহমিকাও প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এ পথে আল্লাহ তায়ালার ছাড়া অন্য কেউ তার পর্যবেক্ষণকারী নেই।

'আর তোমরা যা কিছু করো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে অবহিত আছেন, তিনি সব খবর রাখেন।'

এ হচ্ছে নারীর অবস্থা। অতপর আলোচনা ধারায় সে সব পুরুষের প্রসংগের অবতারণা করা হয়েছে, স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন সময়ে যারা তার প্রতি আগ্রহী। মন-মানসের শিষ্টাচার, সামাজিক রীতিনীতি, আবেগ অনুভূতি, প্রয়োজন ও সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্যে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে কতিপয় নীতিমালা,

'আর তোমরা যদি আকার ইংগিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের মনে মনে তা গোপন রাখো, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই।' ইদ্দত পালনকালে নারী মৃত ব্যক্তির পরিবারের অনুভূতিতে বেঁচে থাকে। তেমনিভাবে তার গর্ভে কিছু আছে কি নেই, সে বিষয়েই আলোচনা চলে। তার অন্তস্বত্তা হওয়ার বিষয়টি ইতিপূর্বে প্রকাশ পাক বা না পাক, ইদ্দত গর্ভ খালাসের সাথে সম্পৃক্ত। স্বভাবগতভাবেই এসব বিষয় নতুন দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে বারণ করে। কারণ, সে আলোচনা করার এখনো সময় হয়নি। এটা বারণ করা হয় এজন্যে যে, তাতে নারীর অনুভূতি আহত হতে পারে। এসব আলোচনা তাকে পীড়িত করতে পারে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আকার ইংগিতে বিয়ের পয়গাম দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে; কিন্তু স্পষ্ট করে বিয়ের কথা বলা যাবে না। এমন দূরবর্তী ইংগিতের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যাতে নারী বুঝতে পারে যে, লোকটি তাকে কামনা করে, ইদ্দত পালন শেষে তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আকার ইংগিত যেমন এরকম বলবে, আমি বিয়ে করতে চাই, আমি নারীর প্রয়োজন বোধ করছি। আমি যদি একজন ভালো নারী পেতাম!' এমনিভাবেই ইচ্ছা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে খুব বেশী স্পষ্টভাবে আকার ইংগিতেও এ আকাংখা ব্যক্ত করা যাবে না। এতোটুকু বৈধ করা হয়েছে এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা জানেন–এ এমন এক কামনা যা রোধ করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই।

'আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের সাথে কথা বলবে। নারীদের প্রসংগের অবতারণা করা কে আল্লাহ তায়ারা বৈধ করেছেন এজন্যে যে, স্বাভাবিক আকর্ষণের সংগে তা সম্পৃক্ত। মূলতঃ তা হালাল এবং বৈধ। ইসলাম নারী সংসর্গের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানায় এবং এ জন্যে একটা সময় নির্ধারণ করে। স্বাভাবিক আকর্ষণ নিশ্চিহ্ন না করার প্রতি ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে এ সব নিয়ম শৃংখলার মাধ্যমে স্বাভাবিক আকর্ষণকে আরো সুস্থ

সুন্দর করে তোলে। ইসলাম মানব প্রকৃতিকে সমূলে উৎপাটিত না করে তাকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। এ কারণে ইসলাম অনুভূতির পরিচ্ছন্নতা আর বিবেকের পরিশুদ্ধির পরিপন্থী বিষয় সম্পর্কে বারণ করে দেয়।

কিন্তু সে সব নারীদেরকে সংগোপনে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া যাবে না। তবে নারীদেরকে আকার ইংগিতে বিয়ের পয়গাম দেয়া যাবে কিংবা নিজেদের মনে মনে আকাংখা লুক্কায়িত রাখা যাবে, তাতে কোনো দোষ নেই, নেই কোনো পাপ। কিন্তু সে জিনিসটা নিষিদ্ধ, তা হচ্ছে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সংগোপনে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া। এভাবে সংগোপনে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া শিষ্টাচারের পরিপন্থী, এতে করে বিয়ের আলোচনা ত্বরান্বিত হয় এবং আল্লাহর ভয় আর লজ্জা শরম হ্রাস পায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা তো জীবনের দু'টি পর্যায়ের মধ্যে ইদ্দতকে সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অবশ্য তোমরা বর্ণিত রীতি অনুযায়ী কোনো কথা সাব্যস্ত করে নিতে পারো। যাতে আপত্তিকর এবং অশ্লীল কিছু থাকবে না। এ অতীব সূক্ষ্ম বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার পরিপন্থী কিছুও এতে থাকতে পারবে না।

'আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তির পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করার কোনো সংকল্প করবে না।' লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে-

'তোমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে না' বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, 'তোমরা বিয়ে করার দৃঢ় সংকল্প করবে না। যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সে জন্যে আগ বাড়িয়ে এভাবে বলা হয়েছে। যে দৃঢ় সংকল্প বিবাহের বন্ধন সাধন করে, তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ কথা যেন-মানুষ ভুলে না যায় তাই বলা হয়েছে

'এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা', 'তোমরা তার ধারে কাছেও ঘেষবে না'। এতে অর্থের দিক থেকে এক ধরনের চরম মেহেরবাণী এবং সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায়।

'তোমরা জেনে রাখবে যে, তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করে চলবে।' এখানে আল্লাহর বিধান আর আল্লাহর ভয়কে একাকার করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মনের গভীরে লুক্কায়িত বিষয়েও আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত আছেন। নারী পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনের গভীরে যে ভাবের উদয় হয়, যে গোপন অনুভূতি জাগ্রত হয় , এখানে তারও মূল্য রয়েছে। এসব সম্পর্ক নিতান্ত স্পর্শকাতর। অন্তরের সংগে এর সম্পর্ক। মনের গভীরে তা প্রোথিত। আল্লাহর ভয় এবং মনে যে ভাবের উদয় হয়, আল্লাহ তায়ালা তা জানেন, এ অনুভূতি হচ্ছে সর্বশেষ রক্ষাকবচ। এর সংগে রয়েছে আল্লাহর বিধান এবং সে বিধানের বাস্তবায়ন। আল্লাহর ভয়-ভীতি যখন মানব মনকে নাড়া দেয়, তখন তা পরিশুদ্ধ হয় এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় তাকওয়ার কম্পন। তখন মনোজগতে বিরাজ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তি। আল্লাহর ক্ষমার আস্থা এবং তাঁর পক্ষ থেকে ধৈর্য ও ক্ষমা।

'তোমরা জেনে রাখবে যে, আল্লাহ হচ্ছেন মহা ক্ষমাশীল, অতি ধৈর্যশীল।' তিনি ক্ষমাশীল, অন্তরের অপরাধ ক্ষমা করেন। এতে মনে আল্লাহর অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, মনের গভীরে লুক্কায়িত বিষয়ও তিনি জানেন। তিনি ধৈর্যশীল, তাই তৎক্ষণাৎ অপরাধের শাস্তি দেন না। শাস্তি দেন না এজন্যে যে, হয়তো তাঁর অপরাধী বান্দা তাওবা করে অপরাধ থেকে ফিরে আসবে।

তালাকের আরো কিছু বিধান

অতপর যৌন মিলনের পূর্বে তালাক দেয়া স্ত্রীর বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ এক নতুন পরিস্থিতি। ইতিপূর্বে মিলনের পর তালাক দেয়া স্ত্রী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিটিই বেশী দেখা দেয়। তাই এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর অধিকার আর কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে–

'স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্যে কোনো মোহর নির্ধারণ করার আগে তোমরা যদি তাদেরকে তালাক দাও, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। তবে ....আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা করে দাও তবে তা হবে তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা তোমরা বিস্মৃত হবে না। নিসন্দেহে তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবে অবগত আছেন।

প্রথম অবস্থা হচ্ছে মিলনের তালাক দেয়া স্ত্রী, যার জন্যে মোহরও সাব্যস্ত করা হয়নি অথচ মোহর ধার্য করা ফরয। এ অবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে তাকে কিছু সম্পদ দান করা। অর্থাৎ সাধ্য সামর্থ অনুযায়ী তালাক দেয়া স্ত্রীকে কিছু দান করে দেবে। এ কাজের জন্যে মানসিক মূল্য হিসেবে দিতে হবে। এটা দিতে হবে এক ধরনের বিনিময় মনে করে। দাম্পত্য জীবনের সূচনার পূর্বেই তার পরিসমাপ্তি ঘটা নারীর জীবনে এক অবাহত দুঃখ-বেদনার জন্ম হয়। তার এ বিবাহ বিচ্ছেদ শত্রুতার অপবাদে পর্যবসিত হয়। কিন্তু তাকে কিছু অর্থ-উপকরণ দান করা হলে মনের এ ভাব কিছুটা হলেও লাঘব হবে। তার মধ্যে জাগ্রত হবে এক ধরনের ভালবাসা আর অক্ষমতার ভাব। বিচ্ছেদজনিত দুঃখ কিছুটা হলেও হাল্কা করবে। তখন তার কাছে বিয়ে একটা সাময়ীক ব্যর্থ প্রয়াস বলে প্রতিভাত হবে, চরম আঘাত বলে প্রতীয়মান হবে না। এ কারণে তার স্বামীকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যাতে রীতি সিদ্ধ উপকরণ তার মধ্যে মানবিক ভালবাসা জিইয়ে রাখতে পারে। ভালভাবে গোটা পর্যালোচনাকে ধারণ করে রাখতে পারে। একই ব্যাপারে স্বামীর উপরও সাধ্যের অতীত চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। ধনী স্বামীর কর্তব্য হবে তার ধন অনুপাতে দান করা, আর গরীব স্বামীর উচিত হবে তার সাধ্য সামর্থের সীমার মধ্যে থেকে দান করা।

'সামর্থবান জন্যে তার সামর্থ অনুপাতে, আর তার সংগতি অনুপাতে'। সে স্বামী দান করবে, অনুগ্রহ করবে। এর দ্বারা মনের অভাববোধ পূরণ হবে আর হৃদয়ের শূন্যতা কিছুটা হলেও উপশম হবে।

এ দান হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এবং সৎকর্মশীলদের জন্যে এ দান অবশ্যই কর্তব্য।

আর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে এই যে, মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অবস্থায় স্বামীকে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। এটাই হচ্ছে আইন। কিন্তু কোরআন মাজীদ এরপরও বিষয়টি উদারতা, বদান্যতা এবং সহজ করার উপর ন্যস্ত করে। এরপরও স্ত্রী নিজে সেচ্ছায় অথবা সেকমবয়স্ক হয়ে থাকলে তার অভিভাবকরা মোহরানার অংশ যতো খুশি ক্ষমা করে দিতে পারে। আইন যা ফরয করে তা তারা ছেড়েও দিতে পারে। এ অবস্থায় দাবী ত্যাগ করা উদারতার পরিচায়ক। এতে এমন এক ব্যক্তির সম্পদ গ্রহণ ক্ষমা করা হয়, যার সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু এরপরও কোরআন মজীদ সে লোকের প্রতি ছায়াপাত করে তাদের অন্তরের মিলন ঘটাতে চায়, যাতে অন্তর কলুষ কালিমা মুক্ত হতে পারে।

'আর তোমরা পুরুষরা যদি তাকে প্রাপ্য অংশের চেয়ে আরো বেশী দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ দেখাতে চাও তবে তা হবে তাকওয়া পরহেযগারীর অতি নিকটবর্তী ব্যাপার। আর নিজেদের

মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। আর তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই দেখছেন।' এতে তাকওয়া পরহেযগারীর অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। সংগে সংগে উদারতা বদান্যতার অনুভূতিও জাগ্রত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে সব কিছু দেখেন, সে অনুভূতিও জাগিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহই তো সর্বক্ষণ তাদেরকে নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন, সম্পর্ক পূর্ণ হোক, কি অপূর্ণ, এভাবে আচরণ করলে পরিবেশে একটা উদারতা বিরাজ করবে, পরিবেশ সুস্থ সুন্দর হবে। অন্তর হয়ে উঠবে স্বচ্ছ নির্মল নিষ্কলুষ। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

জীবন একটি অখন্ড ইউনিট

যে পরিবেশে অন্তরকে আল্লাহর সংগে সম্পৃক্ত করা হয়, যে পরিবেশে ইহসান অনুগ্রহ আর ভালো কাজকে নিজেরা এবাদাতে পরিণত করে, ঠিক সে পরিবেশে ইসলামের সবচেয়ে বড় এবাদাত নামায সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করা হয়। কোরআন মজীদ এসব আলোচনার অবতারণা থেকে নিবৃত্ত হয় না। এসব বিধান বর্ণনা থেকে বিরত থাকে না। এসব বিধানের মধ্যে রয়েছে সে স্ত্রীর বিধান, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। আলোচনা করা হয়েছে স্ত্রীর পক্ষে ওসিয়ত সম্পর্কে । সে ওসিয়ত স্বামীর ঘরে তার টিকে থাকার সুযোগ এনে দেবে, সুযোগ এনে দেবে স্বামীর সম্পদে তার জীবন ধারনের। এ প্রসংগে বিশেষভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ভরণ পোষণ দানের বিষয়টি। এবং এর সাথে নামায সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা নামাযের মতোই এবাদত। এটা মূলতঃ এবাদাতেরই পর্যায়ভুক্ত। এটা কোরআন মজীদের সূক্ষ্ম ইংগিতসমূহের অন্যতম। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের যে দর্শন তার সংগে এটা সংগতিপূর্ণ। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

'জিন এবং ইনসানকে আমি কেবল আমার এবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি'। আর এবাদাত কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল আচার-আচরণকেই এবাদাত তার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যে কাজে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা হয়, যে কাজে আল্লাহর আনুগত্যই উদ্দেশ্য, তাই-ই এবাদাত।

তোমরা তোমাদের নামাযসমূহের ব্যাপারে (গভীর) যত্নবান হও মধ্যবর্তী নামাযসহ ....তখন (ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাকে স্মরণ করার নিয়ম) শিখিয়েছেন, কিছুই তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।'

এখানে সব নামায হেফাযত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যথাসময়ে নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নামাযের আরকান ঠিকমতো আদায় করতে বলা হয়েছে, তার শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। অবশ্য মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে যতো বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে আসরের নামায। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের দিন বলেছেন,

তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায- আসর থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাদের অন্তর আর ঘরকে আগুনে পরিপূর্ণ করুন। সম্ভবত এখানে মধ্যবর্তী নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্যে যে, দুপুরে খাবার পর বিশ্রামান্তে আসরের নামাযের সময় হয় এবং কখনো কখনো আসরের নামায বাদ পড়ে যায়।

তথা বিনয়াবনত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী হচ্ছে আল্লাহর সমীপে বিনয়ের সংগে দাঁড়ানো এবং নামাযে আল্লাহর স্মরণে নিবিষ্ট চিত্তে মনোনিবেশ করা। ইতিপূর্বে তারা নামায আদায় কালে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে কথা বলতেন। এ আয়াতটি নাযিল হলে তারা জানতে পারবেন যে, আল্লাহর সমীপে বিনয়াবনত হওয়া এবং একান্তভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তার সমীপে দাঁড়ানো ছাড়া নামাযে অন্য কোনো কাজ করা যাবে না।

১. মুসলিম শরীফ

অবশ্য যখন এমন আশংকাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করে, যাতে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করার কোনো উপায় থাকে না তখনো বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে নামায আদায় করে নিতে হবে। সওয়ারীতে আরোহনকারী এবং পদব্রজে বিচরণকারী, জেহাদে নিয়োজিত ব্যক্তিও তখন নামাযে মনোনিবেশ করবে এবং অবস্থা আর পরিবেশ পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। নামাযের রুকু আর সেজদার জন্যে সংক্ষিপ্ত ইংগিত করবে। সূরা নিসায় ভয়ের নামাযের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে, এটা তার চেয়ে ভিন্ন। সেই বিবরণটি এমন অবস্থার সংগে সম্পৃক্ত, যখন সারিবদ্ধ হয়ে নামাযে দাঁড়াবার সুযোগ থাকে, তখন একদল ইমামের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, অপর দল পেছনে তাদেরকে পাহারা দেবে। অতপর দ্বিতীয় দল আবার নামায আদায় করবে আর যে দল আগে নামায আদায় করেছে, তারা এবার পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। অবশ্য আশংকা যখন বৃদ্ধি পাবে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে কার্যত তখন ইশারা ইংগিতে নামায আদায় করতে হবে। এখানে সূরা বাকারায় ইংগিতে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর। নামাযের প্রতি আল্লাহ কত বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন এ থেকে তা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের অন্তরে নামাযের গুরুত্ব বদ্ধমূল করেন। এ বিধান চরম ভীতিকর অবস্থার জন্যে। চরম ভীতির অবস্থায়ও নামায ত্যাগ করা যাবে না। এমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের যোদ্ধা নামায আদায় করবে আর তখন তার হাতে থাকবে অস্ত্র এবং মাথায় থাকবে শিরস্ত্রান এমন কঠিন মুহূর্তেও নামায আদায় করবে এ জন্যে যে, মোমেনের জন্যে নামায হচ্ছে ধাতব অস্ত্রের মতোই একটা অস্ত্র। যে ঢাল মোমেনকে রক্ষা করে সে ঢালের মতোই নামায মোমেনের জন্যে একটা হাতিয়ার। মোমেন এ অবস্থায়ও নামায আদায় করবে আর পালনকর্তার সংগে সংযোগ স্থাপন করবে। মোমেন তো আল্লাহর সংগে সম্পর্ক স্থাপনেরই বেশী মুখাপেক্ষী। মোমেন এভাবেই আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হতে পারে। ভীতিকর অবস্থায়ও মোমেনকে এভাবে আল্লাহর সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

দ্বীন-ইসলাম বিস্ময়কর কিন্তু সহজ সরল এক বিচিত্র জীবন ব্যবস্থা। তা হচ্ছে এবাদাতের রীতি নীতি। এবাদাতের অনেক রূপ চিত্র রয়েছে এতে। এসব রূপ আর চিত্রের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে নামায। নামাযের পথ ধরেই মানুষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছতে পারে। আর নামাযের পথ ধরেই মানুষ কঠোর বিপদকালে দৃঢ় হতে পারে। সুখ-স্বাচ্ছন্দকালে সুসভ্য ও পরিশীলিত হতে পারে। এবাদাতের পথ ধরেই মোমেন পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। পারে শান্তি স্বস্তিতে ধন্য ও বিভূষিত হতে। এভাবে নামাযের মাধ্যমে সে এ দানে ধন্য হতে পারে। তখন তার হাতে আর কাঁধে থাকে অস্ত্র।

যখন নিরাপত্তা অর্জিত হবে, তখন সে নামায আদায় করবে। যা করতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। আল্লাহ শিক্ষা না দিলে তারা জানতো না কিভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

'তোমরা যখন নিরাপত্তা লাভ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যা তোমরা জানতে না।' আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা না দিলে মানুষ কি করে জানতে পারতো? আল্লাহ যদি তাদের শিক্ষা না দিতেন, তাহলে সকল দিনে সকল ক্ষণে কী করে তার এবাদাত করতে হবে, মানুষ তা কিছুতেই জানতো না।

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার সংরক্ষণ

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ বিধবা স্ত্রী, জীবিত রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে যেন (তার উত্তরসূরীদের) অসিয়ত করে যান যেন তারা তার বিধবা স্ত্রীর এক বছর পর্যন্ত যাবতীয় জীবিকা ও ব্যয়ভার বহন করে- (কোনো অবস্থায়) তাকে যেন তার ভিটেমাটি থেকে বের করে না দেয়, ...এভাবেই আল্লাহ তায়ালা (দাম্পত্য জীবনেরর সাথে জড়িত) তার নির্দেশ খুলে সুস্পষ্ট করে (খুলে খুলে) বলে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝে শুনে চলতে পারো। (আয়াত ২৪০-২৪২)

প্রথম আয়াতে যে নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার অধিকার নির্ণয় করা হয়েছে। এমন স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর জন্যে ওসীয়ত করে যাওয়া, যাতে সে সুখে শান্তিতে এক বৎসর কাল স্বামীর ঘরে বসবাস করতে পারে। এ সময় সে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাবে না। অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহও করবে না, অবশ্য এটাকে যদি সে তার নিজের জন্যে কল্যাণকর মনে করে। এই প্রসংগে পূর্ববর্তী আয়াতে তাকে এ অধিকারও দেয়া হয়েছে যে, চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলেও যেতে পারে। ইদ্দত পালন করা তার জন্যে ফরয। আর এক বছর স্বামীর ঘরে অবস্থান করাটা হলো তার অধিকার। আর কোনো কোনো মোফাস্সের এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমান আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। আমাদের মতে আয়াতটিকে রহিত মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ দুটি আয়াতের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। আমরা পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করেছি। বর্তমান আয়াতটি তার জন্যে একটা অধিকার নির্ণীত করে দেয়। সে ইচ্ছা করলে এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

আর পূর্ববর্তী আয়াতটি তার উপর একটা কর্তব্য বর্তায়, যা পালন না করে তার উপায় নেই। এখানে 'আলাইকুম' শব্দটি বলে সে দলটিকে বুঝানো হয়েছে, যারা এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। এ ব্যাপারে যা কিছু ঘটবে, তার দায়িত্ব সে দলটি গ্রহণ করবে এবং এজন্যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। এরা হচ্ছে তারা যাদের সংগে এ বিষয় আর এ বিধানের সম্পর্ক, সকল বিষয় আর সকল কর্মের জন্যে যারা দায়িত্বশীল। এ এমন এক দল, যাদেরকে তার সদস্যদের দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। মুসলিম জামায়াতের আসল মূল্য এবং তার গুরুত্ব এ একটি মাত্র শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে এমন একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা এবং কোনো সদস্য তা থেকে বিচ্যুত হলে তাকে ঠিক রাখা মুসলিম জামায়াতের কর্তব্য। সদস্যদের ছোট বড় সব কাজে গোটা দলকেই দায়িত্বশীল করা। মুসলিম দলের সকল সদস্যের অনুভূতিতে এ তত্ত্ব বদ্ধমূল করার জন্যে তাকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এ দিকেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ব্যক্তি ও দলের অনুভূতিতে এ সত্য বদ্ধমূল করাই এর উদ্দেশ্য। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

'আর আল্লাহ হচ্ছেন মহান পরাক্রমশালী এবং অতি কুশলী।' আল্লাহর ক্ষমতা অন্তরে বদ্ধমূল করা এবং তিনি যা নির্ধারণ করেছেন, তাতে তাঁর যে কিছু রহস্য ও নিগুঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করানোর জন্যেই এ কথা বলা হয়েছে। এতে ভীতি প্রদর্শন আর হুমকি নিহিত রয়েছে।

আর দ্বিতীয় আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে সাধারণ অধিকার নির্ণয় করা হয়েছে। আর গোটা বিষয়টিকে তাকওয়া তথা খোদাভীতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

'আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া মোত্তাকীদের কর্তব্য।'

কোনো কোনো তাফসীরকারক এখানেও এ মত পোষণ করেন যে, পূর্ববর্তী বিধান দ্বারা এ বিধানটিও রহিত করা হয়েছে। আমাদের মতে রহিত সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে যে খরচের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সকল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে খরচ সাব্যস্ত করা। তা সে নারীর সংগে সংগম করা হোক বা না হোক। তার জন্যে মোহর ধার্য করা হোক বা না হোক। কারণ খরচ কথাটি দ্বারা তালাকের পরিবেশের যেমন ইংগিত পাওয়া যায় তেমনি এক দুঃখজনক বিচ্ছেদের জন্যেও তা মনকে প্রস্তুত করে। এই আয়াত তাকওয়া তথা খোদাভীতির অনুভূতি জাগ্রত করে আর এ খোদাভীতির সংগেই ব্যাপারটি সম্পৃক্ত। আর এ খোদাভীতি হচ্ছে সবচেয়ে এবং একমাত্র গ্যারান্টি।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত সমস্ত বিধানের পরিসমাপ্তি হিসাবে তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে,

'আর এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর (নির্ধারিত পারিবারিক জীবনের বিধান-সম্বলিত আয়াতগুলো স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পারো।'

এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতগুলো ব্যক্ত করেন, যা তোমাদেরকে তা অনুধাবন করার দিকে নিয়ে যাবে, তোমাদেরকে চালিত করবে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার দিকে। নিয়ে যাবে তার পেছনে যে গোপন রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে সেদিকে। তার অভ্যন্তরে যে দয়া আর অনুগ্রহ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, নিয়ে যাবে সেদিকে, নিয়ে যাবে তা থেকে প্রকাশ্য বা অনুভূত অপ্রকাশ্য অসংখ্য নেয়ামতের দিকে। আর সে নেয়ামত হচ্ছে সহজ করা এবং উদার করে দেয়া। আর তার সংগে রয়েছে দৃঢ়তা ও স্থিরতা। রয়েছে শান্তি স্বস্তির উপকরণ, যা জীবনকে করে তোলে ধন্য ও পুলকিত।

মানুষ যদি এ বিধানের সার্থকতা অনুধাবন করতে সক্ষম হতো আর খোদায়ী বিধান নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতো, তবে তাদের অবস্থা আজ হতো অনেক উন্নত গতিশীল ও প্রাণবন্ত। তাদের অবস্থা হতো আনুগত্য আত্মসমর্পণ আর পরিতুষ্টি ও মেনে নেয়ার। তখন তাদের চিত্তে বিরাজ করতো অনাবিল শান্তি স্বস্তি।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا قف ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ص وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ
إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ م إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ط قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

রুকু ৩২

২৪৩. তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, তাদের (এ কাপুরুষোচিত আচরণে রুষ্ট হয়ে) আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও, (এক সময় তাদের বংশধররা সাহসিকতার সাথে যালেমের মোকাবেলা করলো)। আল্লাহ তায়ালাও এর পর তাদের (সামাজিক ও রাজনৈতিক) জীবন দান করলেন; আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের সাহসী) মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। ২৪৪. (অতএব হে মুসলমানরা, কাপুরুষতা না দেখিয়ে) তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং (এ কথা) ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা (যেমন সব) শোনেন, (তেমনি) তিনি সব কিছু জানেনও। ২৪৫. (তোমাদের মধ্য থেকে) কে (এমন) হবে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, (যে কেউই আল্লাহকে ঋণ দেবে সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা (ঋণের সে অংক) তার জন্যে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কাউকে ধনী আবার কাউকে গরীব করেন, (আর সব শেষে) তোমাদের (ধনী গরীব) সবাইকে তো একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ২৪৬. তুমি কি বনী ইসরাঈল দলের কতিপয় নেতা সম্পর্কে চিন্তা করোনি? যখন তারা মূসার আগমনের পর নবীর কাছে বলেছিলো, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যেন (তার সাথে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি; (আল্লাহর) সে নবী (তাদের) বললো, তোমাদের অবস্থা আগের লোকদের মতো এমন হবে না তো যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের লড়াইর আদেশ দেবেন এবং তোমরা লড়াই করবে না, তারা বললো, আমরা কেন আল্লাহর পথে লড়বো না, (বিশেষ করে

وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ

قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ

أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ

تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

যখন) আমাদের নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে, (বের করে দেয়া হয়েছে) আমাদের ছেলে মেয়েদেরও, অতপর যখন (সত্যি সত্যিই) তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় (সাহসী) বান্দা ছাড়া অধিকাংশই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন। ২৪৭. তাদের নবী তাদের বললো, আল্লাহ তায়ালা তালুতকে তোমাদের ওপর বাদশাহ (নিযুক্ত) করে পাঠিয়েছেন; (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার কি অধিকার আছে আমাদের ওপর রাজত্ব করার? বাদশাহীর অধিকার (বরং) তার চাইতে আমাদেরই বেশী রয়েছে, (তাছাড়া) অর্থ প্রাচুর্যও তো তার বেশী নেই; আল্লাহর নবী বললো, (শাসন ক্ষমতার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা তাকেই বাছাই করেছেন এবং (এ কাজের জন্যে) তার শারীরিক যোগ্যতা ও জ্ঞান (প্রতিভা) আল্লাহ তায়ালা বাড়িয়ে দিয়েছেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর রাজক্ষমতা দান করেন; তাঁর ভান্ডার অনেক প্রশস্ত, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই রাজত্ব দেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও মহাবিজ্ঞ। ২৪৮. তাদের নবী তাদের (আরো) বললো, (আল্লাহ তায়ালা যাকে পাঠাচ্ছেন) তার বাদশাহীর অবশ্যই একটা চিহ্ন থাকবে এবং তা হচ্ছে, সে তোমাদের সামনে (হারানো) সিন্দুকটি এনে হাযির করবে, এতে তোমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে (সান্ত্বনা ও) প্রশান্তির বিষয় থাকবে, (তাছাড়া) এ (অমূল্য) সিন্দুকে মূসা ও হারূনের পরিবার পরিজনের কিছু রেখে যাওয়া (জিনিসপত্রও) থাকবে, (আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে) তাঁর ফেরেশতারা এ সিন্দুক তোমাদের জন্যে বহন করে আনবে, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো তাহলে (তোমরা দেখবে), এসব কিছুতে তোমাদের জন্যে (এক ধরনের) নিদর্শন রয়েছে।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ

بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ

قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ

اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ

اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

রুকু ৩৩

২৪৯. (রাজত্ব পেয়ে) তালুত যখন নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলো, তখন সে (তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা একটি নদী (-র পানি) দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এর পানি পান করে তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি তা খাবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তার হাত দিয়ে সামান্য এক আঁজলা (পানি খেয়ে) নেয় তা ভিন্ন কথা, অতপর (সেখানে গিয়ে) হাতেগোনা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃপ্তিভরে পানি পান করে নিলো; এ কয়জন লোক– যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো, তারা এবং তালুত যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা (নিজেদের দীনতা দেখে) বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই; (এ সময় তাদেরই সাথী বন্ধুরা) যারা জানতো তাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। ২৫০. তারপর (যখন) সে তার সৈন্য নিয়ে (মোকাবেলা করার জন্যে) দাঁড়ালো, তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদম অটল রাখো এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো; ২৫১. লড়াইয়ের ময়দানে তারা তাদের পর্যুদস্ত (লাঞ্ছিত) করে দিলো এবং দাউদ আল্লাহর সাহায্য নিয়ে জালুতকে হত্যা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করলেন এবং তাকে (রাজক্ষমতা চালানোর) কৌশলও শিক্ষা দিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ

وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

ইচ্ছামতো আরো (বহু) বিষয়ের জ্ঞান দান করেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখন্ড ফেতনা ফাসাদে ভরে যেতো, কিন্তু (আল্লাহ তায়ালা তা চাননি, কেননা) আল্লাহ তায়ালা এ সৃষ্টিকুলের ওপর বড়োই অনুগ্রহশীল! ২৫২. (এ কেতাবে বর্ণিত) এসব ঘটনা হচ্ছে আল্লাহর এক একটা নিদর্শন (মাত্র), যা যথাযথভাবে আমি তোমাকে শুনিয়েছি (এর কোনো ঘটনাই তো তুমি জানতে না); তুমি অবশ্যই আমার পাঠানো (নবী) রসূলদের একজন!

তাফসীর

আয়াত ২৪৩-২৫২

এই অধ্যায়ের আয়াত এবং এতে আলোচিত ঘটনা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন আমরা তখনই করতে পারবো, আমরা যখন কোরআনকে গতানুগতিকভাবে না পড়ে একটু ভিন্নভাবে পড়ার চেষ্টা করবো। আমরা যদি আমাদের মনে এই বিশ্বাসটিকে একেবারে বদ্ধমূল করে নেই যে, কোরআনই হচ্ছে মানব জাতির জন্যে সঠিক ও একমাত্র পথপ্রদর্শক, তাহলেই আমরা আলোচিত বিষয়টিকে যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করতে পারবো। কেননা কোরআনই হলো সেই পাঠশালা যেখান থেকে মুসলিম উম্মাহ তার জীবনের পাঠ নেবে।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে মুসলিম জামায়াতটিকে বাছাই করে নিয়েছিলেন তাদের তিনি কোরআনের মাধ্যমেই এই মহান দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। কোরআনী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সম্পূর্ণ যোগ্য করে তুলেই তিনি তাদের ওপর এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তা হলো আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যে, রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর যুগে যুগে অনুকূল প্রতিকূল সকল পরিবেশে কোরআনই যেন তাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। মুসলিম উম্মাহ যেন কোরআনের আদর্শে উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত হয়ে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে। মানবতার কল্যাণে সঠিক ভূমিকাটি যেন মুসলিম উম্মাহ যথাযথভাবে পালন করতে পারে এবং মানবজাতিকে যেন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত করতে পারে, এটাই ছিলো তার একমাত্র লক্ষ্য।

কোরআনকে মুসলমানদের খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। কেননা মুসলিম উম্মাহকে মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে বসানোর যে ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা করেছেন তা ততোক্ষণই কার্যকর থাকবে যতোক্ষণ তারা কোরআনকে নিজেদের জীবনব্যবস্থা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেবে। কোরআনের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে জানবে, জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্যে তারা কোরআনের কাছেই হাযির হবে এবং জাহেলিয়াতনির্ভর প্রচলিত সকল মানব রচিত জীবন ব্যবস্থাকে পায়ে দলে কোরআনের জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

কোরআন শুধু সূর করে পড়ার কোনো কেতাব নয়, এটি একটি সর্বাত্মক জীবন ব্যবস্থা। জীবনকে সুন্দর সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে কোরআন প্রয়োজনীয় সকল প্রশিক্ষণের মূলনীতি ও বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি। কোরআন মানব ইতিহাস থেকে অনেক ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছে যাতে করে এই গ্রন্থ যে প্রশিক্ষণ দানের জন্যে এসেছে মুসলমানরা তার প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশিকা এর মধ্যে খুঁজে পেতে পারে। এ পর্যায়ে কোরআন হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত ঈমানী দাওয়াত দানের অভিজ্ঞতা ও অনেক রক্তরঞ্জিত ইতিহাস পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে। অন্য কিছু নয়, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যুগে যুগে দ্বীনের পতাকাবাহীরা যেন কোনো ধরনের প্রতিকুল পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে ঘাবড়ে না যায়। এই সমস্ত ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, পাথেয় সঞ্চয় করে তারা যেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে। কোরআনের উপস্থাপিত এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে যেমন রয়েছে বাস্তব জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারণের দিক নির্দেশনা, তেমনি রয়েছে মনস্তাত্বিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ। এতো ঘটনা এতো অভিজ্ঞতার সমাহার কোরআন এ কারণেই করেছে যে, মুসলিম উম্মাহ যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতনতার সাথে সত্যের ওপর টিকে থাকতে পারে।

এই প্রয়োজনে কোরআন অনেক ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন আংগিকে বর্ণনা করেছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী বিস্তারিতভাবে এসেছে বনী ইসরাইলের ইতিহাস। এর অনেক যৌক্তিক কারণও আছে। যার কিছু কিছু আমি প্রথম পারায় বনী ইসরাইলের আলোচনার শুরুতে পেশ করেছি। আরো কিছু কারণ বিভিন্ন জায়গায় প্রসংগক্রমে আলোচনা করেছি। এখানে আমি এমন একটি কারণ উল্লেখ করতে চাচ্ছি যা আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড়ো ও উল্লেখযোগ্য। কারণটি হলো, আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন যে, ঈমান আকীদার ব্যাপারে বনী ইসরাইলরা যেমন বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা, ফেরকা ও ঈমান আকীদা বিধ্বংসি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলো তেমনিভাবে উম্মতে মুসলিমাহও বিভিন্ন যুগে এমন কিছু ক্রান্তিলগ্ন, এমন কিছু সংকটময় সময়, এমন কিছু ঈমান আকিদা বিধ্বংসি ফেৎনার মুখোমুখি হবে, যা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এই ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু দিক নির্দেশনা তার জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। তখন যেন তারা এই সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করে হকের ওপর টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ সেখান থেকে খুঁজে নিতে পারে। এই জন্যেই কোরআন ইতিহাসের আলোকে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরে, যাতে সে স্বয়ং আল্লাহর তুলে ধরা আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবিটা দেখে নিতে পারে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আগেই সে যেন সে নিজের করণীয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারে। বনী ইসরাইলীরা যেমন পথভ্রষ্ঠ হয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজালে পা জড়িয়ে সত্যবিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো তেমন দুরাবস্থা যেমন এই উম্মাহর ভাগ্যলিপি না হয়– সে জন্যেই কোরআন আমাদেরকে বারবার ইতিহাসের পাতা থেকে ঘুরিয়ে আনে। চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কোনটা হক-কোনটা বাতিল, কোনটা সত্য-কোনটা মিথ্যা, কোনটা গ্রহণীয়-কোনটা বর্জনীয়।

কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যাকে সকল যুগের সকল পরিবেশে মুসলমানরা প্রয়োজনীয় সকল পথ নির্দেশের জন্যে অধ্যয়ন করবে। সব সময় মনে রাখতে হবে, কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থ, কোরআন চির নতুন। কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সকল যুগের, সকল পরিবেশের, সকল সমস্যার এমন বলিষ্ঠ সমাধান দেয় যে, মনে হয় যেন এটি এই মাত্র নাযিল হয়েছে এবং এই সমস্যাটির

সমাধান দেয়ার জন্যেই নাযিল হয়েছে। কোরআন আজকের সমস্যার সমাধান যেমন বলিষ্ঠভাবে করে আগামী দিনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও প্রদান করে। কোরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, সুমধুর-সুললিত কণ্ঠে পাঠ করাই যথেষ্ঠ। কোরআন এমন কোনো অথর্ব ইতিহাসের জঞ্জালে ভরা কোনো কেতাব নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। না এটা কোনো অতীতের থ্রিলিং গল্পের সমাহার।

কোরআন তখনই আমাদের সামনে তার সঠিক ভাবমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে যখন আমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে আমাদের জীবন সমস্যা সমাধানের জন্যে কোরআন অধ্যয়ন করবো, কোরআনের কাছে হাযিরা দেবো। মুসলিম জমায়াতের প্রথম সেই মহান দলটি যেমন জীবন সমস্যার ঐশী সমাধান খুঁজতে কোরআনের আয়াত থেকে আয়াতে ঘুরে ফিরতেন, যেভাবে তারা এ থেকে চির নতুন পথ নির্দেশিকা নিয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করতেন– ঠিক তাদের মতো মানষিকতা নিয়ে যখন আমরা কোরআন অধ্যায়ন করবো তখনই কোরআন আমাদের সামনে তার জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে ধরবে, তখনই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, সকল দিক নির্দেশনা কোরআনের পাতায় খুঁজে পাবো। এমন সব আশ্চর্যজনক তথ্য কোরআনের পাতায় আবিষ্কৃত হবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। একমাত্র এভাবে পাঠ করলেই আমরা দেখবো কোরআনের অক্ষর শব্দ সবই জীবন্ত এবং তা সক্রিয়ভাবে আমাদের জীবন চলার সকল পথ নির্দেশ দান করে যাচ্ছে। কোরআন সরাসরি আমাদের বলে দিচ্ছে, এটা করো, এটা করো না, এই তোমাদের দুশমন এই তোমাদের বন্ধু। আমাদের বুঝিয়ে দেবে কোন স্তরে কোন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কোন সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের কী প্রস্তুত রাখতে হবে। আমাদের সকল কাজকর্মে সকল ক্ষেত্রে কোরআন আমাদের স্পষ্ট দিক নির্দেশ দেয়। এ সকল অবস্থা সামনে রেখে আমরা যখন কোরআনের দারস্থ হবো তখনই আমরা দেখতে পাবো যে, কোরআনে শুধু জীবনোপকরণ নয় বরং গোটা জীবনই নিহীত রয়েছে তার মধ্যে। সত্যি কথা হচ্ছে, তখনই আমরা আল্লাহর বাণীকে যথাযথ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

'হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে নতুন জীবন দানের দিকে ডাকে (সূরা আল আনফাল, ২৪)।

আসলে এটাই হচ্ছে জীবনের দাওয়াত। অনন্ত জীবনের দাওয়াত, নতুন জীবনের দাওয়াত। তাও আবার এমন কোনো জীবন নয় যার বিচরণ ইতিহাসের কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ।

এই আয়াতগুলোতে অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলীর মধ্যে অভিজ্ঞতাপূর্ণ দুটো ঘটনা তুলে এনে মুসলিম উম্মাহর অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে তার ওপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যুগে যুগে যেসব সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে, যে কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হবে তার জন্যে কোরআন প্রস্তুত করে। এসব প্রেক্ষাপটে সঠিক নির্দেশনা কি তা জানিয়ে দেয়। কেননা ঈমানী আকীদা ও দ্বীনের ময়দানে এরাই তো এসব অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী।

আলোচিত ঘটনা দুটির প্রথমটির বর্ণনা দিতে গিয়ে কোরআন বলে দেয় না যে, এই অভিজ্ঞতা কারা অর্জন করেছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করা হলেও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যে ঘটনাটি যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটি এমন একটি দলের ঘটনা যাদের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে বলা হয়েছে,

'মৃত্যু ভয়ে যারা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো অথচ তারা সংখ্যায় ছিলো হাজার হাজার।'

কিন্তু তাতে কী লাভ হয়েছে? এই মৃত্যুভয় তাদের কোনো উপকারেও আসেনি, আবার তাদের এই ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়াও আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেনি, আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাদের ঠিকই গ্রেফতার করে নিয়েছে।

'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের (এই কাপুরুষোচিত আচরণে রুষ্ঠ হয়ে) বললেন, নিপাত হয়ে যাও তোমরা। তারপর তিনি আবার তাদের জীবন দান করলেন'

যে বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তা হলো, মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা তাদের কোনোই কাজে আসেনি। আবার জীবন ফিরে পাওয়ার ব্যাপারেও তাদের কারো কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না। উভয় অবস্থায় চূড়ান্তভাবে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে। কোরআন এই অভিজ্ঞতাপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে ঈমানদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধন সম্পদ ও জীবনকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতে তাদের উৎসাহিত করে। জীবন ও সম্পদের মোহে বিভোর মানুষের মস্তিস্কে সজোরে আঘাত করে বলে– এই জীবন এই সম্পদ তো তিনিই দিয়েছেন এবং যে কোনো মুহূর্তে তা তিনি ছিনিয়ে নিতেও পূর্ণ সক্ষম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে বনী ইসরাইল জাতির। এটি হযরত মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পরের ঘটনা। বনী ইসরাইলরা তখন তাদের সম্মান নেতৃত্ব সবকিছু হারিয়ে একান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলো। দুশমনরা তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে তারা অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন কাটাচ্ছিলো। এর কারণ একমাত্র এটাই ছিলো যে, তারা তাদের রবের দেয়া পথনির্দেশনা ও নবীদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো। অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে সইতে এক পর্যায়ে গিয়ে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা অনুধাবন করতে পারে যে এই মানবেতর জীবন জগদ্দল পাথরের মতো কেন তাদের ওপর চেপে বসেছে, তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, পাপ-পংকীলতার পর্দা ভেদ করে তাদের অন্তরের সুপ্ত ঈমান আকিদা আবার জেগে ওঠে। তারা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে নতুন উদ্যোমে আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের অন্তরে জেহাদের জযবা জেগে ওঠে।

'যখন তারা তাদের নবীর কাছে দাবী জানিয়েছিলো যে, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যেন তার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করতে পারি'

হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোরআনের এই বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে অনেক বাস্তব সত্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। এর মধ্যে রয়েছে সকল যুগের মুসলিম উম্মাহর জন্যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। যাদের সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে সেই মুসলিম জামায়াতের প্রথম দিকের সৌভাগ্যবান দলটির জন্যেও রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক কিছু।

এই পুরো ঘটনাটি মন্থন করলে যে শিক্ষণীয় বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হলো তারা তাদের মৃত আকীদাকে সঞ্জীবিত করা ও সুপ্ত ঈমানকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে অসাধারণ এক সাফল্য লাভ করেছিলো। অথচ ইতিপূর্বে পরীক্ষার সময় তাদের অলসতা, অবাধ্যতা, যুদ্ধের ডাকে পিছটান, দলে দলে বিভক্ত হয়ে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস কারোই অজানা নয়, এইসব আলসেমী দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে যখন তারা ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে বলিষ্ঠভাবে দ্বীনের ঝাণ্ডাকে উঁচুতে তুলে ধরেছে, তখনই এই অসাধারণ সাফল্য এসে তাদের হাতে ধরা দিয়েছে।

শত্রুদের কাছে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও দীর্ঘ বিপর্যস্ত জীবন কাটানোর পর ঈমানের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর পথে জেহাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই আল্লাহ তায়ালা তাদের এই বিজয় দান করেছেন। এই বিজয়ের সূত্র ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর সুবিশাল রাজত্ব। এ সময় বনী ইসরাইলের সম্রাজ্য ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সমাজ। এটা ছিলো তাদের ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়। তাদের এই অবিস্মরণীয় উন্নতি অগ্রগতির কথা ছিলো মানুষের মুখে মুখে। এটা ছিলো সফলতার এমন এক শীর্ষচূড়া, যেখানে স্বয়ং মুসা (আ.) থাকতেও তারা পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলো না। অধপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া সত্তেও একমাত্র ঈমান-আকিদার পুনর্জাগরণ ও আল্লাহর পথে দৃঢ়তার ফলেই জালুতের বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের এই অবিস্মরণীয় বিজয় সম্ভব হয়েছিলো ।

এই মৌলিক শিক্ষা ও উপদেশ ছাড়াও এমন কিছু খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে যার মধ্যে সকল যুগের মুসলিম উম্মাহর জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে।

এর একটি হলো এই, শুধুমাত্র জযবা, উৎসাহ উদ্দীপনার ওপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশী। মনে রাখতে হবে জোশের সাথে হুঁশও অপরিহার্য্য।

এজন্যে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতিকে আল্লাহর পথনির্দেশ ও রসূলের আদর্শের নিরীখে বিশ্লেষণ করে, জনবল, অস্ত্রবল ও দলীয় বীরত্বের অহমিকাবোধ ঝেড়ে ফেলে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঘটনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, বনী ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের নবীর কাছে এসে এমন একজন নেতা তাদের জন্যে নির্বাচিত করতে বললেন যার নেতৃত্বে তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে দুশমনরা তাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলো, যারা মুসা ও হারুন (আ.)-এর স্মৃতিচিহ্নটুকুও লুটে নিয়েছিলো, যারা তাদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তাদের তদানিন্তন নবী তাদের কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে তাদের বললেন–

'এমন তো হবে না যে, তোমাদের ওপর যখন যুদ্ধ ফরয করা হবে তখন তোমরা বলবে যে, আমরা যুদ্ধ করবো না।'

একথা শুনে তাদের জযবা আরো বেড়ে গেলো। তারা বললো–

'(তা কি করে সম্ভব!) এমন কী হলো আমাদের যে, আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পর এবং ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা করে দেয়ার পরও আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না?'

কিন্তু ইতিহাসের যে ধারা আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো– এই বক্তব্যের সাথে তার যোজন যোজনের দুরত্ব বিদ্যমান। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই তাদের এই জযবা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, তাদের ঈমানী চেতনাও মরে গেলো। দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে তারা পথভ্রষ্টতার বিনিময়ে ঈমান আকীদাকে বিকিয়ে দিলো। ঘটনার এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টি কোরআনের আয়াতে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে

'অতপর যখন (সত্যি সত্যিই) তাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো তখন সামান্য সংখক (মোমেন) ছাড়া অধিকাংশই পালিয়ে গেলো।'

যদিও চুক্তি ভংগ করা, ওয়াদা খেলাফ করা, জেহাদে রওয়ানা দিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে আসা সহ আরো নানা ধরনের অবাধ্যতায় বনী ইসরাইলের জুড়ি ছিলো না, তথাপিও ঈমানী প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে আত্মাকে চূড়ান্তরূপে পরিশুদ্ধ করে না নিতে পারলে এমন দুর্বলতা এমন পরিস্থিতির শিকার যে কোনো যুগের মুসলিম উম্মাহই হতে পারে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই দুর্বলতাকে দূর করতে না পারলে মুসলিম নেতৃত্বকে যুগে যুগে এই ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আশংকাকে মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং ঘটনাটি সামনে রেখে মুসলমানরা শিক্ষণীয় অনেক কিছুই গ্রহণ করতে পারে।

এই ঘটনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আরো একটি বিষয় বুঝা যায় এবং তা হচ্ছে, মুসলিম জামায়াতের উৎসাহ ও বীরত্বকে ঈমানের কষ্ঠিপাথরে একবার নয় বারবার যাচাই করে নেয়া দরকার। কেননা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বনী ইসরাইল জোশের সাথে অনেক উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা বলেছিলো। তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছিলো। কিন্তু সামান্য কিছু সংখ্যক আল্লাহর সাহসী বান্দা ছাড়া তাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো, যুদ্ধের ময়দান ও ঈমান একীনের সঠিক পথ ছেড়ে পালিয়েছিলো। এমনকি এই পর্যায়ে উন্নীত ঈমানদারদের অবস্থাও খুব একটা সুখকর ছিলো না, তারাও যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলো না। ফেরেশতার মাধ্যমে তাদের নবীদের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত ঐতিহাসিক সিন্দুক এনে দেখানোর পর যখন তারা বুঝতে পেরেছিলো যে তারা আল্লাহ তায়ালাকর্তৃক বিশেষভাবে বাছাই করা দল তখনই তারা তালুতের সাথে যুদ্ধের জন্যে বেরিয়েছিলো।

এখানেই শেষ নয়, পরবর্তী পরীক্ষায় এদেরও একটা বিরাট অংশ ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের দলে গিয়ে শামিল হলো। এই পরীক্ষায় এদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা দুর্বলতাও প্রকাশ হয়ে পড়লো। ঘটনার এই পর্যায়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই কোরআন বলছে,

'তালুত সেনাবাহিনী নিয়ে যখন এগিয়ে গেলো তখন (কিছুদূর গিয়ে) বললো, আল্লাহ তায়ালা একটি নদীর পানি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যে এই নদীর পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে পান করবে না সেই আমার সাথে থাকতে পারবে। তবে সামান্য এক আজলা যদি কেউ খায় তবে সেটা ভিন্ন কথা। অতপর দেখা গেলো যে, সামান্য সংখ্যক লোক ছাড়া সবাই তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলো।'

কিন্তু হাতে গোনা এই সামান্য সংখ্যাটাও শেষ পর্যন্ত টিকলো না। তারাও পরীক্ষার স্তরগুলো পার হয়ে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারলোনা। জীবনের মায়া, শত্রুপক্ষের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য দেখে যুদ্ধে যাওয়ার আগেই তারা হেরে গেলো, মৃত্যু ভয়ে মরার আগেই তারা মরে গেলো। ঘটনার এই পর্যায়টি কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে,

'অতপর যখন সে (তালুত) এবং তার সাথের ঈমানদাররা নদী পার হয়ে গেলো তখন তারা বলে উঠলো, 'এই মুহূর্তে জালুত ও তার বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি সামর্থ তো আমাদের নেই'।

এই পর্যায়ে এসেই আমরা দেখতে পাই ঈমানের পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উন্নীত মোমেনদের সংখ্যা নগন্য হলেও তাদের সাথীদের পিছুটান দেখেও তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঈমানের ওপর টিকে থাকলো। সফলতার সাথে সকল পরীক্ষায় উন্নীত এই মোমেনরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বললো,

'(ইতিহাসে এমন অনেকবার দেখা গেছে যে,) আল্লাহর ইচ্ছায় কতো ক্ষুদ্র দলও বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর বিজয়লাভ করেছে, আল্লাহ তায়ালা (সব সময়) ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।'

এই ক্ষুদ্র দলটির ঈমানী দৃঢ়তার কারণেই ইতিহাসের সফলতার পাল্লা এদের দিকে ঝুকে পড়েছে। এই ক্ষুদ্র দলটিই আল্লাহর সাহায্যে বিজয় ও সম্মানের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলিম উম্মাহর জন্যে ঈমানদার, বিচক্ষণ ও দুরদর্শী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। তালূতের নেতৃত্বের মধ্যে এই সব কয়টি গুণাবলীই আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই। বাহ্যিক জোশ, জযবা, তেজস্বীতা বা বীরত্ব দেখে প্রতারিত না হয়ে তিনি তাদেরকে বারবার পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। একবার পরীক্ষা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বারবার পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। সম্মুখ লড়াইয়ের আগেই তিনি তার সৈন্যদের ঈমানী দৃঢ়তা ও আনুগত্যের বিষয়টি বারবার যাচাই করে নিচ্ছেন এবং যাদের ভেতরই দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাদেরকে তার সেনাবাহিনী থেকে আলাদা করে দিচ্ছেন। একবার নয় বারবার। সত্যিই তার দুরদর্শি নেতৃত্বের বিচক্ষণতাও বিশেষভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তিনি কোনো অবস্থাতেই দুর্বলতা কিংবা পিছুটানের স্বভাবকে প্রশয় দিতে রাযি নন। অথচ প্রতিটি পরীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে তার সৈন্য সংখ্যা কমেই চলেছে। শেষ পর্যন্ত হাতে গোনা খুবই নগন্য সংখ্যক লোক তার সাথে টিকে থাকলো। সংখ্যায় কম হলেও মূলত এরাই সত্যিকার ঈমানের বলে বলিয়ান, ঈমানের ধনে ধন্য। এই স্বল্প সংখ্যক খালেস ঈমানদারদের ঈমানী শক্তি নিয়ে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে তালুত বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন।

সর্বশেষ আরো একটি মূলবান শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা হলো এই যে, বস্তুগত সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে মহান রব্বুল আলামীনের সাথে যে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে হৃদয়ের দৃষ্টিভংগি চিন্তা চেতনা সব কিছুতেই এক আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। তুচ্ছ ও সীমিত ছোটোখাটো ঘটনাকে সে এমন দৃষ্টিভংগি নিয়ে প্রত্যক্ষ করে যা তার কাছে ছোটো-বড়ো নিরবিচ্ছিন্ন সকল ঘটনাকে অদৃশ্য জগতের মহানিয়ন্তার সাথে মিলিয়ে দেয়। যে দৃষ্টি জড়বাদী সীমারেখা ছিন্ন করে সকল কিছুকে মহাজাগতিক মহাসত্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। এই দৃষ্টি তাকে ক্ষুদ্র সীমিত ঘটনার পেছনে লুকায়িত আসল নিয়ন্ত্রক সত্তার সাথে মিলিয়ে দেয়।

সুতরাং ঈমানের বলে বলিয়ান যে ক্ষুদ্র মোমেন দলটি শেষ পর্যন্ত দৃঢ়পদে ঈমানকে আকড়ে ধরে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ের পাল্লা তাদের দিকেই ঝুকে পড়ে। বাহ্যিকভাবে নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা, শত্রুদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য তাদের মতোই দেখছিলো, যারা বলেছিলো,

'এই মুহূর্তে জালুতের বাহিনীর সাথে লড়াই করার সামর্থ আমাদের নেই।'

কিন্তু তারা শুধু এই বাহ্যিক দৃষ্টিভংগি দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, তাদের সিদ্ধান্ত ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন, তারা বলেছিলো,

'আল্লাহর ইচ্ছায় কতো ক্ষুদ্র দল বিশাল বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করেছে, আল্লাহ তায়ালা সব সময় ধৈর্য্যধারণকারীদের সাথেই থাকেন।'

এরপর তারা তাদের মালিকের দরবারে দোয়া করেছিলো,

'হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দাও। দুশমনদের মোকাবেলায় আমাদের পদযুগলকে অটল রাখো আর কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের সাহায্য করো।'

তারা সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, কাফেরদের হাতে নয় সকল শক্তি একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতেই নিয়ন্ত্রিত, এ জন্যে তারা সেই আল্লাহর কাছেই সাহায্যের দরখাস্ত করেছিলো। তারা সেই সত্ত্বার দরবারেই হাত তুলেছিলো যিনি তাদের একমাত্র মালিক এবং দিতে চাইলে একমাত্র তিনিই কিছু দিতে পারেন। হৃদয় যখন ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, অদৃশ্যজগতের মহাসত্যের সাথে যখন তার সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন সকল কাজ কর্ম চিন্তা-চেতনা দৃষ্টিভংগি সবকিছুই এভাবে আমুল পরিবর্তন হয়ে যায়। এই বিশ্লেষণের আলোকে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, কোনো পরিস্থিতিকে দৃষ্টিগোচর ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেয়ে চির প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর ওয়াদার ওপর নির্ভর করে পরিপূর্ণ ঈমানী দৃষ্টিভংগী নিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পদক্ষেপ নেয়াটাই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

আলোচিত ঘটনা থেকে সামান্য কিছু শিক্ষণীয় ইংগিত নিয়ে আলোচনা করে কোরআনের দৃষ্টিভংগিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি জানা যায় তা হলো, কোরআনের সাথে একজন পাঠকের হৃদয়ের সম্পর্কের গভীরতার ওপর নির্ভর করে কোরআন তার জ্ঞানভাণ্ডারের কতোটুকু তার সামনে তুলে ধরবে এবং কাকে সে কতোটুকু দেবে। যে হৃদয়ের সাথে কোরআনের সম্পর্ক যতো গভীর কোরআন তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা মোজেযা ততোটাই তার সামনে প্রকাশ করে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে যে পর্যায়ে যতোটুকু দরকার কোরআন ততোটুকু জ্ঞানই তাকে দান করে।

দৃষ্টিভংগীর আমুল পরিবর্তন

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমরা এই অধ্যায়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করবো।

'তুমি কি ভেবে দেখেছো তাদের কথা যারা মৃত্যু ভয়ে .... অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।'

এই হাজার হাজার সংখ্যার লোক কারা ছিলো যারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাচ্ছিলো? কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলো তারা, এটা কোন যুগের ঘটনা? এ ব্যাপারে মোফাসসেররা অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আমি এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে মাথা ঘামানোর পক্ষপাতি নই। কেননা এসব বিষয় সম্পর্কে জানা যদি আমাদের খুব বেশীই প্রয়োজন হতো তবে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তা বর্ণনা করে দিতেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা অনেক ঘটনাই তো কোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার স্থান বা সময় বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়, এখানে উদ্দেশ্য হলো ইতিহাসের আলোকে মুসলিম উম্মাহকে কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ ও বস্তুনিষ্ঠ দিকনির্দেশনা দান এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে ঘটনার স্থান বা সময় বর্ণনা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করার মধ্যে বাড়তি কোনো ফায়দাও নেই।

মূলত এর উদ্দেশ্য হলো জীবন মৃত্যু এবং এর মধ্যকার দৃষ্টিগোচর ও অদৃশ্য জগত সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভংগী বিশুদ্ধ করা। মানুষের সামনে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, জীবন মৃত্যুর বিষয়টি সেই সত্ত্বা, সেই শক্তির ওপরে ছেড়ে দেয়াই শ্রেয় যার ক্ষমতা সৃষ্টি জগতের সর্বত্র প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে, যে শক্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর ফয়সালাকে প্রতিটি মানুষের সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া উচিৎ এবং প্রত্যেকের ওপর আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিৎ। কেননা জীবন মৃত্যুসহ সকল ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই-ই হবে, তবে জবাবদিহি করতে হবে

ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে। মৃত্যুভয় কখনো কারো উপকারে আসে না। ভয়ভীতি জীবনে কোনো কল্যাণও বয়ে আনতে পারে না। একটি মুহূর্ত এই জীবনের সময়সীমাকে বাড়িয়ে দিতে পারে না, পারে না আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তকে ঘুরিয়ে দিতে। যিনি জীবন দিয়েছেন তিনিই ফিরিয়ে নেবেন। এই দেয়া এবং নেয়া উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা মেহেরবান দয়ালু। উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর অদৃশ্য ক্ষমতা কার্যকর। জীবন মৃত্যু, জীবন দেয়া-জীবন নেয়া উভয়ের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত এবং উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণকামী।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।'

আলোচিত ঘটনায় তারা যেভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো এই ধরনের ধৈর্যহীনতা, অস্থিতিশীলতা এবং হা হুতাশ– যে কোনো যুগেই মানুষের মাঝে দেখা যেতে পারে। হতে পারে এই পলায়ন শত্রুভয়ে কিংবা আল্লাহর কোনো গযব থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে; কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, এসব চেষ্টা তদবীর কখনোই কাউকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না, পারে না একটি মুহূর্ত মৃত্যুক্ষণকে বিলম্বিত করতে।

'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন,

নিপাত হয়ে যাও তোমরা।

আল্লাহ তায়ালা কথাটা কিভাবে তাদের বলেছেন? মৃত্যুভয়ে পলায়নের কারণেই মৃত্যু তাদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে? নাকি অন্য কোনো কারণে যা তারা চিন্তাও করেনি ......।

এগুলো ভেবে সময় নষ্ট করা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। এগুলোর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা দেননি। কেননা যে শিক্ষণীয় বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে ঘটনাটির অবতারনা করা হয়েছে, তার সাথে এসব বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। যে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহকে বুঝানোর জন্যে ইতিহাসের এই অধ্যায়টি কোরআনের পাতায় তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে– হা হুতাশ, ভয় ভীতি, শংকা, পলায়নপর মনোভাব কোনো কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। এর মাধ্যমে কখনোই আল্লাহর ফয়সালা রহিত হয়ে যায় না।

সুতরাং এইভাবে আল্লাহর উপর এই নির্ভরতা ছেড়ে না দিয়ে যদি তারা ধৈর্যের সাথে তাঁর ওপর ভরসা করে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে দৃঢ়তার সাথে বলিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতো সেটাই তাদের জন্যে কল্যাণকর হতো।

'অতপর আল্লাহ তাদের পুনরায় জীবন দান করলেন।'

এটা কিভাবে হলো? আল্লাহ তায়ালা কি তাদের মৃতাবস্থা থেকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন? নাকি তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন জাতির উদ্ভব করেছিরেন যারা ছিলো জীবনী শক্তিতে উজ্জীবিত, যারা অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা প্রদর্শন করেনি বা হা হুতাশ করেনি।

এরও কোনো বিস্তারিত জবাব আল্লাহ তায়ালা দেননি। গতানুগতিক অনেক তাফসীরের মতো আমরা এই ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করতে রাযি নই। এমন ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী আর রূপকথার গোলক ধাধায় ঘুরপাক থেকে চাই না যার কোনো সহীহ সনদ কিংবা দলীল প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। এটা না করে, আমরা যদি কোরআনের এই ঘটনা তুলে ধরার পেছনে যে তাৎপর্য নিহিত এবং এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে সেটাই হবে আমাদের জন্যে অধিক কল্যাকর, আর তা হলো এই যে, তাদের বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মৃত্যু দিয়েছেন তখন কোনো কলাকৌশল চেষ্টা-প্রচেষ্টা কিছুই তাদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেনি।

অস্থিরতা বা হা হুতাশ– কখনো আল্লাহর সিদ্ধান্তকে টলাতে পারে না। পারে না মৃত্যু থেকে জীবন রক্ষা করতে। জীবন একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছায় তাকে এই মূল্যবান জীবন দান করেছেন এবং নির্ধারিত সময়েই তা আবার ফিরিয়ে নেবেন। সুতরাং মৃত্যুভয়, কাপুরুষতা দেখিয়ে কোনো লাভ নেই!

'এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো আর (ভালো করে) জেনে নাও যে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন সবকিছু দেখেন।'

এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা আলোচিত ঘটনাটি বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারি। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ইতিহাসের পাতা থেকে মুসলিম উম্মাহর সামনে এই ঘটনা তুলে ধরার অন্তর্নিহীত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য কী? আসলে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুসলমানরা যেন কখনো জীবনের মোহ কিংবা মৃত্যুভয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ ছেড়ে না দেয়। কেননা জীবন মরণ একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতেই নিয়ন্ত্রিত।

'আল্লাহর পথে জেহাদ করো।'

অর্থাৎ অন্য কোনো পথে নয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় অন্য কোনো লক্ষ্যেও নয়– একমাত্র জামায়াতুল মুসলিমীনের পতাকাতলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অন্য কোনো পতাকাতলে নয়,

'এবং জেনে রেখো আল্লাহ সব জানেন সব দেখেন।'

তিনি মানুষের মুখের কথাও শোনেন এবং তার মনের উদ্দেশ্যও জানেন। অথবা তিনি সকল দোয়া শোনেন এবং তা কবুলও করেন। তিনি জীবনের জন্যে কোন জিনিষ সবচেয়ে কল্যাণকর এবং আন্তরিক প্রশান্তির জন্যে কী প্রয়োজন তাও সবচেয়ে ভালো জানেন।

'যুদ্ধ করো (একমাত্র) আল্লাহর পথে।'

কেননা আল্লাহর পথে কোনো আমল কখনোই বিনষ্ট হয় না। এই মোহময় জীবন তো তিনিই দিয়েছেন আবার সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে একদিন তিনিই একদিন ফিরিয়ে নেবেন।

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে জান মাল দুটোরই ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এজন্যে প্রাসংগিকভাবেই জেহাদের আলোচনার সাথে আল্লাহর পথে ব্যয়ের আলোচনাও এসে যায়। তৎকালীন যুগে এই বিষয়টি আরো গুরুত্ব বহন করতো, কেননা তখন জেহাদের ব্যয় বহন করার জন্যে কোনো রাষ্ট্রিয় তহবিল ছিলো না। মোজাহেদদের যার যার ব্যয়ভার তাকে নিজেকেই বহন করতে হতো। এ কারণে অনেক সময় দেখা গেছে যে, অনেক সাহাবাদের জেহাদে যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা সত্তেও যুদ্ধে যাওয়ার ব্যয়ভার বহন করতে না পারার কারণেই তারা যুদ্ধে যেতে পারেননি। এজন্যে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টির উপস্থাপন করেছেন। যাতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলদের জন্যেও আল্লাহর পথে লড়াই করা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তোমাদের মাঝে এমন কে আছো যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে তারপর আল্লাহ তায়ালা ঋণের অংককে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং আল্লাহ্ই কাউকে গরীব কাউকে ধনী করে দেন আর সবশেষে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে, সুতরাং শুধু মাত্র যুদ্ধে যাওয়ার কারণে কোনো মানুষের মৃত্যু হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যদি তার জীবন বাঁচিয়ে রাখেন কোনো পরিস্থিতিই তাকে মৃত্যু দিতে পারে না, আর আল্লাহ তায়ালা যদি মৃত্যু দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন তবে কোনো কৌশলই মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না।

ঠিক একইভাবে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করলে সম্পদও শেষ হয়ে যায় না। এই অর্থ আল্লাহ তায়ালা উত্তম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর কাছে এটা জমা থাকবে। এই ঋণ আদায়ের যিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তিনিই এর যামিন। এর বিনিময় তিনি অনেকগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। দুনিয়ায় তিনি তাদের সুখ শান্তি, ধন সম্পদ ও আর্থিক প্রশান্তি দান করবেন এবং কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে তিনি এর বিনিময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সাফল্য, অফুরন্ত নেয়ামত, সীমাহীন বিত্তবৈভব সর্বোপরি তাঁর একান্ত নৈকট্য দান করবেন। দারিদ্র ও প্রাচুর্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কুদরতী হাতে নিয়ন্ত্রিত। মুক্ত হস্তে দান করলেই একজন মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায় না আবার কৃপণতা করে যক্ষের ধনের মতো অর্থ সম্পদ আগলে রাখলেই কেউ সম্পদশালী হতে পারে না।

'আল্লাহই দরিদ্র বানান আল্লাহই ধনী বানান।'

শেষ পর্যন্ত এই মোহময় জীবন, ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য সবকিছু ছেড়ে আল্লাহর দরবারেই সবাইকে হাযির হতে হবে।

'এবং তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

মৃত্যুভয়ে শংকিত হয়ে লাভ নেই। দারিদ্র্যের ভয়ে কার্পন্য করেও লাভ নেই। কেননা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া ছাড়া বান্দার কোনো উপায় নেই। পরিণতি যখন এটাই চূড়ান্ত হয়ে আছে তাহলে জানমাল দিয়ে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্যে প্রতিটি ঈমানদারেরই প্রস্তুত থাকা উচিৎ। সর্বোতভাবে নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করে দিতে হবে। এই বিশ্বাস প্রতিটি মোমেনের অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া দরকার যে, একটি মানুষ জীবনে কতোবার নিঃশ্বাস ছাড়বে কতোবার নেবে, তা অনেক আগেই স্থির হয়ে আছে। রুযী, রোযগার, প্রাচুর্য, ধন সম্পদ কতোটুকু সে পাবে তা আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে এবং এগুলো বেধে দেয়া নিয়ম অনুযায়ীই তার কাছে আসতে থাকবে। সুতরাং মানসিক অস্থিরতা, শংকিত জীবন নিয়ে কাপুরুষের মতো জীবন যাপন না করে সবল স্বাচ্ছন্দ বিরত্বপূর্ণ সম্মানজনক জীবন যাপন করাই শ্রেয়। কেননা সর্বাবস্থায় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

কোরআনে উপস্থাপিত কিছু জীবন্ত প্রতিচ্ছবি

আয়াতে উপস্থাপিত ঈমানী শিক্ষার বিষয়টি আলোচনার পর আমি এবার শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাভংগির সৌন্দর্যের বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

'তুমি কি দেখোনি ....

আয়াতের স্বাভাবিক বর্ণনাভংগিই আমাদের সামনে হাজার হাজার ভীতসন্ত্রস্ত পলায়নপর মানুষের একটি প্রতিচ্ছবি জীবন্তরূপে তুলে ধরে। 'তুমি কি দেখোনি?' মাত্র এই শব্দদুটির মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্বার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। অন্য কোনো বর্ণনাভংগি মানুষের বিবেককে এতো জোরে নাড়া দিতে পারে না। পারে না হাজার হাজার মানুষের ইতিহাসকে সার্থকভাবে এতো স্বল্প শব্দে তুলে ধরতে, অথচ আল্লাহ তায়ালা মাত্র দুটি শব্দের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন।

আয়াতটি এক জীবন্ত দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিকবিদিক ছুটছে। তারা পালিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে চাইছে। নিমেষেই দৃশ্য পরিবর্তন হয়ে নতুন দৃশ্য আসছে। যে মৃত্যুভয়ে তারা পালাচ্ছে সেই সর্বগ্রাসী মৃত্যুই তাদের সামনে এসে হাযির হয়েছে। মাত্র একটি শব্দে এই দৃশ্যটি আল্লাহ তায়ালা চিত্রায়ন করেছেন।

(মৃত্) 'মরে যাও তোমরা'।

এই একটি শব্দই বলে দিচ্ছে যে, তাদের এই ভয়ভীতি, তাদের শংকা, মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে তাদের সকল প্রচেষ্টা সর্বোতভাবে ব্যর্থ, সম্পূর্ণ নিষ্ফল, একেবারেই অর্থহীন ছিলো, 'মরে যাও' শব্দটি যে তথ্য আমাদের চেতনায় বদ্ধমূল করে দিতে চায় তা হলো, মৃত্যু থেকে বাঁচার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। আয়াতটি আমাদেরকে আরো বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহর ফায়সালা অবধারিতভাবে কার্যকর হবে, তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আল্লাহ তায়ালা চাইলে মুহূর্তেই তা বাস্তবায়িত হয়।

'অতপর তিনি তাদেরকে (পুনরায়) জীবিত করলেন'

তাদেরকে পুনর্জীবন দেয়ার কারণ কী ছিলো তা আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেননি। এটা বলার কোনো প্রয়োজনও ছিলো না। আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চান যে, মানুষ ভালো করে বুঝে নিক যে, এমন এক মহাপরাক্রমশালী সত্ত্বা রয়েছেন, যার কুদরতী হাতে রয়েছে জীবন মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ। তিনিই বান্দার অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। তাঁর কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো ইচ্ছা বাস্তবায়নে কেউ বাধা দিতে পারে না। কারো এমন ক্ষমতা নেই যে, তার ইচ্ছার বাস্তবায়নে কোনো ব্যঘাত ঘটাতে পারে। তিনি যা চান তা-ই হয়েছেও তা-ই হচ্ছে এবং চিরকাল তা-ই হবে। এ ব্যাখ্যাই মানুষের সামনে জীবন মৃত্যুর বাস্তব ও স্বার্থক চিত্র তুলে ধরে।

জীবন দেয়া মৃত্যু দেয়া অন্যকথায় জান কবয করা এবং তা আবার ফিরিয়ে দেয়া, তথা জীবন মৃত্যুর বাস্তব দৃশ্য তুলে ধরার পর জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত বিষয় রেযেক প্রসংগের দিকে আলোচনা এগিয়ে চলেছে। এ পর্যায়ে কোরআন বলছে–

'আল্লাহই (রেযেক) সংকীর্ণ করে দেন এবং তিনিই (যাকে চান তাকে) প্রাচুর্য দান করেন।'

'কবয' এবং 'বাস্‌ত' শব্দ ব্যবহার করে খুবই সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ্মভাবে আল্লাহ তায়ালা রূহ কবয ও তা পুনরায় ফিরিয়ে দেয়ার অর্থের সাথে রেযেক দেয়া ও কেড়ে নেয়ার সামঞ্জস্যবিধান করেছেন।

শাব্দিক সাযুজ্যের মাধ্যমে বিষয় দুটির মধ্যে বাস্তব সাদৃশ্যের দিকে ইংগীত রয়েছে। দৃশ্য দুটির চিত্রায়নের মাঝে সূক্ষ্ম এক জীবন্ত মিল রাখা হয়েছে। সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ চয়নের মাধ্যমে আলোচিত দুটি বিষয়ের এমন সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে যাতে পাঠকের হৃদয়ে এর অন্তর্নিহিত মিলের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

ইহুদীদের চরম হঠকারীতা

এরপর দ্বিতীয় ঘটনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাতে আমরা মূসা (আ.) পরবর্তী বনী ইসরাইলের একটি দৃশ্য দেখতে পাই। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি বনী ইসরাইলের নেতাদের ঘটনাটি দেখোনি? ....আল্লাহ তায়ালা যালেমদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।

'তুমি কি দেখোনি?'

প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়েছে যেন দৃশ্যটি এখন ঘটছে, এবং তা এই মুহূর্তেও চোখে দেখা যায়। যে দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো বনী ইসরাইলের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক তাদের সমকালীন নবীর দরবারে উপস্থিত হয়েছে। তারা তাদের নবীর কাছে এই দাবী নিয়ে এসেছে যে, তাদের জন্যে তিনি যেন এমন একজন নিযুক্ত করে দেন, যার নেতৃত্বে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে।

জেহাদ শুধু আল্লাহর পথে

কথাটি তাদের আকীদা বিশ্বাসের পূনর্জাগরণের বিষয়টিকেও তুলে ধরে। তাদের অন্তরে এক অনুপ্রেরণা, এক ঈমানী চেতনা জেগে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, তারাই সত্যপথের ওপর আছে। তারাই সত্যিকার ঈমান আকিদার ধারক বাহক এবং তাদের শত্রুরা পথভ্রষ্ট–ভ্রান্ত। তারা কুফরী ও অন্ধকারের ভেতর নিমজ্জিত আছে।

কোরআন এখানে তাদের সমকালীন নবীর নাম বলেনি। বনী ইসরাইলের মধ্যে একের পর এক অনেক নবীরই আগমন ঘটেছে। নবীর নাম জানানো এই ইতিহাস পর্যালোচনার উদ্দেশ্য নয় এবং তা উদ্দেশ্য ব্যহতও করতে পারে না। নিজের ঈমান আকীদা সম্পর্কে এই স্বচ্ছতা স্পষ্টতা দৃঢ়তা মোমেনের অন্তরে অসাধারণ এক শক্তি যোগায়। একজন মোমেনকে অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে যে, সে একটি চিরসত্য বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য উদ্দেশ্য কর্মপদ্ধতি সবই তার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বাতিলপন্থী ও ভ্রান্তদের মতো সে অন্ধকারে হাতড়ে মরে না।

তারা নবীর কাছে উপস্থিত হলে নবী তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কথাবার্তা এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যে কতোটুকু বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে তা যাচাই করে নেয়ার জন্যে তাদের জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের অবস্থা এমন হবে না তো যে, তোমাদের যুদ্ধের হুকুম দেয়া হবে অথচ তোমরা যুদ্ধ করতে চাইবে না?'

অর্থাৎ তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হলে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেবে না তো? এখনো সুযোগ আছে ভালো করে ভেবে দেখো, কারণ এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ ফরয করা হয়নি। তোমাদের দাবী মোতাবেক যদি যুদ্ধ ফরয করেই দেয়া হয়, তখন কিন্তু আর কোনো অবকাশ থাকবে না, যুদ্ধ তোমাদের ওপর তখন ফরয হয়ে যাবে। যুদ্ধ থেকে পালানো তখন চরম সীমালংঘন হিসেবে গন্য হবে। কোনো বাহানায়ই তখন যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

নবীর পক্ষ থেকে এটাই যুক্তিযুক্ত কথা। কেননা নবীদের কথা ও হুকুমের বিরোধিতা করা বা তার মতের বিপরীত কোনো মত পেশ করার কোনো অবকাশ কারো নেই। কোনো সুযোগ নেই তাদের কথাকে গুরুত্বহীন মনে করার। নবীর একথার জবাবে তারা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলো আল্লাহ তায়ালা তা এভাবে তুলে ধরেছেন,

'তারা বললো, এটা কি করে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবো না– অথচ আমাদেরকে আমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে?'

তাদের জবাব শুনে মনে হয় যেন তারা আগেই জানতো তাদের কী বলা হবে। যেন তারা জানতোই যে কী কর্মসূচী তাদের জন্যে আসতে পারে। তারা জানতো যে, যারা আল্লাহর দ্বীনের দুশমন তারা তাদেরও দুশমন। তারাই তাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। সন্তান সন্তুতি, আত্মীয় স্বজন থেকে তাদের আলাদা করে দিয়েছে। তাদের স্ত্রী পুত্রদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য। তাদের যুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচতে হলে একটি মাত্র পথই তাদের সামনে খোলা– তা হলো যুদ্ধ এবং এর জন্যে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এ ব্যাপারে বিপরিতমুখী তর্কবিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আয়াতের পরবর্তী অংশের দিকে তাকালে যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই তাতে তাদের এই দীর্ঘ গলাবাজী ও উৎসাহ উদ্দীপনার বিন্দুমাত্র বাস্তবতা নেই। কোরআন তাদের এই লজ্জাজনক অধ্যায়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

'অতপর যখন তাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হলো তখন সামান্য সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পালিয়ে গেলো।'

এ পর্যায়ে এসে আমাদের সামনে বনী ইসরাইল জাতির চরিত্রের জঘন্যতম দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ওয়াদা খেলাফ, চুক্তি ভংগ, আনুগত্য স্বীকারে অনীহা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্ববিরোধী কথা বার্তা ও স্পষ্ট সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দলাদলি ফেরকাবাজী করে উম্মাহকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা– এসবই ছিলো তাদের অভ্যাস।

এই স্বভাব তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। এই ধরনের স্বভাব তাদের মধ্যেও পাওয়া যাবে যাদের ঈমানী প্রশিক্ষণ ও তারবিয়তের মাধ্যমে মানসিক গঠন এখনো পরিপক্ক হয়নি। একমাত্র দীর্ঘ পরিশ্রম ও ঈমানী তারবিয়তের মাধ্যমেই এই ধ্বংসাত্মক দুর্বলতা দূর করা সম্ভব। মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় লোকদের অবশ্যই এই ধরনের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়ার সময় তাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। গভীরভাবে এ দিকটি পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে অধীনস্তদের ঈমানী দৃঢ়তাকে সূক্ষ্ম কৌশলে যাচাই করে নিতে হবে। কেননা এমনটি কখনো কাংখিত নয় যে, কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার পর কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী হলে তারা ঘাবড়ে যাবে, তারা পেছন ফিরে পালিয়ে যাবে, আর গোটা মুসলিম জাতি হয়ে পড়বে সমুহ ক্ষতির সম্মুখিন।

আসলে বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ, জাতি, প্রজাতি নির্বিশেষে যে বিশেষ দলটি এ কাজের জন্যে গড়ে ওঠে সে দলটি যদি সুদীর্ঘ ঈমানী তারবিয়তের মাধ্যমে নিজেদেরকে যাবতীয় পংকিলতা থেকে পরিশুদ্ধ করতে না পারে তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়াটা মোটেই অভাবনীয় কিছু নয়। তাদের এই চরম কাপুরুষতা ও পশ্চাদপসরণের প্রেক্ষাপটেই কোরআন তাদের সাবধান করে দেয়,

'আর আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।'

এই বাক্যটি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এই আচরণকে কতোটা অপছন্দ করেছেন। তাদের নিজেদের দাবীর প্রেক্ষিতেই তাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছিলো, অথচ তাদের অধিকাংশই এরপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। মৃত্যুভয়ে তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে, নবীর অবাধ্য হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এদের যালেম আখ্যা দিয়েছেন। তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করে নিজেদের ওপরই যুলুম করেছে। তারা তাদের নবীর ওপর যুলুম করেছে। সঠিক সত্যকে উপলব্ধি করেও বাতিলের মোকাবেলায় সত্যকে সাহায্য না করে ও সত্যের পক্ষে না থেকে সত্যের ওপর যুলুম করেছে।

বনী ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় লোকদের মতো যারা নিজেদের আকীদা বিশ্বাস ও পথ পদ্ধতিকে সত্য বলে জানে এবং শত্রুদের ভ্রান্ত মতবাদকেও ভালো করে চেনে, তারা যদি সত্যের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনে আলসেমী করে, সত্যের পক্ষ অবলম্বনের অংগীকার ভংগ করে তাহলে তারা নিসন্দেহে যালেম বলে পরিগণিত হবে। এই যুলুমের পরিণতি তাদের ভোগ করতেই হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

ঘটনা এগিয়ে চলছে বনী ইসরাইলের বেয়াদবী ধৃষ্ঠতা আর অবাধ্যতার আলোচনার মধ্য দিয়ে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের নবী তাদের বললো তালুতকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে বাদশাহ মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, একথা শুনে তারা বললো তার কী অধিকার আছে আমাদের ওপর রাজত্ব করার ....'

এই ধৃষ্ঠতাপূর্ণ ঝগড়ার মধ্যে দিয়ে বনী ইসরাইলের জঘন্য চরিত্রের বিষয়টি আরেকবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অবশ্য এ বিষয়ের দিকে এই সূরার আরো অনেক আয়াতেই ইংগীত করা হয়েছে। তাদের দাবীই তো ছিলো এমন একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার, যার নেতৃত্বে বাতিলের বিরুদ্ধে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। শুরুতে তারা স্পষ্ট করেই বলেছিলো যে, তারা একমাত্র আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে চায়।

অথচ নেতা নির্ধারণ করে দেয়ার পর এরাই এখন নবীর মাধ্যমে আল্লাহর মনোনয়নের ব্যাপারে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। তারা ওয়াদা খেলাফ করতে শুরু করেছে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে তালুতকে তাদের বাদশাহ হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন তার ব্যাপারেই তারা বলছে, সে কেন তাদের বাদশাহ হবে? কী অধিকার আছে তার বাদশাহ হবার? সে তো কোনো শাহী বংশোদ্ভূতও নয়। তার চেয়ে তারাই তো নেতৃত্বের বেশী উপযুক্ত, বেশী হকদার। এর কারণ হলো যে, তারা মনে করেছে এমন কী ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য তার আছে, যে আমরা চোখবুজে তার নেতৃত্ব মেনে নেবো?

মুলত এগুলো সত্যিকার অর্থে কোনো ওযরই ছিলো না। এসব কথার সামান্যতম যৌক্তিকতও ছিলো না। এগুলো তাদের চিন্তার বিভ্রান্তি। এটা তাদের চির পরিচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের নবী তাদের বুঝিয়ে বললেন যে, তালুতকে বাছাই করার ভেতরে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো হেকমত আছে এবং সকল বিবেচনায় সে-ই এই পদের জন্যে বেশী উপযুক্ত। কোরআন বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছে,

'আল্লাহই তাকে তোমাদের ওপর বাছাই করেছেন এবং এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শারিরীক যোগ্যতা ও জ্ঞানগত প্রতিভা তিনি তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন ....।'

নেতৃত্বের জন্যে তালুতের উপযুক্ততা প্রমাণের জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে বাছাই করেছেন। দ্বিতীয়ত এর জন্যে প্রয়োজনীয় শারীরিক ও জ্ঞানগত যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালাই তাকে দিয়েছেন,

'আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাজত্ব যাকে খুশি তাকেই দিতে পারেন।'

আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই নেতৃত্ব দান করেন। মূলত রাজত্ব তো আল্লাহরই হাতে। তিনিই এই বিশ্বলোকের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে নেতৃত্বের জন্যে যাকে খুশি তাকে বাছাই করতে পারেন, আর আল্লাহর ভান্ডার প্রশস্ত তিনি তো মহাবিজ্ঞ। তাঁর দয়া অনুগ্রহ কেউ রোধ করতে পারে না, তাঁর দানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কল্যাণ কিসে আছে তা তিনিই ভালো জানেন। তিনিই ভালো জানেন কোন দায়িত্ব কাকে দিতে হবে, কোন জিনিষ কোথায় রাখতে হবে।

বিষয়টি সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর তাদের সকল সন্দেহ সংশয়, বক্র চিন্তাধারা দূর হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বনী ইসরাইলের বক্র স্বভাবের কথা তাদের নবীর অজানা ছিলো না। তাদের মনের সংকীর্ণতা দূর করার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট ছিলো না। তারা যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছে, তাদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে কিছু অলৌকিক ঘটনা

দেখানোটাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। অলৌকিক কিছু দেখানো হলে হয়তো তাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিতে পারে। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে পারে, তাই নবী তাদের বললেন,

'তার (তালুতের) রাজত্বের প্রমাণ হলো যে, সে তোমাদের সামনে সেই হারানো সিন্দুক এনে হাযির করবে ....'

এখানে এসে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হয়।

মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরাইলরা ইউশা বিন নূনের নেতৃত্বে তাদের পুন্যভূমি ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছিলো। কিন্তু কিছুদিন পরই আবার তাদের শত্রুরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। সে সময় তাদের দুশমনরা তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী পবিত্র বরকতময় সিন্দুকটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো যাতে তাদের নবী মূসা ও হারুন (আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত কিছু জিনিষ ছিলো। কথিত আছে যে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)কে তাদের শরীয়তের হুকুম আহকাম লিখিত যে ফলক দান করেছিলেন তাও সেই সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিলো।

স্মৃতি বিজড়িত সকল জিনিষসহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের হারানো সিন্দুক ফিরিয়ে আনার ঘটনাকে তালুতকে আল্লাহ কর্তৃক বাছাই করার স্বপক্ষে একটি নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপন করা হলো। এতে হয়তো তাদের মনে আস্থা ফিরে আসবে। হৃদয়ে প্রশান্তি জন্মাবে এবং তারা যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাকে তাহলে এই প্রমাণ তাদের জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কোরআনের বর্ণনাভংগিতে মনে হয় এ ঘটনা তাদের হারানো মনোবল ও দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলো।

দুরদর্শি নেতৃত্বের সুফল

এরপর আমরা দেখতে পাই যে, যারা জেহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, নবীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগ করেনি তাদের সমন্বয়ে তালুত তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন।

দৃশ্য দুটির চিত্রায়নে কোরআন যে ধারা বর্ণনা অবলম্বন করেছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দৃশ্যটির ইতি টানার সাথে সাথেই দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে। তালুত তার সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়েছেন।

'তালুত তার বাহিনী নিয়ে যখন শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে বেরিয়ে পড়লো ....'

এই পর্যায়ে এসে তালুতকে মনোনীত করার অন্তর্নিহিত রহস্য, আল্লাহর হেকমত আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি এগিয়ে চলছেন সম্মুখ সমরে। অথচ তার সাথে যে সেনাবাহিনী রয়েছে তাদের গুণগতমান মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

তারা তো পরাভূত, পরাস্ত ও দাসত্বের শৃংখলে দীর্ঘদিন আবদ্ধ একটি জাতি। পরাজয়, অবমাননাই তাদের ইতিহাস। অথচ তাদেরকে নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে শক্তিশালী ও বিজয়ী একটি জাতির। সুতরাং এই জাতির মোকাবেলায় টিকে থাকতে হলে অবশ্যই তাদেরকে প্রচন্ড মনোবল আস্থা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

অস্ত্র ও জনবলের মোকাবেলায় টিকতে হলে আগে তাদের মনে প্রচ্ছন্ন এক শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা, প্রচন্ড মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পই মানুষের মধ্যে এমন শক্তি এনে দিতে পারে যা প্রবৃত্তির সকল কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ধরনের ঈমানী মনোবলই সুখে-দুঃখে, অভাবে-অনটনে, বিপদে-আপদে, মানুষকে সত্যের ওপর অটল রাখতে পারে। এই মনোবলই মানুষকে বস্তুবাদী জগতের ওপরে তুলে এক মহাশক্তির সাথে পরিচিত করতে পারে। এই মনোবলই যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষকে আনুগত্যের ওপর অটল রাখতে পারে। যে কোনো কষ্ট সহ্য করে সত্যের ওপর টিকে থাকতে এটিই তাকে শক্তি যোগায়। এই

মনোবলই একের পর এক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা যোগায়। সুতরাং একজন সেনা নায়কের অবশ্যই তার বাহিনীকে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। যাচাই করে নিতে হবে তার সৈন্যদের মনোবল মনোভাব ধৈর্য ও আস্থা। খতিয়ে দেখতে হবে লোভ লালসার মোকাবেলায় ঈমানের ওপর তারা কতোটা অনড়। কঠিন অবস্থা, প্রতিকূল পরিস্থিতি, দুঃখ দুর্দশায় তারা কতোটা অবিচল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে তাও যাচাই করা দরকার।

ঠিক এই উদ্দেশ্যেই তালুত তাদেরকে পানি পান না করতে বলে একটা বড়ো ধরনের পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তারা সে সময় পিপাষার্ত ছিলো। তালুতও এই সুযোগে যাচাই করে নিতে চাইলেন ধৈর্যের সাথে কে তাদের সাথে থাকে, তার আনুগত্য করে– আর কে অধৈর্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেখা গেলো তার এই বিচক্ষণতা ঠিকই কাজে লেগেছে।

'সামান্য কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলো।'

তালুত তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন পথ চলতে চলতে হাতের কোষ ভরে সামান্য পানি পান করার, যাতে পিপাষাও মেটে আবার সবার থেকে বিচ্যুত হয়েও না পড়ে। কিন্তু তারা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে পানি পান করতে গিয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলো না। তাদের ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে তারা অযোগ্য বিবেচিত হলো। এমতাবস্থায় তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করে দেয়াটাই ছিলো বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার পরিচয়। শুধু সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে তাদেরকে বাহিনীতে রাখার কোনোই প্রয়োজন নেই; বরং এই ধরনের লোক বাহিনীতে থাকলে অনেক সময় এরা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কেননা এরা হলো দলের মধ্যে দুর্বলতা, পরাজয় ও বিশৃংখলার বীজ। কোনো সেনা বাহিনীর শক্তি কখনোই সংখ্যাধিক্যের দ্বারা বৃদ্ধি হয় না। ঈমানের দৃঢ়তা, অটল অবিচল সংকল্প ও আনুগত্যের একনিষ্ঠতাই হলো একটি বাহিনীর প্রাণশক্তি।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, শুধু মনের ইচ্ছাই যথেষ্ট নয় বরং সম্মুখ সমরে ঝাপিয়ে পড়ার আগে সেনাবাহিনীর বাস্তব অবস্থা যাচাই করে নেয়া দরকার। নেতৃত্বে ও সেনা পরিচালনায় যারা থাকেন তাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই। প্রথম পরীক্ষায় অধিকাংশ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ সেনা প্রধানের ওপর সামান্যতম প্রভাব ফেলতে পারেনি, তিনি একটুও হতোদ্যম হয়ে পড়েননি। তিনি তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলিষ্ঠভাবেই এগিয়ে গেলেন।

বিজয় কোনোদিন সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না

এই পরীক্ষার পর তালুতের বাহিনী অনেক ছোটো হয়ে গেলো। কিন্তু তাতে সে তার মিশন বন্ধ করেনি।

'অতপর সে যখন তার ঈমানদার সাথীদের নিয়ে নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো তখন তারা নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে বললো, এই মুহূর্তে জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই।'

এভাবে সৈন্যসংখ্যা কমতে কমতে মাত্র হাতেগোনা কিছু লোকই তার সাথে ছিলো এবং তারা একথাও জানতো যে, তারা লড়াই করতে যাচ্ছে দুর্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষ জালুতের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু সামান্যতম বিচলতাও তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। এরাই ছিলো সত্যিকার ঈমানদার যারা কোনো অবস্থাতেই নবীর সাথে করা অংগীকার ভংগ করেনি। সর্বোপরি যে বাস্তব অবস্থা তারা চোখে দেখছিলো তাতে শত্রুশক্তির মোকাবেলায় নিজেদের শক্তিকে অপ্রতুল মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শত্রুর তুলনায় তারা ছিলো খুবই দুর্বল ও নগন্য। এটা ছিলো তাদের জন্যে এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চাচ্ছিলেন যে, তারা সকল শক্তির নিয়ন্ত্রক, মহাশক্তিধর, মহা ক্ষমতাবান আল্লাহর অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করে

কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, এই ধরনের নাযুক পরিস্থিতিতে অটল অবিচল থাকা শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত, যাদের হৃদয় মহাশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, যাদের সকল শক্তির মূল উৎস হলো নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠ ঈমানী চেতনা। তারা কখনো সেই সব সংকীর্ণমনা লোকদের মতো নয় যাদের দৃষ্টি বস্তুবাদী জগতের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ।

এই কঠিন পরীক্ষার পরও একদল আত্মনিবেদিত মোমেন সত্যের পথে অবিচলভাবে টিকে রইলেন।

'যারা বিশ্বাস করতো যে আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে ....।'

হাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য। জয় পরাজয়ের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে মৌলিক নীতি। এটা একমাত্র তারাই অনুভব করতে পারে যারা একদিন আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। হাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক যে, মোমেনরা সংখ্যায় খুবই সামান্য থাকবে। কেননা এরা তো সেই দল যারা অনেক কষ্টের পাহাড় পাড়ি দিয়ে, অনেক দুঃখ দুর্দশা বিপদ আপদ সহ্য করে, অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে আল্লাহর বাছাই করা বান্দাদের কাতারে শামিল হয়েছে। সংখ্যায় তারা যতো স্বল্পই হোক না কোনো চূড়ান্ত বিজয় এদের হাতেই ধরা দেবে।

কেননা তাদের সম্পর্ক রয়েছে সেই মহাশক্তিমান আল্লাহর সাথে যিনি সকল ক্ষমতার উৎস। তারা তো সেই শক্তির প্রতিভু যে শক্তি সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত। তাদের সংযোগ সেই আল্লাহর সাথে যার ইচ্ছা যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো সময়ে কার্যকর হয়। যিনি অহংকারী, দাম্ভিক ও প্রতাপশালীদেরকে যে কোনো মুহূর্তে অপমানিত, অপদস্থ, লাঞ্ছিত করে পরাজিত করতে সক্ষম। তারা সাহায্য ও বিজয়ের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে। তারা বলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু হয়, তারা বিশ্বাস করে–

'আল্লাহ সবসময় ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।'

এবং তারা এটাও উপলব্ধি করে যে, হকের পক্ষ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের বাছাই করেছেন।

সেই ক্ষুদ্র মোমেন দলটির ঘটনা এগিয়ে চলেছে, যারা নিরংকুশভাবে এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো। যারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলো। আমরা দেখতে পাচ্ছি শত্রুদের শক্তি, সংখ্যাধিক্য ও নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা সত্তেও তাদের মনে কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি, তারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতেও তারা সাহায্য চেয়েছেন একমাত্র আল্লাহর কাছে। বিজয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন।

'তারপর যখন সে তার সৈন্য নিয়ে মোকাবেলার জন্যে দাঁড়ালো তখন তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বললো ....।'

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবরের তাওফীক দাও।'

এ কথাটি তাদের ধৈর্যের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলে এবং এই সবরের ক্ষমতা যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে তাও প্রতিভাত হয়। শব্দ চয়নে মনে হয় যেন সবর তাদেরকে ছেয়ে ফেলেছে। কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ় মানসিক শান্তি ও অবিচল থাকার শক্তি তাদের ওপর বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে।

'এবং আমাদের কদমকে অটল রাখো।'

নিসন্দেহে অটল অবিচল থাকার ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, তার কুদরতী হাতেই এর সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনিই মোমেনদেরকে সত্যের ওপর এমনভাবে অটল অবিচল রাখেন যে, কোনো কিছুই তাদেরকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে না।

'এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।'

এ পর্যায়ে এসে পুরো বিষয়টি একেবারে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ যুদ্ধ ঈমান ও কুফরের, এ যুদ্ধ হক ও বাতিলের। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর শত্রু কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর বন্ধু ঈমানদারদেরকে সাহায্য করবেন, তাদেরকে বিজয় দান করবেন। সুতরাং তাদের মনে কোনো প্রকার হীনতা, জড়তা, অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতা আদৌ শোভা পায় না। লক্ষ্য উদ্দেশ্য পথ পদ্ধতি এখানে স্পষ্ট। সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ এখানে নেই।

মোমেনদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের প্রতিক্ষিত ফলাফল আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন।

'তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পর্যুদস্ত করে দিলো।'

'ইযন' অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। যাতে করে মহাবিশ্বের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ যে একমাত্র মহাশক্তিমান আল্লাহর কুদরতি হাতেই নিবদ্ধ তা মোমেনরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বাস্তব সত্যটা হলো মোমেনরা আল্লাহর হাতিয়ার, আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা যা খুশি তাই করান। তাদের মাধ্যমে মূলত তিনি তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন করেন এবং এর ভেতরে অন্য কারো ইচ্ছার কোনো প্রভাব নেই। এমনকি যাদের মাধ্যমে তিনি তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন তাদেরও কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালাই নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্যে তাদের মনোনীত করেছেন, তাঁর অনুমতিক্রমেই তাদের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হয়। এ এমনই এক শক্তি যা মোমেনের হৃদয় শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তায় কানায় কানায় ভরে দেয়। তারা হলো আল্লাহর বান্দা আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের বাছাই করেছেন, এটা আল্লাহর এক অসীম দয়া ও মেহেরবানী।

এদের জন্যে রয়েছে সম্মান আর সম্মান। প্রথমত আল্লাহ তায়ালা এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদেরকে বাছাই করে সম্মানিত করেছেন। দ্বিতীয়ত এই দায়িত্ব পালনের পর তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ সাফল্যের তাজ পরিয়ে দিয়েছেন। এটাও আল্লাহর এক সীমাহীন করুনা। তিনি যদি দয়া করে তাদেরকে সাহায্য না করতেন তাহলে তারা এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতো না এবং সাফল্যও তারা পেতো না। এমনিভাবে যখন লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মহত্ব, পথ ও পদ্ধতির পরিচ্ছন্নতা একজন মোমেনের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা তার নিয়তের মধ্যে খুলুসিয়াত ও কাজে কর্মে একনিষ্ঠতা দান করেন। তখন তার মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ বা রিপু কাজ করে না। অপরদিকে নিয়তের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, আনুগত্যের দৃঢ় সংকল্প আর একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে, সকল রিপুকে দমন করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করলেই আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষকে এ সবকিছুর অধিকারী করেন।

অতপর কোরআন হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা আমাদের সামনে এভাবে তুলে ধরে,

'আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো'।

বনী ইসরাইলের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) তখন নিতান্ত যুবক মাত্র। আর জালুত হচ্ছে শক্তিধর বাদশাহ, প্রবল প্রতাপশালী এক দুর্ধর্ষ নেতা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলেন যে, গোটা জাতি এটা দেখুক যে, নিছক বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ীই সবকিছু হয় না, বরং ঘটনা ঘটে বাস্তবতার নিরীখে, যে বাস্তবতার জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর, আর সে বাস্তবতার পরিমাণ আর

তার মানদন্ডও কেবল তাঁরই হাতে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা। আল্লাহর সংগে সম্পাদিত অংগীকার পূরণ করা। অতপর তাই হবে তাই ঘটবে, যা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন, যেভাবে এবং যে উপায়ে তিনি তা ঘটাতে চান সেভাবেই হবে। তিনি ইচ্ছা করলেন যে এক অল্প বয়স্ক যুবকের হাতে এ প্রবল প্রভাবশালী দুর্দমনীয় স্বেচ্ছাচারীর পতন হোক। যাতে লোকেরা এটা বুঝতে পারে যে, দুর্বলরা যে দোর্দন্ড প্রতাপশালীকে এতো ভয় পায় একজন অল্প বয়স্ক যুবকও তাকে পরাভূত করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ তায়ালা কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন। এখানে আরো একটি গোপন রহস্য ছিলো, আর তা ছিলো এই, তিনি ফয়সালা করে রেখেছিলেন যে, তালুতের পর দাউদের হাতে নেতৃত্ব দান করা হবে। তার পুত্র সোলায়মান হবে তার উত্তরাধিকারী, বনী ইসরাইলের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার যুগটাই হবে সোনালী যুগ। আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের মনে যে বিভ্রান্তি আর গোমরাহী বাসা বেঁধেছিলো তা দুর হয়ে তারা বিশুদ্ধ দ্বীনী আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

'আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করলেন রাজত্ব ও প্রজ্ঞা, দুরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দিলেন এমন কিছু- যা তিনি শিক্ষা দিতে চান।'

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন যুগপৎ বাদশাহ এবং নবী। আল্লাহ তায়ালা তাকে যুদ্ধাস্ত্র এবং লৌহবর্ম নির্মাণের কৌশল শিখিয়েছিলেন। কোরআন মজীদের অনেক স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণনাধারায় গোটা কাহিনীর পেছনে ভিন্ন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এখানে কেবল কাহিনীর পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে কথাটি এখানে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ঈমানী শক্তিরই জয় হয়, বস্তুবাদী শক্তির নয়। জয় হয় ঈমানের, সংখ্যা সেখানে প্রধান বিষয় নয়। এখানে একটি বিরাট লক্ষ্যের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করা হয়েছে। সে মহান লক্ষ্য কোনো সম্পদ হস্তগত করা নয়, ছিনতাই করাও নয়। মর্যাদা আর প্রভুত্ব কর্তৃত্বও তার উদ্দেশ্য নয়। তা হচ্ছে কেবল পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায়ের সংগে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করাই হচ্ছে সে মহান লক্ষ্য,

এক যালেম দিয়ে আরেক যালেমকে দমন

'আর আল্লাহ তায়ালা যদি কতক লোককে দিয়ে কতক লোককে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী নিশ্চিত বিপর্যস্ত হতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো জগৎবাসীর প্রতি দয়াশীল।'

এ ক্ষুদ্র বাক্যে পৃথিবী পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর একটা রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শক্তির সংঘাত, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং দুনিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এখানে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সংঘাতময় জীবনের নানা দিক, যা সমুদ্রের উত্তাল তরংগের মতো মানুষের জীবনকে তরংগায়িত করে তোলে। একে অপরকে প্রতিহত করে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এসবের পেছনে আল্লাহর ক্রিয়াশীল প্রজ্ঞাময় শক্তিই মূল নিয়ন্ত্রণভার ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহর সেই প্রজ্ঞাময় শক্তির নেতৃত্ব এ সংঘাতময় শক্তিকে নেতৃত্ব দিয়ে কল্যাণ আর উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

যদি কতক লোককে দিয়ে কতক লোককে প্রতিহত না করতেন, তাহলে মানুষের গোটা জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। এ জীবন হয়ে পড়তো পূতিগন্ধময়, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাতেই বাহ্যিক স্বার্থের সংঘাত নিহিত রয়েছে। একারণেই একে অপরের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে অন্যকে প্রতিহত করার জন্যে এমনিতেই মানুষ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রবৃত্তিতে এই প্রতিযোগিতার ভাবধারা নিহিত না রাখলে মানুষকে

অলসতা আর দুর্বলতা গ্রাস করতো। তার প্রকৃতির মধ্যে এই প্রবৃত্তি থাকার কারণেই মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষ হয়ে পড়ে সদা জাগ্রত, কর্মতৎপর। মাটির নীচে রক্ষিত সম্পদের সন্ধানে সে অনেক নিচে নেমে পড়ে। সুপ্ত শক্তির গোপন রহস্যকে সে কাজে নিয়োজিত করে। এভাবে সেশান্তি, সুস্থিতি, মংগল কল্যাণ আর প্রবৃদ্ধি খুঁজে পায়। যদি এই উন্নতি অগ্রগতি এমন একটা কল্যাণকামী, হেদায়াতপ্রাপ্ত একটি দলের হাতে হতো, যারা সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে, সত্যকে ভালোভাবে চিনতে পারে এবং আল্লাহর পথ কোনটা তাও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। যারা অনুধাবন করে যে, পৃথিবীতে বাতিলকে প্রতিহত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তারা আদিষ্ট হয়েছে। এটাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কর্তব্য। যারা বুঝতে পারে যে, এ মহান ভূমিকা পালন করা ছাড়া আল্লাহর আযাব থেকে নাজাতের অন্য কোনো পথ নেই। এ ছাড়া দুনিয়ায় আল্লাহর পথে আনুগত্য প্রকাশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার অন্য কোনো উপায় নেই।

এখানে এসেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দেশ জারী করেন। তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি কার্যকর করেন। সত্য, মংগল কল্যাণ ও সুস্থিতির বাণীকে তিনি উর্ধে তুলে ধরেন। সংঘাত-সংঘর্ষ আর প্রতিরোধের পরিণাম তিনি দান করেন গঠনমূলক আর কল্যাণকর শক্তির হাতে। জীবনের যে চরম ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে নিয়ে যাওয়া তিনি নির্ধারন করে রেখেছেন, সেখানে তিনি তাকে নিয়ে যান।

এখানে এসেই আল্লাহর ওপর আস্থাবান ক্ষুদ্র মোমেনের দল শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয় এবং তারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করে। এর কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর বুক থেকে বিপর্যয় রোধ করে জীবনে মংগল ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় বাস্তবায়নে তারা আল্লাহর প্রতিকী শক্তিতে পরিণত হয়। উন্নত লক্ষ্যের প্রতিভূ হওয়ার ফলেই তারা এ সাহায্য লাভের যোগ্য হয়।

সবশেষে এই বাহিনীর ওপর মন্তব্য করে বলা হয়েছে,

'এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমার ওপর যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি, আর তুমি নিশ্চিতই রসূলদের মধ্য থেকে।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ আয়াতগুলো তাঁর নবীকে পড়ে শোনাচ্ছেন। মানুষ এসব আয়াতের গভীর তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারলে বুঝতে পারবে যে, এটা কতো বিস্ময়কর ব্যাপার।

'তোমার ওপর তা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি'।

এখানে কেবল তেলাওয়াত করার কথা বলা হয়নি; বরং তার সংগে যোগ করা হয়েছে 'যথাযথভাবে'। তা আবার পাঠ করছেন এমন এক সত্ত্বা যিনি নিজেই তেলাওয়াত করা আর নাযিল করার অধিকার রাখেন। এ আয়াতগুলোকে তিনি বান্দাদের জন্যে সংবিধান হিসেবে রচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মানুষের জন্যে সংবিধান দেয়ার অধিকার আর কারো নেই। আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানুষের জন্যে জীবন বিধান রচনা করা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা। তারা নিজেদের ওপর যুলুম করে, যুলুম করে বান্দাদের ওপরও। তারা এমন দাবী করে, যে দাবী করার অধিকার তাদের নেই। তা সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা। আনুগত্য পাওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই। আনুগত্য করতে হবে কেবল আল্লাহর নির্দেশের, আর যারা আল্লাহর হেদায়াত মেনে চলে তাদের– অন্য কারো নয়।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ
شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَّلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ

২৫৩. এই (যে) নবী রসূলরা (রয়েছে)- এদের কাউকে কারো ওপর আমি বেশী মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে এমনও (কেউ) ছিলো যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন এবং (এর মাধ্যমে) কারো মর্যাদা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন; আমি মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে (কতিপয়) উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতপর পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের (আগমনের) পর যাদের কাছে এসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে তারা কখনো মারামারিতে লিপ্ত হতো না, কিন্তু (রসূলদের পর) তারা (দলে উপদলে) বিভক্ত হয়ে গেলো, অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো আবার তাদের কিছু লোক (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীকে) অস্বীকার করলো, (অথচ) আল্লাহ পাক চাইলে এরা কেউই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

রুকু ৩৪

২৫৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমার দেয়া ধন সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো- সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বেচাকেনা, বন্ধুত্ব ভালোবাসা থাকবেনা- থাকবেনা কোনো রকমের সুপারিশ। (এ দিনের) অস্বীকারকারীরাই হচ্ছে যালেম। ২৫৫. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি এক সত্তা, ঘুম (তো দূরের কথা, সামান্য) তন্দ্রাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে না; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর; কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ لَاۤ
اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى
النُّوْرِ ۥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ اَلَمْ تَرَ
اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ

করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন (তবে তা ভিন্ন কথা), তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান। ২৫৬. (আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, (কারণ) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বাতিল (মতাদর্শ)-কে অস্বীকার করে, আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই শোনেন) এবং (সবকিছুই) জানেন। ২৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), তিনি (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে তাদের (ঈমানের) আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, বাতিল (শক্তিসমূহ)-ই হয়ে থাকে তাদের সাহায্যকারী, তা তাদের (দ্বীনের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়; এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

রুকু ৩৫

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখোনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ার) রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়ার পর সে ইবরাহীমের সাথে স্বয়ং মালিকের ব্যাপারেই বিতর্কে লিপ্ত হলো,

إِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ
إِبْرَٰهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

(বিতর্কের এক পর্যায়ে) ইবরাহীম বললো, আমার মালিক তিনি, যিনি (সৃষ্টিকুলকে) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, সে বললো, জীবন মৃত্যু তো আমিও দিয়ে থাকি, ইবরাহীম বললো, (আমার) আল্লাহ তায়ালা পূর্ব দিক থেকে (প্রতিদিন) সূর্যের উদয়ন ঘটান, (একবার) তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে বের করে দেখাও তো! (এতে সত্য) অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে কখনো পথের দিশা দেন না।

তাফসীর

আয়াত ২৫৩-২৫৮

আলোচ্য অংশটি সূরায়ে বাক্বারার তৃতীয় পারার অন্তর্গত, এ অংশটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটি বর্ণিত হয়েছে সূরায়ে বাক্বারার মাঝামাঝি জামানায় আর দ্বিতীয় অর্ধাংশটি হচ্ছে সূরা আলে-ইমরানের প্রথমাংশ। আমরা এখানে সংক্ষেপে প্রথম অংশের আলোচনা শুরু করবো। দ্বিতীয় অংশের আলোচনা হবে সূরা আলে-ইমরানের শুরুতে ইনশাআল্লাহ্।

সূরা বাক্বারার শেষ ভাগে সেই মূল বক্তব্যের পরিশিষ্টটি বর্ণনা করা হয়েছে যার পূর্বাভাষ এই সূরাটির সূচনাতেই প্রদান করা হয়েছিলো। অবশ্য সূরাটির দ্বিতীয় পারার শেষ অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়, আর তা হচ্ছে মুসলমানদের নব গঠিত দলটি যা মদীনায় এসে সবেমাত্র আশ্রয় পেয়েছিলো, তাকে অনাগত দিনের আরও কঠিন বিপদাপদের মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত করা। এসব বিপদ-আপদ আসলে আগেই শুরু হয়েছিলো এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র এ ছোট্ট দলটি ঈমানরূপী এ মহা আমানতের কঠিন বোঝা বহন করার জন্যে পুরোপুরিভাবেই দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছিলো এবং পূর্বেকার নবী রসূলদের উম্মাতরা যেসব পরীক্ষা দিয়েছিলেন সে সব পর্যায়ও তারা অতিক্রম করে এসেছিলেন। তারা যেমন এ পথের রূপরেখা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন তেমনি এ পথে চলতে গিয়ে যে কোনো মুহূর্তে যে পদস্খলন হতে পারে সে বিষয়ও তারা ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তারা তাদের দুশমন, আল্লাহ্‌র দুশমন, সত্যের দুশমন ও ঈমানের সর্বপ্রকার তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। এভাবে তারা এই দুর্গম পথের সকল মনযিলের চিহ্নগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন।

সকল উপায়-উপকরণ, সকল পাথেয় ও অভিজ্ঞতা এবং সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই তাদের এই প্রস্তুতিগুলো গৃহীত হয়েছিলো।

ইসলামের প্রথম যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের প্রত্যেক দলকে কোরআনে কারীম যুগের প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে তুলেছিলো। এটাই ছিলো মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার সুষ্ঠু এবং সুদৃঢ় পথ। প্রত্যেক যুগেই ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্যে এই প্রশিক্ষণটারই প্রয়োজন ছিলো বেশী, আর সেই সময় থেকেই একটি জীবন্ত পথ প্রদর্শক হিসেবে কোরআনে করীম সক্রিয়ভাবে কাজ করে এসেছে। এ মহাগ্রন্থই প্রত্যেক যামানার সকল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বরং আরও সঠিক কথা হচ্ছে এই, যারাই কোরআনের কাছে সঠিক পথের সন্ধান চায়, সঠিক দিক নির্দেশনা চায় এবং জীবনের পদে পদে যতো প্রকার সমস্যা আসতে পারে, সে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যারা কোরআনের কাছেই হাযির হয়, কোরআন তাদের কখনো বঞ্চিত করে না; তাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক,

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্ববিষয় সম্পর্কেই কোরআন মজীদ উপদেশ ও সঠিক দিক নির্দেশনা দান করে।

আলোচ্য অধ্যায়ে সূরায়ে বাক্বারার সমাপ্তি পর্যায়ের কথা শুরু হয়েছে। নবী মোহাম্মদ (স.) কে সম্বোধন করে আল্লাহর নিম্নলিখিত কথাগুলো দিয়েই তা শুরু হয়েছে।

'আমি আল্লাহর আয়াতগুলো তোমার কাছে সঠিকভাবে তেলাওয়াত করছি। অবশ্যই তুমি রসূলদের একজন।'

একথাগুলো বনী ইসরাইলের সর্দারদের কথার জবাব দিতে গিয়ে বলা হয়েছিলো, এরশাদ হচ্ছে,

'মূসার অন্তর্ধানের পর বনী ইসরাইলের সর্দাররা যখন তাদের কাছে আগত একজন নবীকে সম্বোধন করে বললো, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ্ পাঠিয়ে দিন যার সাথে গিয়ে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করবো।'

এ প্রসংগে কোরআনের শেষ কথাগুলো হচ্ছে,

'দাউদ জালুতকে হত্যা করলো। আল্লাহ তায়ালা তাকে শাসনক্ষমতা ও বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন তাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ পছন্দমতো আরও বহু জ্ঞানের কথা।'

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পারার শেষ দিকেই মূসা ও দাউদ এর আলোচনা এসে গেছে। সে আলোচনার মধ্যে জানানো হয়েছে যে নবী মোহাম্মাদ (স.)-এর আগমন-বার্তা তাদের আগেই দেয়া হয়েছিলো। রসূলদের যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে বিবরণও এ অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। এরপরই তৃতীয় পারা শুরু হয়েছে এবং রসূলদের পূর্বেকার আলোচনাই এগিয়ে গেছে। এ আলোচনায় নবীদের একজনকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার কথা এবং কারো কারো কারো বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, আরও বর্ণনা এসেছে এদের কারো মর্যাদা বৃদ্ধি সম্পর্কে। তারপর এ নবীদর অন্তর্ধানের পর তাদের অনুসারীদের মধ্যে মতবিরোধ এবং ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, কাটাকাটির বিবরণও এখানে এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

(আল্লাহ)র এই যে নবী রসূলরা রয়েছে তাদের (সবার মর্যাদা সমান নয়) কাউকেও কারো ওপর আমি বেশী মর্যাদা ও সম্মান দান করেছি। এদের মধ্যে এমনও ছিলো যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলেছেন। আবার কাউকে তিনি অন্যদিকে বেশী মর্যাদা দান করেছেন। আমি মারইয়ামের ছেলে ......, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (মানব জাতির পরীক্ষার জন্যেই তেমনটি করননি, তিনি) তাই করেন, যা তার ইচ্ছা।

দ্বিতীয় পারার শেষে এবং তৃতীয় পারার শুরুতে বর্ণিত কথাগুলোর মধ্যে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায়, তার উপযোগিতা বা যৌক্তিকতাও রয়েছে। এরূপ উপযোগিতা অবশ্য সূরার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে মদীনায় ক্রমবর্ধমান মুসলিম দল, মদীনার অভ্যন্তরে ও উপকণ্ঠে অবস্থিত বনী ইসরাইলদের লোকদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়ই বিবাদ বেধে যেতো। এ বিষয়টি প্রথম দুটি পারায়ও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল জাতি বরাবর রসূলদের অনুসরণ প্রশ্নে মতভেদ করেছে এবং সর্বদাই তারা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। অবশ্য তাদের একটি দল যেমন কুফরী করেছে তেমনি অপর দলটি রসূলদের ওপর ঈমানও এনেছে। (এর বিস্তারিত বিবরণ উপযুক্ত স্থানে দান করা হবে ইনশাআল্লাহ।) এখানে সে সব ঘটনার উল্লেখই জরুরী মনে করা হয়েছে যাতে মুসলিম উম্মাহ তাদের সাথে ব্যবহারের সঠিক নীতি গড়ে

তুলতে পারে এবং রসূলদের সাথে বনি ইসরাইল ও অন্যান্যদের সঠিক ব্যবহার কি হওয়া উচিত তা তাদেরকে জানানো যেতে পারে। এদের মধ্যে অবশ্য অনেকে হেদায়েতের ওপর কায়েম ছিলো এবং অনেকে আবার সঠিক পথ পরিত্যাগ করেছিলো। এ ঘটনাটি জানতে পারলে এখনকার সঠিক পথের অনুসারী মানুষদের নবীর পথ পরিত্যাগকারীদের সাথে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

এ কারণে অতীতে রসূল ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে, এমনকি তারা যে প্রচন্ড ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে একথাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করার সাথে সাথে তাদেরকে এ কাজের প্রসার কল্পে খরচ করতেও এগিয়ে আসতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

সেই দিনটি আসার পূর্বে তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো। সেদিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না, থাকবে না কোনো সুপারিশ। কোনো দানও সেদিন গ্রহণ করা হবে না।'

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দ্বীনী দাওয়াত-এর সাথে জেহাদ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এবং সকল অবস্থাতেই এই কাজে অর্থের প্রয়োজন হবে। তাই, যারাই ঈমান আনবে তাদেরকে এ পথে চলতে গিয়ে দুঃখ কষ্ট বরদাশত করার সাথে সাথে অর্থের কোরবানীও দিতে হবে। বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুগে, যখন রসূল (স.) ও তাঁর সংগী সাথীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন আল্লাহর পথে খরচ করার এই মালের কোরবানীর বড়ো বেশী প্রয়োজন ছিলো।

তারপর যে চিন্তাধারার ওপর মুসলিম জামায়াতের অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে তার মূলনীতিগুলো এখানে একে একে বিধৃত হয়েছে। সে বিবরণের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব এবং তার অস্তিত্ব, সব কিছুই যে একমাত্র তিনিই পরিচালনা করে চলেছেন এবং তাঁর কারণেই সকল কিছুর অস্তিত্ব টিকে আছে, এ কথাগুলোর ওপর ঈমান আনা। এ কথাটিও জানানো হয়েছে যে, সাধারণভাবে সব কিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বিরাজমান। তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান সব কিছুর ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। সব কিছুর ওপর তাঁর তদারকী ক্ষমতা রয়েছে তথা তাঁর ক্ষমতা সব কিছুকেই ঘিরে রেখেছে এবং সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণও একমাত্র তিনিই করে চলেছেন। তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোনো সুপারিশ করা চলে না, তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া কারো কোনো জ্ঞানও নেই। এসব কথা জানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধ্যান ধারণা নিয়ে তাঁর পথে চলতে পারে। কেননাএই পরিষ্কার আকীদা বিশ্বাসের ওপরই সকল কাজের পূর্ণতা নির্ভর করে। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহ তায়ালা এক চিরঞ্জীব পরাক্রমশালী সত্ত্বা- এই বিশ্ব ভূমন্ডলের সব কিছুকে তিনি অত্যন্ত শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন- তিনি ছাড়া (এই আকাশ নভোমন্ডলে) দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নাই। (সমগ্র সৃষ্টিকূলের সৃষ্টি ও পরিচালনার কাজে) ঘুম (তো দূরে থাক) সামান্য তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, এই বিশ্ব চরাচরে যেখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তার, কার এমন সাহস আছে যে, এই শাহানশাহর দরবারে তার বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে?

প্রতিটি সৃষ্টির বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন। তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই তার সৃষ্টির জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কোনো ছিটে ফোঁটা বিষয়ের কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করে থাকেন, তবে তা ভিন্ন কথা আসমান যমীনের সব

কিছুই পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এ উভয়টি ও এর মধ্যে সৃষ্টিকূলের হেফাযত করার কাজ তাই কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না। তিনিই হচ্ছেন মহান ও অসীম ক্ষমতার আধার!

'ইসলামের ধ্যান-ধারণাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কোন জবরদস্তী নেই, অসত্যের আধারের মধ্য থেকে সত্যের বাতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন যে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে, সেইই মজবুত করে ধারন করেছে সেই দৃঢ় বন্ধনের রশীকে যা কখনও ছিঁড়বার নয়, আর আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্ত্বা যিনি শুনেন এবং দেখেন আর সেইতো (সে মোমেন) নির্লিপ্ত চিত্তে ও পরম প্রশান্ত মনে তার পথে চলে আল্লাহর সাহায্য বলে এবং আল্লাহরই পরিচালনায়। সে আল্লাহর হেদায়েতের ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে এবং তাঁর পরিচালনার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল। এরশাদ হচ্ছে,

আল্লাহ তায়ালা তাদের বন্ধু অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে তিনি অন্ধকারের ঘনঘটা থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করেছে। তাদের বন্ধু আল্লাহদ্রোহী, সীমা লংঘনকারী ব্যক্তিরা যারা তাদেরকে আলোক থেকে বের করে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। ওরাই তো হচ্ছে দোযখবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরদিন।'

এভাবে এই পারার শুরুতে এই কথাগুলো একের পর এক বর্ণনায় এসেছে। সূরাটির শুরু হয়েছিলো যে কথাগুলো দিয়ে সেই আলোচনার ধারাই গোটা সূরাটিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যাতে করে এর ফলে মুসলিম জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে স্থিরিকৃত হয়ে যায়।

মৃত্যু ঠিক সেইভাবে সত্য যেভাবে জীবনের আগমন সত্য– একথার ওপর ঈমানী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে নীচে কিছু আলোচনা আসছে। বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ.)কে যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তার মধ্যে দুটি পরীক্ষা ছিলো প্রধান। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয় একটি অভিজ্ঞতাও তার জীবনে এসেছে, আর তা হচ্ছে জীবন ও মৃত্যুর বাস্তবতা। আসলে এ উভয় অবস্থার সরাসরি সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার সাথে। ইচ্ছা করলেই কেউ কাউকে মারতে পারে না। এখানে আল্লাহর ইচ্ছাই সব কিছুর মধ্যে প্রবাহিত। এ বাস্তব অভিজ্ঞতাটি ইবরাহীম (আ.) যে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছিলেন তা অন্য কোনো মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। একমাত্র তিনিই এ পরম ও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা রহস্যসমূহ মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সীমার মধ্যে আসা কোনো কঠিন ব্যাপার বরং এটাই সঠিক কথা যে, আল্লাহর অসীম জ্ঞান-ভান্ডার মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার বহু উর্ধের জিনিস ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধ ও জেহাদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী পার্থক্য রয়েছে, যেমন ঈমানী ধ্যান ধারণা ও অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যকার পার্থক্য সবার কাছে স্পষ্ট।

এখান থেকে মুসলিম সমাজের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা শুরু হচ্ছে। তারপর জানানো হচ্ছে যে, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনভাবে সে দায়িত্ব পালন করা মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। এ সমাজে সূদী লেন-দেন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়েছে এবং একে অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম সমাজকে আল্লাহর পথে খরচ ও দান সম্পর্কে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং এই বিষয়েই সূরা বাক্বারার অবশিষ্টাংশে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনে মজীদের বহু সূরার মধ্যে এবং এই তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মধ্যেও আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

যে সমস্ত ঘটনা ও উৎসাহব্যঞ্জক ইতিহাস কোরআনে মজীদে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপযুক্ত স্থানে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে জেহাদ ও ক্বেতাল সম্পর্কে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কিছু

বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর পথে খরচ করা এবং সদ্কা-খায়রাত করাকে ইসলামী সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলেও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে দানশীলতার বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ইসলামী সমাজ এবং তার মোকাবেলায় সূদভিত্তিক অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে সে নোংরা সমাজের কাছে কোরআনের সুন্দর আবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আবেদনের ফলে সেই বাতিল সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তেমনি ধসে পড়েছে যেমন করে বজ্রপাত হলে কোন প্রসাদের সার্বিক ধ্বংস সাধিত হয়। এর সাথে সাথে কোরআনে কারীমের শিক্ষা উপস্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহ সোব্হানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিম সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও নির্মল একটি অর্থ ব্যবস্থা দিয়েছেন।

এবার আসছে ইসলামের আইন প্রণয়ন প্রসংগ। কোরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এখানে দুটি আয়াতের মধ্যে কোরআনে কারীমের আইনের মূলনীতি সম্পর্কিত কিছু কথা বিধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি আয়াত কোরআনের সব থেকে দীর্ঘ আয়াত। এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের মূল কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে। এগুলো কোরআনের শুরুতে বর্ণিত কথাগুলোর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এ বর্ণনা অত্যন্ত সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। অতপর একথাগুলো বলে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে যে, ইসলামী চিন্তা-চেতনার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতা, ঐশী গ্রন্থাবলী এবং রসূলদের ওপর দৃঢ়বিশ্বাস বা ঈমান। সেখানে একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, 'রসূলদের পরস্পরের মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য আমরা করি না।' এ মূলনীতি ইতিপূর্বে অন্য সূরার মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে। এমনি করে সূরাটির শেষের দিকে আল্লাহর সমীপে মুসলমানদের বিনম্র মোনাজাত ব্যক্ত হয়েছে। এই মোনাজাতের মাধ্যমে মোমেন ও তার রব-এর সম্পর্কের প্রকৃতি স্থায়ী ও সুনিবিড়ভাবে স্থির করে দেয়া হয়েছে। সূরাটির মধ্যে বর্ণিত বনি ইসরাইলের দিকেও এখানে ইংগীত পাওয়া যায়। দোয়া শেখাতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে 'হে আমাদের রব, পাকড়াও করো না আমাদেরকে আমরা যদি কিছু ভুলে গিয়ে থাকি অথবা কোন ক্রটি করে থাকি। হে আমাদের রব, আমাদের দ্বারা এমন কোন বোঝা বহন করিয়ো না যা বইবার মত শক্তি আমাদের নেই। মাফ করে দাও আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো সার্বিকভাবে আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং রহম করো আমাদের ওপর। তুমিই তো আমাদের মওলা; অতএব আমাদেরকে কাফের জাতির ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য করো।

এই সমাপনী কথাগুলো সূরাটির শুরু ও মধ্যস্থিত দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম বর্ণনার সাথে পরিপূর্ণ সাম স্যশীল।

'সে সকল রসূল যাদের মধ্যে কেউ ছিলেন এমন, যার সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছিলেন, আর তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা অনেক বাড়িয়েছেন এবং আমি, মারইয়ামের-পুত্র ঈসাকে বহু স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম এবং তাকে পবিত্র রূহ্ দ্বারা সাহায্য করেছিলাম। এমতাবস্থায়, ...আল্লাহ তায়ালা তাদের বন্ধু-অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন; আর যারা কুফরী করেছে তাদের অভিভাবক হলো তাগুতরা। তারা তাদেরকে আলোর থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।'

রেসালাত ও নবুওত প্রসংগ

বর্তমান পাঠ থেকে আমরা যে জিনিসটি পাচ্ছি তা হচ্ছে রসূলদের সম্পর্কিত বিশেষ ব্যাখ্যা। বলা হচ্ছে, 'ওই রসূলরা;'

এখানে কিন্তু 'এই রসূলরা' বলা হয়নি। এই বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁদের সম্পর্কিত কথাগুলো বুঝা অনেকটা সহজ হয়ে গেলো। এ কথা দ্বারা অত্যন্ত জোরালো এবং স্পষ্টভাবে রসূলদের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সূরার গোটা পাঠটি একত্রে সামনে রাখলে আমরা দেখবো যে সামনে কোনো একটি কথার বর্ণনা আসার পূর্বেই সেই বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করে নেয়াটা আসলেই একটা উত্তম পন্থা।

রসূলরা হচ্ছেন মূলত একটি বিশেষ দল, তাঁদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যদিও অন্য মানুষের মতোই তাঁরা মানুষ! তারপরও প্রশ্ন থাকে যে, তবে তাঁরা কে? রেসালাতই বা কি জিনিস? রেসালাতের প্রকৃতিই বা কি? এ রেসালাত কিভাবে পূর্ণত্ব লাভ করে? একমাত্র তাঁরাই কেনো রসূল, অন্য কেউ নয় কেন? আর কেমন করেই বা তাঁরা রসূল হলেন? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে জাগে, যার জবাব উৎসাহী পাঠকের জানা প্রয়োজন। একথাগুলো লিখতে গিয়ে আমার নিজের অনুভূতি এমনভাবে কানায় কানায় ভরে গেছে যে, তাকে কথা কোনো ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু লেখা দরকার!

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, আর যে বিশ্ব পরিবারের আমরা একটি অংশ, সেখানে এসব কিছুকে নিয়েই আমাদেরকে চলতে হয় এবং এর যাবতীয় নিয়ম-কানুনের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হয়। এসব নিয়ম আল্লাহরই দেয়া। মানুষের সকল কাজই সহজ হয়, শৃংখলার সাথে সম্পাদিত হয় এবং সবাই নিজ নিজ কাজ যথাযথভাবে করতে পারে।

যখনই মানুষ রাব্বুল আলামীন এর কাছে আত্মসমর্থন করার মন-মানসিকতা নিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করতে শুরু করে তখন প্রকৃতির সব কিছুর সাথে তার আচরণে একটা গভীর মিল পাওয়া যায় এবং সে তার সীমিত অনুভূতি দ্বারা ইচ্ছা করলে বুঝতে পারে, যে সব কিছু যেমন স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে সেও একইভাবে তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করে চলেছে। তখন সে একথা অনুভব করে ধন্য হয় যে, খেলাফতের যে গুরুদায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিলো তার সীমিত পরিসরে যথাসম্ভব তার হক আদায় করার চেষ্টা সে করে চলেছে।

মানুষ বিশ্বাস করে যে তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতির বস্তু নিচয়ের জ্ঞান লাভ করার জন্যে তার সামনে মৌলিক কিছু উপায় আছে, যদি এটা মাঝে মাঝে অবশ্যই অনুমানভিত্তিক হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তাদের মতে আরও দুটি পথ আছে এবং তা হচ্ছে নিজ চোখে সেগুলো দেখা, অপরটি হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা যা অপরের কাছ থেকে জানা যায়।

এ উপায়গুলো সঠিক পথপ্রাপ্তির জন্যে কিছুতেই যথেষ্ট নয়। প্রকৃতির মধ্যে প্রদত্ত এ দুটি উপায় সঠিক পথ-প্রাপ্তির ব্যাপারে কিছু আংশিক কাজ করতে পারে। কিন্তু এগুলো যেমন পূর্ণাংগ নয় তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়। সুনিশ্চিতভাবে সেখানে এর সুফল আশা করা যায় না। তবুও সেগুলোর গুরুত্ব একেবারে কম নয়, এ দুটি উপায় তাকে প্রকৃতির সব কিছু থেকে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এতে যা কিছু সে হাসিল করে তা কোনো পূর্ণাংগ জ্ঞান নয়, যাকে তার যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্যে যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে; কারণ এসব কিছু প্রকৃতির নিয়ম কানুনের মধ্যে যে গোপন তথ্যগুলো রহস্যাবৃতাবস্থায় আছে– যা সব কিছুকে এক অদেখা বন্ধনী তা দ্বারা বেঁধে রেখেছে, তা মানুষের এ সীমিত দৃষ্টিশক্তির আংশিক দেখা দ্বারা

কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। তার জানার সুযোগ যতো দীর্ঘই হোক না কেন! আর এটাও সত্য যে, তার জানার ক্ষমতা আপেক্ষিক, অর্থাৎ জনে জনে তা বিভিন্ন রকমের হবে। এই যে মহাকাল- তা দুনিয়ার মানুষের এই জীবনকে কেন্দ্র করেই পরিমাপ করা হয়। আসলে এটা চূড়ান্ত কোনো জিনিস নয়, মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিতেই এর হিসাব-নিকাশ চলে, আর এই সময়ের একটা সীমাও আমরা এ দিয়ে বুঝতে পারি। এরই ওপর ভিত্তি করেই জানা শোনার কাজ এগিয়ে চলে। যতো কিছু জ্ঞান মানুষ এ উপায় দুটির দ্বারা লাভ করুক না কেন তা সীমিত হয়েই থাকবে, তাও থাকবে আংশিক ও আপেক্ষিকতার সীমার মধ্যে।

এ পর্যায়ে এসেই রেসালাতের বিষয়টির কথা বলতে হয়। এ হচ্ছে প্রকৃতির এমন এক অবস্থা যা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই দান করা হয়, যাতে সে একান্তভাবে তা গ্রহণ করতে পারে। এমন এক পদ্ধতির মাধ্যমে বান্দাকে এ রেসালাত দান করা হয় যার প্রকৃতি বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এর যে লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোই শুধু বুঝতে পারি। বুঝতে পারি সেই সুনিশ্চিত সূত্রটি যার ওপর গোটা সৃষ্টি টিকে আছে।

এটাই হচ্ছে ওহীর বিশেষ ব্যবস্থা। যাকে ওহী দান করা হয় তাঁকে তার বোঝা বহন করার শক্তিও দেয়া হয় এবং তাঁকে ওহী গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা দিয়ে তৈরী করা হয়। ওহী হচ্ছে এই সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক ইংগীতবাহী খবর। আর এই খবরটি এই সৃষ্টি লোককে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এক বিশ্বস্ত সংবাদ বাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। কিভাবে এই ইংগীতবাহী সংবাদ আসে, এর জন্যে কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় বা কিভাবে রসূলকে তৈরী করা হয়- এসব প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা প্রয়োজন।

এসব প্রশ্নের জবাব আমরা এভাবে দিয়ে থাকি যে, ওহী হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বান্দার জন্যে বিশেষ এক সংবাদ এ সংবাদ, তিনি তাঁর পছন্দনীয় কোনো বান্দার মাধ্যমে দুনিয়ায় পাঠান। এ বিষয়ে আল্লাহর কথা হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন কোথায় কাকে তিনি রেসালাত-এর এই আমানত দান করবেন।' এটা সৃষ্টির জন্যে প্রেরিত এ এক মহা বিস্ময়কর জিনিস যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

সকল রসূলই আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের সবাইকে প্রেরণ করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার জন্যে একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো, যাতে করে তিনি সকল সময়ের জন্যে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সকল রসূলই মানুষদের একই হেদায়েতের উৎসের দিকে ডেকেছেন, যে উৎসের কোনো সীমা-পরিসীমা কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। ফেরেশতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে এটা জানা যায় আল্লাহর হুকুম তামিল করে চলেছেন। নবী রসূল ও ফেরেশতা সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই এই তথ্য পাওয়া গেছে, যখন বাইরের জ্ঞান বৃদ্ধির কোনো সুযোগ তাদের আসেনি বা দেখা ও অভিজ্ঞতারও কোন ক্ষেত্রও তাদের সৃষ্টি হয়নি অথবা বিশ্ব প্রকৃতির সেইসব নিয়ম কানুনও যখন জানা যায়নি যা মানুষকে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করতে পারে তখনও তাদের চরিত্র ছিলো বিশ্বস্ত।

নবী রসূলরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার দিকে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন, যে সত্যের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাত লাভ হয়েছে এবং যে সত্যকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই দিকেই তাঁরা বরাবর মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। তাঁদের নিজেদের এ সত্যকে জানার স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে

এমনভাবে যে তাঁদের মন মগয সত্যের আলোকে আলোকিত থাকে। শেরক তাদের অস্তিত্বকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁদেরকে এইভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে, অন্য কোন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়।

নবী রসূলদের প্রকৃতির মধ্যে সত্যের প্রতি আগ্রহের প্রবণতার কথা তাঁদের নিজেদের ভাষায় মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এটা উল্লেখিত হয়েছে, অথবা তাদের কোনো কোনো আচরণে তা প্রকাশ পেয়েছে।

যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর কথা থেকে জানা যায়। তিনি বলেছেন; 'হে আমার জাতি, তোমরা কি দেখছোনা, আমি আমার রব-এর কাছ থেকে আগত স্পষ্ট দলীল-প্রমাণের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি এবং তিনি আমাকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে রহমত দান করেছেন, অথচ ....হে আমার জাতি, আমি যদি ওদেরকে (ঘৃণাভরে এবং যুক্তিহীনভাবে) তাড়িয়ে দেই তাহলে কে আমাকে আল্লাহর আক্রোশ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে সাহায্য করবে? এসব বিষয়ে (চিন্তা করে) তোমরা কি শিক্ষা নেবে না?

আবার দেখুন হযরত সালেহ (আ.)-এর ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই। তিনি বলেছেন. 'হে আমার জাতি, আমি তো অবশ্যই আমার রব-এর কাছ থেকে আগত সত্যের উপর টিকে আছি এবং তিনি আমাকে (নবুওতরূপ) রহমত দান করেছেন। এমতাবস্থায়, ...'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনী থেকেও আমরা একই ধরনের কথা জানতে পারি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘটনাটি কিভাবে উদ্ধৃত করেছেন, 'আর তার জাতি তার সাথে তর্ক জুড়ে দিল। সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করছো, অথচ তিনি তো আমাকে হেদায়েত করেছেন (সঠিক পথ দেখিয়েছেন)। আর পরিষ্কার জেনে নাও, মোটেই আমি ভয় করি না ওইসব জিনিসকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর (শক্তি ক্ষমতার) অংশীদার মনে করো। .... তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কি একটু কাজে লাগাবে না?

একই শিক্ষা আমরা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর ঘটনা থেকে পাই। তাঁর কথা কোরআনে এভাবে এসেছে, 'সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি খেয়াল করে দেখছো না, আমি আমার রব-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট দলীল প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এবং ......আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি, আর তাঁর কাছেই ফিরে যাবো (বলে বিশ্বাস করি)।'

হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে চূড়ান্ত কথা বলতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তার থেকেও আমরা এ সত্য জানতে পারি, তাঁর কথাগুলোর উদ্ধৃতি এভাবে আসছে, 'অবশ্য অবশ্যই আমার বকাবকি এবং আমার দুঃখের জন্যে আমি আল্লাহর কাছেই নালিশ পেশ করছি, আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।'

এমনিভাবে রসূলদের কথা, তাদের গুণাবলী ও আচরণ থেকে আমরা বহু কথাই জানতে পারি– যা একান্তভাবে সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা প্রকৃতিগতভাবে সত্য সঠিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আর নবী রসূলদের এ সকল কথাও জানা যায় তাদের কথা বিরোধীদের বিবেকের গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করতো, কিন্তু উপস্থিত স্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিলো বলে তারা সত্যকে স্পষ্টভাবে দেখে ও বুঝে তা মেনে নিতে পারেনি।

এইভাবে যতোই দিন পার হয়ে গেছে ততোই প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সৃষ্টিলোকের সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান এক ও অভিন্ন নিয়ম-কানুন আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষর মানুষের জ্ঞানের চোখকে খুলে দিয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে রয়েছে একই সুরের প্রতিধ্বনি এবং এই সুপ্রশস্ত

জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একই আন্দোলন বিজ্ঞজনের মনের মধ্যে বরাবরই এসব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক যে এক এবং অদ্বিতীয় তার ঘোষণা দিয়ে এসেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যেটুকু জ্ঞানের আলো মানুষের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে তার দ্বারা এ টুকু তো সে বুঝতে পারে যে সকল কিছুর সৃষ্টির মূলে রয়েছে যে অণু-পরামাণু তা আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। আসলে সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান পরমাণুগুলোই হচ্ছে তার মূল শক্তি এবং গোটা বিশ্ব চরাচরে যতো বস্তু আছে সব কিছুই এই পরমাণুরই যা চর্ম চোখে দেখা সম্ভব নয় তার স্থূলরূপ। এ সব কিছুর মধ্যে ধনাত্মক দুটি শক্তি পাশাপাশি সদা সর্বদাই বিরাজ করছে। বস্তু বলতে যা কিছু আমরা দেখি, তা সবই এর পরমাণুগুলোকে ভাংগার ফলেই সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই শক্তি সেই মহাশক্তির সাথে যুক্ত বলেই একে এভাবে দেখা যায়। এর দ্বারাই গোটা সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ প্রবাহ বিরাজমান থাকে। এমনি করে মানুষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে, সকল বস্তুর মধ্যে এই পরমাণুগুলো সদা-সর্বদা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বর্তমান রয়েছে, আর এ পরমাণুগুলোই ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। নিউট্রন ও প্রোটন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার মাইল গতিতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় এটি বর্তমান রয়েছে। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এই ঘূর্ণনের কাজটি সদা সর্বদা চলছে। বিজ্ঞানীদের বর্ণনা মতে প্রত্যেকটি পরমাণু যেন এক একটি সূর্য যার চতুর্দিকে আমাদের এই সূর্যসম অসংখ্য তারকারাজি দিবারাত্র অবিরামভাবে ঘুরছে।

গোটা সৃষ্টিজগতে একই নিয়মে একইভাবে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও এ আবর্তন চলছে। এ দুটি জিনিসের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় কাজ করে যাওয়া প্রমাণ করে যে, সব কিছু একই স্রষ্টার পরিচালিত একই নিয়মের অধীন। মানুষের জ্ঞান-গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় আজ পর্যন্ত যা কিছু ধরা পড়েছে তাতে সে স্পষ্টভাবে এটা বুঝতে পেরেছে যে সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র সেই মহাশক্তি যাঁকে আমরা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বলে স্মরণ করি। অন্য যা কিছু প্রাকৃতিক জিনিস বর্তমান রয়েছে, যেগুলোকে আমরা বিশেষভাবে আমাদের খেদমতে নিয়োজিত বলে অনুধাবন করতে পারি, সেগুলো সবই মহান সেই সত্তার আইন মোতাবেক চলছে, কেননা গোটা বিশ্বের সব কিছুর সাথে তারা একই সূত্রে গ্রথিত অবস্থায় রয়েছে।

যে সকল দৃশ্যমান তারা রয়েছে সেগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে আবর্তন করে চলেছে, তারা কখনও কাছাকাছি বা একত্রিত হয় না। এসব বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা আজ পর্যন্ত কোনো একমত হতে পারেনি। কিন্তু তারা এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার জন্যে অবশ্যই আত্ম-নিয়োগ করেছে, এভাবে তারা ধীরে ধীরে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আজ বুঝতে পেরেছে যে, এই সৃষ্টিলোকের সব কিছু মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে টিকে আছে এবং নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই মানসিক পরিবর্তন এটাও আল্লাহর নিজস্ব দান এবং সার্বিক দিক দিয়ে তারা আস্তে আস্তে নির্ভুল পথে সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে সেই মহা শক্তিমানের ইচ্ছা ও শক্তি সক্রিয় রয়েছে যিনি সব কিছুর মালিক। তাঁর ইচ্ছাই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কার্যকর রয়েছে। সুতরাং এই মহাবিশ্বের সব কিছুর মালিক যে এক আল্লাহ এ কথা বিশ্বাস করা তাদের জন্যে এখন সহজ হয়ে গেলো।

এ বিষয়ে মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞান দু একটি তথ্যই জানতে পেরেছে, যার ফলে কখনও সে আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, আবার কখনও সে ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। যে সব তথ্য সে সংগ্রহ করতে পেরেছে অবশ্যই তা আপেক্ষিক, আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। সে কখনও সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেনি, কেননা

গবেষণাভিত্তিক তথ্যাদি সর্বদাই পরিবর্তনশীল, যার একটি প্রায় অপরটির বিপরীতে মত পেশ করে, মাঝে মাঝে একটা আর একটার সাথে মিলেও যায়।

সৃষ্টির ধারা ও সকল কিছুর গতির মধ্যে একই নিয়ম থাকা সম্পর্কে যে আলোচনাটা আমি শুরু করেছি তার দ্বারা আমি বলতে চেয়েছি যে, সকল পয়গম্বর-এর কাছে একই বিশ্বস্ত ও নির্ভুল বার্তা পৌঁছানো হয়েছে। গোটা সৃষ্টি সেই একই উৎস থেকে এসেছে যার ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করা যায়, যিনি চিরন্তন যাঁর কাছ থেকেই একমাত্র সঠিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। অন্য যে জ্ঞান মানুষ নিজ চেষ্টা বলে পায় তা যেমন নির্ভরযোগ্য নয়, তেমনি তা পূর্ণাংগও নয়।

তাগুতকে বর্জন করা ঈমানের পূর্ব শর্ত

এরপর ঈমানের তাৎপর্যকে আরও বিস্তারিত আরো সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে দেওয়া হচ্ছে।

'কুফ্র-এর প্রকৃতিই হচ্ছে যে, 'কুফর' চায় যে তার দিকেই কাফের ব্যক্তিটি মনোযোগী হোক, সে তাগুতকে ক্ষমতায় বসাতে চায় এবং তাগুত-এর কাছেই তার সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্যে হাযির হয়। আর ঈমানদারদের প্রকৃতি হচ্ছে যাবতীয় বিষয়ের সমাধানের জন্যে তারা আল্লাহর কাছে যাওয়াকেই বিশ্বাস করে। তারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই সমস্ত ক্ষমতার মালিক ও উৎস হিসেবে গ্রহণ করে।

তাগুত শব্দটি এসেছে 'তুগ্ইয়ান' থেকে, যার অর্থ হচ্ছে জেনে শুনে আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা, অত্যাচার করা, যুলুম করা। এতে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস বা আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এর থেকে আল্লাহর পথ বর্জন করার যতো আচার-আচরণ বা পদ্ধতি থাকতে পারে সেগুলো সবই বোঝানো হয়। এসকল ধ্যান-ধারণা, চাল চলন বা নিয়ম নীতির সাথে আল্লাহর কোনো যোগাযোগ নেই। এসব কিছুকে সেই অস্বীকার করবে, যে একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। যে তাঁর ওপর নির্ভর করবে সেই নাজাত পাবে, আর তাঁর দেয়া কেতাব-রূপ-রশি ধারণ করার মাধ্যমে তার নাজাত আসবে- যে রশি কখনও ছিঁড়ে যাবার নয়।

এখানে বোধগম্য ও অর্থবহ সত্যকে পাওয়ার জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস তথা আল কোরআনকে আমরা সামনে পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তাঁর কেতাবকে মনে প্রাণে আল্লাহর কেতাব হিসেবে গ্রহণ করাই হচ্ছে সেই মযবুত রশি- যা কখনও ছিঁড়বার নয়। এ রশিটি নির্দিষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত, কারোর সাধ্য নেই একে ছিঁড়ে ফেলার। এ রশিকে যে ধারণ করবে সে নাজাত লাভ করা থেকে ব্যর্থ হবে না। এ রশির প্রান্তভাগ রয়েছে মুক্তি দাতা মালিকের হাতে।

ঈমান সেই মৌলিক সত্যের দিকে মানুষের মনোযোগকে আকর্ষণ করে যে সত্যের ওপর সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব টিকে আছে, আর সে সত্য হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাস্তবতা। ঈমান সে সত্যের দিকেই মানুষকে পথ দেখায় যা গোটা সৃষ্টিজগত অনুসরণ করে এবং যে ব্যবস্থাপনার ওপর এ বিশ্ব টিকে আছে। যে ব্যক্তি ঈমানের রশি আঁকড়ে ধরে সে মূলত আল্লাহর দেখানো পথেই চলে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলে সে অন্য কোনো অব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে পারেনা বা অন্য কোনো চিন্তাধারার সাথে নিজেকে সম্পৃক্তও করতে পারে না, পারে না সে বিভিন্ন পথের প্যাঁকে পড়ে পেরেশোন হতে। সত্য পথকে পরিত্যাগ করে সে ভ্রান্তিপূর্ণ কোনো ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে পারে না।

তিনি মুখের উচ্চারিত কথাগুলো যেমন শুনেন, তেমন অন্তরের সকল গোপন কথাও তিনি জানেন। অতএব, যে মোমেনের অন্তরে ঈমান আছে তাকে প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে সেদিন কিছুমাত্র কম করা হবে না, তার প্রতি কোন যুলুমও করা হবে না এবং সে ব্যর্থও হবে না। দেখুন কী চমৎকারভাবে হৃদয়ের পটে হেদায়েত ও গোমরাহীর জীবন্ত ছবি আঁকা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে হেদায়েত ও গোমরাহীকে দেখানো হয়েছে। কেমন করে আল্লাহ তায়ালার সত্য সঠিক পথের ওপর তারা ঈমান এনেছে, তা দেখানো হয়েছে। তিনিই তাদের বন্ধু অভিভাব, আর এই কারণেই তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, বের করে নেন তাদেরকে তিনি বিরোধী শক্তি ও ক্ষমতাধরদের নিগড় থেকে। এই বিরোধী শক্তি হচ্ছে কাফেরদের বন্ধু। এই মুরুব্বীরা তাদের হাত ধরে হেদায়াতের আলো থেকে বের করে নেয় এবং তাদের ঠেলে দেয় জাহেলিয়াতের গভীর তিমিরে। সত্যের আলো ও অসত্যের অন্ধকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে যে ছবি এখানে পেশ করা হয়েছে তা সত্যি এক অপূর্ব দৃশ্য। একে মনে হয় জীবন্ত এবং এ দৃশ্য যে দেখে সেও এর ফলে সজীব হয়ে ওঠে। এ ছবি দেখে এর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং এ ছবি তাকে এক দিক থেকে আর এক দিকে পরিচালিত করে, তার মন মস্তিষ্কে উদিত চিন্তাধারাকে এ ছবি শুধুমাত্র দোলাই দেয়না, তার খেয়াল ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে শুধু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করে না কিংবা তার অনুভূতির দুয়ারে শুধু প্রচণ্ড আঘাতই হানে না, বরং জীবন্ত অর্থ ও শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে পরিচালিতও করে।

এরপর কোরআনে অংকিত হেদায়েত নামের সেই পথের ছবির মর্যাদা যখন আমরা সঠিকভাবে বুঝতে চাইবো তখন আমাদেরকে এই ছবির বদলে কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। মূলত আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মোমেনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে ঈমানের দিকে আহবান জানান, আর যারা কুফরী করেছে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূত, তারা ওদেরকে কাফেরদের আখড়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ সকল ব্যাখ্যা আমাদের সামনে একদিন নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে বিরোধীদের যাবতীয় উত্তাপ ও আন্দোলন; কিন্তু এই জীবন্ত বর্ণনা ব্যাখ্যা যা মনকে উজ্জীবীত করে এবং সত্যকে তার নিজস্ব রূপ ফুটিয়ে তোলে, তা কখনও হৃদয় থেকে মুছে যাবার নয়।

আল্লাহ তায়ালা তাদের বন্ধু অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে, তিনিই ওদের অন্যায় অসত্যের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তাদের অভিভাবকরা সত্যের আলো থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাগুতের সাথে সখ্যতা কখনো এক সাথে থাকতে পারে না। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হলে তাগুতকে সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে।

এখানে বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায় যে,'যে তাগুতকে অস্বীকার করে তারপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক রশী ধরলো'....... অর্থাৎ তাগুতের সাথে কুফরী করাটা ঈমান আনার পূর্বশর্ত। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে হলে তাগুতের সাথে অবশ্যই সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। আমার কাজ কর্ম, শক্তি সামর্থ দিয়ে যদি আমি খোদাদ্রোহী শক্তিকে সহযোগিতাই করলাম, আমি নিজেকে যদি খোদাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কাজেই নিয়োজিত রাখলাম, তাহলে মুখে যতোই ঈমানের বুলি আওড়াই না কেন, আমার এই ঈমানের কোনো গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর কাছে নেই। মোমেনের কাজই হলো খোদাদ্রোহী শক্তির মূলোৎপাটন করে দ্বীনী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা– সুতরাং খোদাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার কোনো কাজে কখনোই সে

নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে না। যতো নবী রসূল আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন তাদের দাওয়াতই ছিলো মানবজাতিকে তাগুত বা খোদাদ্রোহী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে ছেড়ে দেয়া– সূরা নাহলে এই তাগুত বা খোদাদ্রোহী শক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'আমি প্রত্যেকটি জাতির কাছে রসুল পাঠিয়েছি, যাতে করে তাদেরকে সে বলতে পারে যে, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগুত থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকো।'

এই তাগুত সকল যুগেই ছিলো, সকল যুগে থাকবে। আপনাকে চিনে নিতে হবে আপনার সময়ে কারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে নিজেদের মন মতো আইন কানুন তৈরী করে মানুষকে নিজেদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখে নিজেদেরকে তাগুত বা আল্লাহদ্রোহী শক্তি হিসেবে প্রমাণ করেছে। ঈমানদার হিসেবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে চাইলে সকল ধরনের তাগুতকে বর্জন করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। তাগুতকে বর্জন না করে ঈমানের দাবী করাটা নাপাকী থেকে পবিত্র না হয়ে নামায পড়ার মতো বৈ কিছু নয়।

আসলে ঈমানই হচ্ছে নূর, প্রকৃতির দিক দিয়েও সত্য যেমন নূর তেমনি বাস্তবতার নিরীখেও সত্য হচ্ছে নূর। আর কুফ্‌র হচ্ছে অন্ধকার। বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন রূপেই এটা অন্ধকার; ঈমান এর ব্যাখ্যায় 'নূর' শব্দের প্রয়োগ থেকে উপযোগী আর কোনো শব্দই হতে পারে না এবং কুফ্‌র এর সঠিক ব্যাখ্যা অন্ধকারই বটে।

অবশ্যই ঈমান হচ্ছে এমন এক নূর যার আলোকে মানুষের গোটা সত্ত্বা উদ্ভাসিত হয়, বিশেষ করে যখন তার মধ্যে বিবেক বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। এই ঈমান তার রূহকে আলোকিত করে। আশপাশের লোকেরা সবাই এ নূর দেখতে পায় এবং তাদের সামনে এ নূর যেন ষোলকলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঈমানের এ নূর সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে দেয়। যাবতীয় জিনিসের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাকে জানিয়ে সকল প্রকার ধারণা, অভিব্যক্তি বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরে, আর তখনই মোমেনের অন্তর স্পষ্টভাবে এ নূরকে দেখতে পায়। এ নূরকে সে নিরীক্ষণ করে, স্থিরভাবে সে দাঁড়িয়ে দেখে এ সত্যের স্তম্ভকে যা অনড়ভাবে চতুর্দিকে শুধু আলোই বিলিয়ে যাচ্ছে।

এ আলো থেকে যে যতোটা নিতে চায় সে নিয়ে নেয়, এ আলোর কল্যাণে সে আল্লাহর রহমত, প্রশান্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং অবিচল স্থৈর্যের হকদার হয়ে যায়। সত্যের এ নূর রব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছানোর দরজাকে তার জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়, আর তখনই মোমেনের কাজ ও আল্লাহর কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখা দেয়, আর সে ধীরে সুস্থে আল্লাহর পথে চলতে থাকে; কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হলেও কারো সাথে তার কোনো সংঘাত বাধে না। তার পুরস্কারস্বরূপ বলা হয়েছে, সে এখানে বা পরকালে কোনোখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা বুদ্ধিহারাও হবে না। কেননা সত্য সঠিক পথ তার জন্যে উন্মুক্ত ও পরিষ্কার রয়েছে।

এই ঈমানই হচ্ছে একমাত্র 'নূর' যা মানুষকে একটি বিশেষ পথের দিকে তাকে নিয়ে যায়। অপরদিকে কুফর এর পথ হচ্ছে ভুল পথ, তা মানুষকে বহু অন্ধকার পথে পরিচালিত করে; যেমন প্রথম অন্ধকার হচ্ছে মানুষের কুপ্রবৃত্তি, যৌনাবেগ ও তার ক্ষুধা। দ্বিতীয় অন্ধকার হচ্ছে সত্য থেকে দূরে সরে থাকার প্রবণতা ও ভুল পথের প্রতি মোহ। তৃতীয় অন্ধকার হচ্ছে অহংকার ও বিদ্রোহী মনোভাব বা নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এক প্রচন্ড মোহ। চতুর্থ অন্ধকার হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্বলতা ও হীনতা। পঞ্চম অন্ধকার হচ্ছে মানুষকে দেখানোর মনোভাব ও কপটতা। ষষ্ঠ অন্ধকার হচ্ছে লালসা ও লাভ করার মনোভাবজনিত অন্ধকার। সপ্তম অন্ধকার হচ্ছে সন্দেহ প্রবণতা ও অস্থিরতা।

এই রকম আরো বহু প্রকারের অন্ধকার আছে যা বলে শেষ করা মুশকিল। কখনও এগুলো পর্যায়ক্রমে আসে আবার কখনও একসাথে এসে জমা হয়। আসে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে যে আল্লাহর দেয়া সত্য পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়। এরা আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত পথ পরিহার করে বাঁকা পথে শাসন ক্ষমতা দখলে প্রয়াসী হয়, আর এভাবেই মানুষ যখন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সত্য সঠিক নূরকে বাদ দিয়ে অন্য পথে চলে তখন সে বহুপ্রকার ও বহু শ্রেণীর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয় আর। আর এ সবগুলোই হচ্ছে ভুল ধ্বংসাত্মক পথ। এই বিপথগামী ও অন্ধকার পথের যাত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা, 'তারাই হচ্ছে দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে'; এটাই হচ্ছে কঠিন সত্য। সঠিক ঈমান এর আলোয় উদ্ভাসিত পথে যারা না চলবে তারা চিরদিন দোযখের আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকবে। সত্য এক ও অভিন্ন এবং অন্ধকারের পথ নানা রং-এর ও নানা ধরনের, সুতরাং সত্যকে পরিহার করে যেটাই ধরা হবে সেটাই গোমরাহী ও ধ্বংসাত্মক ছাড়া আর কি হতে পারে?

ইসলামের জেহাদ ও তার কারণ

এ পাঠ শেষ করে অন্য পাঠ শুরু করার পূর্বে 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'– দ্বীন ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই– এই আয়াত এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, আর তা হচ্ছে ইসলামে জেহাদের ফরয হওয়া এবং কোন্ কোন্ স্থানে ইসলাম জেহাদের ঝুঁকি নিতে অনুমতি দিয়েছে সে প্রসংগটি। এ প্রসংগে আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কেও কিছু আলোচনা এখানে একান্ত প্রয়োজন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যুদ্ধ করতে থাকো ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ পর্যন্ত বিশৃংখলা ও অশান্তি দূর না হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণত চালু না হয়ে যায়।'

ইসলামের কিছু সংখ্যক শত্রু জেহাদের প্রশ্নে ইসলামকে নানা প্রকার দোষারোপ করেছে। তারা মনে করে তরবারি দিয়েই শুধু জেহাদ করা যায়। আলোচ্য আয়াতের দ্বারা কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি আবার এই দোষারোপ খন্ডন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই শত্রুরা চায় মানুষের অন্তর থেকে জেহাদের প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধাবোধকে খতম করে দিতে। এ হীন চক্রের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হচ্ছে জেহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে কলংকিত করা। এদের ধারণা, এইভাবে মুসলমানদের জেহাদী চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়া যাবে। এ জন্যে এই আয়াতের পরিষ্কার ব্যাখ্যা আসা প্রয়োজন, যাতে এ প্রশ্নের ফলে উত্থিত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে।

এই উভয় দল এক দল বদনামকারী, অপর দল খন্ডনকারী, সবাই পাশ্চাত্যের ওই একই ময়দানের মানুষ– যারা নানাভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে এবং তারা চায় ইসলামের এই পথটার গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে। তারা চায় বিভিন্ন প্রশ্নের জালে জড়িয়ে মুসলমানদের তীব্র অনুভূতিকে খতম করে দিতে, চায় তাদের অগ্রযাত্রাকে রোধ করে দিতে। যে শক্তি একবারের জন্যেও যুদ্ধের মোকাবেলা করেনি বরং তা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে হতে শেষ হয়ে যাক এটাই তাদের আকাংখা, আর যারা ঈমান আনার পর সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব সংগ্রাম থেকে দূরে থেকেছে এবং বিভিন্নভাবে মানসিক গোলামীর শেকলে আবদ্ধ হয়ে থেকে সকল দিক থেকে নিষ্পেষিত হয়েছে তাদের অন্তরে একথা এঁটে দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ তো চলা দরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ভিন্ন কোনো দেশের মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। আক্বীদা বিশ্বাস যার যা আছে তাই থাক, তা নিয়ে তো কোনো যুদ্ধ হওয়া উচিৎ নয়। বিদেশীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ তো জেহাদ

হতে পারে না, সেগুলো তো হয় শুধু বাজার দখল, খনিজ সম্পদসমূহের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার ও বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্র ও অট্টালিকা দখলের প্রতিযোগিতা। এগুলো কখনোই জেহাদ বলে গৃহীত হবে না। এ সমস্ত কথা বেশী বেশী প্রচার করে জেহাদের মূল প্রেরণাকে খতম করে দেয়া হচ্ছে।

ইসলাম অতীতে তরবারি যুদ্ধে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে এবং অন্যায় অত্যাচার ও বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছে। এর উদ্দেশ্য কখনো মানুষকে জবরদস্তি ইসলাম গ্রহণ করানো ছিলো না, বরং জেহাদের যতোগুলো লক্ষ্য রয়েছে তা পূর্ণ করাই ছিলো এ সংগ্রামের লক্ষ্য।

সর্বপ্রথম ইসলাম সংগ্রাম করেছে মোমেনদেরকে নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে, এরপর তাদের জান মাল ইযযত আবরু এবং আকীদা বিশ্বাসকে যেন তারা ধরে রাখতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা ছিলো তাদের আরেকটি লক্ষ্য। এ সূরার শুরুতে এ বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা করে বলা হয়েছে যে উপরে বর্ণিত ইসলামের লক্ষ্য দুটি দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম সাধনার ফলেই অর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে (২য় পারাতে) এরশাদ হয়েছে, বিশৃংখলা ও মানুষের ওপর অত্যাচার অবিচার যুদ্ধ থেকেও ভয়ংকর।' সুতরাং আমি মনে করি, আকীদা বিশ্বাসকে আক্রমণ করা বা এ জন্যে তার ওপর কোনো বল প্রয়োগ করা আর সে জন্যে তাকে কষ্ট দেয়া সব থেকে বড়ো যুলুম এবং সব থেকে কঠিন ফেৎনা। উপরন্তু তার আত্মীয় স্বজনকে এজন্যে দোষী সাব্যস্ত করা ও তাদের ওপর অত্যাচার করে তাদের জান মালের ক্ষতিগ্রস্ত করাও কঠিন যুলুম। এ কারণেও তাদের সাথে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে পড়ে এবং এই কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মুসলমানরা ঈমান আনার কারণেই সমাজের চাপ এবং নানাবিধ যুলুম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিলো, এ অবস্থায় তাদের যা কিছু ছিলো তা নিয়েই যুদ্ধে নামা ছাড়া আর তাঁদের কোনো উপায় ছিলো না। তাদের আকীদাকে পরিবর্তন করানোও তাদের জীবন বিপন্ন করার এই যুলুম বিভিন্ন দেশে তাদেরকে একমাত্র বিশ্বাসগত কারণেই দেয়া হয়েছে, যেমন স্পেনের আন্দালুস মানব ইতিহাসের এক অমানবীয় নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছে, মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র তাদেরকে তাদের 'দ্বীন' থেকে ফেরানোর জন্যে দলবদ্ধভাবে হত্যা করা হয়েছে সভ্যতা সংস্কৃতি।

খৃষ্টান প্রোটেষ্ট্যান্টদেরকেও এ ধরনের পরীক্ষায় পড়তে হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক মতবাদের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে তাদেরকেও নির্যাতন করা হয়েছে। স্পেনে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে যে কারণে সে এই একই অপরাধে (?) ভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানদেরকেও বিভিন্ন দেশে সেই পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছে। এইভাবে বায়তুল মাকদেস ও তার আশপাশের এলাকাতে একমাত্র খৃষ্টধর্ম বিশ্বাসের কারণেই তাদের ইহুদীদের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। শুধুমাত্র ইসলামী আকীদার অধিকারী হওয়ার কারণেই এই এলাকায় মুসলমানদের বিভিন্ন সময়ে চরম বিপদে পড়তে হয়েছে। তারা এখনও ঈমান বাঁচানোর জন্যে নিজ নিজ এলাকায় সংগ্রাম করে চলেছে। তারা এক সময় আন্দালুসের মযলুম উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ও দিয়েছে। এমনি করে মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একমাত্র আকীদার কারণে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তারা নিগৃহীত হয়ে চলেছে সমাজতন্ত্রীদের হাতে, মূর্তিপূজারীদের হাতে, চরম পন্থী ইহুদীদের এবং খৃষ্টানের হাতে, আর এই একই কারণে মুসলমানদেরকেও তাদের সবার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে– যদি প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান হয়।

দ্বিতীয় যে কারণে ইসলাম জেহাদের কাজ চালিয়ে গেছে তা হচ্ছে ইসলামী দাওয়াতের পথ পরিষ্কার করা। বলা বাহুল্য যে দাওয়াত দানের কাজটি তারাই করবে যারা এই আকীদাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। এটাই সুনিশ্চিত সত্য যে একমাত্র ইসলামই সমগ্র সৃষ্টির জন্যে পূর্ণাংগ মতাদর্শ এবং জীবনকে সমৃদ্ধশালী করার মতো একটি জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে। গোটা মানবমন্ডলীকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যেই এই কল্যাণকর ব্যবস্থা তথা ইসলামের উদাত্ত আহবান পৌঁছে দেয়ার কাজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে চালাতে হবে। স্পষ্ট এ জীবন বিধান পৌঁছে যাওয়ার পর যার ইচ্ছা সে এ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক অথবা অস্বীকার করুক এটা তার খুশী, সুতরাং এই 'দ্বীন' গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো ওপর কোনো প্রকার জবরদস্তি নেই। তবে এর পূর্বে সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমগ্র মানবমন্ডলীর কাছে এ কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থাকে পৌঁছে দিতে হবে- এটাই মুসলমানদের দায়িত্ব, আর এ ব্যবস্থাটি এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্যেই। এ কাজকে চালু রাখতে গেলে বহু বাধা বিপত্তি আসবে, আসবে ঝড়-ঝঞ্ঝা, আসবে বিরোধীতা ও দুঃসহ নির্যাতন। মানুষ ইসলামের কথা শুনতে চাইবে না, প্রথম প্রথম তারা গ্রহণও করবে না। এসব দুঃসহ জ্বালা সয়ে আল্লাহর পথের পথিকরা যদি অবিরাম গতিতে তাদের প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং কোন অবস্থাতেই ক্ষ্যান্ত না হয় তাহলেই তারা দেখবে মানুষ ইসলামের সুমহান পতাকাতলে দলে দলে সমবেত হবে।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আপনি প্রায়ই দেখবেন এই বিরোধিতার ঝড়-তুফান যখন শুরু হবে তখন তা শুধু ব্যক্তি, সংগঠন বা দল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা এ আহবানকে রোধ করতে গিয়ে মানুষকে এমনভাবে বাধা দিতে থাকবে যেন অন্যরা এ অমিয় বাণী শুনতেই না পায়। যারা হেদায়াতের এ আলো গ্রহণ করবে তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতেও তারা কোনো দ্বিধাবোধ করবে না। তারা মনে করে যে এ আওয়ায মানুষের কান পর্যন্ত যদি পৌঁছে যায় তাহলে আজ হোক বা কাল হোক, এ ব্যবস্থাকে মানুষ অলিংগন করবেই। আর তখন তাদের ক্ষমতার মসনদ নড়ে উঠবে। তখ্‌তে তাউসে বসে তারা ভাবছে জনগণকে বঞ্চিত করে এইভাবে বিলাসিতাপূর্ণ চিরদিন জীবন যাপন করতে পারবে। তাই ইসলামের এই উদাত্ত আহবান তাদের হৃদকম্প সৃষ্টি করে, তারা এ আমন্ত্রণের প্রতি এতো মারমুখী হয়। সুমহান লক্ষ্য অর্জনেই মূলত ইসলামের আগমন ঘটেছে। ইসলামের দুর্নিবার ব্যবস্থা মানব নির্মিত সমগ্র বাতিল ব্যবস্থাকে চুরমার করে দেয় যার নিগড়ে পড়ে মানবতা নিষ্পেষিত হচ্ছে। তারপর ইসলাম সেস্থলে পূর্ণ ইনসাফপূর্ণ একটি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে মানুষকে সত্য সঠিক পথে আহবানের অবাধ সুযোগ সুবিধা থাকবে, আমাদের দাওয়াত দানকারীদের এখানে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত থাকবে, চলবে এ সংগ্রাম। গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে একজন মুসলমানদের দায়িত্ব, সারা জগতের মুসলমানদের এ দায়িত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং এ দায়িত্ব পালনে তাদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, যদি সত্যই তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে।

তৃতীয় যে কারণে ইসলাম জেহাদ পরিচালনা করেছে তা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে তার বিশেষ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, সেই ব্যবস্থাকে স্থায়ী রাখা এবং তার পক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করা। কেননা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই একমাত্র ব্যবস্থা যা মানুষের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে, সাথে সাথে জনগণের মধ্যেও এই চেতনা জাগায় যে দাসত্ব

ও নিরংকুশ আনুগত্য নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাজ হিসেবে মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভূত্বকে খতম করতে হবে– তা সে প্রভুত্ব যে কোন প্রকারের এবং যতোটুকু হোক না কেন। মানুষের জন্যে কোন ব্যক্তি মানুষ, কোন সংগঠন অথবা কোন জনগোষ্ঠী, কেউই আইন তৈরী করতে পারে না এবং তাদেরকে নিজেদের আইন বলে পদানতও রাখতে পারে না। সমগ্র মানুষের জন্যে আইন রচনার কাজ একমাত্র তিনিই করতে পারেন যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, মনিব এবং স্রষ্টা। একমাত্র তাঁর কাছেই আনুগত্য ভরা মাথা নত করা যায়, যেমন করে একমাত্র তাঁর শক্তি ক্ষমতার ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর গোলামী করা যায়। ইসলামী ব্যবস্থায় একমাত্র আল্লাহর আইন অনুসারে যে শাসন কাজ পরিচালনা করে তার ছাড়া অন্য কোনো মানুষের আনুগত্য করা যায় না। ইসলামী দলের কাজই হচ্ছে শরীয়তের আইন কানুন চালু করা, অন্য কোন মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো ব্যবস্থা নয়। কেননা কোনো মানুষের পক্ষেই সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্যে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল বান্দার প্রয়োজন বুঝে তাদের জন্যে আইন দান করতে পারেন। তাঁর দেয়া আইনের মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে তাঁর প্রভুত্ব প্রকাশিত হয় এবং সে প্রভুত্বের প্রদর্শনীও একমাত্র এভাবেই সম্ভব হয়। সুতরাং তাঁরই একজন বান্দা হয়ে আইন প্রণয়নের এই কাজ কোন মানুষ করবে এবং প্রকারান্তরে স্বয়ং মালিকের আসনে সে নিজেকে বসাবে এটা কোনোভাবেই বৈধ কাজ হতে পারে না।

এইটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ম যা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই মূলত ইসলামের আগমন ঘটেছে। এই নিয়ম নীতির ভিত্তিতেই মানুষের জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক নৈতিক বিধান গড়ে ওঠে, যার মধ্যে সমগ্র মানুষের স্বাধীনতার জামানত দান করা হয়েছে। সেখানে সেই মানুষের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা হয়েছে যে এখনও ইসলাম কবুল করেনি। তাদের মান মর্যাদাকেও সেখানে অক্ষুণ্ন রাখার সব ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে, – তার আকীদা বিশ্বাস যাইই হোক না কেন। সেখানে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে কাউকেই মজবুর করা হয় না। বাধ্য করা হয় না কাউকে ইসলামী বিধানকে মেনে নেয়ার জন্যে। তাদের কাছে 'দ্বীনের দাওয়াত' পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব শেষ।

এই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ইসলাম জেহাদ করেছে। এ ব্যবস্থাকে সমাজ জীবনের সর্বত্র চালু করা এবং এ ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থন আদায় করাই ইসলামী আন্দোলনের কাজ। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রত্যেক মুসলমানের এটা একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে যে, তারা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত আইন প্রণয়নকারী আল্লাহদ্রোহীদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেবে এবং তাদের প্রণীত আইন কানুনকে ভেংগে চুরমার করে দিয়ে সেখানে খোদ আল্লাহর আইন চালু করবে, কেননা বিদ্রোহীরা আল্লাহর রাজ্যে নিজ আইন চালু করার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বান্দায় পরিণত করেছে, যার কোন অধিকারই তাদের নেই। এটাও সম্ভব নয় যে ইসলাম মানুষকে সজোরে টেনে এনে ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়ে দেবে, আর নিজেদের ব্যক্তিগত আকীদা বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে স্বাধীন বলে অভিহিত করবে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তার সামাজিক নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসমূহ মেনে নেবে। অন্তরের বিশ্বাসের ব্যাপারে

প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন, ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনায়ও তারা স্বাধীন। সেখানে তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী চলবে নাগরিক হিসেবে ইসলাম তাদেরকে তাদের বিশ্বাসগত আযাদী করে হেফাযত করবে, তাদের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে, আর তাদের দৃষ্টিকোণের বিবেচনা তাদের সম্ভ্রমকে রক্ষা করবে।

ইসলামী ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে জেহাদ প্রয়োজন তা অবশ্যই সীমাবদ্ধ মুসলমানদের মধ্যেই থাকবে, এটা ধরে নেয়া যায়। কেননা আল্লাহর ঘোষণা, 'জেহাদ চলবে ততোদিন যতোদিন বিশৃংখলা ও অশান্তি দূর না হয়, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাংগভাবে চালু না হয়ে যায়, পৃথিবীতে কোন বান্দার প্রভুত্ব কায়েম না থাকে।

বিশ্বাসগত দিক অর্থাৎ ইসলামী আকিদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে ইসলাম কখনও অস্ত্র ধারণ করেনি, আর ইসলামের প্রচার ও প্রসারও তরবারির দ্বারাও হয়নি, যদিও এ ধরনের কিছু দোষ ইসলামের দুশমনরা সব সময় ইসলামের ওপর দিতে চেয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে, যাতে করে এর আওতায় যারা আসবে, এর ছায়াতলে যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা যে আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারীই হোক না কেনো তারা যেন নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে এবং বাস্তব দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত আইন-কানুন (যার সম্পর্ক একমাত্র দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তির সাথে এবং মানুষের পারস্পরিক কল্যাণের সাথে জড়িত এমন কিছু তারা মেনে নিতে পারে, তাহলে আকিদা তা যাই থাকুক না কেন এবং ইসলামের আকিদা বিশ্বাসগত দিকগুলো যদি সে নাও মানে তবু তারা সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে।

ইসলামের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, এর প্রচার ও প্রসারের জন্যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের নিজ বিশ্বাসের ওপর নিশ্চিন্তে টিকে থাকার জন্যে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভের জন্যে– এ দুনিয়ায় বরাবরই মানুষদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিলো। এর প্রয়োজন ছিলো এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও হেফাযতের জন্যেও। জেহাদ কোনো নগন্য জিনিস বা কোনো গুরুত্বহীন জিনিস নয়। এর প্রয়োজন আজও শেষ হয়ে যায়নি এবং ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও এর গুরুত্ব কোনো দিন কমবে না। অবশ্য ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদেরকে এই ধারণা দিতে চায় যে ইসলামী ব্যবস্থার জন্যে শক্তি সঞ্চয় বা শক্তি লাভের কোন প্রয়োজন নেই।

অবশ্য ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে যার প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্ষমতা প্রয়োজন, আর এ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এবং এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সংগ্রামসহ সার্বিক সংঘর্ষ-জেহাদ। এছাড়া ইসলাম টিকতেও পারে না, নিজের ব্যবস্থা সে পরিচালনাও করতে পারে না।

'দ্বীন এর ব্যাপারে জবরদস্তি নেই।' হাঁ, এ কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তার পাশাপাশি আল্লাহর এই নির্দেশ ভুলে গেলে চলবে না 'তোমরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যতোটা পারো, শক্তি সঞ্চয়ের দ্বারা এবং অশ্বসমূহ পরিচালনার মাধ্যমে যাতে করে তোমরা আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতে পারো এবং তোমাদের দুশমনদেরকেও ভয় দেখাতে পারো। এ ছাড়া সে সকল দুশমনকে ভীত করে রাখার জন্যেও এ কাজ তোমাদের অব্যাহত রাখতে হবে– যাদেরকে দুশমনীর খবর তোমরা জানো না, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে আজ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আয়াতের আলোকে মুসলমানদের তাদের দ্বীনের তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে; বুঝে নিতে হবে তাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্ব। তাহলেই আশা করা যায় ইসলামের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে যারা চেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে দোষারোপের বাক্যবাণ ঘায়েল করতে পারবে না। এ সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ জ্ঞান তাদেরকে নিজ বিশ্বাসে অটল ও অবিচল থাকতে সাহায্য করবে এবং তাদের ধ্যান-ধারণা অন্যান্য মতবাদগুলোকেও প্রভাবিত করবে। প্রভাবিত করবে অন্যান্য সংগঠনকে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও। তাদের দ্বীনের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে আজ সর্বত্র যে নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে এবং জেহাদের যে মর্মার্থ তারা বুঝতে পেরেছে সেই চেতনা আরও বহু মুসলমানকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আসলে জেহাদ হচ্ছে বলদর্পী বাতিলের জন্যে এক ভীষণ প্রতিরোধ। জেহাদ মানুষের সেই কল্যাণ পিপাসা নিবারণের ঝর্ণাধারা যা নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটেছে।

যে ব্যক্তি জেহাদকে নিষিদ্ধ মনে করে এবং নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দেয় তার থেকে বড় অপরাধী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি ইসলাম ও জেহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান প্রমাণিত করার চেষ্টা করে সে মানবতার সব থেকে বড় দুশমন। সঠিক পথে চলতে চাইলে এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে চাইলে এই জঘন্য ইসলামের দুশমনকে অবশ্যই পরিহার করা প্রয়োজন। মোমেনদেরও কর্তব্য মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে এদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে গোটা মানব মন্ডলীর মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দান করেছেন এবং ঈমানরূপী নেয়ামত দ্বারা তাদেরকে ধন্য করেছেন। অতএব ইসলামের দুশমনদের চিহ্নিত করে নিজেদের স্বার্থে এবং গোটা মানবমন্ডলীর স্বার্থে তাদের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করে দেয়া তাদের কর্তব্য। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

জীবন মৃত্যুর রহস্য ও মূর্খ শাসকের ঔদ্ধত্ব

এরপর তুলে ধরা হয়েছে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে ইবরাহীম (আ.)-এর বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনাটি। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি কি দেখেছো সে ব্যক্তিকে যে ইবরাহীমের সাথে তার রব এর ব্যাপারে তর্ক করলো, কারণ তাকে আল্লাহ তায়ালা শাসন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সে তর্ক করেছিলো ইবরাহীম তাকে বলেছিলো, আমার রবই জীবন ও মৃত্যু দেন। সে বললো– না আমিই জীবন মৃত্যু দেই। ইবরাহীম তখন বললো, বেশ, আমার রব সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি পশ্চিম দিক থেকে তাকে উঠাও তো। এতে কাফের লোকটি হতভম্ব হয়ে গেলো। ....আল্লাহ তায়ালা বললেন আচ্ছা বেশ, তুমি চারটি পাখি ধরো এবং তাদেরকে ভালো করে চিনে রাখো, তারপর তাদের বিচ্ছিন্ন (কর্তিত) টুকরোগুলোকে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে এসো। এরপর নাম ধরে তাদেরকে ডাক দাও। দেখবে, তারা দ্রুতগতিতে তোমার কাছে চলে আসবে। জেনে নাও যে, আল্লাহ তায়ালা মহা-শক্তিমান, মহা-বিজ্ঞানময়।'

এই তিনটি আয়াতে একটি মাত্র বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে জীবন মৃত্যু ও জীবন মৃত্যুর তাৎপর্য। এ ঘটনার মাধ্যমে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সেই বিশেষ অংশকে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ প্রসংগকে সরাসরি 'আয়াতুল কুরসী' সংলগ্ন করে আল্লাহর গুণাবলীকে প্রমাণিত করা হয়েছে। এই পারার মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের ধারার সাথে সংযোগ রেখেই এর বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে।

কোরআনে করীমে এই সুদীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল ধারা বিবরণ মুসলমানদের বিবেক বুদ্ধি ও উপলব্ধি শক্তির কাছে এই সৃষ্টি রহস্যের মূল সত্যকে অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। এমন একটি বিষয় যার উপস্থাপনা সৃষ্টি তত্ত্বকে বুঝার জন্যে অত্যন্ত জরুরী। এ রহস্যটির দ্বার উন্মোচিত হলে দৃষ্টিশক্তিতে আরও বহু রহস্য ভেসে ওঠে এবং মানুষ তখন বহু সঠিক জিনিসের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, এ সময়ই তার মনে সুনিশ্চিত বিশ্বাস পয়দা হয় যা মানুষের মনের মধ্যে স্থিরতা ও অনাবিল প্রশান্তি এনে দেয়।

এরপর আলোচনা আসছে ইসলামের জীবন পদ্ধতি, জীবনে চলার পথের অনুসরণযোগ্য বাস্তব দিক নির্দেশনা, নৈতিক আচার-আচরণের নিয়ম-নীতি এবং সব কিছুর পরিপূর্ণ শৃংখলার সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ কার্যধারার ধারা বিবরণী প্রসংগে। কিন্তু এসব কিছু মানুষের আক্বীদা বিশ্বাস বহির্ভূত জিনিস নয় বরং আকীদার ভিত্তিতেই এসব কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। বিশ্বাসগত অবস্থান অনুসারেই এই জীবনের সুন্দর নিয়ম-নীতি ও বাস্তব কার্যধারা গড়ে ওঠে। এই কার্যধারার স্থায়ীত্বের জন্যে এবং সুদৃঢ়ভাবে ওই সকল নিয়ম-নীতিকে চালু থাকার জন্যেও একটি স্থায়ী মাপকাঠির প্রয়োজন, যার সাথে আক্বীদার গভীর সংযোগ থাকবে। সংযোগ থাকবে সৃষ্টিজগতের বাস্তবতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার, যার গভীরের সাথে মহান স্রষ্টার সাথে সূক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েছে, যিনি গোটা সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এইভাবেই মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে ঈমান আকীদা সম্পর্কিত নিয়ম নীতিগুলোকে অত্যন্ত জোরালো এবং স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারপর জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আইন-কানুন ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে ইবরাহীম (আ.) এবং এ সময়কার একজন বাদশার মধ্যকার বিতর্ক পেশ করা হয়েছে। এখানে আয়াতটি যে শিক্ষাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছে সে বিষয়ের জন্যে এর প্রয়োজন না থাকায় বিতর্করত ওই বাদশাহর নাম এখানে নেয়া হয়নি। এই বিতর্কটিকে মোহাম্মদ (স.) ও মুসলমানদের একটি দলের কাছে পেশ করা হয়েছে, যাতে তারা এ অদ্ভুত বিতর্কটি থেকে কিছু আনন্দ উপভোগ করতে পারে। বলা হয়েছে এ ব্যক্তি ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তার 'রব' সম্পর্কে তর্ক জুড়ে দিল। এই ঝগড়ার দৃশ্যকে কোরআন মজীদ বড় চমৎকারভাবে এখানে পেশ করেছে। দেখুন আল্লাহর বাণী,

'দেখেছো কি ঐ ব্যক্তিকে যে ইবরাহীম এর সাথে তার রব এর ব্যাপারে বিতর্ক জুড়ে দিলো, ...আর আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে পথ দেখান না।

ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিতর্করত এই বাদশাহ আসলে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো না; কিন্তু সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এক আল্লাহকে সব ক্ষমতার মালিক বলে সে মানতে নারায ছিলো। মানুষের প্রতিপালন ও সব কিছুর ওপর একমাত্র তাঁর ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনাই চলছে একথা সে স্বীকার করতো না। আজও অনেক হঠকারী নাদান আছে যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে মানে সত্য, কিন্তু তাঁর সাথে কিছু অংশীদার বানায়, তাদের সাথে আল্লাহর ক্ষমতার ভাগাভাগি করে। শাসন ক্ষমতায় এবং প্রতিপালনের ব্যাপারে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যকেও এ বাদশাহ মানতে চাইতো না। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে যে, তিনি ছাড়া হুকুম দেয়ার মালিক আর কেউ নেই, নেই সামাজিক বিধানদাতা আর কেউ। এই অস্বীকারকারী হঠকারী মানুষটি যে কারণে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মানতে চাচ্ছিলো না তা ছিলো এই যে, তাকে আল্লাহ তায়ালা বাদশাহ বানিয়েছিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার বাদশাহী প্রাপ্তির কারণেই এই অস্বীকার করার কথাটি সে বলতে পেরেছে। এই বাদশাহী প্রাপ্তিতে তার তো শোকরগোযারি করা উচিৎ

ছিলো এবং মানা দরকার ছিলো যে, সকল ক্ষমতা দানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। অতএব যারা আল্লাহর নেয়ামতের কদরদানী করে না এবং নিজের আচরণে সীমালংঘন করে সব কিছুর ওপর নিজের প্রভুত্ব খাটাতে চায়, বুঝতে চায় না শক্তি ক্ষমতার আসল উৎসটি কোথায়? তাদের বাদশাহী তাদেরকে রসাতলে কেন ডুবাবে না? এসব লোকদের পক্ষে শোকরগোযারি না করে কুফরী করাই স্বাভাবিক এবং হেদায়েতপ্রাপ্তি কস্মিনকালেও এদের ভাগ্য জুটেনা, বরং সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়াই হয় এদের ভাগ্য লিখন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মেহেরবানী করে শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই যে তারা শাসনকর্তা হতে পেরেছে এ কথা তারা মনে করে না। জোর করে মানুষের ওপর তাদের আইন কানুন চাপিয়ে দিয়ে তারা মানুষকে গোলাম বানাবে– এটা আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না, যেহেতু আল্লাহর নযরে সবাই সমান এবং সকল মানুষই আল্লাহর এক একটি ক্ষুদ্র দাস। তাদের উপযোগী আইন-কানুন তারা আল্লাহর কাছ থেকেই পাবে। তিনি ব্যতীত হুকুম দেয়ার মালিক বা আইন প্রণয়নের অধিকারী কেউ নেই। তাদের আসল পজিশন হচ্ছে তারা আল্লাহর খলীফা তারা নিজেরা কোন ক্ষমতার মালিক নয়।

এই পর্যায়ে এসে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কাছে নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করছেন এবং তিনি তাঁর নবীর কাছে এ বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন, 'তুমি কি দেখোনি সেই ব্যক্তিকে যে ইবরাহীমের সাথে তার রব এর ব্যাপারে তর্ক করলো, কারণ তাকে তিনি বাদশাহী দিয়েছিলেন।'

এখানে প্রথম শব্দটি 'আলাম তারা'– এ এমন একজোড়া শব্দ যার দ্বারা এক অদ্ভুত জিনিসের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। এ শব্দ দুটো একাধারে অস্বীকার ও অজ্ঞ থাকা উভয় অর্থই ব্যক্ত করে। কার্যত এর অর্থ দাঁড়ায়, এমন অদ্ভুত কিম্বাকার বেওকুফ ব্যক্তিকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখোনি যে এমন নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করতে পারে। আল্লাহর এতো নেয়ামত ভোগ করার পরও তার শোকরগোযারি না করে, উল্টা তাঁর স্থান নিজেকে দাঁড় করাতে চায়, এমন পাগল দুনিয়ায় আর কে হতে পারে। আর আল্লাহর আইন পাওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করে, প্রবৃত্তির তাড়নে পড়ে নিজেই মানুষের জন্যে আইন রচনার ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে এমন হতভাগ্য ও নির্বোধ লোক নিশ্চয়ই তোমরা দেখোনি। ওর নির্বুদ্ধিতা ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে

'ইবরাহীম বললো; আমার রব প্রাণ দান করেন ও মারেন।'

জীবন মৃত্যুর আনাগোনা এখানে প্রতি নিয়তই সংঘটিত হচ্ছে। এর নিয়ম পদ্ধতি সবার সামনেই আছে। মানুষের অনুভূতি ও বুদ্ধিতে সৃষ্টির এ গুপ্ত রহস্য ধরা পড়েছে। এ রহস্য সম্পর্কে যখন সে চিন্তা করে তখন ভীষণভাবে সে পেরেশান হয়ে যায়। এ রহস্য মানুষের উপলব্ধি শক্তিকে উচ্চতর এক শক্তির কর্ম কুশলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় এমন এক সৃষ্টিকর্তার কথা যিনি অন্তরীক্ষে থেকে সবকিছু পরিচালনা করছেন। এখানে সেই মহান পরওয়ারদেগারের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, যার হাতে সৃষ্টি ও লয় উভয় ক্ষমতাই বিদ্যমান। একথা মানুষ যখন বুঝে তখন সৃষ্টির এই কাজে অন্য কারো ভূমিকা আছে এমন অস্পষ্টতা তার মন থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে একমাত্র শর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই আশ্রয় পাওয়া সম্ভব, অন্য কারো কাছে কোন বিষয়ে কোনো আশ্রয় পাওয়ার উপায় নেই।

বাস্তবিকপক্ষে আমরা আজও জীবন ও মৃত্যুর সঠিক তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই জানি না, শুধুমাত্র এই জীবন মৃত্যুর বাহ্যিক অবস্থাটাই আমরা দেখি এবং কিছু কিছু আন্দাজ করি মাত্র। পরিশেষে জীবনের সূচনা ও মৃত্যুর পরে কি হবে তা জানার জন্যে আমাদের সেই মহাশক্তির মুখাপেক্ষী হতেই হয় যাঁর হাতে সবার জীবন নিবদ্ধ, আর তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ সোব্হানাহু ওয়া তায়ালা।

এইভাবে ইবরাহীম (আ.) তাঁর রবকে তাঁর সকল গুণাবলীসহ এমনভাবে জেনেছিলেন যেভাবে আর কেউ জানতে পারেনি। আর ভবিষ্যতে অন্য কেউ এভাবে জানবে বলে চিন্তাও করা যায় না। পরম করুণাময় আল্লাহর 'রবুবিয়্যাত' এর জন্যে প্রয়োজন দুটো জিনিসের এবং তা হচ্ছে তিনি হুকুম দেয়ার মালিক এবং তিনি আইন প্রণেতা, আর যখন ইবরাহীম (আ.) বললেন তার রবই জীবন মৃত্যুর একমাত্র মালিক তখন নির্বোধ বাদশাহ দাবী করে বসলো সেও নাকি বাঁচাতে ও মারতে পারে। ইবরাহীম (আ.) বেওয়াকুফটির এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে এবং তাকে বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে এমন একটি কথা বললেন যাতে সে লা জওয়াব হতে বাধ্য হয়ে গেলো।

ইবরাহীম (আ.) ছিলেন বিশেষভাবে আল্লাহ পাকের পছন্দ করা এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং তেজস্বিনী ভাষায় জীবন মৃত্যুর মূল রহস্যের কথা সে হতভাগ্য ব্যক্তির সামনে তুলে ধরেছিলেন, তুলে ধরেছিলেন জীবন দাতা ও জীবন কেড়ে নেয়ার রহস্যকে। এ এমন এক রহস্য যা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষই উদঘাটন করতে পারেনি, আর শুরু থেকেই তিনি গোটা সৃষ্টির মধ্যে অতি চমৎকার এমন ভারসাম্য কায়েম রেখেছেন যা এখনও আমরা জানি না। তবে তাঁর কিছু জিনিস আমাদের সবার কাছে বোধগম্য এবং অতি মনোরম দৃশ্য আকারে দেখা যাচ্ছে সেগুলো আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে রয়েছে। বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য বিরাজ করছে এবং আল্লাহর যে মহান গুণটি এখানে ফুটে ওঠেছে– তা এ কথায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়ে ওঠেছে– আমার রব তো তিনি যিনি জিন্দা করেন যিনি মারেন। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন যে, জীবন দান ও জীবন গ্রহণ এর কাজটি একমাত্র আল্লাহর হাতেই সীমাবদ্ধ, আর যারা আল্লাহর এই নেয়ামতকে মানতে রাযি নয়, নিজেদের হঠকারিতায় অনড় এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বাজে তর্ক করে তারা বলতে চায় যে, আল্লাহ তায়ালা হয়তো পৃথিবীর সব অংশের সব জনপদের ওপর শাসন ক্ষমতা রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের সব কিছুকে শাসন করেন, পরিচালনা করেন। বিশ্বজগতের প্রতিপালক বলেই তো তিনি মানুষেরও প্রতিপালক এবং তাদের জন্যে তিনিই সকল আইন-এর উৎস। তাই ইবরাহীম (আ.)-এর কথার উদ্ধৃতি পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'ইবরাহীম বললো, আমার রব তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে তোলেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে তোলো।'

এ সত্যটি বারংবার আমাদের সামনে ঘটছে। প্রতিদিন একই নিয়মে সূর্যের উদয় এবং অস্তের দৃশ্য আমাদের নযরে পড়ছে। সময়ের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, নিয়মের বাইরে কোন দিন একটু বিলম্বেও তা উঠছে না। প্রকৃতির এ ব্যবস্থা আল্লাহর সার্বক্ষণিক পরিচালনার সাক্ষ্য বহন করছে– যদিও মানুষ এই সৃষ্টিলোকের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে মোটেই অবহিত নয়, সে ঊর্ধ্বাকাশের মধ্যে নিহিত তথ্যসমূহ এবং দৃশ্যমান বস্তুর মূল রহস্য জানে না, আর নবী রসূলরা পৃথিবীর সূচনা থেকেই প্রতিটি পর্যায়ে মানুষকে এইসব দৃষ্টি আকর্ষণকারী বস্তুনিচয়ের দিকে তাকাতে বলেছেন এবং তাদের বুদ্ধিগত, কৃষ্টিগত এবং সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সকল পর্যায়ে তাদেরকে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এইভাবেই প্রকৃতি যেন মানুষকে জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত এক বাক শক্তি সম্পন্ন জীব হিসেবে এমনভাবে এ মহাসত্য সম্পর্কে জানাচ্ছে যার ওপর কোন বিতর্ক তোলার অবকাশ নেই। এই কারণেই 'তখন হতভম্ব হয়ে গেলো সে ব্যক্তিটি যে কুফরী করেছিলো।'

এখানে মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝা গেলো এবং আসল সত্য বিকশিত হলো। এখন ভুল বুঝাবুঝির আর কোনো সুযোগ রইলো না, রইলো না আর তর্কবিতর্ক করার এবং সন্দেহ করার কোনো অবকাশ। এমতাবস্থায় এ হতভাগ্য ব্যক্তির জন্যে উত্তম পথ ছিলো এ সত্যকে মেনে নেয়া এবং ঈমান আনা। কিন্তু, হলে কি হবে, সত্যপথ গ্রহণ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো তার অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা যার কারণে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো না এবং কুফরী অবস্থাতেই সে রয়ে গেলো। সে বুদ্ধিহারা ও দ্বিধাদ্বন্ধের মধ্যে পতিত বিভ্রান্ত হয়েই রয়ে গেলো। এ ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা সত্য সঠিক পথ দেখার তৌফিক দেন না, কারণ সে হেদায়েত চায় না, হেদায়েত পাওয়ার জন্যে সে লালায়িতও নয় তার নিয়তের কোন দৃঢ়তাও নেই, আর না আছে তার মধ্যে ইন্সাফ বা সুবিচারের অস্তিত্ব। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আর আল্লাহ তায়ালা যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।'

এই যে যুক্তির বার্তা আল্লাহ পাক তাঁর নবী (স.) ও তার অনুসারীদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তাই নিয়ে তারা বিশ্বের দরবারে হাযির হচ্ছেন। আজ এই যুক্তির বার্তা দিয়েই তারা সকল বিরোধী লোকের হিংসা বিদ্বেষ ও হঠকারিতার জবাব দেন। দাওয়াতী কাজের এই নতুন অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা বিরোধীদের মোকাবেলা করেন। তাদের বিরোধিতা থেকে মুসলমানরা এর মাধ্যমে ধৈর্য ধারণের ট্রেনিংও লাভ করেন।

এমনি করে স্পষ্ট ঈমানী ধ্যান ধারণার বলিষ্ঠ নীতিগুলো বাতিলপন্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে শেকড় গেড়ে চলেছে। আল্লাহ তায়ালা সে নীতিগুলোর মূল কথাগুলো ইবরাহীম (আ.)-এর কথার উদ্ধৃতি তুলে ধরে, পেশ করেছেন 'আমার রব তো তিনি যিনি যিন্দা করেন ও মারেন'

এর পরে বলা হচ্ছে,

'আমার রব সূর্যকে পূব কি থেকে তোলেন, তুমি তাকে পশ্চিম থেকে উঠাও।'

এসত্য যেমন সকল মানুষের জানা, তেমনি দিগন্ত বলয়ে প্রতিনিয়তই এ সত্য সংঘটিত হচ্ছে। এ হচ্ছে দুটি অমোঘ সত্য। এ সত্য দুটি বারবার সংঘটিত হচ্ছে, দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে এ সত্য দুটি মানুষের অন্তরের চোখে যেমন দাগ কাটছে তেমনি বাহ্যিক দৃষ্টিতেও এগুলো মানুষের চোখে ধরা পড়ছে। এ সত্যকে বুঝার জন্যে কোন গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, না প্রয়োজন দীর্ঘ কোন চিন্তা-ভাবনার। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁর বান্দাদের কোনো কঠিন সমস্যায় ফেলতে চান না এবং তাঁকে পাওয়ার পথও জটিল করে দেন না। তিনি তাদেরকে এমন জ্ঞানের ভান্ডার দান করেছেন যা ক্ষয় হবার নয়। যে গভীর চিন্তাশক্তি তিনি তাদেরকে দিয়েছেন যার স্থায়িত্ব রয়েছে। তা একেবারে প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান নয়। এ ব্যাপারে তিনি তাদের এমন জিনিস দ্বারা পরিমাপ করেন যা জীবন্ত এক মহা শক্তি হিসেবে তাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। এগুলো ছাড়া তাদের জীবন মযবুত হতে পারে না। এ মূল্যবান জিনিস ছাড়া তাদের সমাজ সুসংগঠিতও হতে পারে না জীবন মৃত্যুর যে মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা একথার প্রতি গভীর বিশ্বাস ছাড়া মানুষ বুঝতে পারে না যে কোত্থেকে তারা জীবন বিধান, মূল্যবোধ এবং জীবনের শৃংখলা লাভ করবে। সবার সামনে বিশ্ব প্রকৃতির যে রহস্যসমূহ সারাক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে সেগুলোর প্রভাব কতোটা তাদের জীবনে পড়ে তার ভিত্তিতেই আল্লাহ তায়ালা তাদের মূল্যায়ন করেন, তাদের ওপর আরোপিত কর্তব্যের প্রতি তারা কতোটা যত্নবান। সুতরাং আশ্রয়স্থল হিসেবে মানুষ একান্তভাবে এপথ গ্রহণ করতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে সর্বপ্রকার দুঃখ ও বিরোধিতার মোকাবেলায় কঠিন শপথ নিয়ে মজবুত হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহর দেয়া বিভিন্নমুখী ইচ্ছা ও প্রবণতার অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে তাঁরই ইচ্ছাক্রমে যুগে যুগে বহু অবদান রেখে গেছে। এ সময় তাদের মধ্যে যেসব মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে তা তাদের পূর্ণতা বিকাশের উপায় হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছে। এ বিভিন্নমুখী রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতা দান করে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তারা এগুলোকে ব্যবহার করে নিজের উপকারার্থে হেদায়েতের পথ গ্রহণ করুক, সৌভাগ্যের পথে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাক এবং নিজেরা ঈমানী যিন্দেগী যাপন করুক। তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ ঝোঁক প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের সামনে সৎপথ প্রাপ্তির জন্যে বহু যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। তাদের কাছে কিছু মানুষ রেসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা এসেছে। আর হেদায়াত ও ঈমানের এই গন্ডির মধ্যেই তাকে বহু কল্যাণ দান করা হয়েছে। মানুষের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে এতো বেশী সম্ভাবনা এখানে দেয়া হয়েছে যার নযির সারা পৃথিবীর সব যামানার মানুষেরা একত্রে মিলে কোনো দিন দিতে পারে না।

তবু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এই প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত থাকা সত্তেও খোদ মুসলমানরা আজ মতভেদ করে করে এতো বেশী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা আজ সর্বত্রই শক্তিহীন। এই মতভেদ করে কেউ ঈমানের পথে টিকে আছে, আর কেউ কুফরী ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে গেছে।

এই কঠিন মতভেদ আসমানী কেতাবধারীদের মধ্যেও এক সময় এতোবেশী ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলো যে, কুফর ও ঈমান এর মধ্যকার ব্যবধান সম এই বৈরীভাব তাদেরকে পরস্পর মারমুখী করে তুলেছিলো। এর পরিণতিতে তারা রীতিমতো একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, মেতে উঠেছিলো তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করায়। তাদের সংগ্রাম সাধনা কুফরকে ঈমান দ্বারা দমন করা কঠিন হয়ে পড়লো। গোমরাহীকে হেদায়াতের দ্বারা পর্যুদস্ত করা ও মন্দকে ভালো দ্বারা পরাভূত করার কাজও অসম্ভব হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় কে পৃথিবীকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দেবে, কে টেনে আনবে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে? এই নৈরাশ্যের মধ্যেই অবিমিশ্র কুফর গোমরাহী ও অন্যান্য অবিচারপূর্ণ ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়। এদের দ্বারা পৃথিবী কোনো সংশোধন, শান্তি অথবা কল্যাণ আশা করতে পারে না। অপরদিকে নবীদের অনুসারীদের দলীয় কোন্দল কুফর এর পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়াতে তাদেরকে আর নবীদের অনুসারী মনে করা যাচ্ছিলো না। এমন এক ভয়ংকর অবস্থাই সেই শহর এবং সেই সময়ের পৃথিবী অবলোকন করেছে যখন সেখানে আল্লাহর কথাগুলো নাযিল হচ্ছিলো। একদিকে মক্কার মোশরেকরা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ও তাঁর মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করতো; অপরদিকে, মদীনার ইহুদীরা মনে করছিলো তারা মূসা (আ.)-এর 'দ্বীন'-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার নাসারারা (খৃষ্টানরা) ভাবছিলো তারাই ঈসা (আ.)-এর আনীত সত্য সঠিক দ্বীন-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ সব দলের প্রত্যেকেই তাদের আসল 'দ্বীন' থেকে বহু বহু দূরে সরে গিয়েছিলো। মূল দ্বীন থেকে এতো বেশী দূরে তারা চলে গিয়েছিলো যে, তাদের ওপর 'কুফর'-এর শব্দটি প্রয়োগ না করে উপায় ছিলো না। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মুসলমানরা আরবের কাফেরদের সাথে যুদ্ধরত ছিলো এবং আহলে কেতাবদের মধ্যকার কাফেরদের সাথেও একইভাবে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এই কারণেই, নানাপ্রকার মতভেদে লিপ্ত হয়ে তাওহিদের বিরোধিতায় যারা 'কুফর' এর পর্যায়ে নেমে এসেছিলো তাদের বিরুদ্ধে এখানে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা জরুরী হয়েছে। কাজেই এ যুদ্ধের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি শামিল ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্য, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা যুদ্ধ করতো না।'

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যুদ্ধ সংঘটিত হোক। চেয়েছেন এই জন্যে যাতে করে ঈমান দ্বারা 'কুফর'-কে দমন করা যায়। আরও যে কারণে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধ চেয়েছেন তা হচ্ছে সত্য সঠিক একমাত্র সেই ইসলামী আকীদাই বিজয়ী হোক যা নিয়ে সকল নবীর আগমন ঘটেছে। তারপর থেকে তাঁদের অবর্তমানে সত্য প্রত্যাবর্তনকারীরা মুখ ফিরিয়ে ভুল পথের দিকে চলে গেছে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা একথাও জানেন যে, নির্জলা ভ্রান্তি নেতিবাচক ভূমিকায় থেকে কখনও একেবারে নিশ্চুপ থাকতে পারে না। ভুল পথের পথিকদের প্রকৃতিই হচ্ছে তারা সর্বদা অন্যায় পথে অগ্রসর হয়, এই কারণেই তারা সীমালংঘন করতে বাধ্য হয় এবং সত্য পথের যাত্রীদেরকে তারা গোমরাহীর দিকে টানতে চেষ্টা করে। সরল সোজা পথে পরিচালিত তাদের কোন প্রয়াসই সফল হতে পারে না- একথা তারা বুঝে বলেই তো দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদেরকে তারা বাঁকা পথে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। নিজেদের যাবতীয় কাজকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরং, আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি চান।'

আল্লাহর ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য এবং সেই অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার সাথে যুক্ত রয়েছে তাঁর কার্যকরী কুদরত কর্মনির্বাহী ক্ষমতা। সৃষ্টির সূচনা থেকে তিনি নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে মতভেদ থাকবে এবং এটাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে প্রত্যেক মানুষই সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে নিজ বুদ্ধিকে বড় মনে করবে। এটাও তিনি স্থির করে দিয়েছেন যে, সত্য ও যুক্তিপূর্ণ পথকে যে গ্রহণ না করবে সে হবে ভুল পথের যাত্রী। তিনি আরো স্থির করে দিয়েছেন যে, 'অন্যায়' বা মন্দ পথ অবলম্বনকারীরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবে এবং বাঁকা পথেই তারা চলবে; আর এটা ভাগ্য লিখন যে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। এমতাবস্থায়, আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঈমানের শুভ সঠিক ও মযবুত পথের যাত্রীদেরকে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। এই বিরোধীরা নবীদের বংশোদ্ভূত বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও নবীদের কোনো শিক্ষাকেই তারা গ্রহণ করে না– এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য এবং আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা। তাদের ধ্যান-ধারণা ও মজ্জাগত যে বিশ্বাস রয়েছে এবং বাস্তবে যা তারা করে চলেছে তার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাওয়াটাই যে তাদের একমাত্র কাম্য এর নানা দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে চলেছে। সুতরাং, যতোই তারা সঠিক পথ পরিহার করে বাঁকা পথে চলুক না কেন, তাদেরকে নবীদের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে মোমেনদের চেষ্টাও অব্যাহতভাবে চালাতে হবে।

এই সত্যটিকে গ্রহণ করাই হচ্ছে প্রতিটি শহর নগরের ইসলামী সংগঠনের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা এটাই তার জন্যে স্থির করে দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালন কোনো বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চিরন্তন সেই এক ও অনিবার্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই কোরআনে কারীমের কর্ম পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব

কেতাবধারীদের মতভেদ ও পারস্পরিক লড়াই ঝগড়ার বর্ণনা শেষে এবার আসছে ঈমানের প্রসংগ। বলা হচ্ছে– 'যারা ঈমান এনেছো', অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

এরপর তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে রেযেক দিয়েছেন তার থেকে খরচ করার জন্যে আহবান জানানো হচ্ছে। আসলে 'ইনফাক' (খরচ) হচ্ছে জেহাদ এর অনিবার্য এক দাবী । এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আমার দেয়া রেযেক থেকে আমারই পথে ব্যয় করো। সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না, থাকবে না কোন বন্ধুত্ব বা কারও সুপারিশ করার সুযোগ। আর সব কাফেররাই হচ্ছে যালেম।'

মোমেনদের কাছে পেশ করা অত্যন্ত প্রিয় এই গুণ উল্লেখের সাথে তাদের এ দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, যে গুণটি আহবানকারীকে তাদের সাথে সম্পর্কিত করে রেখেছে। তিনি হচ্ছেন সেই সত্ত্বা যাঁর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাই বলা হচ্ছে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা।'

এ দাওয়াত দেয়া হচ্ছে সেই রেযেক থেকে খরচ করার জন্যে যা তাদেরকে তিনিই দিয়েছেন। সুতরাং তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি দান করেছেন আর তিনিই আহবান জানাচ্ছেন সেই জিনিস থেকে খরচ করার জন্যে যা তিনি দিয়েছেন।

এই খরচ করার সময় একবার চলে গেলে আর কখনও ফিরে আসবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো বেচাকেনা, বন্ধুত্ব এবং কারো জন্যে সুপারিশের কোনো সুযোগ থাকবে না।'

সুতরাং এখনই সে সুযোগ গ্রহণ করা দরকার যা এর পরে আর থাকবে না। যদি তাদের থেকে এ সুযোগ দূরে চলে যায়, তা আর কখনও ফিরে আসবে না। এ এমন এক বিক্রয়, যার লাভ থেকে সম্পদ শুধু বৃদ্ধিই পাবে এবং এ ব্যবসার শুধু উন্নতিই হবে। এ সুযোগ চলে গেলে কোনো দান বা কারো কোনো এমন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না যা তাদেরকে ত্রুটি বিচ্যুতি বা পাকড়াও থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারবে।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সে উদ্দেশ্যের দিকে ইংগীত করছেন যার জন্যে খরচ করা হবে, আর তা হচ্ছে জেহাদের প্রয়োজন পুরণ, 'কুফর' কে দমনের লক্ষ্যে এ জেহাদ, আর যুলুম যেহেতু কুফর এর অনিবার্য ফল, সুতরাং তা বন্ধ করার জন্যেও জেহাদ অপরিহার্য।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর কাফেররা, সবাই যালেম।'

সত্যের প্রতি তারা যুলুম করেছে এবং সত্যকে তারা ঘৃণা করেছে এর ফলে আসলে তারা নিজেদের ওপরেই যুলুম করেছে এবং নিজেদের জন্যে ধ্বংসের কবর রচনা করেছে। তারা মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, মানুষকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দিয়েছে, ঈমানের পথে থাকার কারণে তাদের জীবনকে ওরা বিপন্ন করে তুলেছে, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের জীবন পথকে এক গোলক ধাঁধা করে ফেলেছে কল্যাণের পথকে তারা অকল্যাণের সিঁড়ি হিসেবে চিহ্নিত করছে। তারাই বলেছে এ পথে নেই কোনো শান্তি, দয়া প্রাপ্তি, প্রশান্তি, সংস্কার ও নিশ্চয়তা।

এইভাবে অন্তরের মধ্যে ঈমানের অস্তিত্ব টিকে থাকার বিরুদ্ধে যারা অভিযান চালিয়েছে, অভিযান চালিয়েছে জীবনে সত্য বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে, অভিযান চালিয়েছে সমাজের সবার মধ্যে ঈমানের ভিত্তিতে কর্মধারা গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে, নিসন্দেহে তারা মানবতার সব থেকে বড় দুশমন, তারা সব যালেমের বড়ো যালেম। এখন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান পেলে তা মনে প্রাণে গ্রহণ করা এবং বিরুদ্ধবাদী মানবতার এ সকল দুশমনদেরকে সর্বদিক দিয়ে এমনভাবে অক্ষম করে দেয়া যেন তাদের হিংস্র থাবা বিশ্ব মানবতাকে আর ক্ষতিগ্রস্ত করতে না

পারে। তাদের হাত থেকে ক্ষতিকর হাতিয়ারগুলোকে কেড়ে নিয়ে তাদের ধনবল ও জনবলকে কবযা করে নেয়াও মোমেনদের সম্মিলিত প্রেচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুসলিম সংগঠনসমূহকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালন করার জন্যে যেমন সর্বতোভাবে তাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তেমনি বাকি মানবগোষ্ঠীকে এ দায়িত্ব পালনের আহবান জানাতে হবে, আর এ ব্যাপারে তাদেরকে জনগণের সামনে আদর্শের প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার সম্মোহনী গুন বৈশিষ্ট

রসূলদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, যুক্তিপূর্ণ কথা ও কাজ দ্বারা ঈমানী যেন্দেগীর বাস্তব প্রদর্শনী ও দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়ার পর কুফর এর প্রচার প্রসার এবং কেতাবধারীদের নিজেদের চরম মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়েছে। এই আয়াতে ঈমানী ধ্যান-ধারণার মূলনীতিসমূহ বিধৃত হয়েছে। এতে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আল্লাহর সেই সকল গুণ প্রকাশ করা হয়েছে যা তাঁর একত্ব ও একক শক্তি সম্পর্কে মানুষের মনে প্রতীতি জন্মায়। রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতার সকল দিক ও বিভাগ তার পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ আয়াত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, পথ প্রদর্শনে তা মানুষের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং সুবিশাল বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অতি প্রশস্ত ধারণা দান করে। এরশাদ হচ্ছে,

মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব পরাক্রমশালী সত্ত্বা। ঘুম (তো দূরের কথা সামান্য) তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই তার সৃষ্টির কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি) তিনি কাউকে দান করে থাকেন (তবে তা ভিন্ন কথা,) তার বিশাল ক্ষমতা আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে না তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত যতোগুলো গুণ আছে তার প্রত্যেকটির মধ্যেই পূর্ণাংগ ইসলামী ধ্যান-ধারণার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেছে। আয়াতটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হওয়া সত্তেও ইসলামী জগতের সবখানে এবং সর্বকালে এ আয়াতটির মধ্যে পেশ করা গুণগুলো সবার কাছে সমভাবে ক্রিয়াশীল থাকে ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোরআনের বহু জায়গায় মাদানী যুগের অনেক আয়াতেও এই আয়াতের বর্ণিত গুণ ও বিষয়গুলো পরিস্ফূট দেখতে পাই। এ কথাগুলোর গুরুত্বও সে সকল স্থানে সমভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতিগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়েছে। এই মূলনীতিগুলো জানা না থাকলে অনুভূতির প্রকোষ্ঠে এই জীবন পথের চিন্তাধারাগুলো সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে না, পারে না স্পষ্ট হয়ে উঠে স্বতসিদ্ধ তথ্যগুলোকে মনের মধ্যে স্থির করে রাখতে। মূলত, আল্লাহর এই ব্যাপক গুণগুলোর জ্ঞানই তাঁর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে সাহায্য করে।

আল হামদু লিল্লাহ! এই তাফসীরের প্রথম খন্ডের মধ্যে সূরায়ে 'ফাতেহা'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লাহর সম্মোহনী গুণ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসংগে আমি অনুরূপ গুরুত্ব দিয়ে তাঁর গুণগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে করে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের বিবেকের মধ্যে এক সুস্পষ্ট ও ব্যাপক অনুভূতি জাগে। জাহেলিয়াতের যে জগদ্দল পাথরের বোঝা যুগের পর যুগ ধরে মানুষের বিবেককে পংগু করে রেখেছিলো তা প্রধানত এসব তথ্য না জানার

কারণেই সম্ভব হয়েছে। এরপর আবার ছিলো মিথ্যা ও ক্রমবর্ধমান অন্ধবিশ্বাস এবং বড়ো বড়ো দার্শনিকের অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা- এসব কিছু মিলে মানুষকে সত্য চিন্তা ও সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো, অবশেষে ইসলামের আগমনে দুশ্ছেদ্য সেই অন্ধকারের পর্দা অপসারিত হলো এবং দেদীপ্যমান সত্যের শুভ্র সমুজ্জল বাতি আদিগন্ত বলয়ের মানব সভ্যতাকে উদ্ভাসিত করলো, স্তূপীকৃত জাহেলিয়াতের চাপের মধ্যে হতভাগ্য পতাকাতলে তাদের জড়ো করলো। এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর প্রত্যেকটি গুণ ইসলামের সেই মূলনীতিগুলোকে স্পষ্টভাবে পেশ করছে যার উপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আজও পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

চূড়ান্ত সত্য কথা এই যে, তিনিই একমাত্র সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বা দূরে সরে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা পূর্ববর্তী রসূলদের পর তাঁদের পরিত্যক্ত ব্যবস্থাগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় সেগুলোর কোনো একটিতেও ফিরে গিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়ও আর কারো নেই। ধরুন, ত্রিত্ববাদের যে বিশ্বাস ঈসা (আ.)-এর অবর্তমানে গড়ে ওঠেছিলো তা কি কখনো গ্রহণ করা যেতে পারে, বা গ্রহণ করলে ইহ-পরকালের কোনো কল্যাণ বা মুক্তির আশা করা যেতে পারে? এমনি করে তাওহীদ বা একত্ববাদের দিকে ঝুঁকে থাকা যে সব দল আলো আঁধারের মাঝে আছে; সত্য বলতে কি এরা কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তির উপর নেই। আছে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত। এইভাবে প্রাচীনকালে মিসরের অধিবাসীরা তাওহীদের ওপরে কায়েম থাকলেও পরবর্তীকালে থালাসম প্রশস্ত ও বিরাটকায় একটি চাকতির ওপর 'আল্লাহর প্রতিবিম্ব পড়ার' ওপর বিশ্বাস করতে থাকে এবং তার কাছেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ধর্ণা দেয়া শুরু করে। সেখানে একটি বিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং তা হচ্ছে ছোট ছোট কিছু ক্ষমতাধর যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করতো তবে তারা সাধারণ মানুষকেও সর্বোচ্চ আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করতো।

এই স্পষ্ট এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত আল্লাহর একত্বই হচ্ছে সেই মূল বিষয় যার ওপর গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে। এই মতাদর্শ গ্রহণ করার ফলেই এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং সার্বক্ষণিক তাঁর আনুগত্য করার দিকে মানুষের মন ঝুঁকে পড়ে। অতএব মানুষ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলাম হবে না এবং তিনি ব্যতীত আর কারো সামনে আনুগত্য ভরা মাথা নত করবে না। আল্লাহ তায়ালা তাকে যে সব নির্দেশ দিয়েছেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই নির্দেশগুলোই সে মেনে চলবে। এই ধ্যান-ধারণা থেকে যে মূলনীতি গড়ে উঠেছে তারই নাম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর শাসন। সুতরাং এক আল্লাহ তায়ালাই সকল বান্দার জন্যে জীবনের আইন প্রণেতা এবং এ কারণেই মানুষ আল্লাহর বিধানকে সামনে রেখে আইন কানুন রচনা করেছে। এই ধ্যান-ধারণার কারণেই এ কথাটা সৃষ্টি হয়েছে যে, সকল স্থায়ী এবং মযবুত বিধান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সুতরাং, সারা জীবনের জন্যে সরল সঠিক ব্যবস্থা আর কোনটিই গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়। যে কোনো আইন কানুন তৈরী করা হোক না কেন, গড়ে তোলা হোক না কেনো যে কোনো সংগঠন– যদি তা আল্লাহর পথের খেলাফ হয় তাহলে তার আনুগত্য করাও কারো জন্যে জরুরী হবে না বরং তার বিরোধিতা করতে হবে। এইভাবে মোমেনের মন মগযে সারা পৃথিবীর জন্যে জীবন পথ রচনার প্রশ্নে আল্লাহর এই একত্ব এবং একক ক্ষমতার কথা সদা সর্বদা জাগরুক থাকতে হবে; কেননা তিনিই চিরঞ্জীব। তিনিই চিরস্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী।

একক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যে জীবন দান করার কথা ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে সেই জীবন যা এককভাবে প্রত্যেককে দেয়া হয়েছে। যতো সৃষ্টিই বিশ্ব চরাচরে আছে তার মধ্যে

একটিও এমন নেই, যে সে নিজে নিজেই বা অন্য কারো ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। সকল সৃষ্টির উৎস একমাত্র তিনি। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে এবং সমষ্টিগতভাবে সকল তিনিই সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। যদিও আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টিশক্তির কারণে সকল সৃষ্টির সৃষ্টিক্রিয়া দেখতে বা বুঝতে পারিনা; কিন্তু এ বিষয়ে যখনই কোন জ্ঞান গবেষণা করা হয় তখনই এই সত্য ভেসে ওঠে যে, মহান স্রষ্টার সৃজনী শক্তি সবখানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। অবশ্য এই সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে চালু রাখার জন্যে তিনি একটি বিশেষ নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন এ নিয়মও একক নিয়ম। এর মধ্যে কোনো বিভিন্নতা নেই। এই নিয়মের বাইরে যখন মানুষ যেতে চেয়েছে বা কাউকে চালাতে চেয়েছে তখনই তাকে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয়েছে। মানুষ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তার অক্ষমতা ও মহান স্রষ্টার ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান দেখতে পায়, আর তখনই তার মন আল্লাহর কাছে নুয়ে পড়ে। তখনই সে বুঝতে পারে যে তাঁর সমকক্ষ সৃষ্টিকারীও কেউ নেই। তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য, শক্তি ক্ষমতা সবই একক। এর কোনো একটিও এমন নেই যার মধ্যে বিন্দুমাত্র কারো কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা কার্যকরী হতে পারে। সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে, কোনোভাবেই তাঁর শক্তির ওপরে অন্য কোনো শক্তি ক্রিয়াশীল হতে বা থাকতে পারে না।

তাঁর গুণ 'আল কাইউম'-এর দ্বারা সব কিছুর ওপর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্ষমতার স্থায়িত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন 'তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছুর অস্তিত্ব টিকে আছে' বলতে বুঝায় তাঁর ইচ্ছা ছাড়া বা ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো ইচ্ছা টিকে থাকা সম্ভব নয়। সকল সৃষ্টিকে তাঁর ওপর, তাঁর তদ্বীরের ওপর ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, নির্ভর করতে হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলে তাকে তা সমূলে বিনাশ করে দেবে, যেমন বড়ো এক গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, দৈনন্দিন কাজে তিনি নিজে তাদেরকে পরিচালনা করেন না। তাদের বুঝশক্তি অনুযায়ীই তারা চলে। তাদের ভালো মন্দের মালিক তারা নিজেরাই। আল্লাহ তায়ালা নিজের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু চিন্তা করেন না (এটাই তাঁর উদারতার নমুনা যে তিনি মানুষকে স্বাধীন করে দেয়ার পর কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না)। এ্যারিষ্টটলের বিবেচনায় এটাই নাকি তাঁর মর্যাদার জন্যে উপযোগী। কিন্তু ভ্রান্ত এই দার্শনিক বুঝতে পারেনি যে এই মতবাদ দ্বারা তাঁর সাথে তার সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কের আর কোনো বন্ধন বাকী থাকে না। প্রকারান্তরে তিনি ঠুটো জগন্নাৎ হয়েই রয়ে গেলেন। তারিফ করতে গিয়ে এই দার্শনিক ব্যক্তিটি তাঁকে অক্ষম বানিয়ে দিলেন। তাঁর রাজ্যে বিশৃংখলা ঘটতে থাকবে, যুলুম চলতে থাকবে, অথচ তিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না।

ভ্রান্ত ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটি প্রশংসা করতে গিয়ে, মহান আল্লাহকে এভাবে চরম অবিবেচক বানিয়ে দেবে, ইসলামী মতাদর্শের মধ্যে এই ধরনের হতাশাব্যঞ্জক কোনো বিষয় নেই। যে বা যারা তাঁর দিকে রুজু করে তাদেরকে তিনি হতাশ করেন না। তিনি সর্বদাই তার খোঁজ খবর রাখেন। যারা তাঁর পরিচালনা সম্মিলিতভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত এবং এর জন্যে একতাবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা-রত, তারাই তাঁর সার্বিক পরিচালনা বুঝতে সক্ষম হয় এবং তাঁর রহমত লাভে তারা ধন্য হয়।

এরশাদ হচ্ছে,

'তাঁকে কোনো তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না ।'

এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সদা সর্বদা নিজ ক্ষমতায় দাঁড়িয়ে আছেন, প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই কথাগুলোকেই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সব কিছুকেই তিনি নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ

করছেন। সব কিছুই তাঁর নজরে থাকার কারণে তাঁর অস্তিত্বের সাথে সব কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয়ে আছে। তাঁর সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি দিয়ে সব কিছুর গতিবিধি লক্ষ্য করার কথা বলে মানুষের উপলব্ধি শক্তিকে তাঁর স্থায়িত্বের কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সত্যটিকে তুলে ধরার জন্যই, 'আল্লাহ্ তায়ালা যে শ্রান্তি ক্লান্তিহীন ও যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধে' এই কথা বলে তাঁর তন্দ্রা ও নিদ্রার স্পর্শ থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। এই সমুদয় কারণের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত ঘোষণা এসেছে, 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'।

সব যামানায় ও সকল স্থানে আংশিক ও পরিপূর্ণভাবে তাঁর নিজ শক্তি ক্ষমতায় তার প্রতিষ্ঠিত থাকা এমন একটি সত্য যা মানুষ একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারে। মানুষ তার সংকীর্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে এই তথ্য এবং আরও অনেক কিছু বুঝে, যা সৃষ্টির অন্যান্য জীব জন্তু বা কীট পতংগ ইত্যাদি বুঝতে পারে না। আল্লাহর এইসব নিদর্শন একমাত্র মানুষই বুঝে। তবে সবাই সমানভাবে বুঝে না। বুঝ শক্তির তারতম্য থাকায় প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী বুঝে। বুঝতে পারে সে আল্লাহর খবরদারী ও তদ্বীরের কথা। আল্লাহর তদ্বীর এমন একটি বিষয় যার পরিপূর্ণ ধারণা হাসিল করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে তো মনে করে আল্লাহর তদ্বীর বুঝা সহজ, কিন্তু অতি মারাত্মক এ চিন্তা। তাঁর তদ্বীর বুঝতে চেষ্টা করলে মানুষের মাথা ঘুরে যায় দিশেহারা হয়ে যেতে হয় তাকে, তবে চেষ্টা করলে আল্লাহ তায়ালা দয়া করে কিছু বুঝ দেন, আর তখন তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়,

'আসমানসমূহ ও যমীনের বুকে যা কিছু রয়েছে সব তাঁর জন্যেই।'

এ মালিকানা সব কিছুর ওপরে, এই মালিকানা পূর্ণাংগ, যার মধ্যে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। এই মালিকানার মধ্যে কোনো শর্তারোপ করার অধিকার কারো নেই। এই মালিকানা থেকে বাদও নেই কোনো কিছু। এই মালিকানা এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে সকল চেতনা আমরা পোষণ করি সেগুলোর অন্যতম।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা, তিনি এক, তিনি আছেন চিরদিন, চিরঞ্জীব তিনি, তিনিই একক শক্তি। তিনি একাই নিজ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। এককভাবে তিনিই সব কিছুর মালিক– একথা বলার সাথে সাথে মানুষের মনে শরীক বা অংশিদার হওয়া সম্পর্কে যতো প্রকার চিন্তা ভাবনা আসতে পারে সব কিছুকেই নাকচ করে দেয়া হয়েছে; যেমন বলা যায়, মালিকানা শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করার ব্যাপারে মহান সে অস্তিত্ব নিজেই মানুষের মনে নিজ প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবেই বুঝা সম্ভব হয়। মূল মালিকানার মধ্যে কোনো মানুষের এতোটুকু অধিকার নেই, তবে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সব কিছুর উপর তদারককারী, তাঁর ইচ্ছাক্রমে সে সব কিছুর ভোগ ব্যবহার করে। এই কারণে তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সামনে সদা সর্বদা নত হয়ে থাকা। যেহেতু মালিকানাধীন থেকেই প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব মানুষ পেয়েছে। তাই এই জন্যে কোনো সময়েই এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করার, বা খেলাফতের পজিশন ও অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার তার কোনো অধিকার নেই। এই প্রতিনিধি হিসেবেই তাঁর দেয়া সীমা অনুযায়ী সে সব কিছু ভোগ করবে। এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পরিত্যাগ করলে সে যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। মালিকের নির্দেশেই তার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেয়ার ঘোষণা শুনানো হয়েছে। এইভাবে আমরা ইসলামী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের চেতনা লাভ করি। যে এলাকায় আমরা জীবন যাপন করি সেখানে এই দায়িত্ববোধের কারণেই আমরা ইসলামী আইন-কানুন চালু করার অধিকার রাখি। এমন পর্যায়কে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন,

'আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সব তাঁরই মালিকানাধিন।' তিনি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক কিছু ধ্যান-ধারণা এবং আকীদা বিশ্বাসই আমাদেরকে গ্রহণ করতে বলেননি, মানুষের জীবন যাপন করার জন্যে যে সব মূলনীতি প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে মানুষরা তাদের সংবিধান তৈরি করে তার অনুসরণ করেই তারা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করা এবং অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, সেই রকমই একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা তিনি দান করেছেন। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই তাদের বাস্তব জীবনের পারস্পরিক ব্যবস্থা-নীতি গড়ে ওঠে।

চূড়ান্তভাবে এই সত্যকে বিবেকের মধ্যে বদ্ধমূল করতে হবে, মানুষের সমগ্র অনুভূতিকে 'মালিক' এর চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, তিনিই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছুর মালিক। মানুষের ধ্যান-ধারণার মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে থাকতে হবে যে সে আর কোনো মালিকের অধীনে বসবাস করে না, কারণ অনেক সময় এমন কথা যে, 'সে অমুকের মালিক', ব্যবহার করা হয়। সজাগ সচেতনভাবে সব কিছুর মালিকানা চূড়ান্ত মালিকের কাছেই ফিরিয়ে দিতে হবে যেহেতু মহান সেই মালিক পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছুর মালিকানা একমাত্র তাঁরই। চূড়ান্তভাবে মানুষের অনুভূতিকে একথা বিরাট করতে হবে যে, তার হাতে যা কিছু আছে এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তাকে ঋণ দেয়া হয়েছে। সময় পার হয়ে গেলেই ঋণদাতা তা ফিরিয়ে নেবেন। চূড়ান্তভাবে একথা মন-মগযে হাযির রাখতে হবে যে তিনিই মানুষের একমাত্র অভিভাবক ও তদারককারী যিনি মনের মধ্যে অল্পে তুষ্ট থাকার মনোভাব পয়দা করে দিয়েছেন, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারাটা– এটাকে তাঁরই মেহেরবানীর দান হিসেবে বুঝতে হবে। 'জীবন ধারণ সামগ্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে যা পেয়েছি এতেই আমি খুশী' এই পরিতৃপ্ত মন রাখতে পারাটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে। ক্ষমাশীলতা ও যা আছে তার মধ্য থেকে দান করার মনোভাব, অন্তরের প্রশান্তি ও ধৈর্য এবং বিপদ আপদ ও অভাব অভিযোগের সময় ভাবের আবেগে পরিচালিত না হয়ে অবিচল থাকা– এসব কিছু রব্বুল ইয্যতের মেহেরবানী, একথা মনের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে, তাহলেই আর মন অস্থির হবে না, অন্তরের মধ্যে হতাশা বিরাজ করবে না, আফসোস লাগবে না কোনো কিছু না পাওয়া বা হারানোতে, আর যে সব চাওয়া ও পাওয়ার বস্তু মানুষের জীবনকে অস্থির করে ফেলতে চায়, না পাওয়ার গ্লানি হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করতে চায় সেই অবস্থায়ও আল্লাহর ওপর নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ততা, তৃপ্তি ও শান্তি আসবে। এরশাদ হচ্ছে,

'কে আছে এমন যে তাঁর কাছে তার অনুমতি ছাড়া করবে সুপারিশ?'

এটাও আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে আর একটি গুণ যা সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্যাদা ও বান্দা হিসেবে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করবে, সে সীমালংঘন করবে না, অবনত মস্তকে এবং বিনয়াবনত দেহে সে মালিকের সামনে হাযির থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সে অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে এগিয়ে আসতে পারবে না, আর তাঁর কাছে কারো জন্যে সুপারিশ করার সাহসও পাবে না। তবে তিনি যদি কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি দেন তাহলে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন। কাজেই বান্দা অনুমতি লাভের জন্যে অনুনয় করবে এবং অনুমতি পেলে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারবে। আর তারা এইভাবে নিজেদের মধ্যে মর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতা করবে, এইভাবে আল্লাহর পরিমাপের যন্ত্রের মধ্যে থেকেও তারা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে

প্রতিযোগিতা করতে থাকবে। তবে সব কিছুর ব্যাপারে সে সতর্ক থাকবে যেন কোনোক্রমেই সীমালংঘন না হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'কে সুপারিশ করতে পারে'?

এই জিজ্ঞাসার সূরে কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বলতে চেয়েছেন যে সাধারণভাবে সুপারিশ দূরে থাক, কথা বলার সাহসই কেউ পাবে না, সুতরাং বিনা অনুমতিতে সুপারিশের প্রশ্নই আসে না।

এই বাস্তব সত্যকে সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, পরবর্তীকালে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ককে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে একথা বুঝিয়েছে যে কিছু এমন মধ্যস্থ ব্যক্তি আছে যাদেরকে ধরলে এবং যাদেরকে খুশী করলে আল্লাহকে খুশী করা যায় এবং তাদের সুপারিশে সেদিন উৎরে যাওয়া যাবে, তাদের এ কথাগুলো নিছক উগ্র মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়, বাস্তবতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কখনোও তারা আল্লাহর পুত্র কল্পনা করছে, আর যেহেতু পিতা পুত্রের সম্পর্ক সব থেকে ঘনিষ্ঠ, এ জন্যে তার মাধ্যমে বা তার সুপরিশে তরিয়ে যাওয়ার আশ্বাসবাণী তারা মানুষকে শুনিয়েছে। এইভাবে মানুষের রাজ্য ভাগাভাগির মতো পিতাপুত্রের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির কথাও তারা চিন্তা করেছে, অথচ মুর্খরা খেয়াল করে দেখেনি ভাগাভাগির প্রশ্নে 'সার্বভৌমত্ব' বা 'সর্বশক্তিমান' কথাটির বাস্তব কোনো অস্তিত্বই থাকে না বা 'নিরংকুশ ক্ষমতা'র ধারণাটিই এর দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে স্বীকার করার পর ভাগাভাগীর কল্পনা করা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও কেন জানি পৃথিবীর তথাকথিত জ্ঞানী গুনীরা এখনও ধোকার মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং এখনও ওই মিথ্যার মায়াজাল ছিন্ন করে জ্ঞানোজ্জল বাতির দিকে এগিয়ে আসছে না। অবশ্য, এই জটিলতার দুটি জবাব রয়েছে, একটি তথাকথিত মনীষী যে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেচনাকে যথেষ্ট মনে করার কারণে অহংকারে লিপ্ত হয়। শয়তানী যুক্তির বেড়া ডিংগিয়ে তারা নির্ভেজাল সত্যের পথে এগিয়ে আসতে পারেনি। দুই, যদিও তারা নিজেদেরকে স্বাধীন চিন্তাশীল বলে দাবী করে, কিন্তু আসলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। কখনও তারা তাদের বাপ দাদার আমল থেকে প্রাপ্ত মনমানসিকতার জালে আবদ্ধ হয়, আবার কখনও বা পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবে প্রভাবিত। সুতরাং যতোই তারা দাবী করুক না কেন তারা সবাই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, কিছু না কিছু কারো না কারো প্রভাব সেখানে থাকবেই। তাছাড়া মানুষের দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি, বয়স ও অভিজ্ঞতা এবং শক্তি-ক্ষমতা সবই সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে অসীম সত্ত্বা ও তাঁর অসীম কর্মধারা সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে সে খেই হারিয়ে ফেলে, আর আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে বুঝাতে সাহায্য করেন না, কেননা তাঁর কাছে তারা সঠিক হেদায়াত চায় না।

কখনো এইসব উগ্র মস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবী বা ধর্ম জাযকেরা অনুমান করে নিয়েছে, আল্লাহর কিছু খাস প্রতিনিধি আছে যাদেরকে তিনি তাঁর ক্ষমতার কিছু অংশ অর্পণ করেছেন। এই ক্ষমতাধরদের সুপারিশের মাধ্যমেই তাঁর কাছে পৌছানো সম্ভব এবং তাদের মাধ্যমে তাঁর অনুকম্পা হাসিল করা যেতে পারে। মানুষের নিজের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সে ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষেও এই বিশাল সাম্রাজ্য একা একা চালানো থেকে কিছু মধ্যস্থ ব্যক্তি রাখলে প্রশাসন সুন্দর হবে, ভাবখানা এই যে, মানুষ তার প্রশাসন পর্যায়ে যেমন পাওয়ার ডেলিগেট করে, আল্লাহরও তাই করা উচিত। এই ধারণা বশবর্তী হয়ে তারা দরদী সেজে আল্লাহকে পরামর্শ

দিচ্ছে। এই সদয় সেজে এবং দয়া দেখাতে গিয়ে নাদানরা এটা বুঝলো না যে এতে আল্লাহর সব কিছু একাই পরিচালনার ব্যাপারে অক্ষমতা বা দুর্বলতা ফুটিয়ে তোলা হলো। অসীম রব্বুল আলামীন সম্পর্কে সসীম মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে এইভাবে নিজেরা গোলমালের মধ্যে পড়ে যায়, অন্যদেরকেও বিপথগামী করে।

তিনি তাঁর সন্তান, আত্মীয় বা নৈকট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাঁর প্রশাসন চালান– এই খেয়াল বা চিন্তাধারা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এসব অলীক কল্পনার কোনো স্থান আল্লাহর কাছে নেই। তিনি কোনো ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী নন।

এ সমস্ত অলীক চিন্তা-কল্পনা থেকে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পূর্ণ মুক্ত। এসব চিন্তাকে আমল দেয়ার কোনো প্রয়োজন বা সুযোগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নেই। নেই এসব নিয়ে কোনো ধাঁধার মধ্যে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন। সর্বময় ক্ষমতার মালিক নিজ ক্ষমতায় তিনি চির প্রতিষ্ঠিত। বান্দারা হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি তারা সবাই মালিকের পুরোপুরি মুখাপেক্ষী। আল্লাহর প্রকৃতি ও বান্দার প্রকৃতির মধ্যে কোনো দিক দিয়ে বা কোনোভাবে কোনো মিল নেই। শাসনকর্তা, মুনিব, ত্রাণকর্তা একমাত্র তিনি, বাকি সবাই তাঁর অধীন ও তাঁর রহমতের ভিখারী। অতএব সৃষ্টিকর্তা মালিকের সাথে সৃষ্ট গোলামের কোনো মালিকানা বা ক্ষমতার ভাগাভাগি থাকতে পারে না।

এখন প্রশ্ন আসে তাহলে মালিকের সাথে বান্দার সম্পর্কটা কেমন হবে? কেমন হবে বান্দার জন্যে 'রব'-এর রহমত, নৈকট্য, ভালোবাসার এবং সাহায্য? ইসলাম এ এসব বিষয় পরিষ্কারভাবে স্থির করে দিয়েছে, সুস্পষ্ট জ্ঞান ঢেলে দিয়েছে মানুষের অন্তরে। স্বচ্ছ চিন্তাধারা তার হৃদয়কে মায়াময় করেছে । দয়াপূর্ণ একটি অন্তর তাকে দিয়েছে এবং তার ছায়াতলে থেকে মনোরম ও দানশীলতার জীবন যাপন করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাকে অস্পষ্টতার অন্ধকার থেকে, সন্দেহ ও দ্বিধা দ্বন্দ্বে পেরেশানী থেকে, পুঞ্জীভূত জেহালাত থেকে, দুনিয়ার চাকচিক্যের যুক্তিহীন আকর্ষণ থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং এমন পেরেশানী থেকে বাঁচিয়েছে– যা সহজে দূর হয় না।

'তাদের সামনের সবকিছুই তিনি জানেন । তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে কেউ আয়ত্তে আনতে পারে না, তবে তিনি যাকে দিতে চান তার কথা স্বতন্ত্র।'

এখানে উপস্থাপিত সত্যটির দুটি দিক আছে। এগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে মানুষ তার মেহেরবান মালিকের সাথে দুইভাবে সম্পর্কিত হয়, এক, তার সামনে থেকে দুই, তার পেছন থেকে, অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তি জানে ও মানে যে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল প্রকাশ্য ও গোপন জিনিস সম্পর্কে খবর রাখেন, এ কারণে সে হামেশাই সজাগ থাকে, প্রকাশ্যে ও গোপনে জীবনের শুদ্ধি রক্ষা করে চলে ফলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হয়। আল্লাহর পক্ষে তাদের সামনের ও পেছনের সবকিছু জানা অর্থ হচ্ছে তিনি তার গোপন ও প্রকাশ্যের সকল বিষয় সম্পর্কে সমানভাবে অবগত। তাঁর জানার পরিধি থেকে কোনো কিছু বাদ নেই, তা সেগুলো তার প্রকাশ্য আচার আচরণ বা কাজ থেকে হোক, অথবা গোপনে মানুষের জানার সীমার বাইরের জিনিসই হোক। এমনকি তার অতীতের কোনো কাজ বা ব্যবহার হোক যা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে অথবা ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা পরিকল্পনা হোক যা এখনও প্রকাশিত হয়নি তাও এর অন্তর্ভুক্ত। আবার ওই সব জিনিসেরও তিনি খবর রাখেন যা মানুষের জ্ঞানের কোটরে মজুদ আছে। আবার সেগুলোও তাঁর জ্ঞানভান্ডারে সংরক্ষিত যা মানুষের স্মৃতিপট থেকে প্রতিনিয়ত হারিয়ে যায়। এই 'এলম' বা জ্ঞান এর শাব্দিক অর্থ বা ব্যাখ্যা দ্বারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জানার মতো

জিনিসকেই বুঝায়, আর এটা অবশ্যই সত্য কথা যে তারা ততোটুকুই জানে যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানতে দিতে চেয়েছেন।

এই আয়াতে বর্ণিত প্রথম সত্যটির যে দিক তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে 'সামনের ও পেছনের' সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান থাকা।

মানুষের মনের মধ্যে দিবারাত্র ভুরি-ভুরি কথা আনাগোনা করে, এটা অবশ্যই আল্লাহরই মেহেরবানী। যে নফস প্রতিনিয়ত এবং প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সামনে হাযির রয়েছে তিনিই তো তার সামনের ও পেছনের সব কিছু সম্পর্কে খবর রাখেন। তিনি জানেন যা কিছু সে অতীত জীবনে করেছে এবং সে ভবিষ্যৎ জীবনে করবে বলে আশা রাখে। সে মনের গোপন কন্দরে লুকিয়ে রাখছে ও বাইরের কাজ ও ব্যবহার থেকে যেসব চিন্তা ও অনুভূতিকে সংগোপনে দূরে রাখার চেষ্টা করছে তা তার মোটেই অজানা নয়। আবার যেগুলো সে ভুলে যাচ্ছে তাও তিনি জানেন, অর্থাৎ তিনি সেগুলো ভুলে যাচ্ছেন না। যেগুলো অতীত হয়েছে এবং যেগুলো সামনে আসছে এখনও সেগুলো সম্পর্কে কারো কিছুই জানা নেই তাও তিনি জানতে পারছেন। অন্তরের সেইসব অনুভূতি যা বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় নড়াচড়া করে, যখন আঁধারের পর্দার মধ্যে সে পুরোপুরি খোলা থাকে এ সময় আল্লাহর পক্ষেই একমাত্র তার অবস্থা জানা সম্ভব, একমাত্র সেই আলেমুল গায়েব জানতে পারেন ওই সময় পুঞ্জীভূত হয়ে থাকা তার হৃদয়ের জানা অজানা কথা।

দ্বিতীয় সত্যটির এক বিশেষ দিক হচ্ছে, মানুষ তাই জানে যা তাকে আল্লাহ তায়ালা জানাতে চান, এর বাইরে তার জানার কোনো ক্ষমতা নেই। অবশ্য মানুষ জানার জন্যে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা বা জ্ঞান গবেষণা করতে পারে, বিশেষ করে আজকের যামানায় সারা পৃথিবীর সবখানে এবং একেবারে নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে একটি বিশেষ এলাকায়, অজানাকে জানার মধ্যে আনার জন্যে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চলছে।

'তারা জানতে পারবে না তার জ্ঞান ভান্ডারের কোনো কিছু, তবে তিনি যাকে জানাতে চাইবেন তার কথা স্বতন্ত্র।"

তিনি আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনি সব কিছুর সার্বিক ও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। মহান আল্লাহ 'সেদিন সুপারিশের জন্যে অনুমতি দেবেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ভান্ডারের কিছু অংশ তাঁর বান্দাদের কাছে প্রকাশ করেন, যেহেতু তিনি তাঁর কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করতে চান। এরশাদ হচ্ছে–,

'আমি শীঘ্রই তাদেরকে আমার শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শনগুলো দেখাবো দিগন্ত বলয়ের চতুর্দিকে এবং তাদের নিজেদের ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যেও, এর ফলে তাদের কাছে আল্লাহর বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং তারা জানবে যে তিনিই সবার মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি।'

এসব জাজ্বল্যমান নিদর্শনগুলো তারা দেখে এবং তাদের মনে দোলাও লাগে; কিন্তু অচিরেই তারা এসত্যকে ভুলে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর জ্ঞান থেকে সামান্য কিছু দান করে পরীক্ষা করেন। এ জ্ঞান হাসিল করার সুযোগ দান প্রাকৃতিক জিনিস ও তার নিয়ম কানুন সম্পর্কে হতে পারে, অথবা অদেখা তাঁর কোনো গায়েবের শিক্ষণীয় জিনিস সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হতে পারে। সাধারণ বোধগম্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস দ্বারা হোক বা গায়েবী কোনো জিনিস দান করার মাধ্যমে হোক, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চান যে এগুলো পেয়ে তারা আল্লাহ পাকের দান স্বীকার করে কিনা। কিন্তু এটাই বারবার প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারলে তারা আল্লাহকে ও তাঁর দানকে স্বীকার করে না এবং তাঁর

শোকরগোযারিও করে না, বরং আনন্দে মেতে ওঠে এবং নিজেদের কৃতিত্বের প্রচার করে। এভাবে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর নাফরমানী করে বসে।

একথা সুনিশ্চিতভাবে সত্য যে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা, সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে এবং যখন তিনি মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা হিসেবে পাঠানোর মনস্থ করেছিলেন সে দিক থেকে, সব কিছুর জ্ঞান দিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে তাঁকে জানা ও চেনার জন্যে বহু নিদর্শন দেখাবেন। মানুষের নিজেদের সত্ত্বার মধ্যেও তাঁকে চেনার জন্যে বহু নিদর্শন থাকবে, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং দিনের পর দিন এক জনপদ থেকে নিয়ে আর এক জনপদের সামনে তাঁর নিদর্শনকে তিনি প্রকাশ করেছেন। একইভাবে তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ হামেশাই প্রকাশ করতে থাকবেন।

এমনি করে যখনই তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শন বরাবরই কিছু কিছু প্রকাশ করতে থাকবেন। তখন বিশেষভাবে তিনি প্রাকৃতিক আইন কানুনের মাধ্যমে এমন নিদর্শন প্রকাশ করতে থাকবেন যা মানুষ জানবে এবং আল্লাহর খলীফা হিসেবে সে তাকে কাজে লাগাতে থাকবে। তাঁর নিদর্শনগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ এমন পূর্ণত্ব হাসিল করবে যা হবে দুনিয়ার জীবনে চরম সাফল্যের প্রতীক।

যেমন করে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে কিছু কিছু জানিয়েছেন তেমনি অনেক কিছু তার কাছ থেকে গোপনও রেখেছেন। অবশ্য সেগুলোর অভাবে তার পক্ষে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করায় কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আফসোস সাধারণভাবে মানুষ নাফরমানী করতেই থেকেছে এবং বরাবরই এমনসব যুক্তিহীন অথবা কুযুক্তিপূর্ণ বিতর্ক তুলেছে যা তাকে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং যার মাধ্যমে তার অকৃতজ্ঞতা প্রকট হয়ে ওঠেছে। এমনভাবে আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ায় আগামী দিনের গোমরাহ মানুষরা হয়তো খুশী হবে, কিন্তু আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তারা নিজেরা বিস্মৃতির অতল তলে এমনভাবে তলিয়ে যাবে যে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। গোমরাহীর কঠিন পর্দা তাদেরকে এমনভাবে ঢেকে ফেলছে যে পরবর্তীতে চেষ্টা করলেও হয়তো তারা তা উন্মোচন করতে পারবে না। আবার কখনো হয়তো বা আল্লাহর হুকুমে পর্দার আড়াল থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষ সত্যের চমক দেখে বিশেষভাবে জেগে উঠবে এবং পর্দা সরিয়ে শান্তির পথে এগিয়ে আসতে চাইবে; হয়ত বা তখন মানুষ এমন একটি সীমানায় এসে দাঁড়াবে যেখান থেকে সে আর সীমালংঘন করতে পারবে না।

বাতিলপন্থীদের সার্বিক প্রচেষ্টা হচ্ছে মানুষ থেকে অনেক তথ্য গোপন করে দেয়া; তারা এমন অনেক কিছুও গোপন করে দিয়েছে যা পৃথিবীর বুকে মানুষের খেলাফত কায়েমের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পৃথিবী তো মহাশূন্যের বুকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি ধূলিকনার মতো পরিভ্রমণরত অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রহ। এ কথা বুঝতে গিয়ে মানুষ একটি গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়, অর্থাৎ এ বিষয়টির সঠিক জ্ঞান থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। যতো জ্ঞান সাধনাই সে করুক না কেন প্রায়ই সে অস্পষ্টতা বা গোঁজামিলের শিকার হয়। পরীক্ষাচ্ছলে তাকে কিছু ক্ষমতা, কিছু এখতিয়ার, কিছু উদ্ভাবনী শক্তি এবং কিছু স্বাধীনতা দেয়াতে সে নিজেকেই চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক মনে করতে শুরু করে। আল্লাহ তায়ালাকে সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক মেনে না নিয়ে মাঝে মাঝে সে বলে ওঠে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। বিশ্বের সর্বময় ক্ষমতার মালিক যে একজন আছেন তা সে

অস্বীকার করে। যদিও বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি চলতি শতাব্দীতে আলেমদের সত্যের দিকে অনেকাংশে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তারা সত্যের কাছে ধীরে ধীরে নতি স্বীকার করেছে। কিন্তু তাদেরকে আবার পেয়ে বসেছে এক ব্যাধিতে। তারা নিজেদেরকে জ্ঞানের অধিকারী মনে করে না। অপরদিকে জাহেল মুর্খ নাদান শিক্ষানবিশ ছাত্ররা ময়দান দখল করে রেখেছে। তারা মনে করে তারা বহু কিছু জেনে ফেলেছে।

আল্লাহর ক্ষমতার আসন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমগ্র আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী জুড়ে। এগুলোর সংরক্ষণ কাজ তাঁকে কখনো ক্লান্ত করে না। 'আয়াতুল কুরসির' শেষ অংশটির ব্যাখ্যা যেখানে দেয়া হয়েছে সেখানে পূর্ণ আয়াতটি বিবৃত হয়েছে। কোরআন যেভাবে ছবির মতো সব কিছুর বর্ণনা দেয় সেভাবেই এ অংশটিরও ব্যাখ্যা পেশ করেছে, কেননা এখানে প্রদত্ত ব্যাখ্যা বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরেছে যা পড়লে হৃদয় পটে তার স্বাভাবিক একটা ছাপ পড়ে যায়, অত্যন্ত মযবুত গভীর ও স্থায়ীভাবে অন্তরের মধ্যে এ দাগ বসে যায়।

'কুরসী' (আসন) দ্বারা সাধারণ শাসন ক্ষমতাকে বুঝানো হয়। তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যপ্ত হয়ে আছে বলতে বুঝায় তার শাসন ক্ষমতার আওতাভুক্ত ওই সকল এলাকাগুলো চিরদিন বর্তমান আছে যার বর্ণনা এখানে দেয়া হলো। এই সত্যটি মন মস্তিষ্কে সদা সর্বদা বিরাজ করছে, কিন্তু ব্যাখ্যার মাধ্যমে হৃদয়পটে আল্লাহর যে চিত্রটি অংকিত হয় তা আরো স্পষ্ট, আরো গভীর এবং আরো স্থায়ী। ব্যাখ্যার শেষ কথাটি হচ্ছে- 'তাঁকে ক্লান্ত করে না এ দুটির রক্ষণাবেক্ষণ; আর তিনিই মহান, তিনিই বড়।'

কথাটি তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার কথা ঘোষণা করছে, যে ক্ষমতায় কোনো জিনিসের কমতি নেই বা তার থেকে কিছু বাদ পড়ে না। তবুও নাম নিয়ে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু মানুষ এগুলোর কিছু অংশ দেখতে ও বুঝতে পারে আর এগুলো বুঝতে তার কোনো চেষ্টা বা পরিশ্রম করা লাগে না। তাই কোরআনে কারীম এই দুটি জিনিসকে বারবার উল্লেখ করে মানুষের অনুভূতির দুয়ারে আঘাত করেছে এবং হৃদয়পটে আল্লাহর নিদর্শনের জীবন্ত ছবি এঁকে দিয়েছে, যার ফলে এগুলোর দৃশ্য মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী হয়, আরও গভীরভাবে দাগ কাটে এবং অন্তরের প্রভাব বিস্তার করে।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত ব্যাখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না, কেননা আমরা কোরআন থেকে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থার যে পথ পেয়েছি তাতেই আমরা ধন্য। কোরআনে কারীমের ব্যাখ্যার জন্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গর্বী দার্শনিকদের কাছেও আমাদের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা তো কোরআনের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দিয়ে মূলত আমাদেরকে কোরআন থেকেই দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছে।'

'আর তিনিই মহান, তিনিই বড়।'

আয়াতুল কুরসীতে উল্লেখিত আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে এ হচ্ছে শেষ গুণ। এ গুণটি বিশেষ সত্যকে তুলে ধরেছে এবং অন্তরের মধ্যে সে সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। এ গুণটি শ্রেষ্ঠত্বকে একমাত্র পবিত্র আল্লাহর জন্যেই বিশেষত করেছে। দেখা যাচ্ছে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচ্য অংশটির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ গুণ একমাত্র আল্লাহ পাকের মধ্যেই থাকতে পারে, অন্য কারো মধ্যে এ গুণ থাকা সম্ভব নয়। 'তিনি মহান', 'তিনি বড়' একথা

বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, 'তিনিই মহান, তিনিই বড়', অর্থাৎ মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ গুণটির অংশীদার আর কেউ হতে পারে না।

তিনি মহান হওয়ার অধিকারী বলতেও একমাত্র তাকেই বুঝায়, কোনো বান্দা এ স্তরে পৌছুতে পারে না, যেহেতু মালিক সদা সর্বদা এই কথাই পছন্দ করেন যে, বান্দা সব সময় তাঁর কাছেই অবনত থাকবে এবং নিজেকে ছোট মনে করবে। সে আখেরাতের আযাবের কথা স্মরণ করে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। এরশাদ হচ্ছে, সেই আখেরাতের ঘরকে আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি তাদের জন্যে যারা দুনিয়ার বুকে বড়ো বা শ্রেষ্ঠত্ব চায় না এবং কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ফেরাউনের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে বলেছেন, সে ছিলো পৃথিবীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহিরকারী।

এইভাবে মানুষ নিজের বড়াই শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করা ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সদা-সর্বদা ব্যস্ত। এটা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। ততোক্ষণ পর্যন্ত এতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ সে বান্দা বন্দেগীর সীমার মধ্যে থাকবে অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর বান্দা স্বীকার করে তাঁর আইন কানুন মেনে চলার মানসিকতা পুরোপুরি ঠিক রেখে যদি কেউ একটু সচ্ছল হতে চায়, চায় উন্নতমানের জীবন যাপন করতে, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে এই সীমার মধ্যে থাকতে হলে তার হামেশাই মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় রাখতে হবে; তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর বড়ত্ব এবং তাঁর কাছে পাকড়াও হওয়ার খেয়াল সদাসর্বদা অন্তরের মধ্যে জাগরুক রাখতে হবে। থাকতে হবে তার কাজ ও জীবন যাপনের মধ্যে এই শৃংখলা যে সে আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বান্দা বানানোর চেষ্টা করবে না। কারো ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করবে না এবং নিজের ধ্যান-ধারণাতেও একথা আসতে দেবে না যে সে অন্যদের থেকে বেশী সম্মানী।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা

আলোচ্য আয়াতে মোমেনের মধ্যে কাংখিত ঈমান, এর চিন্তা-চেতনা ও গভীর অনুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে আল্লাহর গুণাবলী ও তাঁর বান্দার সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারপর আলোচনা আসছে মোমেনদের চলার পথের রূপ রেখা সম্পর্কে। তারা এক স্বাধীন সৃষ্টি হিসেবে নিজেদের চলার পথ রচনায় ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে কিছু দৃষ্টিভংগী রাখে এবং নিজেদের মধ্যে কোনো না কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বে নিজেদেরকে সোপর্দ করে। যারা তাদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ভুল পথে পরিচালনা করে অথবা কেউ নিজেই উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে এবং ছলেবলে কলে কৌশলে অন্যদেরকে পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয় এবং মানুষকে ভুল পথে চালায় তাদের মতো তারা কখনোই হয় না। এই পর্যায়ে আল্লাহর ঘোষণা,

আল্লাহর দ্বীন পূর্ণাংগ, যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের আকীদা বিশ্বাসগত দিক ও জীবন পরিচালনা লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনসহ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় বিষয় রয়েছে তা গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই, নেই কোনো বাধ্যবাধকতা, ভুল পথের যাবতীয় আবর্জনার মধ্য থেকে সত্য সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন যার খুশী ঈমানের পথ অবলম্বন করবে আর যার খুশী কুফরীর পথ অবলম্বন করবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহদ্রোহীকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর অবিচল ঈমান স্থাপন করবে, সে অবশ্যই এই মযবুত রশি ধারণ করবে যা কোনোদিন ছিঁড়বার নয় এবং আল্লাহ তায়ালা সব শোনেন, সব জানেন, আল্লাহ তায়ালা বন্ধু অভিভাবক, সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক তাদের

জন্যে যারা ঈমান এনেছে। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী (অস্বীকার) করেছে তাদের বন্ধু অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক হচ্ছে তাগুত যারা মুখে না বললেও মানবজাতিকে নিজেদের মনগড়া আইনের শৃংখলে আবদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা কাফেরদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। ওরাই হচ্ছে দোযখবাসী। সেখানে তারা থাকবে চিরদিন।

দ্বীন-ইসলামের মধ্যে যে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি এসেছে, তা হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার ব্যপকতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না পুরোপুরি বুঝানোও সম্ভব নয়। জবরদস্তি করে রাগ করে অথবা কৃযুক্তি দিয়ে কাউকে বুঝতে বাধ্য করা যায় না। এই 'দ্বীন' এসে মানুষের বুঝ শক্তির কাছে সমস্ত শক্তি ক্ষমতা দিয়ে আবেদন করেছে, চিন্তাশীলদের বুদ্ধিকে সম্বোধন করেছে, আবেদন করেছে উপস্থিত বুদ্ধিকে যা সংগে সংগে সাড়া দেয়, মানুষের আভ্যন্তরীণ সজাগ প্রজ্ঞাকে সম্বোধন করেছে এবং মানুষের আবেগ অনুভূতিকে আহবান জানিয়েছে , আহবান জানিয়েছে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ধরে। আহবান জানিয়ে প্রত্যেক শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষকে এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানব মন্ডলীকে। মানব বুদ্ধিকে সর্বদিক দিয়ে চিন্তা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই বুঝানোর প্রচেষ্টায় কখনও কারো ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি এমনকি অস্বাভাবিক কোনো মোজেঝা দেখিয়েও তাদের বোধশক্তিতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু মানুষ তার মনোযোগকে সত্য প্রাপ্তির পথে কাজে লাগায়নি, আর তার বুদ্ধিকেও সে ব্যবহার করেনি বা করতে পারেনি, কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এ সত্য তার চিন্তা ও বুদ্ধির বাইরের বিষয়।

আর যখন এই 'দ্বীন' কোনো মোজেঝা বা বস্তুগত অসাধারণ কোনো জিনিস দেখিয়ে কোনো চাপ হিসেবে ব্যবহার করে না তখন এ ব্যবস্থাকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করা কিছুতেই সমীচীন মনে করতে পারে না। তা করলে প্রকৃতপক্ষে এ সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থাকে হত্যা করারই শামিল হবে; অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি কাউকে কোনো মত বা পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করার দ্বারা দ্বীন ইসলামের অবর্ণনীয় ক্ষতিই করা হবে। যারা যুক্তির ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করে, বিলম্বে হলেও তারা এ দ্বীন কবুল করতে প্রস্তুত হবে কোনোপ্রকার চাপ প্রয়োগে তারা এতো পিছিয়ে যাবে যে তাদের পুনরায় এগিয়ে আসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়ে যাবে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে খৃষ্টবাদই ছিলো আল্লাহর প্রেরিত শেষ ধর্ম। ঈসা (আ.) এর পরবর্তীকালে রোমান সম্রাজ্যে সাধারণভাবে এ প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিলো যে, ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে প্রয়োজনে লোহা ও আগুনের ব্যবহার করা হতো। এমনকি সম্রাট কনষ্টানটাইন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে অনুরূপ চাপ প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের হিংস্র ও নিষ্ঠুর ব্যবহার রোমান সম্রাজ্যে এক সময় কিছুসংখ্যক খৃষ্টান প্রজাদের সাথেও করা হয়েছিলো যারা স্বেচ্ছায় ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীকালে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ না করায় অন্যদের সাথেও এ ধরনের দমন নীতি ও জবরদস্তির কোনো কিছুই বাদ রাখা হয়নি। অথচ রাষ্ট্রধর্ম তখন ভিন্ন মতাবলম্বী থাকায় খোদ খৃষ্টানদেরকেও রাজাদের ওই ধর্ম গ্রহণ না করার কারণে নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিলো। তৎকালীন রাজারা ঈসা মসীহ (আ.)-এর প্রচারিত কোনো কোনো নীতির বিরোধী ছিলো।

তারপর ইসলাম এর আগমনে সর্বপ্রথমে স্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করা হলো, কোনো বিধর্মীকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি করা হবে না, শারীরিক, মানসিক

বা আর্থিক অথবা সামাজিক দিক দিয়ে কোনো প্রকার চাপও প্রয়োগ করা হবে না। অসত্য ও অব্যবস্থার অন্ধকারের মধ্য থেকে সত্য সমাগত হয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগে এ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তার ইচ্ছা, চিন্তা ও অনুভূতিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। তার কর্মপন্থা নিরূপণের ভার তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন যাতে করে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে সে হেদায়াত বা গোমরাহীর পথ যে কোনো একটি বেছে নিতে পারে এবং আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমালোচনা করে নিজ গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে। মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দান প্রসংগে সব থেকে বৈশিষ্টপূর্ণ পন্থা এটাই। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই বিংশ শতাব্দীর ধর্ম বিশ্বাসী, ও ক্ষমতাসীনরা জনগণকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদের ওপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপমানজনক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। গোটা সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তায়ালা নিজ আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী চলার যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা তাদের কেউই দেয়নি। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করে সরকারী ক্ষমতার চাপে পড়ে কারো ধর্ম পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয় না। যে কোনো আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করা ও বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে যে কোনো মত ও পথকে এখতিয়ার করার অধিকার একমাত্র ইসলামই মানুষকে দেয়। তবে সমাজ জীবনকে পরিচালনা করা এবং মানবাধিকারের যে সরকারী আইন রয়েছে, তা ইসলামী ব্যবস্থার অধীন তৈরী হওয়ায় সেগুলো সকল নাগরিককে সমানভাবে গ্রহণ করতে হয়। উন্নতি অগ্রগতি ও মানবাধিকারের ঢাক ঢোল পিটিয়ে যেসব রাষ্ট্র প্রচার করছে যে, সেখানো কারো ওপর কোনো জবরদস্তি নেই। সে সব দেশে আল্লাহর জীবন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাগরিকদের রাষ্ট্রধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে অথবা তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

জন্মগতভাবে প্রাপ্ত অধিকারগুলোর মধ্যে মানুষের বিশ্বাসগত অধিকারই প্রথম যার ওপর তার 'মানুষ' নামের মর্যাদা নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি মানুষের বিশ্বাসগত স্বাধীনতা হরণ করে তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে তার মনুষ্যত্বকেই হরণ করে। বিশ্বাসগত স্বাধীনতাকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সেই বিশ্বাসের দিকে মানুষকে আহবান জানানোর স্বাধীনতাও স্বীকার করা এবং এই স্বীকারোক্তির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে বিপদ আপদ, নির্যাতন ও নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক চাপ থেকে তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা, নতুবা এটা হবে শুধু 'নামকা ওয়াস্তে' স্বীকৃতিমাত্র বাস্তব জীবনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

মানুষের অস্তিত্বের জন্যে ইসলাম তাকে সব থেকে বেশী স্বাধীনতা দিয়েছে। সমাজ জীবনের জন্যে নিঃসন্দেহে দিয়েছে তাকে সর্বাধিক মযবুত একটি জীবন পদ্ধতি। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সেই সত্ত্বা যিনি ঘোষণা দিয়েছেন, 'এই জীবন ব্যবস্থায় কোনো জোর জবরদস্তি নেই'। পূর্বাহ্নে আল্লাহর ঘোষণা থাকাতে কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনো প্রকার জোর প্রয়োগ করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম ও পৃথিবীর অন্যান্য মতাদর্শ বা জীবন ব্যবস্থার পক্ষে কেমন করে কোনো বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেয়া এবং তাদের মতকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা যুক্তিসংগত হতে পারে? কেমন করেই বা কোনো রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ কোনো বিশ্বাসকে গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করতে পারে? আর যে তা গ্রহণ না করবে তার প্রতি অসহিষ্ণু হওয়া বা তার প্রতি ক্ষমা না করার মনোভাব কি করে যুক্তিসংগত হতে পারে?

উপরে বর্ণিত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনোপ্রকার জবরদস্তি করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

আরবী ভাষায় পন্ডিতদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইকরাহা' বা 'কারাহিয়াত' বলতে অপছন্দনীয়

বা যা মানুষের কাছে ভালো লাগে না এমন সব কিছুকে বুঝায়। এরকম কোনো কিছুর স্থান থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার কারণে এ ধরনের যাবতীয় কার্যাবলী ও আচার আচরণ চিরদিনের জন্যে হারাম এই কথাটাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হয়ে দেখা দেয়। দ্বীন ইসলামের শিক্ষার মধ্যে অন্যান্য বিষয় যেমন ফরয ওয়াজেব ও হালাল-হারাম মেনে চলা ঈমানের বহিপ্রকাশ বলে বুঝা যায় তেমনি কাউকে জবরদস্তি ইসলামী আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বলার যে নিষেধাজ্ঞা এ আয়াতে পাওয়া গেলো তা সমভাবে গুরুত্বসহকারে পালন করাও হবে ঈমানের দাবী। মূলত মানুষের বিবেককে এ বিষয়ে সজাগ করার ব্যাপারে এবং সত্য সঠিক পথ গ্রহণ করতে উৎসাহদানের ব্যাপারে এর থেকে উন্নততর আর কোনো পদ্ধতির কল্পনাই করা যায় না।

ঈমানের পথই যে 'একমাত্র সত্য সঠিক ও কল্যাণের পথ এ আয়াতে তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। স্পষ্ট ও পরিষ্কার পথ সামনে এসে যাওয়ার পর কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে এ পথ পরিহার করে অন্য কোনো পথে চলাটা অস্বাভাবিক ও যুক্তিহীন। তাই বলা হচ্ছে

'অবশ্যই সত্য ভ্রান্তিজনক সকল পথের মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ।'

ঈমানই হচ্ছে সেই চির শ্বাসত সত্য পথ। যার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার এবং তার জন্যে লালায়িত হওয়া উচিত, আর কুফরই হচ্ছে সেই ভুল পথ যা পরিহার করে মানুষের উচিৎ তার অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে সর্বোতভাবে যত্নবান হওয়া।

মানব কল্যাণের জন্যে এইই হচ্ছে বাস্তব ও সঠিক পথ।

মানুষরা ঈমান-রূপী নেয়ামত সম্পর্কে যতোই চিন্তা-ভাবনা করবে এর অবদান মানুষের চেতনা ও উপলব্ধি শক্তিকে যতোই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে তুলবে। মানুষের অন্তর যতোই এর শিক্ষা ও উৎকর্ষে যত্নবান হবে পবিত্র জীবন লাভে সে ততোই উদ্বুদ্ধ হবে। সামাজিক জীবন যাপন কালে মানব জীবনের সমৃদ্ধি ও উন্নতির লক্ষ্যে যতো সুন্দর ও মযবুত ব্যবস্থাই সে গ্রহণ করবে, এসব কিছুর মাধ্যমে সে দেখতে পাবে যে, একমাত্র ঈমানই তাকে এই সকল কাজে এগিয়ে দিয়েছে, সে আরও দেখতে পাবে একমাত্র জাহেল হঠকারী ব্যক্তিরাই এই সুন্দর স্বচ্ছ শান্তি সমৃদ্ধি ও উন্নতির সরল পথ ত্যাগ করে তারা নির্জলা ভ্রান্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। হেদায়েতের পথ ত্যাগ করে তারা অন্যায় ও অসত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

أَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ

هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ ۫ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً

لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاِذْ قَالَ

اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ

بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ

২৫৯. অথবা (ঘটনাটি) কি সেই ব্যক্তির মতো যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন দেখলো, তা (বিধ্বস্ত হয়ে) আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (তখন) সে ব্যক্তি বললো, এ মৃত জনপদকে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশ বছর ধরে মৃত (ফেলে) রাখলেন, অতপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন; এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, আমি একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা বললেন, বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছো, তাকিয়ে দেখো তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে, (দেখবে) তা বিন্দুমাত্র পচেনি, তোমার গাধাটির দিকেও দেখো, (তাও একই অবস্থায় আছে, আমি এসব এ জন্যেই দেখালাম), যেন আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি (জীবন্ত) প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, এ (মৃত জীবের) হাড় পাঁজরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, (তুমি নিজেই দেখতে পাবে) আমি কিভাবে তা একটার সাথে আরেকটার জোড়া লাগিয়ে (নতুন জীবন) দিয়েছি, অতপর কিভাবে তাকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, অতএব (এভাবে আল্লাহর দেখানো) এ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। ২৬০. (আরো স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম বললো, হে মালিক, মৃতকে তুমি কিভাবে (পুনরায়) জীবন দাও তা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেন, তুমি কি (না দেখে) বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, হাঁ (প্রভু, আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু (এর দ্বারা) আমার মন একটু সান্ত্বনা পাবে (এই যা); আল্লাহ তায়ালা বললেন (তুমি বরং এক কাজ করো), চারটি পাখী ধরে আনো,

ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط

وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ

اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لا لَّهُمْ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ

مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾ يٰۤاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ

অতপর (আস্তে আস্তে) এই পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওদের নাম তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়), তারপর (তাদের কেটে কয়েক টুকরায় ভাগ করো,) তাদের (কাটা) এক একটি টুকরো এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো, অতপর ওদের (সবার নাম ধরে) তুমি ডাকো, (দেখবে জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে; তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

রুকু ৩৬

২৬১. যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে (একে একে) সাতটি শীষ বেরুলো, আবার এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ শস্য দানা; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক প্রশস্ত, অনেক বিজ্ঞ। ২৬২. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করে তা প্রচার করে বেড়ায় না, প্রতিদান চেয়ে তাকে কষ্ট দেয় না, (এ ধরণের লোকদের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে পুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে, (শেষ বিচারের দিন) এদের কোনো ভয় নেই, তারা (সেদিন) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ২৬৩. (একটুখানি) সুন্দর কথা বলা এবং (উদারতা দেখিয়ে) ক্ষমা করে দেয়া সেই দানের চাইতে অনেক ভালো, যে দানের পরিণামে কষ্টই আসে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি পরম ধৈর্যশীলও বটে। ২৬৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা (উপকারের) খোঁটা দিয়ে এবং (অনুগৃহীত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদকা বরবাদ করে দিয়ো না– ঠিক সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশেই দান করে, সে আল্লাহ

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

তায়ালা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না; তার (দানের) উদাহরণ হচ্ছে, যেন একটি মসৃণ শিলাখন্ডের ওপর কিছু মাটি(-র আস্তরণ), সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, অতপর পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকলো। (দান খয়রাত করেও) তারা (মূলত) এই অর্জনের ওপর থেকে কিছুই করতে পারলো না, আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনো সঠিক পথ দেখান না। ২৬৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে এবং নিজেদের মানসিক অবস্থা (আল্লাহর পথে) সুদৃঢ় রাখার জন্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তা কোনো উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি (সুসজ্জিত) ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও শিশির বিন্দুগুলোই (ফসলের জন্য) যথেষ্ট হয়, আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেন তোমরা কে কি কাজ করো। ২৬৬. তোমাদের কেউ কি চাইবে যে, তার কাছে (ফলে ফুলে সুশোভিত) একটি বাগান থাকুক, যাতে খেজুর ও আংগুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল থাকবে, তার তলদেশ দিয়ে আবার প্রবাহমান থাকবে কতিপয় ঝর্ণাধারা, আর (এর ফল ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান থাকবে, (এ অবস্থায় হঠাৎ করে) এক আগুনের ঘূর্ণিবায়ু এসে তার সব (স্বপ্ন) জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনগুলো তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা (আল্লাহ তায়ালার এসব কথার ওপর) চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ

اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ

الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ

اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ

نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۰﴾

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ

রুকু ৩৭

২৬৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরা যা অর্জন করেছো, সে পবিত্র (সম্পদ) এবং যা আমি যমীনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি, তার থেকে (একটি) উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (আল্লাহর জন্যে এমন) নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে রেখে তার থেকে ব্যয় করো না, যা অন্যরা তোমাদের দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না, অবশ্য যা কিছু তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করো তা আলাদা, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের দানের) মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসার মালিক তো তিনিই! ২৬৮. শয়তান সব সময়ই তোমাদের অভাব অনটনের ভয় দেখাবে এবং সে (নানাবিধ) অশ্লীল কর্মকান্ডের আদেশ দেবে, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর কাছ থেকে অসীম বরকত ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন (এবং সে দিকেই তিনি তোমাদের ডাকছেন), আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সম্যক অবগত। ২৬৯. আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে (একান্তভাবে) তাঁর পক্ষ থেকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করেন, আর যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার সেই) বিশেষ জ্ঞান দেয়া হলো (সে যেন মনে করে), তাকে (সত্যিকার অর্থেই) প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে, আর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া (আল্লাহর এসব কথা থেকে) অন্য কেউ কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে না। ২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করো আর যা কিছু (খরচ করার জন্যে) মানত করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন; যালেমদের (আসলেই) কোনো সাহায্যকারী নেই। ২৭১. (আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে) তোমরা যা কিছু দান করো, তা যদি প্রকাশ্যভাবে (মানুষদের সামনে) করো তা ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা (মানুষদের কাছে) গোপন রাখো এবং (চুপে চুপে) অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম; (এ

خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ

التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ

خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾ ع اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

দানের কারণে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দেবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ২৭২. (যারা তোমার কথা শোনে না,) তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার ওপর নয়, তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই সঠিক পথ দেখান, তোমরা যা দান সদকা করো এটা তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর, (কারণ) তোমরা তো এ জন্যেই খরচ করো যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো; (তোমরা আজ) যা কিছু দান করবে (আগামীকাল) তার পুরোপুরি পুরস্কার তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তোমাদের ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না। ২৭৩. দান সদকা তো (তোমাদের মাঝে এমন) কিছু গরীব মানুষের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত, তারা (নিজেদের জন্যে) যমীনের বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, আত্মসম্মানবোধের কারণে কিছু চায় না বলে অজ্ঞ (মূর্খ) লোকেরা এদের মনে করে এরা (বুঝি আসলেই) সচ্ছল, কিন্তু তুমি এদের (বাহ্যিক) চেহারা দেখেই এদের (সঠিক অবস্থা) বুঝে নিতে পারো, এরা মানুষদের কাছ থেকে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা করতে পারে না; তোমরা যা কিছুই খরচ করবে আল্লাহ তায়ালা তার (যথার্থ) বিনিময় দেবেন, কারণ তিনি সব কিছুই দেখেন।

রুকু ৩৮

২৭৪. যারা দিন রাত প্রকাশ্যে ও সংগোপনে নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে, তাদের মালিকের দরবারে তাদের এ দানের প্রতিফল (সুরক্ষিত) রয়েছে, তাদের ওপর কোনো রকম ভয় ভীতি থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى
فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۚ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۚ وَاللّٰهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৫. যারা সূদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সূদের মতোই (একটা কারবারের নাম), অথচ আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার (যার) কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সূদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে অতপর সূদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যে সূদ সে খেয়েছে তা তো তার জন্যে অতিবাহিত হয়েই গেছে, তার ব্যাপার একান্তই আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের ওপর; কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সূদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সূদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (-র পবিত্র কাজ)-কে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না। ২৭৭. তবে যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। ২৭৮. হে ঈমনদার লোকেরা, তোমরা (সূদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, আগের (সূদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৭৯. যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে), আর যদি (এখনো) তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে, (সূদী কারবার দ্বারা) অন্যের ওপর যুলুম করো না, তোমাদের ওপরও অতপর (সূদের) যুলুম করা হবে না। ২৮০. সে (ঋণ গ্রহীতা) ব্যক্তি কখনো যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে (তার ওপর চাপ দিয়ো না, বরং) তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও; আর যদি তা মাফ করে দাও, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে অতি উত্তম কাজ, যদি তোমরা (ভালোভাবে) জানো (তাহলে এটাই তোমাদের করা উচিৎ)!

রুকু ৩৯

২৮১. সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, সেদিন প্রত্যেক মানব সন্তানকে (জীবনভর) কামাই করা পাপপুণ্যের পুরোপুরি ফলাফল দিয়ে দেয়া হবে, (কারো ওপর সেদিন) কোনো ধরনের যুলুম করা হবে না।

তাফসীর

আয়াত ২৫৯-২৮১

আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি প্রতিটি মানুষের জীবনেই একটি বিরাট ভূমিকা রাখে। এর ওপর নির্ভর করে মানব জীবনের সুখ শান্তি। যে কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্য, পানীয় বাতাস যেমন প্রয়োজন। এইভাবে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ও তার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির চেতনাও বিরাজমান। এ চিন্তা-ভাবনা ও তৎপরতা সবার প্রকৃতিগত চাহিদা। এ বিষয়টি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তথা উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ খেয়াল কেউ ত্যাগ করে না। অথবা বলা যায় জ্ঞান-বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এ চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। এ চিন্তা-চেতনা বিলুপ্ত হলে গোটা সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতো। আর একইভাবে খানা-পিনা ও বায়ুর মতোই ঈমান এর প্রয়োজন রয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের উপর এবং বৈচিত্রময় মানবমন্ডলীকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বারবার আহবান জানিয়েছেন।

বিস্ময়কর দুটো ঘটনা

মৃত্যু ও জীবন সম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগে আর একটি কাহিনীর অবতারণা করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

অথবা সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে কি চিন্তা করেছো যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন দেখলো গোটা জনপদটি বিধ্বস্ত হয়ে আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (এই ভাবেই একদিন পরকালীন জীবনের) এই সত্য যখন তার এই বান্দার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো আমি (এই সত্য) জানি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

কে সেই ব্যক্তি যে ওই এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিলো, ওই বসতির যে সব বাড়ীর ছাদগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছিল সেগুলোই বা কি জিনিস? এ দুটি বিষয় সম্পর্কে কোরআনে কারীম বিস্তারিতভা কোনো বর্ণনা পেশ করেনি। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই সেগুলোর স্পষ্ট এবং বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারতেন। কোরআনে করীমে সতর্কভাবে যার বিশদ বর্ণনা বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই তার পেছনে কোনো যুক্তিসংগত কারণ আছে। আসুন না, পথ পরিক্রমায় কিছুক্ষণ আমরা এই কেতাবের ছায়াতলে একটু অপেক্ষা করি। এবার দেখি ওই ছায়ার মধ্যে একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যা অনুভূতির পর্দায় যেন জীবন্ত একটি স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। তা হচ্ছে মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব এবং এক মহা শূন্যতার দৃশ্য। যে অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা যেন এক জীবন্ত রূপ নিয়ে মানসপটে ভেসে ওঠে। এরশাদ হচ্ছে– আর ওই বসতির ছাদগুলো ধসে পড়ে এমন ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে যে গোটা এলাকা এক বিরান বিয়াবানে পরিণত হয়েছে, যার উপর দিয়ে শন শন করে বয়ে যাচ্ছে হিমেল হাওয়া। কেন এ ভয়ানক দৃশ্য পথিকের মনকে নাড়া দেবে না? মনের পর্দার উপর পতিত এই দৃশ্যের ছাপ ওই ব্যক্তিকে যেমন আন্দোলিত করেছিলো, বিদগ্ধ পাঠকের মনেও সেই ছাপ গভীরভাবে রেখাপাত করে, ফলে ওই দৃশ্যের এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা জাগিয়ে দেয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এমন ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে কেমন করে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন? বলছে যে ব্যক্তি সে জানে যে আল্লাহর কুদরত সব কিছু করতে পারে, তবুও ধ্বংসের ওই তান্ডবলীলা এবং ওই মহাশূন্যতা তাকে দিশেহারা করে দিয়েছে, ভীত বিহ্বল চিত্তে সে বলে উঠেছে আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে 'কিভাবে জীবিত করবেন বহু অতীতে যাদের মরণ হয়েছে?' প্রকৃতপক্ষে এমন কঠিন ও ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য যেন বলতে চায় ওদের পুনরায় জীবন লাভ সুদূর পরাহত ব্যাপার। জীবন সায়াহ্নে আগত শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক কোরআনের ছায়াতলে বসে যখন চিন্তার গহীন সাগরে ডুব দেয়, তখন তার হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়, অভূতপূর্ব অনেক অনেক কথা জানিয়ে যায় তাকে উন্মুক্ত আকাশের দৃশ্যাবলী ও পৃথিবীর ধ্বংসাবলীর ইতিহাস, দিক বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে মহান আল্লাহ একে পুনরায় জীবন দান করবেন মৃত্যুর পর এতোদিন অতিক্রান্ত হয়েছে যাদের! কেমনভাবে ধীর মন্থর গতিতে প্রাণ সঞ্চারিত হবে এসব মৃত দেহে?

'তারপর তাকে মৃত্যু দান করলেন একশত বছরের জন্যে, পরে আবার তাকে জীবিত করলেন'। কিভাবে তাকে জীবিত করলেন তা আল্লাহ তায়ালা জানাননি। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে ভেবে কোনো কূল কিনারা পাইনা কিভাবে তাকে তিনি যিন্দা করলেন! ভাবতে গিয়ে কখনও কখনও আমার অনুভূতি শক্তি ও মানসিক অবস্থার উপর দারুণ প্রভাব পড়ে, কারণ মানবীয় বুদ্ধিতে ওই অবস্থাটা বুঝা সম্ভব নয়, এমনকি আভ্যন্তরীণ শক্তি সহযোগেও (যা আল্লাহরই দান) ওই অবস্থার কোনো কুল কিনারা আমি করতে পারিনি। অথবা চোখে দেখা বাস্তব কোনো ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়েও যে আমি এ কথাটি বুঝবো তাও পারিনি। চোখে দেখা ব্যক্তিগত কোনো ঘটনার সরাসরি অভিজ্ঞতা হয়তো হৃদয়কে প্রশান্ত করতো, অনুভূতিকে তৃপ্তি দিতো। কিন্তু কোনো কথা

দিয়ে এ অবস্থা হৃদয়ংগম করার কোনো সুযোগ আমি খুঁজে পাইনি। আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'কতোদিন ছিলে তুমি এখানে? সে বললো, আমি থেকেছি একদিন বা এক দিনের কিছু অংশ মাত্র।'

সে বেচারা কি করে বুঝবে কতোদিন সে ওখানে ছিলো। বেঁচে থাকলে এবং তার চেতনা বর্তমান থাকলে হয়তো সে বুঝতো তার অবস্থানকালের মেয়াদ কতোটা! অবশ্য মানুষের অনুভূতি শক্তি গভীর সত্যকে পরিমাপ করা বা উপলব্ধি করার জন্যে মাপকাঠি হিসেবে যথেষ্ট নয়। মানুষের অনুভূতি প্রায় সময়েই ধোঁকা খায় এবং ভুল করে। অনেক সময় অনেক লম্বা সময়ও তার কাছে খুব কম মনে হয় কেননা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তার ধারণাশক্তি প্রভাবমুক্ত নয়। আবার অনেক সময় অতি অল্প সময়ও অনেক দীর্ঘ মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'না, বরং তুমি তো কাটিয়েছো এখানে একশতটি বছর।'

স্বভাবত, মানুষ যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার উপর ভিত্তি করেই সে অন্য কোনো ঘটনাকে বুঝার চেষ্টা করে। আমরা এতটুকু ধারণা করতে পারি যে নিশ্চয় সেখানে এমন কিছু নিদর্শন বর্তমান ছিলো যার ভিত্তিতে একশতটি বছর কেটে যাওয়ার অনুমান করা সম্ভব হয়েছিলো। অবশ্য শুধুমাত্র খাবার ও পানীয় দ্রব্যের না পচে যাওয়াই অতগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার অনুভূতি দান করার জন্যে যথেষ্ট মনে হয় না। আল্লাহর কথা, 'দেখো তোমার খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের দিকে, ওগুলো পচেনি।'

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝার মতো কোনো চিহ্ন ওই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অথবা তার গাধাটির মধ্যে ছিলো। তাই তো হয়তো আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'দেখো তোমার গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে গোটা মানব মন্ডলীর জন্যে একটি দৃষ্টান্ত বানাতে চাই। আবার দেখো ওই হাড্ডিগুলোর দিকে, কেমন করে আমি সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করেছি। তারপর সেগুলোকে গোশতের পোশাক পরিয়েছি।' হাড্ডির নিদর্শন? হাড্ডিগুলো নিজেই কি নিদর্শন ছিলো? হয়তো বা তাই হবে। আর তাই হয়ে থাকলে (যেমন কোনো কোনো মোফাসসের বলেছেন, হাড্ডিগুলো গোশ্তমুক্ত কংকাল ছিলো। যখন সে জেগে উঠেছিল তখন দেখতে দেখতে হাড়গুলো গোশত আবৃত হয়ে গেলো- এ দেখে তার অনুভূতিতে বিদ্ধ হতে লাগলো অজানা রহস্য রাশি। কিন্তু আল্লাহর কথার জবাবে এই যে কথা 'আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ এখানে কাটিয়েছি)। এর থেকেও তেমন কিছু বুঝা যাচ্ছে না। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করি যে গাধাটির হাড়গুলো গোশতমুক্ত কংকাল ছিলো। তার পচা অংগ থেকে গোশতগুলো খসে খসে পড়ে পরিষ্কার হাড়গুলোই অবশিষ্ট ছিলো। আর একটি নিদর্শন বুঝা যায় যে, হাড্ডিসার কংকালটি আবার ঠিক মতো লেগে যাওয়া এবং মাংসসমৃদ্ধ হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে যাওয়া ও তারপর তাকে বাঁচিয়ে তোলা এইসব দৃশ্য, তাকে অভিভূত করেছিলো এবং তার মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করেছিলো। কেননা এই দীর্ঘদিন মৃতাবস্থায় থাকার পরও তার নিজের শরীরে এমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। ঘটনার এই বিভিন্নতাকে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা এ বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর কুদরতের সামনে নুয়ে পড়ে, গভীরভাবে তারা যেন অনুভব করে যে আল্লাহ তায়ালা অপরিসীম ক্ষমতার মালিক। যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন তাঁর কাজকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারোও নেই। তাঁর কাজের জন্যে বস্তুগত গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। এখানে এ ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে করে মানুষ মৃত্যুর পর আবার হায়াত লাভ করার বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়।

এ অস্বাভাবিক ঘটনাটি কিভাবে ঘটলো? ঘটলো সেইভাবে যেভাবে অন্যান্য অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো ঘটেছে। যেমন প্রথম সৃষ্টির অস্বাভাবিক ঘটনাটি বাস্তবায়িত হয়েছিলো। আমরা সে অস্বাভাবিক ঘটনাটা আসলেই ভুলে গেছি। সে ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিলো সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। জানি না কিভাবে মানুষ সৃষ্টিজগতে এলো, এতটুকু মাত্র জানি যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাঁর কাছ থেকে মানুষের আগমন। আর এই প্রশ্নে, সৃষ্টিতত্ত্ব বিশারদ বা জীব বিজ্ঞানী ডারউইন নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তিনি অনেক চিন্তা-গবেষণা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মানুষের সৃষ্টি পর্যায়ক্রমিক, অর্থাৎ ক্রম বিবর্তনের ধারা বেয়ে মানুষ আজকের এই আকৃতি লাভ করেছে। তার গবেষণায় যে বিবর্তনের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি পৌঁছে গেছেন প্রথম জীবকোষ পর্যন্ত।

কিন্তু সেই জীবকোষটি কোত্থেকে অস্তিত্বে এলো বা সেটা কিভাবে সৃষ্টি হলো এতদূর পর্যন্ত তাঁর চিন্তা-শক্তি অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। এই অক্ষমতা সত্তেও তিনি সেই মহান সত্ত্বাকে মেনে নিতে রাযি নন বা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান না যার কাছে গিয়ে মানুষের সকল জ্ঞান-গবেষণা পরাজয় স্বীকার করে। এসব কিছু দেখে শুনে মানুষের মুখে যে কথাটি অত্যন্ত জোরালোভাবে ফুটে ওঠে তা হচ্ছে প্রথম সেই জীবকোষটি অবশ্যই মহান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। ওই ব্যক্তি জ্ঞানের অভাবে আল্লাহকে মানে না এমন নয়। এর কারণ ঐতিহাসিক, অর্থাৎ খৃষ্টান পাদ্রীদের উপস্থাপিত ধর্ম বিষয়ক ধ্যান-ধারণা এবং তাদের শাসন নীতি ওই ব্যক্তিকে হতাশ করেছিলো এবং তিনি ধর্মকে শোষণের সহায়ক এক সংস্থা হিসেবে জানার কারণে তার পার্শ্বে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। ঐ ব্যক্তি যে কথাটি মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছিলো তা হচ্ছে– সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বহির্ভূত এমন কিছুকে স্বীকার করা যা যান্ত্রিক সভ্যতার কোনো নিয়ম নীতির মধ্যে পড়ে না।

যান্ত্রিক নিয়ম-নীতিই বা কি জিনিস! চোখ ও দৃষ্টিশক্তি বহির্ভূত বহু জিনিস এমন আছে যা অন্তর শুধু অনুভবই করতে পারে এবং মানুষের উপলব্ধি শক্তি এমন কিছুর সন্ধান পায় যা কোনো যন্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায় না বা কোনো যন্ত্র তার অবস্থান পরিমাপ করতেও পারে না। কিন্তু সে রহস্যকে মানুষ পুরোপুরি অস্বীকারও করতে পারে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা যন্ত্রভিত্তিক জিনিসের বাইরেও বহু বহু বিষয় আছে যা অনেক সময় কোনো ভাষা দিয়ে বুঝানো যায় না।

আর এই যান্ত্রিক নিয়মও এতো জটিল যে, তার বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই কেঁপে ওঠে। কিন্তু জীব কোষগুলো প্রথম ধাপ পার হয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন পৌঁছে যায় তখন মানুষের উপলব্ধি শক্তির কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন কোনো জিনিষের প্রথম সৃষ্টি ও তার উপকরণ সম্পর্কে আর বিস্ময় থাকে না, সে সময় মনকে এ প্রশ্নও আর পেরেশান করে না যে, প্রথম সৃষ্টির কাজে তার নিজের ভূমিকা কী? আর এ সৃষ্টি ক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান গতি এক দীর্ঘ সূত্র ধরে কাজ করে যা মানুষকে তার সৃষ্টির সূচনা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার মনোযোগকে নিয়ে যায় সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সূচনা পর্বের দিকে, অর্থাৎ প্রথম জীব কোষটির দিকে, যা ক্রমবিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়। এই নির্দিষ্ট ধারা পরিত্যাগ করে অন্য কোনো ধারা গ্রহণ করে না, করতে পারে না। নিজস্ব গতিপথ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া বা অন্য পথে যাওয়ার চিন্তা করা কোনোটাই সম্ভব নয়।

এবারে আসুন, আমরা আবার ফিরে যাই উপরে উল্লেখিত বিস্ময়কর ওই বসতির দিকে, যেখানে গেলে আবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, 'একই জায়গায় দীর্ঘ সময়ের অতিক্রম কোনো

কিছুকে পচিয়ে গলিয়ে তার ধ্বংসাবশেষকে বাঁচিয়ে রাখলো, আবার অন্য কোনো জিনিসকে ক্ষয় ও লয় হওয়া থেকে সম্পূর্ণ রেহাই দিলে কোন সে শক্তি যা এর পেছনে কাজ করেছে? এ বিভিন্ন অবস্থা হওয়ার পেছনে কী ছিলো সে অসাধারণ কারণ যা আজও মানুষের মনের কাছে এক জিজ্ঞাসা হয়ে রয়েছে?

সাধারণ দৃষ্টিতে এই কারণ বুঝা যায়, আর তা হচ্ছে– সকল ঘটনার পেছনেই মহাশক্তিমান আল্লাহর হাত রয়েছে যা অবধারিতভাবে তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করে চলেছে। সে শক্তি কারো ইচ্ছা বা কোনো শক্তির মুখপেক্ষি নয়। কোনো উপায় নেই তাঁর বিরোধিতা করার বা তাঁর থেকে বেপরোয়া হয়েও কেউ থাকতে পারে না।

নিজ বুদ্ধিতে স্বাধীনভাবে চলতে চাওয়ার চিন্তাও এক বিরাট অপরাধ। আমরা যদি আমাদের তক্বদীরকে নিজেরা নির্ধারণ করার দুঃসাহস করি এবং আমাদের সিদ্ধান্তগুলো যদি নিছক বুদ্ধিনির্ভর হয় অথবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে কোনো বস্তুবাদী যুক্তিভিত্তিক চিন্তা করি, তাহলেও আমরা ভুল করবো। মানুষেরা সাধারণভাবে যতো ভুল করে সেগুলোর মধ্যে এটা অবশ্যই একটা বড় ভুল। আমাদের ভুলগুলোর একটা হচ্ছে আমরা মনে করি, যে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী আমরা নিজেরা চলি আল্লাহ তায়ালাকে আমরা ওই সব নিয়মের মধ্যে পাবো না কেন? আমাদের বুঝা প্রয়োজন যে অত্যন্ত সীমিত উপায় উপকরণের ভিত্তিতে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তার আলোকেই রচিত হয় আমাদের অভিজ্ঞতার জগত। এইসব অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তো আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ উপলব্ধি শক্তির সাহায্য নেই।

দ্বিতীয় যে ভুলটা আমাদের প্রায়ই হয়ে যায় তা হচ্ছে– আমাদের জানা সৃষ্টির সমস্ত আইন কানুনের মতো আমরাও আমাদের নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করে নিতে পারি। আমরা ভেবে দেখিনা কে সে সত্ত্বা যিনি বলছেন, তাঁর আইনই চূড়ান্ত, পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ আইনের বাইরে কোনো আইন এমন হতে পারে না যাকে চূড়ান্ত এবং সকল প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা যেতে পারে।

তৃতীয় ভুল এই যে, মানুষ মনে করে সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী চূড়ান্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নিয়ম কানুন নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে, এই অবস্থাতে সৃষ্টিকর্তা যে আইন কানুন দান করছেন তা গ্রহণ করতেই হবে, অন্য কিছু মানা যাবে না এমনভাবে তিনি সেগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দেননি। সকল অবস্থাতেই ওই আইন মানাকে ঐচ্ছিক হিসেবেই তিনি রেখেছেন। এমনি করে পরীক্ষা চলতে থাকে এবং নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার আলোকে দাওয়াতের কাজ এগিয়ে যায়, সে বুঝতে পারে মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের রহস্য। বিশেষভাবে বলা হয়েছে সবাইকেই একদিন আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে এবং এটা একটা অমোঘ সত্য।

সর্বাবস্থায় সরল সহজ জীবন যাপন করাই উত্তম। এ সত্যটিকে কোরআনে কারীম অত্যন্ত প্রা ল ভাষায় বর্ননা করেছে এবং মোমেনদের অন্তরে একথা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। যাতে করে বাহ্যিক উপায় উপকরণের পরোয়া না করে এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী উপক্ষো করে নিশ্চিত মনে সে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তখন তাদের মধ্যে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে আল্লাহ তায়ালা তাই-ই করেন যা তিনি করতে চান। যে লোকটির সামনে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নজীর প্রকাশিত হলো সে যা বলে উঠলো, আল্লাহ তায়ালা তার সেই উদ্ধৃতি এখানে পেশ করেছেন, 'যখন তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো, আমি তো জানিই যে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করতে পারেন।'

এরপর আসছে তৃতীয় পরীক্ষা, মুসলিম জাতির পিতা খলীলুল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-এর উপর আগত কঠিন পরীক্ষা। এরশাদ হচ্ছে,

(মৃতকে পুনরায় জীবন দানের ব্যাপারে ইবরাহীমের ঘটনাটিও তুমি লক্ষ্য করো!) ইবরাহীম বললো, ...(দেখবে বিভিন্ন জায়গায় রেখে আসা এই কাটা অংশগুলো জীবন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহান শক্তিশালী এবং বিজ্ঞ কুশলীও বটে।

এ ঘটনা ছিল সর্বশক্তিমান বিশ্বপালকের সৃজনী ক্ষমতার এক বিস্ময়কর নযীর। দেখুন ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতার এই নিদর্শন ফুটে উঠলো তখন পরম অনুগত, সহিষ্ণু, বিশ্বস্ত, পরিতৃপ্ত, আল্লাহভীরু, অত্যন্ত নিকটতম বান্দা ও বন্ধু ইবরাহীম (আ.) এর মানসিক অবস্থা কী হতে পারে। পরবর্তীকালে যখনই তাঁর স্মৃতিপটে এই ঘটনা ভেসে উঠেছে তখন তিনি প্রচন্ড আবেগে প্রকম্পিত হয়েছেন, আর আজও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য বান্দারা এই ঘটনা শুনে ভাবের আবেগে বিগলিত হন এবং আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য অনুধাবনে ভক্তি শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়েন।

এ দৃশ্য সরাসরি ঈমানের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে জড়িত নয়, কোনো দলীল প্রমাণ লাভ করার জন্যেও এর উল্লেখ হয়নি। অথবা ঈমানের শক্তি বৃদ্ধিও এখানে প্রধান কথা নয়, বরং এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা, এর তাৎপর্যও আলাদা। প্রকৃতপক্ষে এটা আত্মার পরিতৃপ্তি লাভের জন্যে এক আগ্রহ প্রকাশ এবং আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য জানার জন্যে এক আকুতি। বাস্তবে ওই দৃশ্যের অবতারণা এবং মানব সৃষ্টি রহস্য বুঝার জন্যে এই যে কাকুতি মিনতি এটা না দেখে বিশ্বাস (ঈমান বিল গায়ব) এর পরিপন্থী কোনো আব্দার নয়, এর দ্বারা ঈমানের উর্ধে আরোও এমন কিছু জিনিস পাওয়া যায় যা আর কিছু থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এর তৃপ্তি মানুষকে এমন উর্ধজগতে নিয়ে যায়, যা শুধু 'ঈমান বিল গায়েব' দ্বারা সম্ভব নয়, এমনকি ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমান দ্বারাও সম্ভব নয়। এই জন্যেই তো ইবরাহীম (আ.) ও তার রবের মধ্যে ওই অভূতপূর্ব কথোপকথন এবং তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ রহস্য দেখে ঈমানের যে বলিষ্ঠতা আসে তা অন্য কোনোভাবেই আসা সম্ভব নয়। আকাংখা পোষণ করা ঈমান বিল গায়েবের পরিপন্থী নয়, এবং ঈমান লাভ করার জন্যে এটাই যে একমাত্র দলীল তাও নয়, বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতা দেখার জন্যে এ এক আকুল আবেদন, যাতে অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তির এক সুবাস বয়ে যায়, আর প্রেমিক হৃদয় আকণ্ঠ সে সুবাসিত 'শরাবান ত্বহুরা' পান করতে পারে। এর দ্বারা বলিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব এবং তার বিকল্প কিছুই হতে পারে না।

বাস্তবে এই নিরীক্ষা সংঘটিতও হয়েছিলো এবং যে বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) তার রবের নিকট আব্দার জানিয়েছিলেন তাতে সাড়াও পেয়েছিলেন, আর এইভাবে তার ঈমানী শক্তি চূড়ান্তভাবে মযবুতও হয়েছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে– 'স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম বললো, 'হে আমার রব আমাকে একটু দেখিয়ে দাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবন দাও। (আল্লাহ তায়ালা) বললেন তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো অবশ্যই, কিন্তু এর দ্বারা হৃদয় সান্ত্বনা পাবে।'

এ হচ্ছে মানুষের অন্তরের গোপন কন্দরে সৃষ্ট আল্লাহর ক্ষমতা সন্দর্শনের এক অতৃপ্ত বাসনা, তাঁর ক্ষমতার উপর পূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও কিভাবে সে কুদরত বাস্তবায়িত হয় তা প্রত্যক্ষ করে

ধন্য হওয়ার অদম্য স্পৃহা উত্থিত হয়েছিল সেই হৃদয়ে, যা নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছিলো তার আল্লাহর জন্যে সবটুকু যা কিছু তার ভান্ডারে ছিলো। তাই উদ্বেলিত এ প্রাণের আকুতি উপেক্ষিত হয়নি মহান মেহেরমান রব্বুল আলামীনের দরবারে। তাই তিনি একান্তভাবে সরাসরি ইবরাহীম (আ.) কে এই নিরীক্ষা লাভের সুযোগ দিতে গিয়ে তাঁকে বললেন,

'চারটি পাখী ধরে আনো। আস্তে আস্তে এই পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওদের নাম তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়)। তারপর তাদের শরীরকে কেটে কয়েক টুকরায় ভাগ করো। এই (কাটা) অংশগুলোর এক একটি টুকরোকে এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো। অতপর এদের (সবার নাম ধরে) তুমি ডাকো, (দেখবে এরা জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে।'

এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ। এটা কোনো কথার কথা ছিলো না। তাই তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) কে চারটি পাখী ধরে তার কাছে রেখে সেগুলোকে পালতে বলেন। এই নির্দেশের কারণ হলো, যেন তিনি ঠিক করে রাখতে পারেন সেগুলোর পশম, রং ও আকৃতি দেখে আলাদা করে তাদেরকে চিনতে কোনো ভুল না হয়। এরপর তাদেরকে জবাই করে টুকরো টুকরো করে দূর দূর পাহাড়ের উপর রেখে আসতে বললেন। এরপরে ডাক দিলে টুকরাগুলো একত্রিত হয়ে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে আসবে। কেননা তাদেরকে পুনরায় জীবন দান করা হলেই তারা ছুটে আসতে পারবে এবং তখন স্বাভাবিক একটা ব্যাপার মনে হবে।

এই দৃশ্যের মাধ্যমে ইবরাহীম (আ.) তাঁর রবের কুদরত বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখেছিলেন। আর এইভাবেই তাঁর ক্ষমতা বিশ্বজোড়া বই-এর পাতায় পাতায় নিশিদিন ও প্রতি মুহূর্তে প্রতিফলিত হচ্ছে। মানুষ এগুলো সংঘটিত হওয়ার পরই শুধু দেখতে পারে। প্রতিটি সৃষ্টিকে দেয়া এই হচ্ছে জীবনের রহস্য, সেই জীবন, যার অস্তিত্ব একদিন বাস্তবে ছিলো না। এই জীবনই প্রত্যেকটি নতুন প্রাণীকে অসংখ্যবার দেয়া হচ্ছে।

ইবরাহীম (আ.) তার সামনে এই রহস্যজনক ঘটনা ঘটতে দেখলেন। পাখীগুলোকে প্রথমে টুকরো টুকরো করে দূর দূর এলাকাতে তাদের খন্ডিত দেহের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলেন, এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের মধ্যে পুনরায় জীবন ফিরে এলো এবং তার কাছে তারা দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করলো।

কেমন করে এটা সম্ভব হলো, এই হচ্ছে সেই রহস্য যা মানুষের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এ ধরনের ঘটনাকে মানুষ ওই বিস্ময় নিয়েই দেখবে যেমন ইবরাহীম (আ.) দেখেছিলেন এবং ইবরাহীম (আ.) যেমন এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন, প্রত্যেক মোমেনও একইভাবে ওই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এই জীবন যাওয়া ও আসার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। এতটুকু একজন মোমেন ব্যক্তি বুঝে ও স্বীকার করে যে আল্লাহর হুকুমেই একাজ সংঘটিত হয়। সে গভীরভাবে উপলব্ধি করে যে মানুষ আল্লাহর জ্ঞানের কিছুমাত্র পরিধি করতে পারে না। তবে তিনি কাউকে কিছু দিতে চাইলে সে কথা স্বতন্ত্র। আর একথাও সত্য যে জীবন ফিরিয়ে দেয়ার এ রহস্য ও পদ্ধতি তিনি কাউকে জানান না, কারণ তিনি তাদের সবার উপর সর্বাধিক মর্যাদাবান এবং তাঁর প্রকৃতি থেকে মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন। কারণ তিনি স্রষ্টা, যখন চান তাই করতে পারেন। আর মানুষ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না।

সৃজনী ক্ষমতাই হচ্ছে স্রষ্টার সব থেকে বড় ক্ষমতা, যা কোনো সৃষ্টি হাসিল করতে পারে না। এ কাজটা পারলে তো সে স্রষ্টার গোপন রহস্যের পর্দা উন্মোচন করতে পারতো, কিন্তু না, যতো চেষ্টাই সে করুক না কেন সে ওই রহস্যাবৃত সৃষ্টির পর্দা আরো একটু টেনে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার ক্ষমতা সে রাখে না। প্রকৃতপক্ষে এ লক্ষ্যে পরিচালিত তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়। অর্থাৎ গায়বের খবর জাননেওয়ালা আল্লাহর হাতে কোনো ক্ষমতা রেখে নিজের হাতেই যখন সে সব কিছু করতে চায় তখন তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

আলোচ্য অধ্যায়ে পেছনের তিনটি 'পাঠ'এ বিবৃত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পৃথক পৃথকভাবে না বলে সমস্ত কথাগুলো এক সাথেই বলা হচ্ছে যাতে করে ঈমানের কিছু মূলনীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই চিন্তাধারাটি নিজেও স্পষ্ট হয় এবং এই চিন্তাধারার শেকড়গুলো আশেপাশে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। দীর্ঘ সূরাটির আলোচনা এই পর্যায়ে এসে একটু বিরতি পায়। ঈমানের মৌলিক মূলনীতিসমূহের দীর্ঘ এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সংগঠনকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন আজকের যামানায় তারা সারা বিশ্বের মানুষকে পরিচালনা করতে পারে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ের বিষদ বিবরণ এসে গেছে।

এখন থেকে সূরাটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাবেন জনসাধারণের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা, যাতে করে মুসলিম সমাজ ওই মূলনীতিগুলো অনুসারে তাদের বাস্তব জীবনে যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। অর্থনৈতিক এ ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে মানুষের দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তির জামানত দান এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের পক্ষে ফরয এবাদাত যাকাতের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা এবং নফল বা ঐচ্ছিকভাবে দেয় দান খয়রাতের মাধ্যমে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় করা। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এটাই মূল উদ্দেশ্য। যা নবী (স.) নিজে চালু করে গেছেন। এটা ওই দৈব ব্যবস্থা নয় যা জাহেলী যুগে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিলো। এ কারণে একাধারে এখানে ছদকা খয়রাতের নিয়ম শৃংখলা বলে দেয়া হচ্ছে এবং সাথে সাথে সূদী ব্যবস্থার দোষ ক্রটির ব্যাখ্যা দান করে সেই ব্যবস্থার প্রতি লা'নত বর্ষণ করা হচ্ছে। এতোটুকুতেই আলোচনা শেষ হয়নি, বরং লেন-দেনের নীতি-নির্ধারণ করতে গিয়ে ঋণ-দান ও ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে করা হবে তাও সূরাটির শেষাংশে বলে দেয়া হয়েছে। এ আলোচনায় স্পষ্টভাবে দেখা যাবে সামাজিক জীবনের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জটিল প্রশ্নের উত্তর এসে গেছে এবং যে ব্যবস্থা অবলম্বনে সামষ্টিক জীবনে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি গড়ে উঠতে পারে তার মূল কথাগুলো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর এইটিই হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল কথা।

উদারতা ও দান খয়রাত

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব উদারতা ও দান খয়রাত সম্পর্কিত আলোচনা এবং সদকা খয়রাত ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার বিধান। আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যবস্থা হচ্ছে গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর বাধ্যতামূলক এবং জেহাদের হুকুম তার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই জেহাদী কাজ শুরু হয় দাওয়াতী কাজ দ্বারা। এই দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে আগত মোমেনদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজনে মোমেনদের পক্ষ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে অর্থ সম্পদ ব্যয়িত হয়, আর তার সাথে অন্যায় উচ্ছৃংখলতা, অশান্তি ও বিদ্রোহ দমনার্থেও হয় অর্থের প্রয়োজন। অর্থের কোরবানী সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন যখন মোমেনদের কোনো দল কোনো শক্তিশালী যালেম শাসক বা জনপদের অধীনে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে প্রয়োজন হয় অনেক অর্থ। এই শক্তিদর্পীরা নিজ কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জন্যে দুনিয়ায় অশান্তির সয়লাব বইয়ে দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং ইসলামী জীবন যে কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। সত্য সঠিক জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করায় তাদেরকে বাধা দান হচ্ছে সকল অপরাধের বড় অপরাধ এবং যুলুম আত্মার প্রশান্তি ও অর্থহানি থেকেও বেশী কষ্টদায়ক।

আলোচ্য সূরার মধ্যে মুসলমানদেরকে দান খয়রাত করার জন্যে বারংবার আহবান জানানো হয়েছে। এখন বিস্তারিতভাবে দান খয়রাতের নিয়ম কানুনের বর্ণনা আসছে। এ নিয়ম কানুন বর্ণনা করতে গিয়ে বড় চমৎকার ও মোহাব্বাতপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রসংগে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নিয়ম শৃংখলার কথা এসেছে। এই দান খয়রাতের নিয়ম এমন সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে, দানকারী ব্যক্তি দান করতে গিয়ে নিজের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দ ও আত্মসম্ভ্রমবোধ অনুভব করে এবং এ ব্যবস্থা দান গ্রহণকারীদের জন্যে উপকারী ও লাভজনক বলে অনুভূত হয়, আর এই নিয়মের ফলে গোটা সমাজের লোকজন এমন এক পরিবারে পরিণত হয় যাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা, সাহায্য করার মানসিকতা, দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি হয় এবং গোটা মানব জাতি, দাতা ও গ্রহীতা উভয়শ্রেণীর লোকেরা সম্মানজনক অবস্থানে এসে পৌঁছায়।

এই পাঠের মধ্যে যে ব্যাখ্যা এসেছে তা দান খয়রাত সম্পর্কে এমন একটি বিধান দেয় যা নির্দিষ্ট কোনো সময় বা নির্দিষ্ট কোন অবস্থার জন্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে এ বিধানের বাইরে যখন আমরা তাকাই তখন দেখি আজও মুসলিম সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে যে দয়া-মায়া, মমতা ও ভালবাসা বিরাজমান এবং এখনও পারস্পরিক যে দয়া সহানুভূতি মুসলিম সমাজে টিকে আছে তা আর কোথাও নেই। আর এই বিধানের কারণেই আল্লাহর অনুগত মুসলিম জনতার মধ্যে ভবিষ্যতেও এই সম্পর্ক বজায় থাকবে। অবশ্য এটা সত্য যে সকল সমাজ ও জনপদের মধ্যে যেমন সব সময়েই কিছু ভালোমন্দের মিশ্রণ থাকে, তেমনি মুসলিম সমাজেও কিছুসংখ্যক কৃপণ লোক অতীতে ছিলো, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, যারা খরচ করার ব্যাপারে ধন সম্পদের কমতি অনুভব করতে থাকবে এবং দান খয়রাত করার প্রশ্ন আসলে মনে করবে তাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে প্রেরণাদায়ক কথা ও হেদায়াতের কথা আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, তাই এহেন ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করেই কোরআনে করীমে বহু উদ্দীপক কথা বলা হয়েছে। তাদের জন্যে উদাহরণ পেশ করারও প্রয়োজন আছে এবং এমন সব সত্য ঘটনা ও দৃষ্টান্ত তাদের সামনে পেশ করার প্রয়োজন আছে যেগুলো নিজেদের উজ্জ্বলতায় নিজেরা ভাস্বর। এইসব দৃষ্টান্ত সংকীর্ণ হৃদয় ও কৃপণ স্বভাব লোকের জন্যে অনেক সময় প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

দান-খয়রাত করলে ধন সম্পদ ফুরিয়ে যাবে বলে যারা মনে করে তারাই সূদ ছাড়া কাউকে কিছু কর্য দিতেও রাযী নয়, এমনিতে দেয়া তো দূরের কথা। আবার আরো কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো কিছু দেয়, কিন্তু বড় কষ্টের সাথে অথবা লোক দেখানোর জন্যে দেয়। আবার এমনও একশ্রেণীর লোক আছে যারা সদকা খয়রাত করে, কিন্তু মনের মধ্যে থাকে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা। ওই আশা ভংগ হলে তারা খোঁটা দিয়ে বসে, ফলে গ্রহীতারা কষ্ট পায়- এইটাই হচ্ছে 'এহসান' করে খোঁটা দেয়া ও কষ্ট দেয়ার নামান্তর। আরো কিছু মানুষ আছে যারা কিছু না কিছু সাহায্য সামগ্রী দেয় তো বটে, কিন্তু বেছে গুছে যা কিছু খারাপ তাই-ই দেয়, আর ভালো জিনিসগুলোকে সযত্নে সরিয়ে রাখে। এদের কেউ-ই নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে দান করেছে বলা যাবে না। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তারা তাদের সম্পদের মধ্য থেকে যা কিছু ভালো তাইই দান করে এবং গোপনে যেখানে খরচ করা প্রয়োজন বোধ করে সেখানে গোপনে খরচ করে, আরে যেখানে প্রকাশ্যে খরচ করা প্রয়োজন মনে করে সেখানে প্রকাশ্যেই খরচ করে এবং সমস্ত খরচের বেলায় একান্তভাবে ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা খরচ করছে বলে বুঝা যায়।

এই উভয় শ্রেণীর মানুষই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান। তাদের বিভিন্নমুখী মানসিকতা ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করণে আমাদের অবশ্যই অনেক উপকার হবে।

প্রথম উপকার এই হবে যে, আমরা কোরআনের আসল প্রকৃতি ও যে কাজে কোরআন নিয়োজিত তা ভালো ভাবে বুঝতে পারবো; বুঝবো কোরআন যিন্দা অবস্থায় বর্তমান আছে এবং আজো পূর্ববৎ সজীব ও সচল আছে। আমরা দেখতে পাবো, উপরে বর্ণিত ওইসব বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ও তাদের আচরণের আলোকে মুসলিম জামায়াতের মধ্যে মোহাব্বতপূর্ণ সম্পর্ক সক্রিয় ও অবস্থা আজো সচল আছে। দেখবো, কোরআন সর্বদাই বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করে যাচ্ছে। কখনো কাউকে প্রতিহত করছে, আবার কখনো কাউকে অনুমোদন দিচ্ছে, আরো দেখা যাবে মুসলিম জামায়াতের মধ্যকার কোনো কোনো শ্রেণীকে এটি প্রতিহত করেও চলেছে। কোরআনের নিরন্তর ভূমিকা চলছেই চলছে, মনে হচ্ছে কোরআন সদা সর্বদা সজীব সচল, কভু ম্রিয়মান নয়। দেখবো, কখনো কোরআন কাজ করছে যুদ্ধের ময়দানে, আবার কখনো কোরআনকে দেখবো মানুষের গতানুগতিক সাংসারিক জীবনের পথ প্রদর্শনের ভূমিকায়। প্রকৃতপক্ষে কোরআনে কারীম একাধারে প্রতিহতকারী, সঞ্চালনকারী এবং ময়দানের সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী।

কোরআনে কারীমের চিরন্তন আবেদন

আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি, কোরআনে কারীম আলোচ্য অধ্যায়ে যে ভূমিকা রেখেছে তার থেকে আমরা নিজেরা শিক্ষা ও সজীবতার যে অমূল্য সম্পদ লাভ করছি তার কোনো তুলনা নেই। আমরা দেখছি আল কোরআন বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে বাস্তব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সজীব, সচল এবং প্রতিহতকারী হিসেবে সর্বদাই কাজ করে চলেছে। অবশ্যই এটা আজকের এক মহাসত্য যে আমাদের এবং ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে যে চুক্তি ছিল, সে চুক্তি ভংগ থেকে আমরা বহু দূরে সরে গিয়েছি, আর এটাও সত্য যে বাস্তব ইসলাম ও আমাদের ইসলামী জীবনের মধ্যে আজ পাহাড় পরিমাণ ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এবং সত্যিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা জীবন্ত অনুভূতি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি। এই পৃথক হয়ে যাওয়ার পর কোরআনও আর তার সেই জীবন্ত রূপ নিয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেনি যা এককালে পৃথিবীর বুকে কায়েম ছিলো এবং মুসলমানদের ইতিহাসে নিজ অস্তিত্বের সাক্ষ্য রেখেছিলো। আর আজকে এটাও আমরা মনে করতে সক্ষম নই যে সেই সময়কার সার্বক্ষণিক যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে আল কোরআন মুসলিম সৈনিকদের জন্যে নিত্যদিনের সাক্ষী হিসেবে কি ভূমিকার অধিকারী ছিলো। অর্থাৎ তা ছিলো নিজের জীবনে কোরআনের আলোকে সমস্ত কাজ পরিচালনা করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআনের আইনকে চালু করার লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া। আর আজকে আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, কোরআন আমাদের অনুভূতির কাছে এক মৃত জিনিস অথবা ঘুমন্ত এক সত্ত্বা; আর কোরআন অবতীর্ণকালে তৎকালীন মুসলমানদের অনুভূতির কাছে এ মহাগ্রন্থ যে রূপ নিয়ে হাযির হয়েছিলো সেই রূপে আমাদের অনুভূতির কাছে কোরআন আর আসেনি। আমরা তো আমাদের মধ্যে কোরআনকে এমন অবস্থায় রেখেছি যে বড়জোর, গানের সুরের মতো কম্পমান কণ্ঠে সুর দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করি, অথবা ভাবের আবেগে গদগদ হয়ে সুরের মূর্ছনায় ঝিমুতে থাকি! অথবা আমরা থেকে থেকে পৃথক পৃথকভাবে এক এক আয়াত করে পড়ি। অবশ্য এসব পড়া থেকেও সত্য সঠিক নিষ্ঠাবান মোমেনের মনের মধ্যে যে গভীর অনুভূতি কখনো

কখনো আসে তার যথেষ্ট সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে তা সে যে ভাবেই পড়ুক না কেন, ধীরে ধীরে সুর দিয়ে, ছোটো ছোটো আয়াতে থেমে অথবা লম্বা আয়াত সুর করে পড়লে, সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে এক দুরন্ত আবেগ সৃষ্টি হয়। এই কোরআন পাঠ তার মনোযোগকে আকর্ষণ করে এবং তার মধ্যে এক প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করে- এ সবই কোরআনের মহিমা যার কারণে কোরআনের প্রতি মানুষের এ মনোযোগ। কিন্তু কোরআন চায় যেন মুসলমানরা সেইভাবে কোরআন পড়ুক, কোরআনের কথা শুনুক ও আমল করুক যেভাবে অতীতের মুসলমানেরা শুনেছিলো ও আমল করেছিলো এবং সেইভাবে কোরআনের অর্থের তাৎপর্য জানুক যেভাবে আজকের জীবনের নানা জটিলতার সমাধান করতে গিয়ে অনেক সময় জানতে পারছে। মুসলিম জামায়াতের ঐতিহ্য কোরআনের পাতায় পাতায় যেভাবে মূর্ত হয়ে রয়েছে আজকের মুসলিম জামায়াতের মধ্যে তার প্রতিফলন কোরআন দেখতে চায়, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোরআন জীবন্ত হয়ে উঠতে চায়। কোরআনের কথাগুলো তার বাক্যাবলীর মধ্যে সর্বদাই গতিশীল এবং সর্বকালের মানুষের জন্যে পথের দিশা দানকারী এ মহান কেতাবের সংস্পর্শে এসে মানুষ অনুভব করে যে, এ ইতিহাস কোন অদ্ভূত বা বিরল ইতিহাস নয়, বরং এইটিই সঠিক ইতিহাস, আর আজকে যা কিছু ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে এবং আমরা নিজ চোখে যা দেখতে পাচ্ছি তা যেনো ওই ইতিহাসেরই জের হিসেবে এগিয়ে চলেছে। আর আজকে যে সব জিনিস আমরা প্রতিরোধ করছি অতীতেও আমাদের পূর্বপুরুষরা তা প্রতিহত করেছিলো। ওই সকল বিষয়ের ব্যাপারেও কোরআন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই জন্যেই সর্বাবস্থায় কোরআন অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে এবং তার থেকে জীবনের জন্যে গতিপথ জেনে নেয়া আজও সমভাবে প্রয়োজন, কারণ কোরআন অধ্যয়নের সময় আমাদের সামনে পেছনের ঘটনাগুলো আজো জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর বাস্তবে যেমন কোরআন আজকের জীবনের জন্যে গঠনতন্ত্র, রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে শাসনতন্ত্র এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্যে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের জন্যেও একইভাবে কাজ করতে থাকবে।

আর দ্বিতীয়ত, কোরআনের আলোকে আমরা যখন অতীতের দিকে তাকাই তখন আমাদের সামনে ভেসে ওঠে সেই সকল অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি, যাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে দাওয়াতী কাজে এবং দাওয়াত দিতে গিয়ে শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা নানা নির্যাতনের মুখে দৃঢ় থাকা অবস্থায়। এ দৃশ্যগুলো আমাদের জন্যে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে প্রথম যুগের মুসলিম জামায়াতের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে যে ইংগীত পাওয়া যায় সেই দৃশ্যগুলো আজো আমাদেরকে সঞ্জীবিত করে, যেহেতু তাদের উপরেই কোরআন নাযিল হয়েছিল এবং এই কোরআনের আলোকেই রসূলুল্লাহ (স.) তাদের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে কিছু দুর্বলতা এবং কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি মাঝে মধ্যে দেখা দিয়েছিলো যেগুলো সংশোধনের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা ও তদারকির প্রয়োজন হতো, তবুও নিশ্চিত একথা সত্য যে, তারাই ছিলেন সকল কালের মধ্যে 'সর্বোত্তম জাতি। এ সত্যটি বুঝতে পারলেই কোরআন আমাদের উপকারে আসবে।

কোরআনের এই উপস্থাপনা আমাদের যথেষ্ঠ উপকারে আসে। কেননা, এসব দৃশ্য কোনোপ্রকার অতিরঞ্জিত না করে, বা কম না করে অথবা অস্পষ্ট বা কাল্পনিকভাবে না করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থা অবিকলভাবে তুলে ধরে। ওই দৃশ্যগুলো আমাদের অন্তর থেকে তখন হতাশা দূর করে দেয় যখন আমাদের মনে হয় আমরা ঐ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো না যা ইসলাম

আমাদের কাছে দাবী করে। তখনই আমাদের হৃদয়ে হতাশার আঁধারে আলোর উজ্জ্বল রেখা ফুটে ওঠে এবং তখন আমাদের মনে আশা জাগে যে, আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাসমূহ বিফল যাবে না। অন্য আর একটি রহস্য বুঝতেও ওইসব তথ্য আমাদেরকে সাহায্য করে– তা হচ্ছে দাওয়াতী কাজের পূর্ণতা হাসিলের জন্যে বা এ মহান কাজের হক আদায় করার জন্যে নিষ্ঠার সাথে অবিরতভাবে কাজ করে যাওয়া। এ বিষয়ে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি বা ক্ষতি হয়ে গেলে হতাশ হওয়া বা ভ্রান্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবেই একাজের গতি শনৈ শনৈ বৃদ্ধি পাবে এবং অবিশ্বাস্যভাবে দাওয়াতী কাজ সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। এই অবস্থায় অগ্রগতি ও সাফল্য বলিষ্ঠতার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং দাওয়াত দানের স্থায়ী কার্যক্রম সুদূরপ্রসারী ফলাফল ও স্থায়ী কল্যাণ ডেকে আনবে; যাবতীয় কল্যাণকর কাজকে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে এবং মন্দ কাজের অকল্যাণকারিতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে, এর সাথে ধীরে ধীরে ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলো দূরীভূত হতে থাকবে, আর যতোবারই তার উৎসাহ দমে যাবে ততবারই হাত ধরে তাকে তুলে নিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে দেয়া হবে। আর যতবার সফলতার পথ দীর্ঘ ও বিপদসংকুল মনে হবে ততোবারই নবতর উদ্দীপনা এসে তার ভাংগা মনকে চাংগা করে দেবে।

ওই সকল দৃশ্য থেকে তৃতীয় যে ফায়দাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, ওই মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সেই গুণগুলোর অধিকারী হওয়া যা প্রায় সময়েই আমরা ভুলে যাই অথবা সে সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যাই। আর তা হচ্ছে, মানুষকে মানুষরূপেই দেখতে হবে, দাওয়াত সমানভাবে সবার কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সব কিছুর জন্যে চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে। সার্বিকভাবে এ কাজটি করতে হলে প্রথম এবং সব কিছুর শুরুতে সংগ্রাম করতে হবে দুর্বলতার সাথে, ক্ষতি লোকসানের সাথে, কৃপণতা ও মনের গোপনে লালিত লোভ লালসার সাথে, তারপর অন্যায় অসৎ গোমরাহী এবং বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাথে। এই সংগ্রামের জন্যে চাই সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা তৈরী করা। প্রকৃতপক্ষে যারা পৃথিবীতে মুসলিম জামায়াতের সাথে কোরআন ও হাদীসের দেখানো পথে চলতে চায়, তাদের জন্যে এইভাবে সর্বপ্রকার ফায়দা হাসিলের দুয়ার খুলে যায়। মর্দে মোমেনকে সংগ্রাম করতে হয় ত্রুটি বিচ্যুতি ও পদস্খলনের বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও ক্ষতি লোকসানের সাথে। যেহেতু এ পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে রয়েছে নানাপ্রকার বাধা। আর যতোবারই এ পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে তার মোকাবেলা করতে গিয়ে যে দুর্বলতা ও ক্ষয়ক্ষতি হবে তা সামাল দেয়ার জন্যেও অবশ্যই মোমেনকে নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হবে। একইভাবে যে কোনো নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যে মোমেনকে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হবে। এ সকল অবস্থার মোকাবেলার জন্যেই তাকে আল্লাহর দিকে একান্তভাবে রুজু থাকতে হয় এবং সেই পদ্ধতিতেই তাঁর কাছে আরযি পেশ করতে হয় যেভাবে কোরআন শিখিয়েছে। এখানে এসে আমরা পুনরায় প্রথম কথার দিকে ফিরে যেতে চাই। ফিরে যেতে চাই আমরা আমাদের জীবনের কাজ ও পরিস্থিতি প্রসংগে কোরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন ইশারা ইংগীতের দিকে এবং সেই দৃষ্টান্তের দিকে যা আমাদের চেতনার মধ্যে ক্রিয়াশীল এবং আমাদের জীবনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে যেমন করে সে সব দৃষ্টান্ত প্রভাবিত করেছিলো প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে।

এবারে আমরা একের পর এক কোরআনের মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই। এরশাদ হচ্ছে,

যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর (নির্ধারিত) পথে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে (একে একে) সাতটি শীষ বেরোয়, আবার এর প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে (এই শস্য দানা ও বীজের উদাহরণের মতোই) বিপুল পরিমাণ দান করেন। আল্লাহর (দয়ার) ভান্ডার অনেক প্রশস্ত, (কাকে কী পরিমাণ দেয়া দরকার তা) তিনিই সবচাইতে বেশী জানেন।

দেখুন, দান করার বিধান সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রথমেই ফরয ওয়াজেবের উল্লেখ করে মানুষের উপর কর্তব্যবোধের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন না। শুরু করেছেন উৎসাহব্যঞ্জক কথা দিয়ে এবং একটি মায়া মমতাপূর্ণ ভংগিমায়। গোটা মানব মন্ডলীর মধ্যেই তিনি দানশীলতার মহিমা ও উপকার বর্ণনা করতে গিয়ে উদারতা সম্পর্কে এক প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সেই মহান উদ্দীপক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা মানুষের আবেগ সৃষ্টি করে এবং তার হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায় যে, দান করলে অর্থ সম্পদ কমে যায় না, বরং তা বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেখুন কী চমৎকার বর্ণনা।

'যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উদাহরণ ওই শস্য দানার ন্যায় যার দ্বারা উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ এবং প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে।'

একথা দ্বারা মন মগজে যে অর্থ বসানো হচ্ছে তা হচ্ছে দান করলে ওই অনুপাতে তার উপকার ফিরে আসে না বা যে পরিমাণে দান করা হবে তা ওই নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে না, বরং তা বহু বহু গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসবে যদিও 'সাতশত গুণ' সংখ্যাটি এখানে বিবৃত হয়েছে। আসলে দানের বিনিময়ে আল্লাহর মেহেরবাণীর খবর দিতে গিয়ে আমাদের বোধগম্য এই পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাভংগীর দিকে একটু খেয়াল করে তাকালে আমরা আয়াতটির মধ্যকার অন্তর্নিহিত অর্থটি গভীরভাবে অনুভব করবো এবং আমাদের বিবেক অবশ্যই গভীরভাবে প্রভাবিত হবে। বস্তুতপক্ষে, দানশীল জীবনই উন্নত জীবন এবং দানশীলরাই সত্যিকারে প্রগতিবাদী। দানশীলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জীবন্ত যে ব্যাখ্যা এই আয়াতটিতে ফুটে উঠেছে তা যে কোনো মানব প্রকৃতিকে আন্দোলিত করে, মহিমাময় করে তোলে দানশীলের ব্যবহারকে এবং তার মধ্যে যে আশ্চর্যজনক মহানুভবতা জাগায় তা কোনো ভাষা দ্বারা পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবুও আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানুষের বুঝ শক্তির উপযোগী, 'সাতটি শীষ, যার প্রত্যেকটিতে থাকবে একশতটি দানা'- এই কথা দ্বারা যে মোদ্দা কথাটা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে যিনি সকল ভান্ডারের মালিক তিনি চান তোমরা বেশী বেশী দান করে আল্লাহর চরিত্রে নিজেদেরকে চরিত্রায়ন করো।

দুনিয়ার এই ক্রমবর্ধমান দানশীল সমাজে অবস্থান করাকালে বহু মানুষের মধ্যে উদারতা ও মহানুভবতার বীজ উপ্ত হয় এবং তখন সে দান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। বস্তুতপক্ষে দান করে মানুষ দেয় যতটা, পায় তার থেকে অনেক বেশী, তার ভান্ডার কমে না, বরং বাড়ে। এভাবে সমাজে দানশীলতার এক শ্রোতধারা বয়ে যায় এবং এর ফলশ্রুতিতে সাধারণভাবে মানুষের উপকার ও শান্তি গড়ে ওঠে। এহেন সমাজে বাস করে সাধারণ মানব চেতনা এমনইভাবে উজ্জীবিত হয় যেন দানশীলতার ফল ও ফসল নিজ চোখে সে দেখতে পায়, তাই সে দ্বিধাহীনচিত্তে এই মধুর মননশীলতা গ্রহণ করে। অপরদিকে মেহেরবান পরওয়ারদেগার এই প্রশ্রবণের উদ্যোক্তার জন্যে খুলে দেন তাঁর অফুরন্ত ভান্ডারের দুয়ার। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বহু বহু গুণে বাড়িয়ে দেন তাঁর

প্রতিদানকে।' তিনি বাড়িয়ে দেন অসংখ্য গুণে ও হিসাব কিতাব না করেই তার রেযেককে (জীবন সামগ্রী) সীমাহীনভাবে, যার সীমা সংখ্যা কেউ জানে না- জানে না তার পরিমাপ কতো। একথা শেষ করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

তিনি প্রশস্ততার অধিকারী, তাঁর দানের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই, এ দানকে তিনি থামিয়ে দেন না বা এর প্রশ্রবণ শুকিয়েও যায় না। তিনি জানেন দানশীলের সংকল্প ও তার মনের মধ্যে জাগ্রত ভাবধারাকে, তাই আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে তার সেই মান গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। তার কাছে তো কেউ কোনো কিছুই গোপন করতে পারে না। তবে খেয়াল করতে হবে, কোন সে দান এটা, যার ফল তিনি বাড়াতেই থাকেন এবং এই দানশীলতার লালন করতে থাকেন? আবার ঐ দানটিই বা কি যা তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে, যার জন্যে ইচ্ছা তার জন্যে বাড়ান? হাঁ সে দান হচ্ছে তাই যা মানবতাবোধ ও চেতনাকে উজ্জীবিত করে এবং কখনো তাকে ম্লান হতে দেয় না। এমন দানশীলতা বা এমন খরচ যা কারো সম্মানকে আহত করে না বা কারো অনুভূতিকে ঘায়েল করে না। সে দান মানুষকে স্বস্তি দেয় এবং মানুষের মধ্যে পবিত্র এক মনোভাবকে জাগ্রত করে; এর লক্ষ্য যে একমাত্র আল্লাহর মোহাব্বাত ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্তি একথা তার ব্যবহারে বুঝা যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

যারা আল্লাহর নির্ধারিত পথে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর তা প্রচার করে বেড়ায় না ....শেষ বিচারের দিন তাদের যেমনি কোনো ভয় ভীতির সম্মুখীন হতে হবে না তেমনি তাদের এ নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনারও দরকার নেই।

'মান্নুন' শব্দটি দ্বারা অত্যন্ত অপ্রিয় এবং কদর্য ব্যবহার বুঝায়। এ এমন এক খারাপ খাসলাত যা মানুষের সম্ভ্রমবোধকে পদদলিত করে। এ খাসলাতটি যার মধ্যে থাকে সে মানুষের উপর অন্যায়ভাবে নিজের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করার জন্যে অথবা দান গ্রহণকারীকে অপমানিত করা বা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্যে এই দান করে। সুতরাং, তার এ দান খয়রাত আল্লাহর জন্যে নয়, বরং মানুষের জন্যে, আর এ ব্যবহার কোনো পবিত্র হৃদয়ে উদগত হয় না এবং তাই কোনো মোমেনের মধ্যেও এ হীন মনোবৃত্তি আসা উচিত নয়। সুতরাং এই এহসান প্রদর্শন, দাতা-গ্রহীতা উভয়ের জন্যেই একই প্রকার ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক ব্যবহার। দানকারীর জন্যে ক্ষতিকর এই জন্যে যে, এর মাধ্যমে তার মধ্যে অহংকার ও লোক দেখানো মানসিকতা সৃষ্টি হয়, এর দ্বারা সে তার (মুসলমান) ভাইকে অপমানিত করে ও তার হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দেয়, ভরে যায় তার নিজ হৃদয়ে লোক দেখানো মনোভাব এবং এর ফলে আল্লাহ থেকে সে অনেক দূরে সরে যায়। গ্রহীতার জন্যেও এই এহসান প্রদর্শন কষ্টকর। কারণ সে অন্যের নিকট বিনয়াবনত থাকতে বাধ্য হয়, পরাজিত মনোভাব নিয়ে তার কড়া কথার জবাব দিতে পারে না এবং কৃতার্থ থাকার কারণে হীনমন্যতা বোধ তাকে পেয়ে বসে। এর ফলে তার মধ্যে এক তীব্র জ্বালা ও প্রতিশোধ স্পৃহা গুমরে গুমরে ওঠে। ইনসাফ বা খরচ করা দ্বারা ইসলাম মানুষের মধ্যে এক মধুময় প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলতে চায়। চায় মানুষের ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত করতে এবং তাদের অভাব অভিযোগ দূর করে সকল প্রয়োজনে মানুষকে মানুষের বন্ধু বানাতে। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য কথা যে ইসলাম দানকারীর মননশীলতাকে এমনভাবে গড়ে দিতে চায় যে, সে দান করার মাধ্যমে উগ্র না হয়ে হবে পূর্বাপেক্ষা আরো নম্র, আরো ভদ্র। তার মধ্যে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর এই হুকুম পালনের মাধ্যমে গড়ে উঠবে মানবতাবোধ, তার স্বভাব জাগবে এবং তা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে যে আল্লাহর নেয়ামত লাভে সে ধন্য। তার যাবতীয় পদক্ষেপ

একথারই স্বাক্ষর বহন করবে যে আল্লাহর ভান্ডার থেকে সে যা কিছু লাভ করেছে তার ব্যবহারে সে কোনো সীমালংঘন করেনি, বা অপচয়ও করেনি অথবা যথেচ্ছা ব্যবহার করেনি, বরং কারো প্রতি এহসান প্রদর্শন না করে বা কষ্ট না দিয়ে সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই খরচ করেছে। একইভাবে দানগ্রহীতার মধ্যে এই নির্দেশ জাগায় মোহাব্বাত ও নমনীয়তা এবং তার দানশীল ভাইয়ের জন্যে জাগায় এক পবিত্র শুভেচ্ছার মনোভাব। আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে এবং মানবতার খাতিরে যে ভাই দয়া মোহাব্বাতের বাঁধনে তাকে বেঁধেছে তার জন্যে হয়ে যায় সে পরম বিশ্বস্ত বন্ধু। এই প্রীতি বন্ধন দলীয় জীবনকে করে পর্বতসম মযবুত। এই দলীয় জীবনে প্রত্যেক মানুষ একে অপরের জন্যে দায়িত্ববোধ অনুভব করে এবং বুঝে যে তারা সবাই মেলে এক গোত্র, একটি জীবন, একই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ধাবমান এক জনগোষ্ঠী তারা, যার এক সদস্য অপর সদস্যের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে। এই কারণেই এহসান প্রদর্শনের কাজটি ওইসব মহৎ গুণগুলোর সব কিছু খতম করে দেয়। এইভাবে খরচ করার কাজটি যাবতীয় পার্থিব কষ্ট ও আখেরাতের আযাবের জন্যে আমন্ত্রণকারী হয়ে যায়। এই এহসান প্রদর্শন বা খোঁটা দান এটা নিজেই কষ্টদায়ক হয়ে যায় যদিও হাত বা জিহবা দ্বারা কষ্ট না দেয়া হয়। এই খোঁটা দেয়া কাজটি নিজেই এমন কষ্টদায়ক ব্যবহার যা সমস্ত দান খয়রাতকে বিনষ্ট করে দেয়, ভেংগে দেয় সমাজ ও সমাজ জীবনের শান্তিকে এবং লেপন করে দেয় ওই খোঁটা দানকারীর ললাটে কলংক কালিমার গ্লানি আরও ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র তিক্ততা ও অশান্তির অংগার।

উপকার করে খোঁটা দেয়া

অধুনা কিছুসংখ্যক মনস্তত্ত্ববিদ কটু তর্কের অবতারণা করতে গিয়ে এহসানের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নাকি মানুষের মনের মধ্যে শত্রুতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

এর কারণস্বরূপ তারা বলতে চায়, দানগ্রহীতা দাতার সামনে নিজের ত্রুটি এবং দুর্বলতা অনুভব করে, আর এই চেতনাই তার মধ্যে শত্রুতার মনোভাব জাগিয়ে দেয়। তখন সে মনে মনে চেষ্টা করতে লেগে যায়, কি করে ঐ ব্যক্তিকে ছোট করা যায় যে তার উপর প্রাধান্যের অধিকারী হয়ে রয়েছে, আর পরিশেষে এই অনুভূতিকেই তার মধ্যে শত্রুতার মনোভাব পয়দা করে এবং তাকে কি করে ব্যথা দেয়া যায় এই খেয়াল তাকে পেয়ে বসে।

হাঁ, মনস্তত্ত্ববিদদের এ চিন্তা জাহেলী সমাজের জন্যে সঠিকই ছিলো বলা যায়, কারণ সে সমাজে ইসলামী ধ্যান-ধারণার কোনো প্রাণ প্রবাহ ছিলো না, আর না তখন ইসলামী ব্যবস্থামত শাসন কাজ পরিচালিত হতো। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীন ইসলাম মানুষের যে সম্পদের মালিকানা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার, আর কারো হাতে নয় আর জীবন ধারণ সামগ্রী সচ্ছল ব্যক্তিদের হাতে যা কিছু আছে তার সবটুকুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। এ সত্যকে মেনে নেয় সকল মোমেন মুসলমান, জাহেলী হঠকারী ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য সবাই। তারা বিতর্ক তোলে এই বলে যে, মানুষ নিজ শ্রম ও কষ্টের বিনিময়ে সম্পদের মালিক হয় এবং সে সম্পদের ভোগ ব্যবহারে সে স্বাধীন। কিন্তু মোমেন বিশ্বাস করে সারাবিশ্বের সকল সম্পদ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। যার যা কিছু আছে সবই তাঁর দান, এর কোনোটার উপরই কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিতে সূর্য থেকে নিয়ে পৃথিবী অবধি পানি বাতাস যা কিছু আছে সব কিছুরই হাত আছে। এগুলোর কোনোটার উপরই মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে শস্য দানার উপর একবিন্দু পানি পড়ায় ও পরিধেয় বস্তুর জন্যে তুলা বীজের মধ্যে সূতা এসে যাওয়ায়, আর এমনি করে সবকিছুর ক্রমিক ধারার সৃষ্টি

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সবকিছু সৃষ্টি করে চলেছেন। তারপর দানকারী ব্যক্তি যখন দান করে তখন সে আল্লাহর মালই দান করে। আর যখন সে কোনো ভালো কাজ করে তখন সেই কাজটিকে আল্লাহ তায়ালা নিজের কর্য হিসেবে গ্রহণ করে তা বহুগুণে তাকে ফিরিয়ে দিতে চান। অপরদিকে গ্রহীতাও আল্লাহর মেহেরবানী থেকে মাহরূম হবে না। কেননা সে তো ওই দানকারীর দান গ্রহণ করে তাকে আল্লাহ পাকের অজস্র অনুকম্পা পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এরপর পেশ করা হচ্ছে সেই নিয়ম শৃংখলার বর্ণনা যা আমরা করতে চেয়েছি। যাতে এই অর্থ অন্তরে গেঁথে যায় এবং দাতা যেন নিজেকে বড় মনে না করতে পারে এবং গ্রহীতা যেন নিজেকে ছোটো মনে না করে। প্রকৃতপক্ষে উভয় ব্যক্তি আল্লাহর রেযেক ভক্ষণকারী। দাতার জন্যে রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার যখনই সে আল্লাহর মাল থেকে আল্লাহর রাহে সেই শৃংখলা মেনে খরচ করবে যা তাকে আল্লাহ তায়ালা শিখিয়েছেন। তারা তো আল্লাহর সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ যে তাদেরকে যে নেয়ামত আমানতস্বরূপ দেয়া হয়েছে তার থেকে তারা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্যে খরচ করবে। তাহলেই তাদের জন্যে কোনো ভয় নেই- নেই ভয় কোনো দৈন্য নেই ভয় তিক্ততার, আর না আছে কোনো অবিচারের ভয়। এই জন্যে তারা আর কোনো দুঃখিতও হবে না- ঐসব জিনিসের জন্যে যা তারা দুনিয়াতে খরচ করেছে আর যা নিয়ে তারা আখেরাতে হাযির হবে।

দানশীলতা ও উদারতার অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে আলোচনা এসে গেছে সে বিষয়ে আরো কিছু কথা বলা জরুরী মনে করা হয়েছে, যাতে করে এর থেকে মানুষ উদারতা ও মহানুভবতার শিক্ষা নিতে পারে এবং অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে নিজেদের মধ্যে দানশীলতার মনোভাব গড়ে তুলতে পারে, গড়ে ওঠে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আল্লাহর রেযামন্দী হাসিলের জন্যে এক গভীর সম্পর্ক। তাই নীচের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'সুপরিচিত প্রিয় ভাষণ এবং ক্ষমা প্রদর্শন সেই দান থেকে উত্তম যার পেছনে কষ্টদায়ক কথা রয়েছে বা যে দান করে খোঁটা দেয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালা অভাবমুক্ত সহিষ্ণু।'

এ আয়াতের মাধ্যমে একথা সুনির্দিষ্টভাবে জানা হয়ে গেলো যে, কোনো দান খয়রাত করে যদি সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, খোঁটা দেয়া হয় বা তার বিনিময়ে তার কাছে অনুগত থাকা হলো না কেন, বা তার বিভিন্ন কাজে কেন এগিয়ে আসা হলো না ইত্যাদি বলে যদি তার মনোকষ্টের কারণ ঘটানো হয় তো সে দানের কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো কিছু দান না করে বরং কিছু ভালো কথা বলে প্রতিপক্ষের অন্তরে শান্তি দেয়া। আসলে অনেক সময় প্রিয় বচন মনের কষ্ট লাঘব করে। যোগায় সন্তুষ্টি ও আনন্দানুভূতি, আর ক্ষমা প্রদর্শন অন্তরে জমে থাকা অনেক তিক্ততাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়, এর সাথে গড়ে তোলে মধুর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সত্যানুভূতি। সুতরাং সুবিদিত উত্তম কথা ও ক্ষমা এমন দুটি গুণ যা সদকার প্রথম বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এ দুটি গুণ মন মগজকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে সেখানে মোহাব্বাতের বীজ বপন করে।

মোমেন দিল এ কথাটা হিসাব করে যে, সে দান করা দ্বারা গ্রহীতার উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা বড়ত্ব অর্জন করে না, বরং সে তো তার নিকট অবস্থিত আল্লাহ কর্তৃক গচ্ছিত ঋণ পরিশোধ করে মাত্র। এই জন্যেই উপরে বর্ণিত আয়াতের পেছনে এরশাদ হয়েছে,

'আর আল্লাহ তায়ালা অভাবমুক্ত ও সহিষ্ণু।'

তিনি সেই সদকা থেকে দায়মুক্ত যে দান করে কষ্ট দেয়া হয়। তিনি সহিষ্ণু তাঁর সেই বান্দাদের জন্যে যাদেরকে তিনি অজস্র নেয়ামত দিয়ে চলেছেন, তবু তারা শোকরগোজারি করে

না। তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি জলদী করেন না বা তাড়াতাড়ি কষ্টও দেন না, অথচ তাদেরকে সব কিছুই তো তিনিই দেন। সম্পদ দান করার পূর্বে তাদেরকে তিনি সুন্দর স্বাস্থ্য ও চেহারা দেন। অতএব তাঁর এই সহিষ্ণুতা থেকে তাঁর বান্দাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারাও যেন আল্লাহপ্রদত্ত ধন সম্পদ কাউকে দিয়ে তার প্রতিদান পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত না হয়ে যায় এবং ওই সকল গ্রহীতারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তাদের প্রতি ক্রোধ না দেখায় বা দুর্ব্যবহার না করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এ সকল গুণাবলীর উল্লেখ করে কোরআনে কারীম মানুষের মধ্যে শৃংখলাবোধ পয়দা করার উদ্দেশ্যে হামেশাই উপদেশ দিয়ে চলেছে। অতএব, মানুষের কর্তব্য সাধ্যানুযায়ী এসব দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। মুসলমান তার রবের গুণ থেকেই শৃংখলাবোধ ও ভারসাম্য হাসিল করে আর, সেই গুণ থেকেই তার উন্নতি হয় আর এর ফলেই তার জন্যে বরাদ্দকৃত সেই সুন্দর ভাগটি পায় যা তার উপযোগী।

এই অবস্থাতেই মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ অনুভব করে। এখানে উন্নতশীল সেইসব মানুষের জীবনের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যারা তাদের ধন সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করে অভাবগ্রস্তদেরকে দেয়, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা কিছু আশা করে না বা কোনো খোঁটাও দেয় না বা অন্য কোনোভাবেও কাউকে কষ্ট দেয় না। যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিশ্বাস করে ও অনুভব করে যে তিনি কারও কোনো জিনিসের ভুখা নন এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সব কিছু দেনেওয়ালা তবুও তিনি অকৃতজ্ঞদের প্রতি তাড়াতাড়ি তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করেন না। এই সকল ব্যক্তিই আল্লাহপ্রদত্ত অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করে। তারপর সম্বোধনের গতি তাদের দিকে ফিরানো হয়েছে 'যারা ঈমান আনার পর তাদের সদকাগুলোকে এহসান প্রদর্শন ও কষ্টদায়ক কথা দিয়ে বরবাদ করে দেয় না। তাদের কথা বলতে গিয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, অথবা দুটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো প্রথম দৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আর সে দৃশ্য হচ্ছে উৎপন্ন হওয়া ও বৃদ্ধি পেতে থাকা এবং এ দুটিকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্যেই খরচ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি সেই খরচ করার কথাও উল্লেখিত হয়েছে যার পেছনে রয়েছে খোঁটা দেয়া ও কষ্টদায়ক ব্যবহার। এই দুই ধরনের অবস্থা এবং এই তুলনা কোরআনের এক বিস্ময়কর চিত্রাংকনের দৃশ্য, যাতে সমস্ত অর্থ মূর্ত হয়ে উঠেছে, এর প্রভাব যেন সব কিছুকে আন্দোলিত করছে এবং পুরো অবস্থাটা কল্পনার চোখে এক জ্যান্ত ব্যক্তির মতো দেখা যাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, উপকারের প্রতিদান চেয়ে বা অনুগৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান খয়রাতগুলোকে ধ্বংস করে দিও না। এ কাজ করলে .... অপরদিকে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদ খরচ করে .... আর আল্লাহ তায়ালা দেখছেন তোমরা যা কিছু করছো। এটাই হচ্ছে প্রথম দৃশ্য।

আকৃতি প্রকৃতি ও ফলদায়ক হওয়ার দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্যকে এখানে পেশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু আংশিক জিনিস আছে যার একটির সাথে আর একটির চিত্র ও শিল্প বৈচিত্রের দিক দিয়ে বেশ কিছু মিল রয়েছে। এইভাবে উদাহরণ দ্বারা চিত্রাংকন ও জীবন্ত মূর্তির সব কিছুকে তুলে ধরে ওই দৃশ্যকে অর্থবহ করে তোলা হয়েছে।

একশ্রেণীর কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তির কাছে আমরা প্রথম দৃশ্যটি তুলে ধরছি, এরশাদ হচ্ছে,

'যে খোঁটা দিয়ে ও কষ্টদায়ক ব্যবহার করে তার দানকে নষ্ট করে দেয় তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো যে তার সম্পদকে লোকদের দেখানোর জন্যে খরচ করে এবং সে আল্লাহ ও বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে না।'

এহেন ব্যক্তি ঈমান আনার আহবান শুনতে পায় না এবং ঈমানের তৃপ্তিও অনুভব করে না, বরং লোক দেখানো মনোভাবের কারণে এক কঠিন অবস্থা তাকে পেয়ে বসে।

লোক দেখানো মানসিকতাপূর্ণ কঠিন হৃদয়ের উদাহরণ হচ্ছে— মসৃণ এক পাথর যার উপর মাটির আস্তর পড়ে রয়েছে, যার মধ্যে না আছে কোনো উর্বরতা আর না সে জায়গাটা কোনো সময় নরম হয়। তার উপর মাটির হালকা একটা আস্তরণ পড়ে থাকে যার কারণে পাথরের ওই কঠিন অবস্থাটা নযরের আড়ালে থেকে যায়; যেমন করে রিয়াকারী ব্যক্তির মনোভাব ঈমান বিবর্জিত হৃদয়ের কঠিনত্বকে ঢেকে রাখে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি হয় তখন ওই শক্ত শিলাটি মসৃণ পাথর আকারে থেকে যায়।'

অর্থাৎ বড় বৃষ্টি হওয়ায় ওই শিলার ওপর অবস্থিত অল্প মাটি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়, আর তখন পাথরটি অনুর্বর ও কঠিন অবস্থায় থেকে যায়, যেখানে না জন্মে কোনো ফসল আর না উৎপন্ন হয় কোনো ফল। এইভাবে যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করে তা না কোনো কল্যাণের ফল ফলাতে পারে আর না আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য থাকে।

এবারে দেখা যাক দ্বিতীয় দৃশ্যের অবস্থা। সেখানে যে অন্তরের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঈমানের আলোকে ভরপুর, আনন্দিত চিত্ত সর্বক্ষণ। সে তার সম্পদ খরচ করে। কল্যাণের অধিকারী হবে বলে সে পরিপূর্ণ ও দৃঢ় আস্থা নিয়ে সে তার সম্পদ খরচ করে। তার অন্তর ও বিবেকের মধ্যে গভীরভাবে গড়ে ওঠা এই আস্থার মূল উৎস হচ্ছে ঈমান। কিন্তু অন্তর যদি শক্ত হয় এবং তার উপর 'রিয়া'র পর্দা পড়ে যায় তখন সেটা ওই পাথরের মতো ভূমিকা পালন করে যার উপর মাটির হালকা আস্তর পড়ে থাকে। মোমেনের অন্তর যেন একটি উদ্যান যা উর্বর ও গভীর মাটির আবরণে ঢাকা এবং এই উদ্যান ওই কঠিন শিলা খন্ডের বিপরীত যার উপর দু মুঠো মাটি ছড়ানো রয়েছে। এ বাগিচা সূক্ষ্ম পর্বত চূড়ায় অবস্থিত এবং এ উদ্যান ওই শিলা খন্ডের বিপরীত যার উপর সামান্য মাটির আবরণমাত্র বর্তমান। আকার আকৃতি হিসেবে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে উভয় জিনিসের মধ্যে অবশ্যই কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু পর্বত চূড়ার এ বাগিচার উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে উল্লেখিত মাটির আবরণে ঢাকা শিলা খন্ডের মতো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় না, বরং বৃষ্টির পানি পেয়ে ঐ বাগিচা জীবন্ত হয়ে ওঠে, আরো উর্বর হয় এবং তার ফলন বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন— যখন তার উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন তার ফলন দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

বৃষ্টিপাত ওই বাগিচাকে তেমনি করে স্বজীব করে যেমন করে সদকা খয়রাত স্বজীব করে মোমেনের হৃদয়কে, পবিত্র করে আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ককে বাড়িয়ে দেয়, এর সাথে আল্লাহ তায়ালা বাড়িয়ে দেন তাঁর সম্পদকেও বহু গুণে যার জন্যে তিনি চান তার জন্যে। এমনি করে ইনফাক (খরচ) দ্বারা মুসলিম জামায়াত সংকীর্ণতা ও কলুষতা মুক্ত হয়, তার দোষ ত্রুটির সংশোধন হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এরপর বলা হচ্ছে- তারপর যদি বৃষ্টিপাত বেশী না হয় তাহলে প্রচুর শিশির পাত হয় যা বৃষ্টির বিকল্প হিসেবে কাজ করে। একে মোটামুটি হালকা বৃষ্টির সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা উর্বর জমির জন্যে যথেষ্ট। যেহেতু উর্বর জমিতে কম পানি হলেও ফসল মোটামুটি ভালোই হয়।

এ হচ্ছে ওই দৃশ্যের পরিপূর্ণ ছবি, বরং বলা যায় তুলনামূলক দৃশ্য, এ দৃশ্যটির অংশগুলোও একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য বর্তমান, এদুটির পারস্পরিক সম্পর্ক ও বাস্তব ভূমিকা এতো সাদৃশ্যপূর্ণ যে দুটিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করাই মুশকিল। এই সকল দৃশ্যের দিকে নযর পড়লে যে

কোনো সন্দেহবাদী ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। এ দৃশ্য মানব চেতনা ও তার আভ্যন্তরীণ গভীরে অনুভূতির জন্যে এক বিস্ময়কর জিনিস যা অন্য সকল অবস্থা ও অনুভূতিকে ছাপিয়ে ওঠে, এগিয়ে দেয় তাকে অবাক বিস্ময়ে সহজেই এক উত্তম পথ পরিক্রমায়।

আর যখন বাহ্যিক ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তারা পাশ থেকে এ দৃশ্যটি দেখবে এবং আল্লাহ তায়ালার মহিমা সন্দর্শনে বাহ্যিক দৃশ্যের আড়ালে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করবে তখন তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হৃদয়সমূহ প্রভাবিত হবেই। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা দেখছেন।'

পরবর্তী কথার মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উপায়ে উপকারের খোটা দেয়ার দ্বারা যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করা হয় এবং অন্যান্য বাস্তব ব্যবহার দ্বারা মানুষকে নির্যাতন করা হয় তার অবসান ঘটাতে বলা হয়েছে। তারপর আমাদের বুঝতে হবে, কেমন করে দান খয়রাতের প্রভাবে পড়ে সেই দুর্বল ব্যক্তির হৃদয় আহত হওয়া থেকে উদ্ধার পায় যারা সহায় সম্বলহীন দরিদ্র এবং তারা নিজেরা কারো উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করার মতো অবস্থা রাখে না। এটা ওই হীনমন্যতার অবসান ঘটানোর ব্যাপারে একটি বিরল দৃষ্টান্ত বৈকি। যেহেতু এ হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিধানের এবং সম্মানজনকভাবে দান গ্রহণজনিত অপমানবোধকে দমন করার সুন্দরতম পদ্ধতি। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের মাঝে এমন (হতভাগ্য) ব্যক্তি কি কেউ আছে- যে চাইবে যে, তার কাছে (ফুলে ফুলে সুশোভিত) একটি বাগান থাকুক যাতে খেজুর ও আংগুর সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমুল থাকবে- তার তলদেশ দিয়ে আবার থাকবে একটি প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, আর (এই ফল ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে, (তাকে সাহায্য করার মতো) তার সন্তান সন্ততি থাকবে (তখনো) দুর্বল, যাদের বয়স হবে নিতান্ত কম- (এই নাযুক পরিস্থিতিতে একদিন হঠাৎ করে) এক আগুনের ঘুর্ণিবায়ু এসে তার সব (স্বপ্ন) ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে যাবে। (এমনটি নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ চাইবে না) আসলে এইভাবেই (বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তার নিদর্শন গুলো তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা (আল্লাহর এসব কথার ওপর ভিত্তি করে) চিন্তা ও গবেষণা করতে পারো।'

মূলত, এই হচ্ছে দান খয়রাত করার মূল তাৎপর্য এবং অনুভূতি রাজ্যে প্রভাব বিস্তারকারী তার প্রতিক্রিয়ার রহস্য। আবারো এরশাদ হচ্ছে,

'এমন বাগিচা যার মধ্যে খেজুর ও আংগুর গাছ ভর্তি।' বস্তুত তার সে বাগিচায় সর্বপ্রকার ফলই বর্তমান।

সে বাগিচা ছায়াঘেরা, মনোরম উর্বর ও ফুলে ফলে ভরা। সদকার প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া ও অবিকল এই রকমই- এমনিভাবে দানকারী ও গ্রহীতার আদান প্রদান মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ভূমিকা পালন করে, এমনি করে সদকা খয়রাত হয়ে যায় প্রাণবন্ত ও মনোরম এবং স্নিগ্ধ ছায়াদানকারী, কল্যাণ ও বরকতময়, সঞ্জীবনী ভান্ডার এবং পবিত্র ও প্রবৃদ্ধিপূর্ণ।

এমতাবস্থায় এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে এমন মন মোহিনী বাগিচা এবং কল্যাণকর অবস্থা হাসিলের পর চাইতে পারে যে খোটা দেয়া বা অনুগৃহ ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়ার কারণে এসব কিছু বরবাদ হয়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক সেইভাবে যেভাবে এক আগুনে ঝড় এসে সকল বাগ-বাগিচাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।

আর কখন এই ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে? সেই কঠিন অন্তিম সময়ে যখন তার ছায়া ফলমূল বড় প্রয়োজন। এরশাদ হচ্ছে- যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং কিছুসংখ্যক দুর্বল বংশধর ছেড়ে যায় আর সেই সময়েই এক অগ্নিবর্ষী তুফান এসে তার সব কিছু পুড়িয়ে ছারখর করে দেয়।

কে এমন আছে যে এই অবস্থাটা চাইতে পারে? আর কেইবা এমন হতে পারে যে ওই অবস্থাতে ফিরে যাবে যেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না? এরশাদ হচ্ছে–

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তার আয়াতগুলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।'

এমনি করে ওই বাগিচার সজীব ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী দৃশ্যটিও ভেসে ওঠে, যার মধ্যে প্রথম যে জিনিসটি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে তার স্নিগ্ধতা, তৃপ্তিকর এবং ভোগ্য জিনিসের সমারোহ। আরো সেখানে দেখা যায় মনোরম ফল ফুলের দৃশ্য এবং খোশবু ও সৌন্দর্যে ভরা মধুর মেলা, কিন্তু অনতিকাল পরে এবং ওই সকল নানা প্রকার সুখ সৌন্দর্যের জিনিস ভোগ করার পূর্বেই হঠাৎ করে যখন আগুনে ভরা ভীষণ ঝড় তুফান এসে পড়ে তখন তা ঠেকানোর ক্ষমতা আর কারো থাকে না।

এরপর আলাদাভাবে আমাদের খেয়াল করা প্রয়োজন যে প্রত্যেকটি দৃশ্যের সৌন্দর্যের জিনিসগুলো কতো চমৎকারভাবে একটি আর একটির সথে সামঞ্জস্যশীল এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, সৌন্দর্যের এই বস্তুগুলো পৃথকভাবে একটি একটি করে আসে না, বরং সৌন্দর্যের এই বস্তুগুলো গোড়া থেকেই একসাথে আসে এবং একই সাথে অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল সবই এক সাথে আসে এবং সবগুলোই কৃষি জমির ফসল। এই কারণেই বলা হয়েছে– একটি দানা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়। 'একটি মসৃণ পাথর যার উপর রয়েছে মাটির আস্তর, এর উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, এবং মাটি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেলে রয়ে গেলো অনুর্বর শক্ত-সমান পাথরটি যার উপর কোনো কিছু উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে রয়েছে পর্বত শিখরে অবস্থিত আর একটি বাগিচা যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাতে কোনো ক্ষতি তো নয়ই, বরং দ্বিগুণ হবে তার ফসল। খেজুর ও আংগুরের বাগিচা। সেখানে মুষলধারের বৃষ্টি, শিশিরপাত এবং ঝড় তুফান হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণ ফসল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেহেতু বাগিচার অবস্থানের বিশেষ গুরুত্বের কারণে সেখানে অধিক পরিমাণে ফসল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কৃষি উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিবর্তন থাকা সত্তেও ওই সকল ক্ষেত্রে অধিক ফসল ফলনের সম্ভাবনাকে কোনো সময়েই নাকচ করে দেয়া যায় না। মানুষ ও মাটির প্রকৃতির মাঝে এই যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে, মূলত- এটা একটা বাস্তব সত্য। উন্নতশীল জীবন ও উর্বর মাটির মধ্যে একই প্রকারের সম্ভাবনা বর্তমান। অপরদিকে কলুষিত জীবনের ধ্বংস এবং অনুর্বর মাটির মধ্যে একই প্রকার সামঞ্জস্য বর্তমান।

এ কথাটিই বর্ণিত হয়েছে কোরআনে হাকীমে, যার প্রতিটি কথা সত্য, যেহেতু এ কালাম এসেছে মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে।

উত্তম জিনিষ দান করার গুরুত্ব

সদকা খয়রাতের নিয়ম কানুন প্রসংগে আর এক আলোচনা আসছে যাতে করে সদকার প্রকৃতি ও পদ্ধতিটি ভালো করে জানানো সম্ভব হয়। ইতিপূর্বে এ ব্যবস্থার নিয়ম শৃংখলা ও পরিণতিতে তার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, বৈধভাবে যে ধন সম্পদ তোমরা উপার্জন করেছো তার থেকে খরচ করো।'

সদকার মূলনীতি সম্পর্কে কোরআনে ইতিমধ্যে যে বর্ণনা এসে গেছে তাতে এ কথাটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, উদারতাই হচ্ছে সর্বোত্তম মানবতা। সুতরাং এ মানবতা ও মহানুভবতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন উত্তম জিনিস দান করা। উত্তম জিনিসের মাধ্যমেই উত্তম মর্যাদা হাসিল করা যায়। আল্লাহ তায়ালা নিম্নমানের জিনিসের ভুখা নন। তাঁকে খুশি করতে হলে উত্তম জিনিস দিয়েই খুশী করতে হবে এবং তার প্রতিদানেও তিনি সর্বোত্তম জিনিস দান করবেন। এর জন্য প্রয়োজন মনের সংকীর্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তবেই গিয়ে আল্লাহর অফুরন্ত ভান্ডারের দ্বার অবারিত হবে।

এইভাবে সুন্দর ও উত্তম জিনিস দান করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সাধারণভাবে উপদেশ দান করেছেন। এ আহবান সর্বকালের সকল জনপদের জন্যে। দান করার এ আহবানের মধ্যে মানুষের হাতে আসা সব ধরনের সম্পদই অন্তর্ভুক্ত। মানুষ পবিত্র ও হালাল উপায়ে যা রোযগার করে এবং কৃষি ভূমি থেকে ফল ও ফসল আকারে সে যে সম্পদ পায় সে সব কিছুর মধ্য থেকেই তাকে যাকাত ও সদকা বের করতে হবে। এসব সম্পদের মধ্যে খনিজ দ্রব্য ও পেট্রোলজাত দ্রব্যও রয়েছে। কাজেই, এক কথায় বলা যায় নবী (স.)-এর আমলে সম্পদ বলতে যা কিছু বুঝান হতো এবং পরবর্তীকালে যা কিছু মানুষ আবিষ্কার করেছে তা সব কিছুই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং সব জিনিস থেকেই দান করতে হবে। এ সব সম্পদের কোনো একটিও কোনোকালেই সদকার শ্রেণী থেকে বাদ পড়বে না। এই দান করাটা হবে বাধ্যতামূলক যাকে কোরআনের পরিভাষায় 'যাকাত' বলে অভিহিত করা হঁয়। এসব জিনিসের মধ্য থেকে কি পরিমাণ অর্থ যাকাত স্বরূপ দিতে হবে সে বিষয়ে হাদীস শরীফ পরিষ্কারভাবে এমন মূলনীতি পেশ করেছে যার আওতায় সব কিছু এসে যায়।

এই আয়াতের শানে নযুল হিসেবে একেবারে প্রথম দিককার বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। যেগুলো উল্লেখ করায় কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু কোরআনে কারীম মানুষকে জীবনের নিয়ম শৃংখলা শেখানোর জন্যে এবং তাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে শিক্ষা দিয়েছে। হাদীসের মাধ্যমে তা আরোও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাদীসগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ,

১. ইবনে জারীর-এর মোসনাদে উল্লেখিত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন- (আলোচ্য) আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আনসারদের লোকেরা তাদের বাগিচাসমূহ থেকে আধাপাকা খেজুর পাড়তো (পেড়ে নিতো) তারপর রসূল (স.)-এর মাসজিদের দুটি খুঁটির মাঝে সেগুলো লটকিয়ে দিতো। সেগুলো থেকে অভাবী মোহাজেররা ছিড়ে ছিড়ে নিয়ে খেতো। এ সময়ে কোনো কোনো ব্যক্তি খারাপ খেজুর এনেও এগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতো (যাতে সেগুলোও ওই অভাবী লোকেরা খেয়ে নিতে পারে) এবং এটাকে তারা জায়েয মনে করতো। এ কাজ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- 'যা কিছু তোমরা খরচ করো সেগুলোর মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস খরচ করো না।'

বারা'র বরাত দিয়ে হাকিমও এই রকমেরই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিশুদ্ধতার যে মাপকাঠি দেয়া হয়েছে সেই অনুসারে এই হাদীসটি বিশুদ্ধ।

ইবনে হাতেম অন্য আর একটি বর্ণনা ধারায় বারা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আর একটি হাসীদ এনেছেন– তিনি বলেছেন, আমাদের সম্পর্কেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আমরা ছিলাম খেজুর বাগিচার মালিক। এ সময়ে কেউ কেউ কখনো বেশী আবার কখনো কম খেজুর নিয়ে আসতো। কেউ পুরো কান্দি ধরেই এনে মসজিদে ঝুলিয়ে দিতো। আসহাবে সুফফা (৪০ জন গরীব সাহাবা যারা প্রায় সময়ই মসজিদে পড়ে থাকতেন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথাগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা করতেন) - এদের খাবারের কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা ছিলো না। তাঁদের মধ্যে কারো ক্ষুধা পেলে তিনি কোনো লাঠি এনে তা দিয়ে খোঁচা মারতেন, এতে কাঁচা ও পাকা সব রকমের খেজুর পড়লে তা কুড়িয়ে নিয়ে খেতেন। কিছু লোক এমনো ছিলো যাদের 'ভালো'র দিকে ঝোঁক ছিলো না- তারা নিকৃষ্ট এবং খারাপ খেজুরের কান্দি আনতো। তারপর তারা অন্যন্য খেজুর কাধির সাথে সেটাকেও ঝুলিয়ে দিতো। এই অবস্থায় নাযিল হলো, যা কিছু তোমরা খরচ করো তার মধ্যে বেছে গুছে এমন নিকৃষ্ট জিনিস খরচ করো না যেগুলো তোমাদের দিলে, নিতে গিয়ে তোমাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে, আর তোমরা তা নিতেই চাইবে না।

বর্ণনাকারী বলেন– তোমাদের কাউকে যদি ওই জিনিস দেয়া হয় যা সে দিতে চায়, তখন সে নিতে চাইবে না, আর নিলেও চোখ বুঁজে লজ্জার সাথে নেবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা তাদের কাছে যা কিছু ভালো জিনিস থাকতো তাই নিয়ে হাযির হতো।

উপরে বর্ণিত রেওয়ায়াত দুটি অর্থ প্রায় কাছাকাছি। উভয় হাদীসই মক্কার তৎকালীন অবস্থা তুলে ধরেছে। অপরদিকে ছবির আর একটি পিঠও আমরা দেখেছি যার মধ্যে মদীনার আনসারদের ত্যাগ কোরবানী এবং নিজেদের প্রয়োজনের উপর দ্বীনী ভাইদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়ার মনোরম দৃশ্যও আমাদের নযরে পড়ছে। দেখেছি আমরা একটি দলকে যারা ত্যাগ কোরবানী করার অত্যাশ্চার্য এবং মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা ওই দলটিকেও দেখেছি যাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজন ছিলো বেশ কিছু প্রশিক্ষণের। যেমন করে আনসারদের মধ্যে কিছু লোক দান খয়রাতের ব্যাপারে রদ্দী মাল খরচ করার পক্ষপাতী ছিলো। এমন রদ্দী মাল যা তাদেরকে কেউ দিতে চাইলে কিছুতেই তা সে নিতে প্রস্তুত হতো না। অত্যন্ত কম মূল্যের হওয়ার কারণে ওই মালের দিকে তাকাতেও তারা লজ্জাবোধ করতো। অথচ সেই জিনিসই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করতে চাইতো। এই কারণে ওই ব্যবহারের সমালোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা জেনে নাও যে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু থেকে বেপরওয়া, চির প্রশংসিত।'

তিনি মানুষের দানের মুখাপেক্ষী নন, কেউ দান করলেও বা কি আর না করলেও বা কি, তাঁর কিছু যায় আসে না। তাঁর পক্ষে কারো সম্পদের পরওয়া করার দরকার করে না। তিনি কারো বা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষীও নন। কেউ দান খয়রাতের মাধ্যমে প্রশস্ত মনের পরিচয় দিলে সে তার নিজের উপকারার্থেই এ কাজ করে।

তিনি চির প্রশংসিত। তিনি সকল পবিত্রতা ও প্রশংসার দাবীদার ও গ্রহণকারী এবং যে প্রশংসা করে তাকে তিনি উচিত বিনিময় দান করেন।

উপরে বর্ণিত এ দুটি গুণের প্রত্যেকের মধ্যে এমন এক সন্ধী সুধা আছে যা অন্তর জাগিয়ে তোলে, যেমন করে আনসারদের সেই দলটিকে চাংগা করেছিলো যারা পূর্বে উদাসীন ছিলো এবং উল্লেখিত আয়াত– 'হে ঈমানদাররা! তোমাদের রোযগারের মধ্য থেকে পবিত্র জিনিসসমূহ খরচ করো। যদি তা না করো তাহলে জেনে রাখো খারাপ কিছু দান করতে চাইলে তিনি তোমাদের দান

করা জিনিসের যথাযথ মূল্যায়ন করেন ও তার উচিত প্রতিদান দেন। আর আল্লাহ তায়ালাই রেযেক দানকারী, আর তিনিই প্রকৃতপক্ষে দেনেওয়ালা। তিনি তোমাদেরকে সেইভাবে দান করার মন পয়দা করবে যেভাবে তিনি অতীতে দান করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দান করার মন পয়দা করে দেবেন এবং এ ব্যাপারে তোমাদের হৃদয়ে উৎসাহ জাগিয়ে দেবেন। এমনভাবে তোমদের মনকে তিনি গড়ে দেবেন যে তোমাদের নিজেদের আশ্চর্য লাগবে যে এতো উদার তোমরা কেমন করে হয়ে গেলে!

শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়

দান করার ব্যাপারে তোমাদের মন যখন সংকুচিত হয়ে যায় অথবা যখন খারাপ জিনিস দান করার কথা মনে জাগে তখন সেটা বিভিন্ন প্রকারের মন্দ অনুভূতির কারণে আসে, প্রকৃতপক্ষে সেই অনুভূতির পেছনে রয়েছে আল্লাহর ভান্ডার থেকেই যে তোমরা সব কিছু পাও এ কথার উপর দৃঢ় আস্থার মনোভাব এবং অভাবগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার ভয়, যার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয় না, তাঁর উপর নির্ভরও করতে পারো না এবং তাঁর কাছেই যে সব কিছু ফিরে যাবে এটাও বোধগম্য হয় না। অপরদিকে মোমেনদেরকে আল্লাহ তায়ালা ওইসব বাজে চিন্তা থেকে দয়া করে উদ্ধার করেছেন, যার ফলে তারা অনুভব করে যে, তারা যে দান করছে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বরং তা ঋণ হিসেবে আল্লাহর হাতে দেয়া হচ্ছে। তারা এটাও অনুভব করে যে, দান খয়রাত করার ব্যাপারে মনের মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি হয় তা শয়তনের ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর দান না করার জন্যে শয়তানই তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাই এরশাদ হচ্ছে– শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায়।

দান খয়রাত করলে তোমরা গরীব হয়ে যাবে বলে, আর তোমাদের হুকুম দেয় (উদ্বুদ্ধ করে) লজ্জাকর কাজ করতে। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, দান খয়রাত করলে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং সম্পদ ও সম্মান আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা প্রশস্ততার অধিকারী মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে ইচ্ছা বুদ্ধিমত্তা দান করেন । আর তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বহু কল্যাণের অধিকার বানান। এসব থেকে তারাই শিক্ষা নেয় যারা সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী।

শয়তান তোমাদেরকে এই বলে ভয় দেখায় যে, তোমরা দান খয়রাত করলে গরীব হয়ে যাবে। এই কারণে সে তোমাদের মনের মধ্যে লোভ লালসা, সংকীর্ণতা এবং বেশী বেশী পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব পয়দা করে দেয়। সাথে সাথে সে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করে লজ্জাকর কাজের জন্যে। লজ্জাকর কাজ বলতে প্রতিটি ওই নাফরমানীর কাজকে বুঝায় যা কোনো সীমা মানে না। অর্থাৎ শয়তান এমনভাবে তাকে উস্কানি দিতে থাকে যে কোনো নির্দিষ্ট পাপ কাজের মধ্যে গিয়ে সে থেমে থাকে না, বরং সর্বপ্রকার পাপ কাজ করা তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। আর দৈন্যের ভয় তো এমন এক কঠিন জিনিস যে জাহেলিয়াতের যুগে মানুষকে কন্যা সন্তানদেরকে পুঁতে ফেলতেও উদ্বুদ্ধ করেছে। মানব সভ্যতার জন্যে ছিলো একটা এক ন্যক্কারজনক কাজ। আর সম্পদ লাভ করার প্রবল লোভ মানুষকে সুদ খাওয়ার ব্যাপারে আহবান জানিয়েছে। আর অবশ্যই এটাও মানবতার জন্যে লজ্জাজনক কাজ, আল্লাহর পথে খরচ করলে মানুষ গরীব হয়ে যাবে এই ভয় এসে যাওয়াটা নিজেরই একটা লজ্জার ব্যাপার।

আর যে সময় শয়তান মানুষকে দৈন্যের ভয় দেখাচ্ছে, সেই একই সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা ও সচ্ছলতার আশ্বাস দিচ্ছেন। বলছেন,

'আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে ক্ষমা ও সচ্ছলতা দানের ওয়াদা দিয়েছেন।'

এখানে লক্ষ্যযোগ্য আল্লাহ্ ক্ষমা দানের কথা বলেছেন প্রথম, আর শেষে সচ্ছলতা বা সম্পদ বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে 'ফাযল'-অর্থাৎ 'সম্পদ-বৃদ্ধি বা 'সম্মান বৃদ্ধি' ক্ষমার অতিরিক্ত আর একটি আশ্বাস। এ আশ্বাস দ্বারা দুনিয়ায় সুখ-সম্পদ বা সম্মান বৃদ্ধিকে বুঝায়। এটাই হচ্ছে আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে উদার হওয়ার পুরস্কার। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা,

'আর আল্লাহ তায়ালা প্রশস্ততার অধিকারী মহাজ্ঞানী। আর তিনি জানেন শয়তান অন্তরের মধ্যে কি কি কথা বলে উস্কানি দেয় এবং বিবেককে কিভাবে বিভ্রান্ত করে।'

অপরদিকে, আল্লাহ তায়ালা শুধু সম্পদ বা ক্ষমাই দেন না, তিনি মানুষকে 'হেকমত' বা বুদ্ধিমত্তাও দান করেন। এই বুদ্ধিমত্তার কারণে মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন ও ভারসাম্য বোধ লাভ করে, যার ফলে সে সকল ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করে এবং কার্যকরণ পদ্ধতিসমূহ ও লক্ষ্য বিবেচনায় যে কোনো পদক্ষেপ নেয়। প্রতিটি কাজ ও ব্যবহার, কোথায় কতোটুকু করা প্রয়োজন সেটা দেখে শুনে ও বুঝে সুঝে সে চলে। তাই তিনি জানাচ্ছেন–

'যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বুদ্ধিমত্তা বা প্রজ্ঞা (সব দিক বিচার বিবেচনা করে চলার শক্তি) দান করেন। আর এই মহা নেয়ামত যাকে তিনি দেন তাকে তিনি প্রভূত কল্যাণ দেন।

যখন মানুষের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার এবং সকল দিক বিচার-বিবেচনা করে চলার ক্ষমতা পয়দা হয় তখন সে 'লজ্জিত হতে হবে' এমন কাজ করে না বা কোনো ব্যাপারে সীমালংঘনও করে না। তবে 'কার্যকারণ পদ্ধতিগুলো কি' এবং কি কি উদ্দেশ্যে সে কাজ করবে তা স্থির করার মতো চিন্তা–ভাবনা করার যোগ্যতা দান করা হয়। কাজেই কিভাবে কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে তা স্থির করতে গিয়ে সে ভুল করে না। তাকে এমন স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয় যার ফলে সে সকল ব্যবহার ও কাজের ব্যাপারে ফলপ্রসূ দিকনির্দেশনা লাভ করে, আর তাই-ই হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ, যা প্রভূত পরিমাণে সে পায়। এসব কথা থেকে শিক্ষা তারাই নেয় যারা বহু বুদ্ধির অধিকারী।

বুদ্ধির অধিকারী বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যে শুভ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, বুদ্ধিকে কাজে লাগায় এবং এই কারণেই সে কখনোও চিন্তা-ভাবনা না করে কাজ করে না। সদা সতর্ক থাকে এবং কোনো জিনিসকে অবহেলা করে না বরং সকল জিনিস থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে আর যার ফলে সহজে সে ভুল পথে পা রাখেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে বুদ্ধির সদ্ব্যবহার। আসলে মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক পথে চলার যে দিক নির্দেশনা সে পেয়েছে এবং এ বিষয়ে যে যুক্তি প্রমাণ সে লাভ করেছে তার থেকে শিক্ষা নেয়া, সে শিক্ষা থেকে ফায়দা হাসিল করা এবং কোনো ব্যাপারেই অবহেলা বা ঔদাসিন্য না দেখানো।

এইভাবে সকল দিকে বিচার বিবেচনা করে চলার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করার ক্ষমতাই হচ্ছে হেকমত। আর, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে, যাকে ইচ্ছা তাকে, এই হেকমত দান করেন, আর এই মহান নেয়ামত দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে। এ নেয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেন, তবে সে দান পাওয়ার জন্যে তাকে নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে। এটাই ইসলামী ধ্যান-ধারণার মৌলিক নিয়ম। এ নিয়মের মূল কথা হচ্ছে– সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ইচ্ছা এখতিয়ারের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়া। কোরআনে কারীম এ প্রসংগে আর একটি মহান সত্যকে তুলে ধরেছে; তা হচ্ছে, যে হেদায়াত চায়

এবং তার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা সাধনা করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তা থেকে বঞ্চিত করেন না, বরং সে হেদায়াতপ্রাপ্তিতে তাকে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। তাই তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে ওয়াদা করতে গিয়ে বলছেন,

'আর যারা আমার পথে থাকার জন্যে চূড়ান্তভাবে চেষ্টা সাধনা করে, আমি (মহান আল্লাহ) অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার বহু পথ দেখাবো। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইহ্সানকারীদের সাথে আছেন (যারা সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করে)।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে এই ওয়াদা এই জন্যে দেয়া হয়েছে যাতে করে ওই সকল ব্যক্তি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত হতে পারে যে, শীঘ্রই তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও মেহেরবানীতে অবশ্যই হেদায়াত ও হেকমত লাভ করবে এবং তিনি তাকে তাঁর নিজের তরফ থেকে প্রভূত কল্যাণ দানে ধন্য করবেন।

এই প্রসংগ পরিত্যগ করার পূর্বে আমরা আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই যা নীচের আয়াত বলা হচ্ছে,

'শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় যে তোমরা গরীব হয়ে যাবে যদি বেশী বেশী দান করো, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ক্ষমা এবং সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধির নেয়ামত দ্বারা। আর আল্লাহ তায়ালা প্রশস্ততার অধিকারী, প্রশস্ত-দানকারী এবং মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে 'হেকমত' দান করেন।

মানুষের সামনে রয়েছে পথ দুটি, তাদের জন্যে তৃতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহর পথ আর শয়তানের পথ। হয় সে আল্লাহর কথা শুনে তাঁর ওয়াদার গুরুত্ব দেবে, নয়তো শয়তানের ওয়াদা লাভ করার জন্যে তার কথা শুনবে। আর যে আল্লাহর পথে না চলে তার ওয়াদার গুরুত্ব দেবে সে শয়তানের পথের পথিক এবং তার অনুসারী হয়ে যাবে। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা দরকার যে, কল্যাণের পথ মাত্র একটাই, আর তা হচ্ছে সেই হক পথ, যা আল্লাহ তায়ালা নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর বাইরে যা কিছু আছে তা হচ্ছে শয়তানের পথ, সে পথ শয়তানের কাছ থেকেই এসেছে।

এই মহা সত্যটিকে কোরআনে কারীম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আর এই উদ্দেশ্যেই কথাটাকে বারবার উল্লেখ করেছে এবং যথাযথভাবে তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে যাতে করে ওই সব ব্যক্তিদের জন্যে কোনো তর্ক বিতর্ক করার সুযোগ না থাকে যারা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গা থেকে সঠিক ও উপযোগী পথ পেতে চায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একদিকে আল্লাহ তায়ালা অন্যদিকে শয়তান (আল্লাহর দেয়া কর্মসূচী, শয়তানের দেয়া কর্মসূচী) আল্লাহর পথ, আর তার পাশাপাশি রয়েছে শয়তানের পথ। এখন তাদেরকে হিসেব করতে হবে কোনটা তারা এখতিয়ার করবে। ভাল বা মন্দ যে কোনটাকে গ্রহণ করার অধিকার ও স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যেন সে স্পষ্ট দলীল প্রমাণ দেখে ও বুঝে সুঝে তার ধ্বংস যদি সে নিজে ডেকে আনতে চায়, আনবে; আর যদি সে সঠিক পথে টিকে থাকতে চায় তাহলে যুক্তি বুদ্ধি নিয়েও বুঝে শুনেই যেন সে চলে, ইসলামের পথ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কোনো সন্দেহের, কোনো ধোঁকা খাওয়ার বা কোনো অস্পষ্টতার অবকাশ সেখানে নেই। এসব কিছু জেনে শুনে হয় সে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করবে অথবা গোমরাহীর পথ বেছে নেবে। আর এটা স্থির সত্য যে, সত্য একটিই, বিভিন্ন নয়। অতএব সত্য পথকে বাদ দিয়ে অন্য যেটাই ধরা হবে সেটাই গোমরাহী বা ভুল পথ ছাড়া আর কীই বা হবে!

এরপর আসুন আমরা সদকা প্রসংগে আবার ফিরে যাই। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন খরচকারী কে কী উদ্দেশ্যে দান করে, মানত পূরণ করার জন্যে খরচ করে, প্রকাশ্যে দান করে না গোপনে দান করে এটা কোনো বিষয় নয় মনের খবর তো আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন। আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নিজ জ্ঞান অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেবেন। সে যে নিয়তে খরচ করবে সেইটেই তিনি ধরবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা যা কিছু দান করার উদ্দেশ্যে খরচ করো, অথবা মানত পূরণ করার জন্যে খরচ করো সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন। ....তোমরা যা কিছু করছো সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত।'

'নাফাকা' বলতে ওই সকল অর্থ সম্পদকেই বুঝায় যা যাকাত দানকারী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি গরীবদের জন্যে বের করে। সে দান যাকাত হিসেবে হতে পারে, সদকা হিসেবে হতে পারে অথবা আল্লাহর পথে জেহাদের প্রয়োজনে ঐচ্ছিক দান হিসেবেও বের করা যেতে পারে। আর মানত আল্লাহ আর কারো নামে হবে না, বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর জন্যেই হতে হবে। আল্লাহর কোনো বান্দার জন্যে যদি মানত হয় তাহলে তা হবে এক প্রকার 'শেরক' যেমন জাহেলীয়াতের যামানায় বিভিন্ন সময়ে মোশরেকরা তাদের মাবূদ ও মূর্তিদের নামে পশু বলী দিতো। এরশাদ হচ্ছে,

'যা কিছু তোমরা খরচ করো অথবা যে সমস্ত মানত তোমরা করো তা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন।'

আর মোমেনের এই অন্তরে সবসময়ই এই বোধ কাজ করে যে, অবশ্যই তার নিয়তের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে, তার বিবেকের মধ্যে এবং তার নড়া চড়া ও কাজের মধ্যে। এই চেতনাই তার অনুভূতি নিচয়ের কাছে নানাভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এসব অনুভূতির মধ্যে রয়েছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির অনুভূতি, অসুবিধা বোধ করা বা সন্দিহান হওয়ার অনুভূতি, কখনো জাগে মানুষকে দেখানো বা রিয়ার অনুভূতি আবার কখনো নিজেকে বেশী বেশী প্রকাশ করা বা ফুটিয়ে তোলার অনুভূতি, কখনো জাগে সংকীর্ণতা কৃপণতা, আর কখনো দৈন্যের ভয় অথবা ঠকে যাওয়ার অনুভূতি। অপরদিকে ঈমানের ধারায় দৃষ্টিভংগী পরিশোধিত হলে প্রতিদান পাওয়ার আশায় মন নিশ্চিন্ততায় ভরে যায় এবং কর্তব্য পালন করার সঠিক মূল্যায়ন হবে বলে গভীর বিশ্বাসে তার বুক ভরে ওঠে, আসে সন্তোষ-প্রাপ্তির চেতনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করতে পারার এক গভীর তৃপ্তি, আর সর্বোপরি আসে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতে পারার জন্যে বুকভরা কৃতজ্ঞতাবোধ।

এখন যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের হক আদায় করতে প্রস্তুত নয় এবং বাস্তবে না আল্লাহর হক আদায় করে না বান্দার হক আদায় করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করার পর অন্যকে দিতেও মানা করে, সে অবশ্যই যালেম, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করার জন্যে সে যালেম, মানুষের জন্যে যালেম এবং নিজের ওপরও সে যুলুমকারী। এরশাদ হচ্ছে,

'যালেমদের জন্যে নেই কোনো সাহায্যকারী।'

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা ও বান্দার ওপর কর্তব্য পালন করাই প্রকৃত পক্ষে ইনসাফ ও সুবিচার, আর এটা না করাই যুলুম ও যবরদস্তি। এ ব্যাপারটা বুঝার ব্যাপারে মানুষ দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার হক আদায়কারী। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দানকে তারা স্বীকার করে এবং তাঁর কাছে

শোকরগোজারি করে; আর একদল হচ্ছে, যালেম আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভংগকারী। না তারা আল্লাহর হক আদায় করে আর না তারা তাঁর শোকরগোজারী করে। তাদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে,

'আর নেই যালেমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী।'

মোস্তাহাব সদকা গোপনে দান করাই ভালো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশী প্রিয়। গোপনে দান করলে প্রকাশ করা বা রিয়ার মনোভাব আসার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু ফরয সদকা অর্থাৎ যাকাত প্রকাশ্যভাবে দান করাতে আনুগত্য প্রকাশ পায়, আর এই অর্থে যাকাত প্রকাশ্যভাবে দান করা এবং জানাজানি করে মানুষকে দেয়াই ভালো। এই কারণেই এরশাদ হচ্ছে,

'যদি প্রকাশ্যভাবে সদকা দাও তাহলে সেটা ভালো আর গোপনভাবে অভাবগ্রস্তদেরকে যদি দান করো সেটা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম। এ আয়াতে দুটি অবস্থার বর্ণনাই এসে গেছে। দুটি অবস্থাতেই যখন যেটা উপযোগী বুঝা যায় সেইভাবে দান করতে হবে এবং প্রতিটি সদকা নিজ নিজ স্থানে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে দান করাই প্রশংসনীয়, এই পদ্ধতিতে সদকা দ্বারা মোমেনদের পালন করা হবে এবং অন্যায় বিদূরিত হবে। এরশাদ হচ্ছে–

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোষ ত্রুটিগুলো মুছে দেবেন।'

এ সদকা খয়রাতের বিধান অনুযায়ী দান করায় মোমেনদের অন্তরে তাকওয়া গড়ে উঠবে এবং অপরকেও উৎসাহিত করা হবে। অপরদিকে এ পদ্ধতিতে আসবে নিশ্চিন্ততা ও শান্তি। আর সকল অবস্থাতে নিয়ত ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যা কিছু তোমরা করো সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা অবহিত রয়েছেন।'

'ইনফাক' বা আল্লাহর পথে খরচ করা সম্পর্কে দীর্ঘ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে নযর দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে এর তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়, দেখা দরকার এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কোন কোন ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে আর কি কি ভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, তাহলে আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পারবো,

এক, বর্তমান আলোচনার মাধ্যমে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে এবং অর্থ সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে মানুষের সংকীর্ণতা ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, সর্বক্ষণ দান খয়রাত করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, উপর্যুপরি তাকে স্মরণ করানো হয়েছে যাতে উদারতা প্রদর্শনে আকাংখী হওয়ার মাধ্যমে সে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার মজ্জাগত সংকীর্ণতাকে এবং মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে মহান সম্মানে ভূষিত করতে চান সৃষ্টির বুকে সে সম্মান লাভ করতে পারে। দুই, তৎকালীন আরব সমাজে দানশীলতা ও উদারতার সুখ্যাতি করা হতো সেই পরিবেশের মোকাবেলা করতে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে এই মহান ভাবধারা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু, তাদের দান-খয়রাত ছিলো প্রদর্শনীমূলক, অনেকটা খ্যাতি হাসিল করার উদ্দেশ্যে। দেশে দেশে ও গোত্রে গোত্রে মান-সম্ভ্রম ও সুনাম হাসিলের উদ্দেশ্যে। এমতাবস্থায় ওইসব খেয়াল বাদ দিয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দান করতে শেখানো ইসলামের জন্যে কোনো সহজ ব্যাপার ছিলো না। মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছু আশা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এই ত্যাগ করা সত্যই বড় জটিল ব্যাপার ছিলো। এজন্যে প্রয়োজন ছিলো বহু চেষ্টা সাধনা ও এক দীর্ঘ প্রশিক্ষণের, প্রয়োজন ছিলো স্থায়ী জীবন লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উদার চিত্ত হওয়া। আর এটা হয়েছিলোও বটে।

এই পর্যায়ে এসে দেখা যাচ্ছে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করার পরিবর্তে রসূলুল্লাহ (স.) কে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে করে ইসলামের মূলনীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামের ব্যবহার নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবপূর্ণভাবে ওই মহা সত্য সঠিক কথাগুলো তুলে ধরা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'ওদেরকে তুমি হেদায়াত করে ফেলবে এ দায়িত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। আর যা কিছু তোমরা খরচ করবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই করো। এইভাবে যে ধন সম্পদ তোমরা খরচ করবে তা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর (তোমাদের কম দিয়ে) তোমাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।'

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে ইবনে আবূ হাতিম তার মোসনাদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী (স.) প্রথম দিকে শুধু মুসলমানদেরকে সদকা দান করার জন্যে নির্দেশ দিতেন। অবশেষে নাযিল হলো- অর্থাৎ তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার নয় ...... সুতরাং এর পর থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে হাত পাতবে তাকেই দান করার জন্যে তিনি নির্দেশ দেন।

অন্তকে প্রভাবিত করা ও সঠিকভাবে পরিচালিত করা বা গোমরাহ করা এগুলো আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই, তিনি আল্লাহর রসূল হলেও এ কাজ তাঁরও সাধ্যের বহির্ভূত। এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাজ। মানুষের অন্তরগুলো আল্লাহরই সৃষ্ট এক শিল্প যার ওপর অন্য কারো শাসন চলে না, তিনি ব্যতীত এ শিল্পকে কেউ ব্যবহার করতেও পারে না। এগুলোর উপর আল্লাহ তায়ারা ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই, রসূলের কাজ শুধু দাওয়াত পৌছে দেয়া। হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য বলে বুঝেন তাকেই তিনি হেদায়াত দান করেন। এই হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সেইই যে হেদায়াত পাওয়ার জন্যে ইচ্ছা করে এবং সে জন্যে চেষ্টা সাধনা করে। মানুষের ইচ্ছা এখতিয়ারের বাইরে এই ক্ষমতাটি একমাত্র আল্লাহর কাছেই ধর্ণা দেয় এবং হেদায়াত লাভের জন্যে একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছেই দলীল প্রমাণ আশা করে। তারপর আল্লাহর মেহেরবাণীতে দাওয়াত দানকারীর জন্যে দাওয়াতী কাজের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। যার কারণে গোমরাহ লোকদের হিংসা বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্তেও দাওয়াত দানকারীদের হৃদয় দাওয়াত দিতে গিয়ে সংকুচিত হয়ে যায় না বরং সে ওই অপেক্ষায় থাকে। আরো কামনা করে যেন তারা আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার ওপরে ওদের হেদায়াতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি বরং আল্লাহ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন।'

অতএব, তাদের জন্যে যেন তোমার বুক খুলে যায় এবং তোমার ধৈর্য যেন আরোও বেড়ে যায়, তুমি যেন তাদেরকে সাহায্য করতে পারো। তাদের সব কিছুর ভার তো আল্লাহরই হাতে এবং খরচকারীকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বিনিময় দান করবেন।

এইভাবে দানশীলতার এমন কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যা সর্বসাধারণ মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের মর্যাদা বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় এবং ইসলামের উপরে টিকে থাকা তার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

দ্বীনি দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে মানুষ যে কতোটা স্বাধীন তার শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়েছে তা নয় এবং দ্বীনের কাজ করার ব্যাপারে বাধ্য করতে শুধুমাত্র নিষেধই

করেনি, বরং এর থেকে আরো অনেক বেশী কাজ করেছে পবিত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। ইসলাম মানুষের প্রতি নমনীয় ভাব পোষণ করতে শিখিয়েছে, শিখিয়েছে অভাবগ্রস্তদের অধিকার এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, যেন তারা সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা লাভ করতে পারে এবং যতোদিন কোনো ব্যক্তি মুসলিম জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র না করবে এবং তাদের আকিদাকে নষ্ট করার কাজে লিপ্ত না হবে ততোদিন তাদের এই অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে, আরো জানিয়েছে যে, দাতাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত হয়েছে, তবে শর্ত হচ্ছে তাদের দান একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই হতে হবে। মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যে একমাত্র ইসলামই এই পদক্ষেপ নিয়েছে এবং একমাত্র মুসলমানরাই মানবতা প্রতিষ্ঠার মর্যাদা বুঝেছে। এই প্রসংগে দেখুন আল্লাহর মহান বাণী–

'যা কিছু তোমরা খরচ করো সে তোমাদের নিজেদের মংগলের জন্যে, আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই খরচ করবে- তা না হলে কোনো মূল্য থাকবে না। জেনে রেখো, এই লক্ষ্যে যা কিছু তোমরা খরচ করবে তা তোমাদের পুরোপুরিই ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না।'

মোমেনরা যখন খরচ করে তখন তাদের মর্যাদা কতো বেড়ে যায়, সে সম্পর্কে কোরআন কারীমে যে বিবরণ এসেছে তার নির্যাস অনুধাবনে আমরা যেনো ব্যর্থ না হই। এ সম্পর্কিত মূল কথাটি হচ্ছে– আর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে খচর করা ব্যতীত যে খরচ আমরা করবো তার কোনো মূল্য নেই।

এটাই হচ্ছে মোমেনের শান, এই গুণ ব্যতীত মোমেনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই খরচ করে। সে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে পড়ে খরচ করে না বা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেও খরচ করে না, অথবা এজন্যে খরচ করে না যে লোকে তাদের দিকে বিশেষভাবে এবং প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে বা খরচ করার পর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখবে– কেউ কিছু বলে কিনা। এজন্যেও তারা খরচ করে না যে মানুষ তার খরচ করার কারণে তার কাছে এসে জড়ো হবে অথবা মানুষের উপর সে প্রাধান্য লাভ করবে এবং তার মরতবা বেড়ে যাবে। এ জন্যেও খরচ করে না যে ক্ষমতাধররা তার উপর খুশী হবে অথবা তাকে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিদান দেয়া হবে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সে খরচ করে এবং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তেই তার যাবতীয় খরচ, আর এ জন্যে তার সদকা যে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে– এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয় ও নিশ্চিন্ত হতে পারে। সে এই খরচের মাধ্যমে তার অর্থ সম্পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভ করতে পারবে বলে প্রশান্তি পায়, আরো সে নিশ্চিন্ত হয় যে তাকে আল্লাহ তায়ালা নেক প্রতিদান দেবেন এবং তাকে পুরস্কৃতও করবেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে কল্যাণ ও সুন্দর ব্যবস্থা দেয়া হবে বলে সে নির্লিপ্ততা অনুভব করে যেহেতু আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অবশ্যই এহসানের প্রতিদানে সার্বিকভাবে এহসান করবেন। তিনি তাকে তার দান করার জন্যে, মর্যাদা দেবেন এবং সার্বিকভাবে পবিত্রও করবেন, এটা তিনি দুনিয়াতে দেবেন। তারপর আখেরাতে তো রয়েছে সবটুকু কল্যাণই কল্যাণ।

এরপর খরচ করার খাতগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ করে একটি খাত সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে; এখানে মোমেনদের একটি দলের জন্যে এক বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এমন এক মর্যাদার কথা তুলে ধরা হয়েছে যা শুনলে চেতনাগুলি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, অন্তরসমূহ

আবেগে প্রকম্পিত হয় এবং যেনো এক স্নেহের পরশ লেগে তার মন নিরুদ্বিগ্ন হয়ে যায়। তখন সে কোনো হীনতা বোধ করে না, তার মন এমনভাবে হালকা হয়ে যায় যে, কোনো উদ্বেগ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না, তার সব প্রশ্ন থেকে যায় এবং মুগ্ধ আবেশে তার কথা বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

বলা হয়েছে,

দান খয়রাতের প্রাপকদের মধ্যে এমন অভাবগ্রস্ত মোহাজের সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ তায়ালার পথে থাকার কারণে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তুমি তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে দেখবে। সেখানে দুঃখ কষ্ট ও দৈন্যের ছাপ লেগে আছে। তারা মানুষের হাত জড়িয়ে ধরে তাদের কাছে কিছু চায় না। এদের জন্যে যা কিছু তোমরা খরচ করো তা আল্লাহ তায়ালা জানেন।

এই প্রাণবন্ত গুণটি মোহাজেরদের একটি দলের ওপর প্রযোজ্য ছিলো, যারা হিজরত করতে গিয়ে তাদের ধন সম্পদ ও পরিবার বর্গ পেছনে ফেলে এসেছিলেন এবং মদীনায় আসার পর আল্লাহর পথে জেহাদে ও আল্লাহর রসূলের পাহারাদারীতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যেমন করে হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন রসূল (স.)-এর জন্যে আসহাবে সুফফার ব্যক্তিরা যাদের কারণে কোনো দুশমন সেদিকে কুদৃষ্টিতে তাকাতেও সাহস পেতো না। এরা জেহাদের কাজে এতোটা নিবেদিত প্রাণ হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তারা বিদেশে ভ্রমণ করতে পারতেন না। এতদসত্তেও তারা কারো কাছে কিছু চাইতেন না। আত্মসম্ভ্রম বোধ সম্পন্ন এই সম্মানিত সাহাবারা তাদের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত না করায় সাধারণ মূর্খ লোকেরা তাঁদেরকে সচ্ছল মনে করতো এবং তাদের আসল অবস্থাটা বুঝতে না পারায় তাদেরকে তারা সম্পদশালী মনে করতো।

কিন্তু আয়াতটিতে উল্লেখিত কথাগুলো সাধারণভাবে সকল যামানার ও সব মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য। এ কথাগুলো তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিলো যারা প্রকৃতপক্ষে বড়োই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যারা কোনো রোযগার করতে পারতো না, আর তাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ তাদেরকে কারো কাছে হাত পাততেও দিতো না এবং তাদের অভাব অন্যের কাছে প্রকাশ পায় তাও তারা পছন্দ করতেন না। এইসব অবস্থার কারণে সাধারণ ও আনাড়ী গোছের মানুষরা তাদের বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে এবং তাদের বিনয় নম্রতা ও সততার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করতো। কিন্তু তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা খোলা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে তাদের বাহ্যিক প্রশান্ত চেহারার অন্তরালে লুক্কায়িত তাদের তীব্র দারিদ্রতাকে দেখতে পেতেন। সে দারিদ্রের ছাপ তাদের চেহারায় পরিস্ফুট হয়ে না উঠলেও তাদের দেখে তারা তাদের কষ্ট বুঝতেন। যদিও লজ্জায় তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুতো না।

এই ছোট্ট আয়াতটির মধ্যে এ সম্ভ্রমপূর্ণ অবস্থার যে ছবি আঁকা হয়েছে তা অনুভূতিশীল লোকের অন্তরে গভীরভাবে দাগ কাটে। আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে তাদের লজ্জাবনত ভাবের এক বাস্তব ছবি যেনো মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে উল্লেখিত প্রতিটি বাক্য তাদের জন্যে অনুভূতিশীল প্রত্যেক হৃদয়াভ্যন্তরে যেনো মোহাব্বাতের এক কোমল পরশ বুলিয়ে দিতে চায়। তাদের এই আত্মমর্যাদাবোধ ছবির মতো ভেসে ওঠে যে কোনো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছে। তখন তাদের চেতনা এমনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে যে, তাৎক্ষণিকভাবে ওদের জন্যে কিছু করার উদ্দেশ্যে তাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই আয়াতটি পাঠ করার সাথে সাথে ওই চেহারাগুলো এবং ওই ব্যক্তিত্বগুলো এমনভাবে পাঠকের হৃদয়পটে ভেসে ওঠে যেন মনে হয় তারা ও তাদেরকে চাক্ষুষ

আপন দেখতে পাচ্ছে। এই-ই হচ্ছে মানবতার উদাহরণ তুলে ধরার জন্যে কোরআনে কারীমের মধ্যে উল্লেখিত হৃদয়গ্রাহক পদ্ধতি যার ফলে কোনো অবস্থা জীবন্ত রূপ নিয়ে অনুভূতির দুয়ারে সাড়া জাগায়।

তারাই হচ্ছেন সেই সম্ভ্রমশীল ও মহান অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যারা তাদের অভাবকে তাদের, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার মতোই গোপন করে রাখেন। তাদেরকে গোপনেই দান করা উচিত যেন তাদের বিবেকে কোনো আঘাত না লাগে এবং তাদের আত্মমর্যাদা আহত না হয়, আর এই কারণেই ওসব ব্যক্তিকে গোপনে সদকা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র আল্লাহর জ্ঞানেই তা ধরা পড়ে এবং তাঁর কাছ থেকেই একমাত্র তার প্রতিদান পাওয়ার আশা করা যায়। এই জন্যেই এরশাদ হয়েছে,

'তোমরা যা কিছু খরচ করো সে বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা খবর রাখেন।'

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই নিভৃত হৃদয়ের গোপন কথার খবর রাখবেন এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে ভালো কোনো কিছু বাদ পড়ে যায় না।

পরিশেষে এ পাঠের মূল আলোচ্য বিষয়- সদকা খয়রাতের নিয়মাবলীর বিবরণ শেষ করার পর কোরআনে কারীমের সেই আয়াতটি শুরু হচ্ছে যা 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র সকল দিকগুলোকেই স্পর্শ করে, তাকে উপযুক্ত সময়ে খরচ করা সম্পর্কে জানিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ওয়াস্তে খরচকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেয়।

'আর যারা তাদের ধন সম্পদ রাত্র দিন গোপন ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাদের জন্যে প্রতিদান রয়েছে তাদের রব এর কাছে এবং নেই তাদের জন্যে কোনো ভয় আর না তারা দুঃখিত হবে।'

এসম্পর্কিত আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে এই যে আয়াতটি- এতে সংক্ষিপ্তভাবে সকল কথার নির্যাস এসে গেছে। এরশাদ হচ্ছে–

'যারা খরচ করে তাদের ধন সম্পদ রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে, একথা দ্বারা সকল প্রকার ধন সম্পদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।'

এবং সকল সময় সর্বাবস্থাতেই খরচ করা বুঝানো হয়েছে।

'তাহলেই তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে'।

এভাবে জানানো হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জীবনকে রহমত ও বরকতে ভরে দেবেন এর পরবর্তীতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রূপে আসবে আখেরাতের পুরস্কার।

'আর থাকবে না তাদের জন্যে কোনো ভয়, আর না তারা দুঃখিত হবে'। অর্থাৎ কোনো ভীতি প্রদর্শনকারীর পক্ষ থেকে দেখানো ভয় তাদেরকে ভীত করতে পারবে না, না কোনো দুঃখজনক অবস্থা তাদেরকে দুঃখিত করতে পারবে; দুনিয়া ও আখেরাতে সমানভাবে তারা এসব কষ্টকর অবস্থা থেকে দূরে থাকবে।

দান-এর আসল প্রাপক

সদকা খয়রাত সম্পর্কিত এই তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনায় এতদসম্পর্কিত সকল আলোচনাই মোটামুটি এসে গেছে।

এরপর বর্ণনা আসছে একই প্রসংগের আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে। তা হলো যে, কোনো মানুষের জীবন শুধু দান-খয়রাতের উপর চলতে পারে না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কর্মঠ ও সর্বতোভাবে আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে দেখতে চায়। এজন্যে ইসলাম

মুসলমানদের মধ্যে সুষম বন্টন ব্যবস্থা চালু করার পক্ষপাতী, যাতে করে শ্রম ও পারিশ্রমিকের মধ্যে হক ও ইনসাফ, সুন্দর ও সুষম সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু সকল সময়েই বিভিন্ন অবস্থার কারণে ওই সুষম বন্টন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে, যার কারণে সচ্ছল ব্যক্তিদের দায়িত্ব থাকবে ওই অব্যবস্থাকে সদকা দ্বারা সামাল দেয়ার। এ সদকার ব্যবস্থা কখনো ফরয ব্যবস্থা বা শরয়ী বিধান হিসেবে গৃহীত হতে হবে, যাতে জনসাধারণের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়, আবার কখনো সংশ্লিষ্ট মহলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ঐচ্ছিকভাবে দান করতে হবে যাতে করে প্রধানত, অভাবী ব্যক্তিরা দারিদ্রের কষাঘাতে জীবন যাপন করাকালে কিছু স্বাচ্ছন্দ বোধ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় নিয়ম শৃংখলা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহীতাদের আত্মমর্যাদাকে অটুট রাখার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। অভাবগ্রস্তদের আত্মমর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন হয় তার জন্যে উপরে বর্ণিত কোরআনে কারীমের আয়াতে বিশেষভাবে যত্ন নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দাতা সম্প্রদায়ের হৃদয়ে ইসলাম এমন প্রেরণা সৃষ্টি করছে যে, কেউ চাইতে না পারলে তাদের খোঁজ খবর নেয়াকে তারা তাদের কর্তব্যের অংগ বলে মনে করবে এবং তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করবে। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত হাদীসগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

১. সহীহ বোখারী আতা ইবনে ইয়াসির এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবি উমরা'র বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে 'উভয় বর্ণনাকারী বলেছেন' 'যে, আমরা আবু হোরায়রাকে বলতে শুনেছি। রসূলুল্লাহ (স.) এই হাদীসের বলেছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য মেসকীন নয় যে যাকে একটি এবং দুটি খেজুর দান করা হয় এবং এক মুষ্টি বা দু'মুষ্টি খাবার দেয়া হয়, প্রকৃত মেসকীন সেই ব্যক্তি যে তার আত্মমর্যাদায় টিকে থাকতে গিয়ে কাউকে অভাব জানায় না তাকে খুঁজে বের করতে হয়। এ বিষয়ে সঠিক কথা জানতে চাইলে আল্লাহর কথা পড়ে দেখো– 'ওরা মানুষের কাছে হাত জড়িয়ে ধরে কিছু চায়না।'

অন্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। ইমাম আহমদ বলেন– আমাদের এই হাদীস বলেছেন আবু বকর আল হানাফী, তাকে আব্দুল হামীদ ইবনে জা'ফর, তাকে তার পিতা, তাকে মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি বলেন, তাকে তার মা বলেছেন– বলো না আমরা গিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সেইভাবে কিছু চাই যেমন করে অন্যরা চায়। সেই ব্যক্তি বলেন– আমি তার কাছে কিছু সাহায্য চাওয়ার জন্যে গিয়ে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, যে ব্যক্তি বিনয়াবনত থাকবে এবং তার আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করবে আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা রক্ষা করবেন, আর যে মানুষের মুখাপেক্ষী হবে না আল্লাহ তায়ালা তাকে কারো মুখাপেক্ষী করবেন না। যে মানুষের কাছে চাইতে গিয়ে হাত পাতবে এমন অবস্থায় যে তার কাছে পাঁচ অক্বিয়াহ (২ কেজি) পরিমাণ খাদ্য আছে, এমতাবস্থায় তার চাওয়াটি হবে হাত জড়িয়ে ধরে অভাব জানানোর শামিল। একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম– আমার যে উটনীটি আছে তা তো পাঁচ অক্বিয়াহ থেকে অনেক বেশী মূল্যের। তাছাড়া একজন গোলামও তো আমার আছে, তার মূল্যও তো ওই উটনীটির সমান এবং পাঁচ অক্বিয়াহ থেকে বেশী। সুতরাং আমি কোনো কিছু না চেয়ে ফিরে এলাম।

২. মুহাম্মদ ইবনে সীরিন এর বরাত দিয়ে হাফেয আত্ তাবরানী বলে, হারিসের নিকট একটি খবর পৌছলো যে কোরায়শ গোত্রের আবু যার নামক ব্যক্তি সিরিয়ায় বাস করে। তার বেশ অভাব যাচ্ছিলো, একথা জানতে পেরে তিনি (হারিস) তার কাছে তিন শত দীনার পাঠিয়ে দিলেন এই দীনারগুলো তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি বললেন– হে আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা হারিস) কি

আমার থেকে আরো বেশী দুরাবস্থাগ্রস্ত কোনো ব্যক্তিকে পেলো না। আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি– যার কাছে চল্লিশটি (দেরহাম) আছে সে যদি কারো কাছে হাত পাতে তাহলে তার এই চাওয়াটা কাতর কণ্ঠে হাত জড়িয়ে ধরে চাওয়ার শামিল হবে এবং আবু যর এর পরিবারে চল্লিশটি দেরহাম তো আছেই, যেমন একটি বকরী এবং ছোট দু'জন খাদেম।

অবশ্যই ইসলাম সর্বদিক দিয়ে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে কোরআন হাদীস এবং রসূল (স.) কর্তৃক বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রদত্ত ব্যাখ্যা একযোগে কাজ করেছে। এ ব্যাপারে কোনো অংশকে বিচ্ছিন্নভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। গোটা ব্যবস্থাকে একসাথে কাজ করার জন্যেই ইসলাম সব কিছুকে একটি অংশের সাথে অপর অংশকে সংযুক্ত করে পাঠিয়েছে। এইভাবেই ইসলাম এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যার দৃষ্টান্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনো পাওয়া যায়নি।

সুদ মানবতার অভিশাপ

পেছনের পাঠে আলোচিত সদকা খয়রাতের ব্যবস্থার বিপরীত হচ্ছে সেই অন্ধকার ও মানবতাবিরোধী ব্যবস্থা যা অশান্তি ও ধ্বংস ডেকে আনে, আর তা হচ্ছে সূদ। সদকা হচ্ছে- দান ও বদান্যতা, পবিত্রতা ও পবিত্র করণের উপায়, সহযোগিতা ও মানুষের দুরাবস্থার সাথী হওয়া। অপরদিকে সুদ হচ্ছে সংকীর্ণতা, অপবিত্রতা ও হিংস্রতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। সদকা হলো অর্থ সম্পদ দান বা ত্যাগ স্বীকার করা, কোনো প্রতিদান বা বিনিময় পাওয়ার আশা ছাড়া নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান, আর সুদ হচ্ছে ঋণের বিনিময়ে বিপদগ্রস্তকে আরো কঠিন বিপদে ফেলার একটি ঘৃন্য ষড়যন্ত্র। সুদ আদায় দিতে না পারলে তার শরীরের গোশত কেটে হলেও আদায় করা, যদি খাতক ব্যবসা করার জন্যে নেয় তো সে ব্যবসায়ের মধ্যে নিয়োজিত শ্রমের উপর ঋণদাতার ভাগ বসানো, যদি সে লাভবান হয়। আর যদি লাভবান না হয় অথবা ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে যায় তাহলেও তাকে পূর্ব নির্ধারিত হারে আসলের উপরে সূদ দিতেই হবে, এমনকি গায়ের গোশত কেটে হলেও দিতে হবে। অথবা যদি নিজ ও পরিবার বা সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্যে ঋণ নেয়া হয় সে অবস্থাতেও মহাজনের সূদ তাকে দিতেই হবে।

এই পর্যায়ে যে পরিমাণ নেয়া হয়েছে তার চেয়ে অতিরিক্ত যা দেয়া হয় তার নামই রিবা বা সুদ- এটি সদকার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর চেহারা সম্পূর্ণ কদর্য , এর রূপ বীভৎস এবং এর পরিণতি ধ্বংস।

এই কারণে আল্লাহ রব্বুল ইযযত মহিমাময় দান খয়রাতের আলোচনার পাশাপাশি মানবতার কলংক, হিংস্র দানবদের প্রবর্তিত সুদী ব্যবস্থা ও তার কদর্যতার আলোচনা সরাসরি এবং পাশাপাশি রেখে বর্ণনা করেছেন। এই সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মানুষের অন্তর থেকে দয়ামায়া মমতা ও উদারতার প্রশ্রবণ শুকিয়ে যায় এবং সমাজ জীবনে নেমে আসে অশান্তি ও বিশৃংখলা, নেমে আসে উচ্ছৃংখলতা, হিংসা বিদ্বেষ। মানবতা ধ্বংসের অতলে নেমে যেতে থাকে।

সামাজিক যেসব ব্যাধি জাহেলী যামানায় গড়ে উঠেছিলো তার মধ্যে অন্যতম ছিলো ঘৃণ্য ও ভয়ানক সুদী ব্যবস্থা। সেই নিষ্ঠুর ব্যবস্থাকে খতম করার জন্যে ইসলাম যে কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছে অন্য কোনো জিনিসের জন্যে তা নেয়া হয়নি। এ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্যে শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে যে কঠিন কথা উচ্চারিত হয়েছে অন্য কোনো জিনিসের জন্যে তা করা হয়নি। এখানে ওই সম্পর্কিত আয়াত এসেছে এবং অন্য খানেও একইভাবে ওই মানবতা বিধ্বংসী ব্যাধির বিরুদ্ধে

কোরআনে কারীম সোচ্চার। আল্লাহ তায়ালারই হাতে রয়েছে সত্য সঠিক ও বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষমতা। জাহেলী যামানায় অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং মানুষের অকল্যাণকর এই ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলো মানুষ সমভাবে বুঝতো, কিন্তু তবুও এ কদর্য ব্যবস্থা যালেমদের তত্ত্বাবধানেই সর্বত্র চালু ছিলো।

সূদ আজো সারা পৃথিবীব্যাপী চালু রয়েছে। এর অকল্যাণকারিতা আজ যেমন মানুষ বুঝে তখনো বুঝতো। তবে এর সমাজ বিধ্বংসী রূপ আজকের এই আধুনিক সমাজে সবার নযরে যেভাবে ধরা পড়েছে সম্ভবত এতো কঠিনভাবে ইতিপূর্বে কখনো তা পড়েনি। এই ভয়াবহ নির্যাতনের কথাটা আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। মানব জীবনের এই দুঃখজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পৃথিবী এই জঘন্য ব্যবস্থার অকল্যাণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করছে এবং পূর্বেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় আজকের এই উপলব্ধি তীব্র, এর ফলে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা 'দ্বীন' ইসলামে এ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্যও মানুষ আজ বেশী বুঝতে পারছে। মানুষের সামনে আজকে দুনিয়ার ঘটনাবলী বিদ্যমান, যার আলোকে মানুষ কালামে পাকের যথার্থতা সরাসরি ও সহজেই নিরূপণ করঁতে পারে। বিভ্রান্ত মানুষ আজও এখানে সূদ খাচ্ছে এবং সুদভিত্তিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইসলামী ব্যবস্থার মাধ্যমে সূদের অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখে সর্বত্র নিজেদের ধ্বংসের ছবিই দেখতে পাচ্ছে। ওই ঘৃণ্য ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া তারা প্রত্যক্ষ করছে তাদের চরিত্রে, তাদের ধর্মে, তাদের স্বাস্থ্যে এবং তাদের আর্থিক অবস্থানের সর্বত্র। অচিরেই তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে তখন তারা তাদের নাফরমানীর প্রতিদান ও শাস্তি ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধভাবে লাভ করবে। ওই শাস্তি নেমে আসবে তাদের গোটা জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর। ওই শাস্তি থেকে কাউকে রেহাই দেয়া হবে না বা কারো শাস্তি লাঘবও করা হবে না।

পূর্বেকার আলোচনায় সদকার নিয়ম প্রসংগে বলতে গিয়ে যে সব কথা পেশ করা হয়েছে তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সত্য সঠিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তিনি চেয়েছেন যেন অন্যরাও তাঁর রহমত লাভ করার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো খেয়াল করে শোনে এবং এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে তার থেকে যথাযথ উপকার পায়। এ ব্যবস্থা মানবনির্মিত নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থার মোকাবেলায় মানুষকে সত্য ও কল্যাণের দিকে আহবান জানাচ্ছে।

এ দুটি ব্যবস্থা পরস্পর বিরোধী। একটি হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থা, অপরটি হচ্ছে দেব দেবীর পূজার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থা। এক কথায় এ দুটি ব্যবস্থা এক সাথে অবস্থান করতে পারে না, আর না এ দু'টির মূলনীতি এক হতে পারে, দুটি ব্যবস্থার পরিণতি এক হওয়া সম্ভব ও নয়। দুটি ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য, মূলনীতি, চিন্তাধারা ও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য কেন্দ্রিক চিন্তাধারা পেশ করে যার এক একটা অপরটার পুরোপুরিই বিরোধপূর্ণ। এই কারণেই ইসলাম ভীষণভাবে ওই সুদ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছে এবং ওই ব্যবস্থাকে খতম করার জন্যে কঠিনতম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইসলাম তার জায়গায় নিজস্ব অর্থ ব্যবস্থা চালু করেছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম এখন বদ্ধপরিকর। এই ব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনিই সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই সকল সৃষ্টির মালিক মনিব অধিপতি তিনিই মানুষকে পৃথিবীর বুকে খলিফা বানিয়েছেন এবং তাকে রুযি

রোযগারের ভান্ডার, খাদ্য খাবার ও শক্তি সামর্থ দান করেছেন বিনিময়ে তিনি তাদের থেকে একটি ওয়াদা গ্রহণ করেছেন তা হলো এই যে, এই প্রশস্ত ও মহাবিশ্বের মালিক কেউই হতে পারবে না। তিনি নিজেই বিশ্বের যেখানে যা খুশী করবেন। তিনি তাকে একটি সুনির্দিষ্টি গন্ডীর মধ্যে খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন, খেলাফত দিয়েছেন তাকে এই শর্তে যে, সে আল্লাহর বিধান মতে সব আইন কানুন চালু করবে এবং এইভাবে আল্লাহর যমীনে সে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে, আর আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকেই সর্বকাজে সে যথেষ্ট মনে করবে। তিনি জীবনের জন্যে যে ওয়াদা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তা তারা পূরণ করবে, যেভাবে কাজ করার, লেনদেন করার, চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার তা সবই করবে তাদের ওয়াদা অনুযায়ী তারা পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে, সঠিকভাবে তার দেয়া জীবন বিধানকে তার যমীনে চালু করবে। এই ওয়াদার বিপরীত যা কিছু অথবা সংঘটিত করতে চাইবে তাকে বাতিল করতে হবে এবং ওই উদ্দেশ্যের পথে সকল তৎপরতাকে থামিয়ে দিতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত যে কোনো শক্তি নিজ প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইবে তার তৎপরতা হবে অন্যায় ও বিদ্রোহাত্মক। আল্লাহ তায়ালা ও মোমেনরা তা কখনো মেনে নেবে না। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টির ওপর যেমন আল্লাহ তায়ালার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত, তেমনি পৃথিবীর সর্বত্র ও সকল মানবমন্ডলীর ওপর তাঁরই শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই তাদের উপর শাসনকর্তা আর সবাই তার অধীনস্থ খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধি। এই খলীফাদের কর্তৃত্ব ছড়িয়ে দিতে হবে আল্লাহ তায়ালারই দেয়া আইন কানুন ও জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। আল্লাহ প্রদত্ত জীবনের যে বিধান, তার বাইরে ওই খলীফাদের কেউই যেতে পারবে না, কেননা তারা আল্লাহরই প্রতিনিধি এবং নির্দিষ্ট শর্ত ও ওয়াদার ভিত্তিতেই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব তারা লাভ করেছে। তাদেরকে কখনো তাদের কর্তৃত্বাধীন জিনিসগুলোর নিরংকুশ মালিক বানিয়ে দেয়া হয়নি।

এই চুক্তির ভিত্তিতেই মোমেনদের পরস্পরের মধ্যে দায়িত্ববোধ পয়দা হয়েছে, যার ফলে তারা একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়, আর এই পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে তারা আল্লাহ তায়ালার দেয়া রেযেক থেকে সবাই ফায়দা হাসিল করে, তবে সাম্যবাদী অর্থনীতির প্রবক্তা কার্ল মার্কস- এর মতবাদ অনুসারে সবাই কিন্তু সমান হয়ে যায় না, বরং সীমিত ব্যক্তি মালিকানার অধিকার থাকার ভিত্তিতে যাদের আল্লাহ তায়ালা তুলনামূলক অধিক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, তারা অস্বচ্ছলদের জন্যে খরচ করবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, যাতে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের ওপর বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সামর্থ থাকা সত্তেও অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এমন যেন কখনো না হয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসে গেছে। আল্লাহ তায়ালা সম্পদশালীদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, কিন্তু দানের ওপর এই রকম কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি।

এই ঐচ্ছিক দান খয়রাতের ব্যাপারেও আবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেনো মুসলমানরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অপচয় না করে বসে। আল্লাহ তায়ালা যেসব পবিত্র জিনিস তাদের জন্যে হালাল করেছেন তার ভোগ ব্যবহারের ব্যাপারে তারা যেন সীমা অতিক্রম না করে। তাদের আয় রোজগারের মধ্য থেকে নিজের প্রয়োজন পুরা করার পর যদি অতিরিক্ত কিছু থেকে যায়, তা থেকেই তারা যাকাত দেবে। এখানে একটি শর্ত অবশ্যই আছে আর তা হচ্ছে, তার রোযগারের স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছলতা অর্জন

করতে গিয়ে অন্য কারো স্বার্থ যেনো বিঘ্নিত না হয়, কারো হক যেনো নষ্ট না হয় বা কেউ যেনো কষ্ট না পায় অবশ্যই সেটা খেয়াল রাখতে হবে। অন্য শর্ত হচ্ছে কোনো সম্পদ মূল্য বৃদ্ধির আশায় যেন বিক্রি করা ঠেকিয়ে না রাখা না করা হয় বা খাদ্য খাবার ও মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে গুদামজাত করে না রাখা হয়; বরং যথাসম্ভব সম্পদের বেচাকেনা যেন সর্বদাই স্বাভাবিকভাবে চালু থাকে যাতে করে 'কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক ধনী ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়।'

তাদের নিয়ত ও কাজের পবিত্রতা আনা অর্থাৎ সব কিছুর ব্যাপারে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা এবং সেইভাবে কাজ করাকে আল্লাহ তায়ালা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, বাধ্যতামূলক করেছেন উপায় উপকরণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার আনয়ন করাকে। অর্থ বৃদ্ধির জন্যে তাদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থ বৃদ্ধির জন্যে এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা যাবে না যাতে কোনো ব্যক্তির অন্তরে কষ্ট লাগে অথবা তার শরীরের কোনো ক্ষতি হয় কিংবা দল বা তার সংগঠনে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়।(১)

এই সৃষ্টির প্রয়োজনে যে বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাকে সামনে রেখেই ইসলাম তার অর্থ ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে। জীবনের এই সুপ্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্যে সবকিছুকে সুসামঞ্জস্যরূপে ব্যবহার করার যে দায়িত্ব মানুষকে দেয়া হয়েছে তা পালন করার উপযোগী করে ইসলাম তার অর্থনীতিকে সাজিয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যাবে সুদী ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ঈমানী চেতনার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। এ ব্যবস্থাটি মূলত অন্য আর একটি দৃষ্টিভংগী অনুসারেই গড়ে উঠেছে, সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করার কোনো দৃষ্টিভংগী নেই, আর এই কারণে সেখানে কোনো নীতি মেনে চলা অথবা মানবতাবোধের কোনো মূল্য নেই, কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা অথবা মানুষের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণের লক্ষ্যে চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন এবং সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন সে সবের কোনো স্থানই এখানে নেই।

সুদ ও ইসলামের মৌলিক তফাৎ

যে নীতির ভিত্তিতে এই সুদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সাথে আল্লাহর ইচ্ছা ও মানুষের জীবনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ তো গোড়া থেকে এই পৃথিবীর নেতা পরিচালক ছিলো। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক রাখতেই হবে বৈষয়িক দিক থেকে এটা কোনো জরুরী বিষয় নয়, কাজেই তার পক্ষে আল্লাহর নির্দেশাবলী মানা না মানার প্রশ্নও আসে না!

প্রত্যেক মানুষ অর্থ সম্পদ লাভের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যে কোনো উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি ও ভোগ ব্যবহারের ব্যাপারেও তাই সে স্বাধীন। এ প্রশ্নে আল্লাহর সাথে তার কোনো চুক্তি বা আল্লাহর কোনো শর্ত মেনে চলা তার জন্যে প্রয়োজন নেই বা তার ওপর এটা বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রশ্নও আসে না। অন্য কোনো কারণে বা কারো সুবিধা বা কল্যাণের জন্যে তাকে কাজ করতেই হবে, এ শর্তও মানুষের ওপর আরোপ করা চলে না, আর এই কারণে সম্পদ লাভ বা সম্পদ বৃদ্ধিতে তার কষ্ট হলো বা না হলো এ চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের প্রকৃতিগত স্বাধীনতাকে সামনে রেখেই তার জন্যে আইন রচনা করতে হবে। অবশ্য কখনো অপরের সুবিধার খাতিরে তার প্রকৃতিগত স্বাধীনতাকে আংশিকভাবে সীমিত করা যেতে পারে যাতে কেউ কাউকে ধোঁকা দিতে না পারে বা কারো জীবন বিপন্ন করে নিজের অবস্থাকে ভালো

(১) লেখকের 'আল আদালাতুল ইজতিমায়িতু ফিল ইসলাম' এর 'সিয়াসাতুল মাল' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করতে না পারে। কেউ যেন কারো ধন সম্পদ লুন্ঠন করতে না পারে, কোনো ব্যবসায়ী যেন পণ্যের ত্রুটি গোপন না করে বা কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ না দেয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু সমাজের এতোটুকু হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নয়, কেননা মানব প্রকৃতির মধ্যে যে সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বিদ্যমান, তার কারণে সে অপরকে কষ্ট দিয়ে হলেও নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সে কুপ্রবৃত্তির তাড়নেই চালিত হয় বেশী। এ জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস এবং তার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন, যাতে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার সে সুনিশ্চিত হতে পারে।

কিন্তু মানুষের তৈরী বিধানের মূলনীতি এত নড়বড়ে যে তা কখনো সর্বসাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। সে বিধানের বড়ো কথা হচ্ছে– যে কোনো উপায়েই হোক না– অর্থ উপার্জন করতে হবে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যয় করার ব্যাপারে স্বাধীন তা থাকবে। আর এই কারণেই সে সম্পদ ও সম্ভোগের সামগ্রী সঞ্চয়ের জন্যে সদা সর্বদা লালায়িত থাকবে, আর এ পথে যতো বাধা বিঘ্ন বা অপরের স্বার্থ তারা অন্তরায় সৃষ্টি করবে সেগুলোকে সে ডিংগিয়ে যাবেই।

মানুষের অর্থলিপ্সায় এই যে প্রকৃতি এরই ভিত্তিতে অবশেষে গড়ে ওঠে এমন এক অর্থনীতি যা মানুষকে মানবতাবোধ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং এ মননশীলতা ব্যক্তি, দল, দেশ ও গোত্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে গুটি কয়েক সুদখোর মহাজনের হীন স্বার্থ উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেয়। তাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্র খতম হয়ে যায়, হিংসা বিদ্বেষ ও ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা জেগে উঠে, বিঘ্নিত অর্থ সঞ্চালন বিঘ্নিত হয় এবং গোটা মানবতার মধ্যে আর্থিক আদান প্রদান ও প্রবৃদ্ধি; আর এর ফলে সম্পদের প্রসার না হয়ে তা কিছুসংখ্যক পুঁজিপতির মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে যায় যেমন করে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে দেখা গেছে। এর ফলে তারা মানুষকে সীমাহীন ও দুর্বিষহ কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাদের মধ্যে একদল লোক তো এমনো আছে যারা মানুষের দুঃখ কষ্টের পরোয়া করে না, সম্পাদিত কোনো চুক্তি রক্ষা করার দরকার মনে করে না বা কারো মান ইযযতের তোয়াক্কাও করে না। এসব লোকেরা ব্যক্তি মানুষদের ঋণ দেয়, দেয় সরকার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কেও, দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশেও এরা ঋণ দেয়। এইভাবে ঋণ দেয়ার ওসীলায় সকল মানুষকে কষ্ট দিয়েই এরা গড়ে তোলে সম্পদের পাহাড়। মানুষকে কষ্ট দিয়ে, মানুষের রক্ত পানি করা পয়সা সেচে নিতে তারা কোনো দ্বিধাবোধ করে না।

এইভাবে ওরা শুধু সম্পদের মালিকই হয় না, সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারীও বলে যায়। তারা কোনো নিয়ম নীতির ধার ধারে না, তাদের না আছে কোনো চরিত্র, আর না আছে তাদের কোনো দ্বীন ধর্ম বা চরিত্রগত ধ্যান-ধারণা। এজন্যে তারা কারো কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। পয়সা ছাড়া তারা আর কিছুই চেনে না। তারা ধর্মীয় বিধানের সমালোচনা করে, এর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, নীতি নৈতিকতা ও চরিত্র তাদের কাছে একটা পরিহাসের বস্তু। এভাবে তারা সারা পৃথিবীব্যাপী এই ভয়ানক সুদী ব্যবস্থার বাজার খুলে বসেছে, এই ব্যবসার মাধ্যমে তারা বিশ্ব বিবেককে খরীদ করে নিয়েছে এবং বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে তাদের পক্ষেই আইন রচনা করতে তারা বাধ্য করে ফেলেছে। তাদের পথে কোনো বাধা বিঘ্ন নেই এবং তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার পথে কোনো কাঁটাও নেই। এ উদ্দেশ্যের তারা মানুষের যৌন অনুভূতিকে ব্যবহার করছে। সেখানে যাকে প্রলুব্ধ করার দরকার মনে করছে তাদের মদ ও নারীর লোভে মাতিয়ে ফেলে তাদের চরিত্রকে হরণ করে নিচ্ছে এবং যে কোনো উদ্দেশ্য তারা তাদের দ্বারা হাসিল করিয়ে নিচ্ছে। আরো অনেকে আছে যারা পয়সা দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিয়ে নিচ্ছে, তারা শিকার

ধরার উদ্দেশ্যে তারা সুনির্দিষ্ট স্থানে পয়সা ঢেলে চলেছে, আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সংকীর্ণ অর্থ লিপ্সাকে চরিতার্থ করার মানসে পৃথিবীর সকল সরবরাহের উৎসগুলোকে করায়ত্ত করা। সারা বিশ্বের অর্থের চাবিকাঠির মালিক হওয়ার জন্যে এর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়া। যতো কঠিনই হোক না কেনো তারা এ ব্যাপারে চেষ্টার কোনো কসুর করেনি; এবং বাস্তবে তাদের হাতেই এখন অর্থ ভান্ডারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তারা শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার তথা মানবতার উন্নতি বিধানের জন্যে সুদভিত্তিক ব্যবস্থাকেই একমাত্র ব্যবস্থা বলে প্রচার করে রেখেছে। এর ফলে বিশ্বে সম্পদ ভান্ডারের চাবিকাঠি ধীরে ধীরে তাদেরই হাতে চলে গেছে।

বর্তমান বিশ্বে দুঃখী মানুষের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে গেছে অতীতে এমন অবস্থা আর কখনো আসেনি; আর তা এই জন্যে যে, পূর্বে ওই সব মহাজনেরা ব্যক্তি ও বাড়ীভিত্তিক তাদের সুদী ব্যবসা চালাতো, আর আজকে এমন ব্যবসা চালানোর জন্যে তারা বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলেছে। তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের শাসনাধীনে থেকে আবার কখন দেশীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বলে বাইরে থেকে তাদের এ ব্যবসায় অবলীলাক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্যে নানাপ্রকার সরকারী উপায় উপকরণ ব্যবহার করে চলেছে। কখনো ছোট বড়ো পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে, কখনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার শিক্ষক মন্ডলীর মাধ্যমে, কখনো রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে আর কখনোও বা সিনেমা বায়োস্কোপের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত ও অসহায় জনগণের মধ্যে এ ব্যবস্থার কেরামতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবে এ ব্যবস্থার অধীন ওই সুদী ব্যবসায়ীরা ওদের মাংস ও হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে এবং শরীরের নির্যাস ও রক্ত শুষে নিচ্ছে। আজ বিশ্বের জনমতকেও এমনভাবে প্রলুব্ধ করা হয়েছে যে জনসাধারণ এই বিষাক্ত ও নোংরা এই সুদী ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা এই ব্যবস্থাকে এই বলে স্বীকৃতি দিয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে এইটিই সঠিক ব্যবস্থা। এটা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতির আর কোনো উপায়ই নেই। এই ব্যবস্থার কল্যাণে এবং এ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার সুবিধার কারণেই পাশ্চাত্যের বর্তমান এই উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে যারা ভেংগে দিতে চায়, তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তারা কল্পনাবিলাসী, অবাস্তব ও অকর্মণ্য। তাদের মতে যারা এই সুদভিত্তিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে বাস্তবতার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তারা নিছক কল্পনা রাজ্যে বাস করে। এইভাবে যারা এ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে তাদেরকে এ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দান করবে। এমনকি যারা এ সুদী ব্যবস্থার সমালোচনা করে তাদেরকে এই বলে টিটকারী দেয় যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার কাছে কোরবাণীর পশুর মতো কোরবাণী হয়ে গেছে, এবং এজন্যেই এর বিরুদ্ধে তারা কথা বলে। কিন্তু সত্য বলতে কি তারা নিজেরাই এখন এই বিশ্ব ব্যবস্থার সামনে অসহায় হয়ে গেছে এবং এই নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার যাঁতাকলে এমনভাবে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, এর থেকে বেরুনোর আর কোনো পথ তারা পাচ্ছে না। তারা সুসংগঠিত এক (তীব্র) আন্দোলনের আওতায় পড়ে নিজেদের জীবনের স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছে। এর প্রবক্তারা নিজেদের অজান্তেই নিজেদেরকে ওই হিংস্র নেকড়ের খোরাকে পরিণত করে দিয়েছে।

সুদ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সকল দিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ এবং মানব সাধারণের জন্যে অকল্যাণকর ও অভিশপ্ত অর্থ ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ নিজেরাই এর মন্দ দিকগুলো তুলে

ধরেছেন। অথচ তারা নিজেরা ওই অর্থব্যবস্থার ছায়াতলেই গড়ে উঠেছেন। তাদের যুক্তি-বুদ্ধি এবং কৃষ্টি অর্থনীতির এ ফলাফল ভোগ করেছে, যার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে রয়েছে তাদের গোটা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, ধ্যান ধারণা ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যে। এই সকল সমালোচকদের শিরোভাগে রয়েছেন ডঃ শাখত আলমানী। তিনি এক সময় শায়েখ আলমানী ব্যাংকের ডিরেকটর ছিলেন। ১৯৫৩ সালে দামেস্কে এক অস্ত্রোপচার কালে তার একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে তিনি ছিলেন অংক শাস্ত্র সমিতির একজন স্থায়ী সদস্য। তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে পৃথিবীর সকল সম্পদ কিছু সংখ্যক মুষ্টিমেয় সুদখোর ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ ঋণদাতারা সুদের বিনিময়ে ঋণ দেয়ার সময় সব সময়েই নিজের লাভের দিকে বেশী খেয়াল রাখে। তাই ঋণগ্রহীতারাই এই লোকসানের শিকার হয়। এরপর দেখা যায় শুভংকরের ফাঁক দিয়ে ঋণগ্রহীতার সকল ধন সম্পদ ধীরে ধীরে ঋণ দাতার ভান্ডারে গিয়ে জমা হয়, কারণ ঋণ গ্রহীতার উপকার হোক বা অপকার হোক এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ দ্বারা ব্যবসা চলুক আর নাই বা চলুক এবং লাভ হোক বা লোকসান হোক তাতে মহাজনের তো কিছুই যায় আসে না, সর্বাবস্থায় তার লাভের অংকটাই ঠিক থাকতে হবে, এইভাবে আজকে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি থেকে নিয়ে সংস্থা ও দেশের পর দেশ ঋণের বোঝা টানতে টানতে দেউলে হয়ে চলেছে এবং সম্পদের বেশীর ভাগ মালিক এখন ওইসব মহাজনেরাই। তারা শুধু লাভই লাভ করে, টাকার পাহাড় রচনা করে চলেছে এবং হাজার হাজার শুধু নয়, লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের লাভের অংক। কৃষি জমি থেকে কল-কারখানার মালিকেরা সবাই ব্যাংক ঋণ নিচ্ছে আবার কখনো নিচ্ছে অন্যান্য সংস্থা থেকে, সবাই কিন্তু নিজেদের লাভের অংকটা ঠিক রেখেই এসব ঋণ দিচ্ছে, নিজেদের লাভই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা হাজার মানুষের শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের লাভের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুদী কারবার চালিয়ে যাওয়ায় পরিণাম শুধু এতোটুকুই নয় বরং এই সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে নিরন্তর এক অবিশ্বাস, ধোঁকাবাজি ও মানুষে মানুষে সংঘাত ও রেষারেষির মনোভাব গড়ে উঠেছে। দেখা যায় সেখানে ঋণদাতা সর্বাধিক লাভ করার জন্যে ব্যস্ত থাকে। এই লক্ষ্যে সে এমনভাবে সম্পদকে কুক্ষিগত করে ফেলে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কল-কারখানাগুলোর মালিকানা চলে যায় পুঁজিপতিদের হাতে, ফলে তারাই লাভের সিংহভাগ পেতে থাকে। তাদের লাভের অংক বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কর্মজীবীরা ওই সকল কারখানা থেকে কোনো লাভই পাচ্ছে না। এমনকি তারা জানতেও পায়না যে ব্যবসায় আদৌ কোনো লাভ হচ্ছে কিনা। এমতাবস্থায় যে সকল কর্মক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে তাদের রক্ত পানি করা পয়সা ওই পুঁজিপতিদের ভাঁড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে। এর ফলে কারখানাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে। কর্মকর্তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এই অবস্থার এতো বেশী অবনতি হয়ে চলেছে যে সুদী কারবারের মহাজনরা দেখতে পাচ্ছে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে অথবা থেমে গেছে এবং এর পরিণতিতে তাদের লাভের বাজারেও মন্দা নেমে আসাটা অবধারিত হয়ে গেছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে কারখানার মালিকের নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হচ্ছে, যেহেতু জীবন যাপনের সকল বিভাগে মন্দা ভাব নেমে এসেছে। এমনিভাবে সারা বিশ্বব্যাপী পর্যায়ক্রমে সংকট বেড়েই চলেছে এবং গোটা মানবজাতি

এক শ্রান্ত ক্লান্ত কাফেলার মত ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

তারপর এই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ পরোক্ষভাবে (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে) ওই সকল সুদী মহাজনদের ট্যাক্স দিতে বাধ্য হচ্ছে। কল-কারখানা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা মহাজনদের কাছ থেকে যে ঋণ নিয়ে কারবার চালাচ্ছে তারাও যে সুদ দিচ্ছে তা নিজেদের পকেট থেকে নয়; বরং ওই সাধারণ শ্রমিকদের পকেট থেকে কেটে নিচ্ছে, যারা এই সুদভিত্তিক ঋণের ওপর গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের ইট পাথর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ওই ধ্বংসাত্মক পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে গোটা পৃথিবীবাসীকে যে সুদের বোঝা বইতে বাধ্য করছে তার ফলে লাভবান হচ্ছে একমাত্র ওই মহাজনেরা। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র বিশ্বব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদী শর্তে উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে যে ঋণ পাচ্ছে তার ঘানি টানতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে এবং তারও মুনাফা পরোক্ষভাবে সুদী মহাজনদের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার এই সকল রাষ্ট্র এইসব ঋণ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ নাগরিকদের ওপর নানা প্রকার ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে চলেছে, আর এর ফলে ঘুরে ফিরে ওইসব সুদ খোর মহাজনদের উদর পূর্তির জন্যে প্রত্যেকটি নাগরিককে অংশ নিতে হচ্ছে। আর এতোটুকুতেও যে সুদের অভিশাপ শেষ হচ্ছে তা নয়; বরং সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঋণের আদান প্রদানের অবসান সর্বসময় সম্ভব, এই সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের কারণে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে

সুদী ব্যবস্থার আরো কিছু ধ্বংসাত্মক পরিণতি

আমরা এখানে কোরআনে কারীমের ছায়াতলে বসে এই সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি ত্রুটি বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করছি। অবশ্য এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে অনুধাবন করার জন্যে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন প্রয়োজন অথবা একটি পৃথক অধ্যায় সন্নিবেশিত হওয়া দরকার।(১)

এতটুকু আলোচনাই আমরা ওই সকল লোকদের জন্য যথেষ্ট মনে করি যারা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অকল্যাণ সম্পর্কে জানার পর ইসলামের সমগ্র ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং যারা সুদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে প্রস্তুত। এখানে সুদ এর ধ্বংসাত্মক অবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করা হয়েছে।

১. প্রথম সত্যটি হচ্ছে, মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগানো যে দেশের বা যে অঞ্চলে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে ইসলাম তার শক্তিপূর্ণ চেহারা নিয়ে বর্তমান নেই বা থাকতে পারে না। ফতওয়াদাতা (মুফতীরা) এবং দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞাত ওলামায়ে কেরাম এবং অন্যান্যরা এ বিষয়ে আপোষমূলক যে সব কথা বলেন তা নির্জলা মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের বুনিয়াদী চেতনা সুদী ব্যবস্থার সাথে সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষশীল। মানুষের গোটা জীবনের ওপর, তাদের চেতনা ও চরিত্রের সুর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

২. দ্বিতীয় সত্য হচ্ছে, গোটা মানব সভ্যতার জন্যে সুদ এক প্রচন্ড অভিশাপ এবং সাক্ষাত বিপদ। এ ব্যবস্থার অধীনে ঈমান এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চেতনা থাকাও মুশকিল, বরং এই

(১) এই সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বিষয়টি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন আল্লাম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর 'সুদ' নামক গ্রন্থে এ পুস্তকে তিনি সুদ এবং ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ এর উপরও বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। এটি মূল গ্রন্থকারের টিকা।

ব্যবস্থার অধীনে সুস্থ মানবতাবোধ এবং কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এ ব্যবস্থার সব থেকে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর দিক হলো এটা মানুষের সুস্থ বুদ্ধি ও সকল প্রকার সৌভাগ্যের দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতির পথকে কন্টকাকীর্ণ করে দেয় যদিও এর বাহ্যিক চেহারাটা বেশ চটকদার, বরং দর্শকদের নযরে আকর্ষণীয়ই থাকে। কিন্তু এর ভেতর তাকালে মনে হয় এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জন সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া সুনিশ্চিত!

৩. তৃতীয় সত্যটি হচ্ছে, মানুষের বাস্তব কর্মব্যবস্থা এবং নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং মানুষ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে খেলাফতের চুক্তি ও তার শর্ততে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সে জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে যতো প্রকার কর্মতৎপরতা চালায় তার মধ্যে তাকে পরীক্ষা করা হয়, তার সকল কাজকে তদারক করা হয় এবং আখেরাতে তার হিসাব নেওয়া হবে। মানুষের নৈতিক ব্যবস্থা ও কর্মব্যবস্থা পৃথক পৃথক অবস্থানে থাকেনা, বরং মানব কল্যাণের পরে এই দুটি ব্যবস্থা একই সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ দুটি ব্যবস্থার যৌথ অবস্থানের ওপরই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য নির্ভরশীল, যার জন্যে তাকে পুরস্কৃত করা হবে– আর অন্যায় করলে তার জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কোনো অংশই নৈতিক বিধান ব্যতীত চলতে পারে না। নীতি নৈতিকতা ইসলামের কোনো বাড়তি জিনিস নয় যে, তা না হলেও চলতে পারে, বরং নৈতিকতার ওপরই যাবতীয় কর্মকান্ডের ভিত্তি। এ ভিত্তির অভাবে গোটা ইসলামী ব্যবস্থা ধসে যাবে।

৪. চতুর্থ সত্য হচ্ছে, সুদী লেনদেন যখনই করা হবে তখন এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারা থাকবে তারা বিবেক হারা ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে যাবেই এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। দলীয় জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের ভাই একথা বুঝা সত্তেও কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসবে না এবং এইভাবে দলীয় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানুষ হয়ে যাবে নিষ্ঠুর, লোভী আত্মকেন্দ্রিক ধোঁকাবাজ এবং সাধারণভাবে এহেন অর্থপূজারী ব্যক্তিদের কথা হচ্ছে আজকের এই ধ্বংসশীল সমাজে মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে পুঁজিকে এইভাবে বিনিয়োগ করতে হবে, যেন বিভিন্ন দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা আসতে থাকে, যাতে করে সুদ দানের শর্তে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা করতে পারে। তাহলে সে সুদ পরিশোধ করার পরও লাভের অংক ঠিক রাখতে পারে। এই কারণে দেখা যায় লাভবান হওয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বিনিয়োগকারী বিভিন্ন নীতি নৈতিকতা বিরোধী ফিল্ম তৈরী করে, যৌন সুঁড়সুড়ি দানকারী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে, নাচ-গানের আসর বসায়, সুন্দরী পরিচারিকা ও সেক্রেটারী এবং আরো বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। সুদ দানের শর্তে ঋণ গ্রহণ করে যে ব্যবসা বাণিজ্য করা হয় তার উদ্দেশ্য কোনো জনকল্যাণ নয়, বরং তার দ্বারা বেশী বেশী মুনাফা হাসিল করাই উদ্দেশ্য। তাতে পণ্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য হয় হোক এবং নিকৃষ্ট ধরনের মাল সরবরাহ করতে হয় হোক তাতেও আপত্তি নেই। এই অবস্থাটাই সারা পৃথিবীজুড়ে এখন দেখা যাচ্ছে, আর এসব কিছুর মূলে রয়েছে সুদভিত্তিক কাজ কারবার।

৫. পঞ্চম সত্য হলো, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা এক দিকে যেমন সুদভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, অপরদিকে ব্যবস্থা দিয়েছে যেন মানুষ হারাম জ্ঞানে সুদকে ঘৃণা করে এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে এমনভাবে

গড়ে তোলে যে সবাই সুদ পরিহার করে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতাপূর্ণ মন মানসিকতার অধিকারী হয়ে যায় এবং মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করে বা মানবতাবিরোধী কাজ করে অর্থনৈতিক সুবিধা হাসিল করতে লালায়িত না হয়।

৬. ষষ্ঠ সত্য, ইসলাম এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনকে গড়তে চায় এবং এক বিশেষ পথে চালাতে চায় যার মধ্যে সুদভিত্তিক ঘৃণ্য লেনদেনের কোনো সুযোগ নেই, নেই এর কোনো প্রয়োজন; বরং ইসলাম চায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে, চায় তার প্রকৃতি হবে মানবকল্যাণ মুখী, তার মধ্যে সুদের মতো কলুষতা ও ঘৃণ্য জঞ্জাল থাকবে না, যা কাজ করবে মানুষের কল্যাণকর অন্যান্য নীতিমালার সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে। এই ধরনের সংগঠন ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, এমন কোনো কাজ বা সংস্থায় পুঁজি নিয়োগ করা হবে না যা মানবতা বিধ্বংসী কাজে নিয়োজিত হবে।

৭. সপ্তম এবং সব থেকে বড় সত্য হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি মুসলমান থাকতে চাইলে তার আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে একথাটা থাকতে হবে যে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হারাম বলে ঘোষণা করেছেন তার দ্বারা মানব জীবনের কোনো কল্যাণ সম্ভব নয়। একইভাবে তার অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, যে জিনিসটি ক্ষতিকর তা যে কোনো বিবেচনায় এবং সাময়িককালের জন্যে হলেও কিছুতেই উপকারী হতে পারে না। আসলে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই সকলের জীবনের মালিক এবং সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সদা সর্বদা মানুষের মধ্যে এবং তাদের সাথেই সুখে দুঃখে মিশে আছেন। তিনি তাদেরকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিচ্ছেন। সৃষ্টির সব কিছুকে তিনি তাদের উপযোগী করে পয়দা করেছেন। তাই তিনি চান, মানুষ তাঁরই ইচ্ছামাফিক কাজ করুক। সুতরাং, এই অবস্থায় একজন মুসলমান কি করে বিশ্বাস করতে পারে যে, একটি জিনিস তিনি হারাম করেছেন এবং তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে অথবা সেটা ছাড়া মানুষ চলতে পারবে না বা তার অগ্রগতি হবে না। অথবা একটি নোংরা জিনিস বলে যে জিনিসটিকে মানুষ বুঝেছে এবং যুগের পর যুগ ধরে যে জিনিসটিকে মানুষ শোষণের যন্ত্র হিসেবে দেখে এসেছে এবং আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে সব মানবতার দুশমন নিজেদের ব্যবস্থা চালু করতে চায়, সে সব বিদ্রোহীরা মনে করে যে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে সুদ অতীব জরুরী। তারা একথাও বলে যে সুদভিত্তিক ব্যবস্থাই হচ্ছে মানুষের জীবনের জন্যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশে এই ধ্যান ধারণার এমন জোরালো প্রচার করেছে যে মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছে। এসকল ধ্যান ধারণা গড়ে তোলার জন্যে সহায়তা করেছে আধুনিক সুদভিত্তিক ব্যবস্থা। বাস্তবে সবখানে চলতে থাকা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় ব্যাংকগুলোর কৌশলপূর্ণ নিরন্তর প্রচেষ্টা ও প্রচারের কারণেই এই জঘন্য ব্যবস্থাটি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ কারণে এরচেয়ে অনেক বাস্তবসম্মত ও উন্নত আর একটি অর্থ ব্যবস্থা যে থাকতে পারে এটা মনে করা সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব কারণে সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে নিয়েছে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ঈমান না থাকা। দ্বিতীয়ত, মানুষের চিন্তাশক্তির দুর্বলতা এবং প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ার অক্ষমতা, কারণ সুদী মহাজনেরা তাদের মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্যে

তাদের সকল শক্তি ও সামর্থকে কাজে লাগিয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর যাবতীয় প্রচারযন্ত্রের মালিকও আজ তারাই। এইসব প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সারাবিশ্বে তারা ওই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার পক্ষে প্রচার করে চলেছে।

৮. অষ্টম সত্য হলো, একথা বলা যে, আজকাল সুদবিহীন বিশ্ব অর্থব্যবস্থা চালু করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। মূলত এটা ভুল কথা, একটা ডাহা মিথ্যা। কারণ সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে এর পরিচালকরা যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা সবার জানা। কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছা ও পরিচ্ছন্ন নিয়তে মনীষীরা অথবা মুসলিম উম্মাহ যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে এবং আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যবস্থার নাগপাশ হতে মুক্ত হতে চায়, আর প্রত্যেকে যদি ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ কামনায় কাজ করে তাহলে এই বরকতপূর্ণ অর্থব্যবস্থা চালু করার জন্যে সমস্ত পরিবেশ আজো উপযোগীই রয়েছে এবং সেই সৌভাগ্য পূর্ণ খোলা রয়েছে যা আল্লাহ তায়ারা মানব সাধারণের কল্যাণের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এ ব্যবস্থা কার্যত, আজও সবার জন্যে উপযোগী। অতীতেও মানবতা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ব্যবস্থা কার্যকরী করায় শান্তি আসবে এবং এর ছায়াতলে সার্বিকভাবে সমাজের উপকার হবে। চাই শুধু শুভ বুদ্ধি খরচ করে সঠিক পদক্ষপ গ্রহণ করা।

সুদের বিভিন্ন ধরণ ও প্রকৃতি

কোন যোগ্যতাবলে এবং কোন পদ্ধতি অবলম্বনে সুদমুক্ত এই অর্থব্যবস্থা কায়েম করা যাবে তা আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কিছু ইংগীত দিতে পারি মাত্র।(১) একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় যে নিষ্ঠুরভাবে খাতকদের কাছ থেকে সুদ আদায় করা হয় ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ওইভাবে আদান প্রদানের কোনো প্রয়োজন নেই। ওই ব্যবস্থায় প্রাচীনকালে মানবতাবোধকে যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে ইসলাম সেই মানবতাবোধকে পুনরুজ্জীবিত করেছে; সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় এই মানবতাবোধ অটুট থাকতেই হবে যা মানুষকে মানব দরদীতে পরিণত করে।

এখন আমাদের দেখা দরকার কিভাবে জাহেলী যুগের সেই প্রাণহীন ও হিংস্র অর্থব্যবস্থার উপর ইসলামী ব্যবস্থার বিজয় সংঘটিত হলো, যার কার্যতার স্বাদ মানুষ এমনভাবে আর কখনও গ্রহণ করেনি। এরশাদ হচ্ছে,

'সুদ যারা খায় তাদের অবস্থা হচ্ছে, তারা দাঁড়িয়ে থাকে এমনভাবে যেন শয়তান তাদেরকে (আছর, স্পর্শ) করে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কারণেই তারা বলে, বেচা-কেনা, এওতো সুদী কারবারের মতোই! এটা কেমন কথা, আল্লাহ তায়ালা বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন! তাই তোমাদের যার কাছে আল্লাহ তায়ালার সুদ সক্রান্ত বানী এসে গেছে সে যেন সুদী কারবার থেকে বিরত হয়ে যায় তাহলে অতীতে যে সুদী কারবার সে করেছে তার ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার উপর। কিন্তু এ ঘোষণা আসার পরও যে ব্যক্তি পূর্বের নীতি ও অভ্যাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তারাই হবে দোযখবাসী, সেখানে

(১) এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানার জন্যে বিদগ্ধ আলেম ও এ বিষয়ের সুপন্ডিত মরহুম উস্তাদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর প্রস্তাবনা ও পরামর্শ (যার দিকে ইতিপূর্বে ইংগীত করা হয়েছে।) যা তিনি তাঁর বিখ্যাত বই দুটোতে পুস্তক 'সুদ' ও ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ।–মূল তাফসীর কারকের টিকা।

থাকবে তারা চিরদিন। আল্লাহ তায়ালা সুদকে খতম করার ব্যবস্থা করেন এবং সদকা খয়রাতের প্রতিপালন করেন। আর আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রত্যাখ্যানকারী অপরাধী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।'

এ আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলোতে রয়েছে (সুদের ওপর এবং সুদখোরের উপর) এক ভয়ানক আক্রমণ। আক্রমণের এ ছবিটিও অত্যন্ত ভয়াবহ। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা দাঁড়িয়ে থাকে এমনভাবে যেন শয়তান স্পর্শ দ্বারা তাদেরকে বশীভূত করে ফেলেছে।'

এর থেকে বড়ো ধমক আর কী হতে পারে যা একটি বাস্তব ও জীবন্ত ছবির রূপ ধারণ করেছে মূর্তিমান এ ভীতি জীবন্ত ও সচল। এ ছবি ভীত সন্ত্রস্ত। এমন পরিচিত এক ছবি এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের সাথে এর সম্পর্ক সুনিবিড়। সুতরাং আয়াতে যে কথা তুলে ধরা হয়েছে তা অনুভূতির পর্দায় এক জীবন্ত ভীতি হিসেবে ফুটে উঠেছে যাতে করে সুদী মহাজনদের সম্পর্কে চেতনাসমূহ জেগে ওঠে ও প্রচন্ডভাবেতো আন্দোলিত হয়। ওই হিংস্র অর্থনীতির শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে এবং ওই লোভ সংবরণ করার জন্যে যা সাধারণভাবে উপকারী হবে বলে জানায়।

আলোচ্য আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে অধিকাংশ মোফাসসের বলেছেন দাঁড়িয়ে থাকার ওই অবস্থাটা সৃষ্টি হবে কেয়ামতের দিন। কিন্তু আমরা তো দেখছি দুনিয়াতেও মানুষের জীবনে এই দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়। তারপর পরবর্তীতে যে আয়াতটি আসছে তার সাথেও এ আয়াতের অভিন্ন সম্পর্ক বুঝা যায়। সেই আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে ওই সুদী কারবারীদেরকে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত থাকার কথা বলে ধমক দেয়া হয়েছে, আর আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজও লড়াইয়ের ওই অবস্থা বাস্তবে বিরাজ করছে এবং গোমরাহী মানব সমাজকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে তারা সুদী সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর নিস্পেষণে পড়ে শক্তিহীন ও অবশ হয়ে পড়ে আছে। এই কঠিন অবস্থার শিকার কারা কিভাবে হয়েছিলো সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা তৎকালীন আরব উপদ্বীপে সুদী কারবারের যে অবস্থা চলছিলো এবং আরব জাহেলিয়াতের ধারকদের ওই বিষয়ে যে চিন্তা চেতনা ছিলো যার দিকে কোরআন ইশারা করেছে তা একবার পর্যালোচনা করি,

যে 'রেবা' বা সুদ জাহেলী যুগে পরিচিত ছিলো এবং যা উচ্ছেদ করার জন্যে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে তা ছিলো প্রধানত দুই প্রকারের।

এক. বাকি মূল্যে বিক্রি করা ও নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বর্তমান মূল্য থেকে অধিক মূল্য গ্রহণ করা।

দুই. ঋণ গ্রহীতা থেকে প্রদত্ত অর্থ বা কোনো পণ্যদ্রব্য ফেরত নেয়ার সময়ে বেশী নেয়া।

'নাসাআ' বা বাকী মূল্যে কোনো জিনিস নেয়ার ব্যাপারে কাতাদা থেকে একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জাহেলী যামানায় যে 'রেবা' সুদ প্রচলিত ছিলো তা হচ্ছে- যখন কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে কোনো পণ্য বাকি বিক্রি করতো তখন সেই নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে ওই পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিতো এবং এইভাবে মূল দ্রব্য বা মূল্য পরিশোধ করার জন্যে তাকে সময় দিতো।

মোজাহেদ বলেন, জাহেলী যামানায় মানুষে মানুষে ঋণের লেনদেন হতো। তখন ঋণদাতা বলতো, যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য বা পণ্য পরিশোধ না করো তাহলে এই এই পরিমাণে 'বাড়তি' মূল্য দিতে হবে। তাহলেই তোমাদের সময় দেয়া যাবে।

আবূ বকর আল জাসসাস বলেন, 'রেবা' সম্পর্কে জাহেলী যামানার নিয়ম অনুযায়ী– বাড়তি মূল্য পরিশোধের শর্তে মেয়াদী ঋণ দেওয়া হতো। যেহেতু ক্রেতা তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ না করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দেরীতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ পেতো এজন্যে ওই সময়ের মূল্য হিসেবে বাড়তি মূল্য দেয়া লাগতো। পরবর্তীতে এটাকে আল্লাহ তায়ালা বাতিল করে দিয়েছেন।

ইমাম রাযী তার রচিত তাফসীরে বলেছেন– 'রেবা-ই নাসাআ' সাধারণভাবে আরব সমাজে পরিচিত ছিলো। কারণ কোনো কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কাউকে তার সম্পদ দিতো; শর্ত লাগাতো এই বলে যে প্রতি মাসে সে ওই ব্যক্তি থেকে একটি অনির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ নিতে থাকবে কিন্তু প্রদত্ত 'মূল' অর্থ গ্রহীতার কাছে রয়েই যাবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সে 'মূল' টা ফেরত চাইতো। দিতে না পারলে বা কোনো ওযর পেশ করলে ঋণদাতা পাওনার অংক ও সেই সাথে পরিশোধের সময় সীমা বাড়িয়ে দিতো।

ওসামা ইবনে যায়দ (রা.)-এর হাদীসে এসেছে যে নবী (সা.) বলেছেন, কোনো 'রেবা' নেই 'নাসাআ'তে ব্যতীত।(১)

'রেবা-ল ফাদ্বল' হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি যখন এমন কোনো ক্রয়বিক্রয় করে যেখানে দ্রব্য ও মুল্য উভয়ই এক এক্ষেত্রে যদি সে নেয়ার সময় বাড়তি নেয়, যেমন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব এবং এইভাবেই একই শ্রেণীর জিনিসের বিনিময়ে ওই একই জিনিস হওয়াকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। এই বিনিময়ের ওপর 'রেবা' কথাটি আরোপিত হওয়ার কারণ হচ্ছে উভয় জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা। এর আরেকটি কারণ হচ্ছে, এক জিনিসের সাথে আর এক জিনিসের সাদৃশ্য থাকা, বিনিময়কালে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, আর বর্তমানে লেনদেনে প্রদত্ত অর্থ বা দ্রব্য ফেরত নেওয়ার সময় অতিরিক্ত নেয়া।

এ বিষয়ের একটি হাদীস দ্রষ্টব্য–

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বদলে যব এইভাবে একই ধরনের জিনিসের বিনিময়ে ওই ধরনের জিনিস হবে, লেন-দেনে পরিমাণে কোনোরকম বেশী করা যাবে না। এমনিভাবে খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ একই প্রকারের দ্রব্য সমান সমান ও হাতে হাতে লেন-দেন এইটিই ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতি। এর ওপর যদি কেউ বাড়িয়ে দেয় বা নেয় তাহলেই অধিক অংশ গ্রহণকারী ও দাতা উভয়েই সুদের মধ্যে পতিত বলে গণ্য হবে।(২)

---

(১) বোখারী
(২) বোখারী ও মুসলিম

আবু সাঈদ খুদরী থেকে আরো একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তিনি বলেন– একদিন বেলাল (রা.) নবী (স.)-এর কাছে একটি মাটির পাত্র ভর্তি করে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হলেন। তখন মোহাম্মদ (স.) বললেন– কোথেকে পেয়েছো এগুলো? তিনি বললেন- আমাদের কাছে কিছু খেজুর ছিলো, সেগুলো আমি এইভাবে বিক্রি করেছি যে দুই সা'-এর বিনিময়ে এক সা' নিয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– উহ্ এ হচ্ছে একেবারে খাঁটি ও নির্জলা 'রেবা' একেবারে নির্জলা 'রেবা' এইভাবে করো না। বরং, তুমি কিনতে চাইলে অন্য আর একজনের কাছে বিক্রি করো, তারপর যে পয়সা পাও তা দিয়ে খরীদ করো।(১)

প্রথম প্রকারের বেচাকেনার ও লেন-দেনে যা দেয়া নেয়া হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে সুদে পরিণত হচ্ছে, একথা বুঝতে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মৌলিক দ্রব্যটি যদি লেন-দেনের সময় একই জিনিস বেশী দেয়া বা বেশী নেয়া হয় তাই-ই সুদ হবে। অর্থাৎ মূল পণ্যের ওপর অধিক গ্রহণটাই অন্যায়। আর 'আযাল' বলতে সেই সময়টিকেই বুঝায় যার কারণে এই বেশীটা নেয়া হয়। আর যখন এই মুনাফা লেনদেনের অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে তখনই তা সুদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এই সময় বৃদ্ধির কারণেই একটি মালের পরিবর্তে তার সমশ্রেণীর মাল কিছু বেশী পরিমান নেয়া, এ ছাড়া এখানে আর কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের কাজটিতে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি জিনিস নেয়ার প্রশ্ন আসছে। আর হযরত বেলাল (রা.)-এর ঘটনায় তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে– যখন তিনি খারাপ দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভালো খেজুর নিয়েছেন। কিন্তু দুটি শ্রেণীর খেজুরের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে মিল থাকায় এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে সেখানে সুদী লেনদেনের মনোবৃত্তি কাজ করেনি। কেননা এই একই খেজুর থেকেতো অন্য খেজুরের জন্ম, এজন্যই রসূলুল্লাহ (স.) এটাকে 'রেবা' বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে পন্য বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে তার চাহিদা মতো অন্য যে কোনো পণ্য সে কিনতে, যাতে করে সুদ বলতে যা কিছু বুঝায় তার থেকে মানুষ দূরে সরে থাকতে পারে।

এমনি করে লেন-দেনের ব্যাপারটা হাতে হাতে হতে হবে এটাও শর্ত। যাতে করে সমান সমান জিনিসের লেন দেনে কোনো বিলম্ব না হয়। লেন-দেন খুব বেশী দেরী হলেও হাতে হাতে লেন-দেন না হলে সেখানে 'রেবা' সুদ এর খেয়াল পয়দা হতে পারে এবং এই খেয়াল পয়দা হওয়াটাও সুদের বহু প্রকারের একটি প্রকার।

এ পর্যায়ে রসূল (স.)-এর অনুভূতি এতোদূর পর্যন্ত গভীর ছিলো যে, কোনো কার্যক্রমের মধ্যে সুদ এর (যাকে অন্যরা কিছু সুবিধা বা ফায়দা মনে করে) কোনো প্রকার ধরেনা সুযোগ যেন না থাকে। এইভাবে জাহেলী যুগে সুদের পক্ষে পেশ করা সকল যুক্তিকে শক্তভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে খন্ডন করা হয়েছে। অবশ্য আজকের যুগে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদীদের ধ্যান-ধারণার সামনে কিছুসংখ্যক পরাজিত মনোভাবের মানুষরা দুটো জায়গায় দুবর্লতা দেখায়, আর তা হচ্ছে নারী আর সুদ। তারা ওসামার হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে, তারা প্রাচীন জাহেলী যুগের কার্যক্রমকে তুলে ধরে ওই পদ্ধতিটিকে ইসলামী নিয়মের নামে হালাল করে নিতে চায়। হাদীসে উল্লেখিত পদ্ধতির কোনটার সাথে জাহেলী যুগের সুদের কোনো মিল নেই।

---

(১) বোখারী ও মুসলিম

কিন্তু এই প্রচেষ্টা আত্মিক ও বুদ্ধিগতভাবে প্রকাশ্য পরাজয়ের সম্মুখিন হয়েছে। ইসলাম মানে শুধু কিছু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষের মৌলিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে গভীরভাবে শেকড় বিস্তার করে। এ ব্যবস্থা রেবা (সুদ) কে যখন হারাম করেছে তখন এর সকল অবস্থাকেই হারাম করেছে। এমন নয় যে ইসলাম কোনো অবস্থাকে হারাম করেছে এবং এর কোনো অবস্থাকে হালাল করেছে। সুদী ব্যবস্থায় কোনো স্থায়ী ধ্যান-ধারণা নেই, যখনই কোনো নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন এটা মানবকল্যাণের সাথে সংঘর্ষশীল হয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থা তার নিজের পক্ষে সাফাইই গাইতে গিয়ে অনেক যুক্তি পেশ করলেও তা তার নিজের যুক্তির ধোপেই টেকে না। এ ব্যবস্থা মানবতাবোধকে এতো তীব্রভাবে আঘাত করে যে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এ ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষে রায় দেয়। এ ব্যবস্থায় মানুষ কোনো মেয়াদী লোন দিয়ে তা ফেরৎ নেয়ার সময় বেশী নেয়াকে নিষ্ঠুরতা ও সংকীর্ণতা মনে করতে পারে না। এ কারণে স্বাভাবিক মানবতাবোধ থেকে এ ব্যবস্থাকে অনেক অনেক দূরের জিনিস বলে মনে হয়।

এই কারণেই যে কোনো সুদী কার্যক্রম ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম, তা সে জাহেলী যামানায় অবলম্বিত পদ্ধতিতেই হোক বা বর্তমান যামানায় আবিষ্কৃত পরিমার্জিত ও পরিশোধিত অন্য যে কোনো নতুন পদ্ধতিতেই হোক। এইভাবেই ওই সকল পদ্ধতি হারাম বলেই গণ্য হবে যার মূলে সুদের ওই মৌলিক নিষ্ঠুরতা বিজড়িত থাকবে এবং লেন-দেনে ওই সকল প্রাচীন পদ্ধতি বা তার অনুরূপ আধুনিক সকল পদ্ধতিই বাতেল বলে গণ্য হবে। সুদের লেন-দেনের মধ্যে যতো প্রকার পদ্ধতি আছে তার মূলে যে যুক্তি কাজ করে তা হচ্ছে দাতা শ্রেণীর ব্যক্তিগত ফায়দা বা মুনাফা অর্জন এবং যে কোনো মূল্যে তার সম্পদ বৃদ্ধি করে যাওয়া। আর এই উদ্দেশ্যে তারা লটারী বা জুয়া খেলাকেও বৈধ ও ভালো মনে করে। এই নিকৃষ্ট অনুভূতি যতো দিন তাদের মধ্যে বিরাজ করবে ততোদিন তারা যে কোনো অজুহাতে এবং যে কোনো উপায়ে পুঁজিপতিরা এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাবে।

সুতরাং, যতো গোঁজামিলই তারা দিন না কোনো এবং যতোভাবেই তারা আমাদেরকে নানা কূট যুক্তির জালে আবদ্ধ রেখে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুন না কেনো. ব্যাপারটির গভীরে প্রবেশ করে আমাদেরকে মূল সত্যটি ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে ওই সুদী কারবারের গোষ্ঠীর প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার তাৎপর্য ও রহস্য অনুধাবন করতে হবে। এ আল্লাহর এরশাদ,

'যারা সুদ খায় তারা শয়তানের আছর করা কতিপয় রুগীর মতোই চেতনাহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যার বুদ্ধিকে শয়তান বিলুপ্ত করে দিয়েছে তার বিষাক্ত স্পর্শ দ্বারা।'

কোরআনে উল্লেখিত তিরষ্কারটা যদিও প্রথমত সুদখোরদের লক্ষ্য করেই এসেছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শুধু ওই সুদখোররাই এই ব্যবস্থা থেকে ফায়দা হাসিল করে চলেছে, বরং সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যারা এই ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে চলেছে তারাও ওই ব্যবস্থা থেকে কোনো না কেনোভাবে ফায়দা লুটছে। এ বিষয়ে উল্লেখিত হাদীসটি দেখুন,

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

সুদদাতা, গ্রহীতা, উভয় পক্ষের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তিনামা লেখক সবার ওপর রসূলুল্লাহ (স.) লা'নত বর্ষণ করেছেন । তারা সবাই সমান (যেহেতু ওই সুদের লেনদেন থেকে তারা সবাই অল্পবিস্তর লাভবান হচ্ছে এবং সবার পারস্পরিক সহযোগিতায় সুদী ব্যবস্থা চালু থাকছে।

এটা তো হচ্ছে সুদী কারবারের সাথে জড়িতদের ব্যক্তিগতভাবে পরিণতি! তাহলে এই সমাজের কী অবস্থা যার পুরো অর্থব্যবস্থাই সূদের ওপর প্রতিষ্ঠিত! তিক্ত হলেও সত্য যে, তারা প্রত্যেকেই অভিশপ্ত এবং তাদের প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। তারা নিসন্দেহে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

তাদের চালচলন আচার আচরণ দেখে মনে হয় যেন তারা শয়তানের স্পর্শে অবশ রোগী যার না আছে স্থিরতা, না আছে নিশ্চিন্ততা, আর না আছে কোনো স্বস্তি। অতীতে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বিগত চার শতাব্দী ধরে আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতায় যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তা দেখে কারোই সন্দেহ থাকে না।

সুদ সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় অস্থিতিশীলতার কারণ

যে জগতে আমরা বাস করছি তার সবখানেই এক পারস্পরিক আস্থাহীনতা, অস্থিতিশীলতা এবং ভয়ভীতি বিরাজ করছে, বিরাজ করছে হিংসা বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ মানসিকতা। একথা আজ এ বস্তুবাদী সভ্যতার যুগের কোনো বুদ্ধিজীবীই অস্বীকার করে না, অস্বীকার করে না কোনো জ্ঞানী গুণী বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তিও। কেননা পরিদর্শক, পর্যটক সকলেই এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার কুফল প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যক্ষ করেছে তারা সভ্যতাগর্বী শিল্পোন্নত সমাজের এই বস্তুবাদী সুদী ব্যবসার প্রতিক্রিয়া। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা খুব সামান্যই চোখে পড়ে। কেননা এইসব অঞ্চলের বস্তুবাদী সভ্যতার বিকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতি চোখকে মাঝে মাঝে ঝলসে দিতে চায়। এতো উন্নতি সত্তেও সেথায় শান্তির কাংগাল মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। প্রতিটি মুহূর্ত সেখানে এক ভয়াবহ অশান্তি অরাজকতা ও মারাত্মক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি সেখানে লেগেই আছে। সূদের সন্ত্রাস মানুষের জীবনকে বিষিয়ে ফেলেছে। স্নায়ুযুদ্ধ ও সর্বব্যাপী অস্থিরতা গোটা সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায়ই তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

সুদী ব্যবস্থার এই দুর্বিষহ কষ্ট থেকে সমাজকে এই সভ্যতা, কিছুতেই রক্ষা করতে পারেনি এর চাকচিক্যময় প্রাচুর্যও তাদেরকে কোনো শান্তি বা নিরাপত্তা দিতে পারেনি। বিলাসবহুল জীবন সামগ্রীর সহজলভ্যতাও তাদেরকে সুখী জীবনের নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এতো অঢেল সম্পদ ও উন্নতির ছড়াছড়ি তাদের কোছে কোন্ সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিলো তাও ভেবে দেখতে হবে।

যে দেখতে চায় বুঝতে চায়, দেখেও না দেখার ভান করে না এবং শিক্ষাগ্রহণের মন মানসিকতা আছে, তাদের জন্যে এইটুকু দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এ এমন এক সত্য যা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই প্রকট হয়ে ফুটে রয়েছে। এ সত্য আজ মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। উন্নতির শিখরে উপনীত খোদ আমেরিকা ইউরোপের ঘরে ঘরে এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তথাকথিত উন্নত বিশ্বে সাধারণ মানুষ সুখ শান্তি থেকে চরমভাবে বঞ্চিত লাঞ্ছিত, অবহেলিত। যদিও তারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী, কিন্তু তবুও দুঃখ কষ্ট, বঞ্চনা ও অস্থিরতা তাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, অর্থের প্রাচুর্যে ডুবে থাকলেও সেইসব অঞ্চলে শান্তির অভাবে প্রতিটি মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এ সমাজ মানুষকে ধ্বংসের অতল তলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে মারামারি কাটাকাটি অথবা, সর্বগ্রাসী

পুঁজির প্রতিযোগিতায় মাতিয়ে তুলছে অথবা বিকৃত যৌন আচরণে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে নানা ধ্বংসাত্মক রোগের বাগানে পরিণত করছে। তারা এসব মারাত্মক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজছে, ওই সকল অপকর্ম থেকে পালাতে চেষ্টা করছে যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একফোটা মানষিক শান্তিও নেই। জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিধারা নেই। অশান্তি ও অরাজকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তারা পাগলপ্রায় হয়ে দিকবিদিক ছুটোছুটি করছে। প্রতিনিয়ত তাদরেকে ভয় ও আতংক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এই আতংক অস্থিতিশীলতা তাদেরকে কোনো সময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না।

এর প্রধান এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষের আত্মার একটা ক্ষুধা আছে যে তাকে অস্থির করে রাখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয় সে আত্মা ভীষণ কষ্ট পায়। বিভ্রান্ত হয় এবং তাকে বদ-মেযাজ বানিয়ে দেয়। তার মধ্যে বস্তুগত যে ক্ষুধা আছে তার সাথে যদি আত্মার ক্ষুধা এসে যোগ হয় তখন সে হয়ে যায় দিশেহারা। আর সে ক্ষুধা হচ্ছে ঈমানের ক্ষুধাটিই। ঈমানের দ্বারা যখন এ ক্ষুধা মেটানো হয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার মধ্যে একটা প্রশান্তি এসে যায়। আত্মার বড়ো ক্ষুধা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দ্বারা তার মধ্যে যে মহান মানবত্বাবোধ পয়দা করতে চান ঈমানের অভাবে ওই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সৃষ্টিলগ্ন থেকে প্রতিজ্ঞা ও শর্ত অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পৃথিবীর পরিচালনার ভার বহন করাও ঈমানের অভাবে সম্ভব হয় না।

এই বিরাট ও প্রধান কারণ থেকে জন্ম নেয় সুদের আপদ। অর্থনীতিতে সুদ হচ্ছে এমন এক আপদ, যার বৃদ্ধি আছে কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম প্রবৃদ্ধি নেই। সেই প্রবৃদ্ধির বরকত ও সমৃদ্ধি সমগ্র মানব জাতির কাছে পৌঁছে না। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুদখোর ধনিকই তার সুফল লাভ করে। তারা ভোক্তাদের শিল্প ও বাণিজ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত মুনাফার ভিত্তিতে ঋণ দেয়।

এভাবে শিল্প ও বাণিজ্যকে এমন এক নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য করে, যার প্রধান লক্ষ্য সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ সাধন এবং প্রয়োজন পূরণ– তথা সকলের সুখ সমৃদ্ধি দান করা নয়। সকলের জন্যে নিয়মিত কর্মসংস্থান ও সুনিশ্চিত জীবিকার ব্যবস্থা করাও এর লক্ষ্য নয়। সে অর্থনীতির লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ মুনাফা সম্বলিত উৎপাদন নিশ্চিত করা, চাই তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাক, বঞ্চনার শিকার হোক, তাদের জীবন দুঃখ দুর্দশা ও দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে যাক এবং সমগ্র মানব জাতির জীবন ভীতি, সংশয় ও উদ্বেগে ভরে উঠুক।

এই আয়াতে মহান আল্লাহর এ উক্তি অকাট্য সত্য ও যথার্থ যে, 'যারা সুদ খায় তারা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন শয়তান নিজের স্পর্শ দ্বারা তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।' বস্তুত, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ সত্যকে বিস্ময় এক জ্বলন্ত বাস্তবতার আকারে বিরাজমান দেখতে পাচ্ছি।

সুদখোররাই সর্বপ্রথম রসূল (স.) এর সামনে সুদ নিষিদ্ধ করার ওপর আপত্তি তুলেছিলো। তারা বলেছিলো যে, ব্যবসাকে হালাল করা হবে অথচ সুদকে নিষিদ্ধ করা হবে, এর কোনো যুক্তি নেই। কোরআন বলছে,

'এর কারণ এই যে, তারা বলেছিলো, ব্যবসা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।'

তাদের সন্দেহের বিষয়টি ছিলো এই যে, ব্যবসা থেকে যেমন লাভ বা মুনাফা আসে, তেমনি সুদ থেকেও তো লাভ বা মুনাফা আসে। মূলত এটা ছিলো একটা উদ্ভট যুক্তি। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ ও লোকসান দুটোই হতে পারে। ব্যক্তিগত দক্ষতা, চেষ্টা সাধনা, চলমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে লাভ ও লোকসান দুটোরই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ সুদভিত্তিক লেনদেনে সর্বাবস্থায় শুধু লাভই হবে। কখনো লোকসান হবে না। এটাই মূল পার্থক্য। আর এটাই একটির হালাল হওয়া ও অপরটির হারাম হওয়ার ভিত্তি ও কারণ। এ লেনদেন বা কারবারটি সর্বাবস্থায় কেবল লাভ বা মুনাফাই নিশ্চিত করে। তাই মুনাফা নিশ্চিত ও তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার কারণেই সুদী কারবার সম্পূর্ণভাবে হারাম। এক্ষেত্রে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ বা মতান্তরের অবকাশ নেই।

'আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।'

কারণ সুদভিত্তিক কারবারে ব্যবসার এই উপাদানটি নেই। তাছাড়া আরো বহু কারণ রয়েছে, যার জন্যে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড মূলতই মানব জীবনের জন্যে কল্যাণকর। আর সুদী কারবার মানব জীবনের জন্যে ক্ষতিকর।(১)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিলো, ইসলাম তাতে এমন বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নিয়েছে যে, সেখানে কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়নি, এর একটি নমুনা আয়াতের এই অংশটিতে লক্ষণীয়'

'যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ আসায় সে (সুদ থেকে) বিরত হয়েছে, এ যাবত যা কিছু উপার্জন করছে সে তার মালিক হতে পারবে। তার বিষয়টি আল্লাহ বিবেচনাধীন।'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর শরীয়তের বিধি ব্যবস্থা শুরু থেকেই বলবৎ করেছেন, চাই ইতিপূর্বে কেউ তা শুনুক বা না শুনুক তাতে কিছু আসে যায়না। যে ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে আল্লাহর উপদেশ ও নির্দেশনাবলী শোনা ও জানা মাত্রই সুদ খাওয়া বন্ধ করবে, তার কাছ থেকে ইতিমধ্যে সুদ বাবদ উপার্জিত অর্থ ফেরত নেয়া হবে না। তার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালাই বিবেচনা করবেন এবং তিনি যেরূপ ভালো মনে করেন তিনি সেরূপই সিদ্ধান্ত নিবেন। এ কথাটা দ্বারা হৃদয়ে এই বিষয়টি বদ্ধমূল করা হচ্ছে, এই গুনাহ অতীতে যতোখানি করা হয়েছে, তার বিচার বিবেচনা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন এবং তা তাঁর দয়ার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বান্দার জন্যে এটাই সমীচীন যে, সে আল্লাহর ফায়সালা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকবে এবং মনে মনে বলবে,

পাপ কাজ যা করেছি, ওই পর্যন্তই সমাপ্তি টানলাম। আর করবো না। আর যদি না করি এবং তাওবা করি, তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

এভাবেই চমৎকার এক পন্থায় কোরআন মানুষের মনকে ও মনের আবেগকে সংশোধন করে।

'আর যে ব্যক্তি পুনরায় (সূদী কারবারে) ফিরে আসবে সে হবে চিরদিনের জন্যে দোযখবাসী।'

---

(১) এ বিষয়ে উস্তাদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রচনাবলী) দ্রষ্টব্য। ইতিপূর্বেও আমরা নানা জায়গায় এ দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। মূল গ্রন্থকারের টীকা।

আখেরাতের আযাবের বাস্তবতা সম্পর্কে এখানে কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোরআন তার অন্তরে জাহান্নামের শাস্তির বিষয়টিকে গভীরভাবে বদ্ধমূল করে। বিভিন্ন দৃশ্যের জীবন্ত চিত্রায়নের মাধ্যমে কোরআনের এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কথা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু আখেরাতের সেই আযাব ঠিক কখন আসবে, কোন মুহূর্তে মৃত্যু হবে ও কখন আখেরাতে স্থানান্তর ঘটবে, তা কারো জানা নেই। এ কারণে অনেকেই এরূপ আশা পোষণ করে যে, আযাবের ও মৃত্যুর এখনো অনেক দেরী, আয়ু হয়তো আরো অনেক বাকী। তারা আখেরাতের হিসাব নিকাশের চিন্তা থেকে দূরে সরে যায়। তারা ধীরে ধীরে শিথিল ও উদাসীন হয়ে যায়। তাই কোরআন তাদেরকে পরবর্তী আয়াতে হুমকি দিচ্ছে যে, শুধু আখেরাতে নয় বরং সুদের কারণে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় তাদের জন্যে অকল্যাণ ও অমংগল অপেক্ষা করছে। পক্ষান্তরে সদকাই হলো বর্ধনশীল ও পরিচ্ছন্ন কল্যাণের উৎস। অতপর যারা এ হুশিয়ারীতেও কর্ণপাত করে না, তাদেরকে আয়াতের শেষাংশে কাফের ও পাপী আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা যে প্রত্যেক কাফের ও পাপীকে অপছন্দ করেন তা জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা সুদকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন এবং সদকাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন। আল্লাহ তায়ালা কোনো কাফের ও পাপীকে পছন্দ করেন না।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো ভালো প্রতিশ্রুতি দেন কিংবা কোনো হুমকি বা শাসানি প্রদান করেন তখন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি হন অকাট্য সত্যভাষী। এখানে আল্লাহ তায়ালা যে হুমকি দিয়েছেন, তাও বাস্তব সত্য। চারদিক চোখ মেলে তাকালে আমরা কোথাও এমন একটি সুদভিত্তিক সমাজ দেখতে পাই না, যা সুখ শান্তি, বরকত, কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ তায়ালা সুদকে ঘাটতি, অকল্যাণ ও দুঃখের আঁধার বানিয়েছেন সুতরাং যে সমাজে এই নোংরা জিনিসটি চালু থাকবে, তাতে দুঃখ, দুর্ভোগ ও দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। বাহ্যত চর্মচক্ষু দিয়ে হয়তো কিছু সম্পদের প্রাচুর্য, উৎপাদন ও সমৃদ্ধি সমানে দেখা যেতে পারে। কিন্তু শুধু সম্পদের বিশালতা ও প্রাচুর্যেই শান্তি কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আসে না, এর জন্যে প্রয়োজন সম্পদের নিরাপদ ভোগ ও সচ্ছল ব্যবহার। অথচ আধুনিক প্রাচুর্যময় দেশগুলোতে সম্পদের নিরাপদ ও সচ্ছন্দ ভোগের সুযোগ খুবই কম।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা ধনী দেশগুলোতে মানুষের হৃদয় গভীর অশান্তি, অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হতাশায় ভারাক্রান্ত। সেই মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কমে না- বরং বাড়ে। এই সকল উন্নত প্রাচুর্যময় দেশ থেকে উক্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা ও অস্থিরতা সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করছে। সারাবিশ্বের মানুষ আজ এক অবিনাশী যুদ্ধের অজানা আশংকায় সর্বক্ষণ শিহরিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। তার পাশাপাশি স্নায়ু যুদ্ধের দাপাদাপির মধ্যে দিয়ে তাদের ঘুম ও জাগরণের লোমহর্ষক মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে। সচেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক, মানুষের স্নায়ুতে জীবন ক্রমেই দুঃসহ ও ভারী হয়ে উঠছে। ফলে সম্পদ, আয়ুষ্কাল, স্বাস্থ্য কিংবা মানসিক শান্তি কোনোটাই তাদের জীবনে প্রকৃত কল্যাণ ও মংগল বয়ে আনছে না।

পক্ষান্তরে যে সমাজে যাকাত ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক দান সদকার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সামষ্টিক নিরাপত্তার ভাবধারা বিরাজ করছে, পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ, প্রীতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা, উদারতা ও মহানুভবতা বিরাজ করছে, যে সমাজে

আল্লাহর অনুগ্রহ ও পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা বিদ্যমান, যে সমাজ সব সময় তার দুর্বল ভাইকে সাহায্য করতে উদগ্রীব থাকে সেই সমাজে আল্লাহর অঢেল রহমত ও বরকত সুনিশ্চিত হয়, সেই সমাজের মানুষের জন্যে তাদের ধন সম্পদ, জীবিকা, স্বাস্থ্য, শক্তি, মনের অনাবিল শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ পরম সৌভাগ্য ও তৃপ্তি বয়ে আনে।

মানব জীবনের এই বাস্তবতাকে যারা দেখতে পায় না তারা আসলে কিছুই দেখতে চায় না। কেননা ওসব না দেখাতেই তাদের লাভ। যে সব সুবিধাবাদী লোক পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান কায়েম হওয়া দেখতে চায় না। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের চোখের ওপর বিভ্রান্তির ঠুলি পরেছে তারাও এই বাস্তব অবস্থাটা দেখতে চায়না।

'আল্লাহ তায়ালা কোনো আল্লাহদ্রোহী পাপিষ্টকেই ভালোবাসেন না।'

সুদকে নিষিদ্ধ করার পরও যেসব পাপিষ্ট আল্লাহদ্রোহী সুদ ত্যাগ করে না, তাদের সম্পর্কে এ মন্তব্য অত্যান্ত কঠোর ও চূড়ান্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন না। আর যারা আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে বৈধ বিবেচনা করে, তাদের ওপর কাফের ও পাপিষ্ট বিশেষণ দুটি যে সংগতভাবেই প্রযোজ্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই– চাই তারা মুখে হাজার বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ উচ্চারণ করুক।' কেননা ইসলাম শুধু মুখে উচ্চারণযোগ্য কতিপয় বাক্য নয়, বরং এটা সার্বিক জীবন ব্যবস্থা ও একটি কর্মপ্রণালী। এর একটি অংশকে অস্বীকার করা সমগ্র ইসলামকেই অস্বীকার করার শামিল। সুদ যে হারাম তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সুদকে হালাল সাব্যস্ত করা ও সুদের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাকে ঘোরতর পাপ ও কুফুরী ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এই কুফুরী থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

ইসলামী অর্থনীতির সুফল পেতে হলে–

কুফুরী ও পাপ সংক্রান্ত আলোচনা এবং সুদভিত্তিক কায়কারবার ও জীবন পদ্ধতির অনুসারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করার পর পরের আয়াতে শুরু হয়েছে ঈমান ও সৎ কাজ, মোমেনদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং সুদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত যাকাত ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা। বলা হয়েছে,

'যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার। সেদিন তাদের কোনো ভয় থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবে না।'

এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে যাকাত। এটি মোমেনদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান উপাদান। এটি হচ্ছে এক শর্তহীন ও বিনিময়হীন দান। আয়াতে এটিকে মোমেনদের একটি গুণ এবং মোমেন সমাজের বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর মোমেন সমাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিজের সন্তোষ বরাদ্দ করেছেন তার দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুত যাকাত হচ্ছে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার স্তম্ভ, যে সমাজে প্রতিটি সদস্যের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে এবং কোনো অবস্থায়ই সুদভিত্তিক সমাজের কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী নয়।

যাকাতের ভাবমূর্তি মুসলিম উম্মাহর যে সকল প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেনি তাদের চেতনায় বিষয়টি নিষ্প্রভ ও অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে। যে প্রজন্ম ইসলামী জীবন বিধানকে যথেষ্ট ঈমানী চিন্তাধারা, ঈমানী শিক্ষাদীক্ষা এবং মোমেন সুলভ চরিত্রসহকারে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত দেখেনি, তাদের কাছে যাকাত একটা অজানা অচেনা জিনিস বলে প্রতিভাত হয়। ইসলামী বিধানকে যদি তার যাবতীয় স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য সহকারে তারা প্রতিষ্ঠিত দেখতো, তাহলে তাদের কাছে যাকাত উন্নত

চরিত্রবান ও মহৎ গুণাবলী সম্বলিত একটা সমাজের স্তম্ভরূপে বিবেচিত হতো। তারা একে সুদভিত্তিক জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত একটা সমাজের ভিত্তি হিসেবে– যে সমাজে জীবন বিকাশ লাভ করে ও অর্থনীতির উন্নতি হয়– ঠিক সে ভাবেই দেখতে পেতো। দেখতো পেতো বক্তিগত চেষ্টা ও সুদ মুক্ত পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ভিত্তিতে কি করে তা সম্ভবপর হয়।

যাকাতের ভাবমূর্তি আমাদের এই হতভাগা প্রজন্মের দৃষ্টিতে এতো ম্লান হওয়ার কারণ এই যে, তারা মানবতার সেই উন্নত নিখুঁত রূপটি কখনো দেখেনি, যা ইসলামের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তারা জন্মগ্রহণ করেছে ও লালিত পালিত হয়েছে এমন এক সমাজে, যা সুদভিত্তিক জড়বাদী ও ভোগবাদী ব্যবস্থার অধীনে বিকাশ লাভ করেছে। তারা দেখেছে একে অপরের ধ্বংস শোষণ এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষাই শুধু দেখেছে। তারা দেখেছে কিভাবে এক ব্যক্তির প্রতাপ ও পরাক্রমে লক্ষ জনতার বিবেক শাসিত ও নিষ্পেষিত হয়। তারা যে সমাজ দেখেছে, তাতে ঘৃণ্য সুদভিত্তিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় অভাবী লোকদের কাছে অর্থ সম্পদ পৌঁছে না। সে সমাজে লোকেরা যতোক্ষণ নিজের ব্যক্তিগত পুঁজি গড়ে তোলে না, কিংবা সুদভিত্তিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলোতে নিজের সম্পদের একাংশ দিয়ে এতে শরীক হয় না, ততোক্ষণ কেউ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে না। শিল্প বাণিজ্যও সে সমাজে সুদ ছাড়া পুঁজি লাভ করে না। এসব দেখে শুনে বর্তমান প্রজন্মের ধারণা জন্মে গেছে যে, চলমান এই ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই যার ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে দাঁড়াতে হবে।

যাকাতের ভাবমূর্তি বর্তমান প্রজন্মের কাছে এতো বিকৃত হয়ে গেছে যে, তারা একে ব্যক্তিগত দয়া দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। তারা মনে করে যে, যাকাতের ভিত্তিতে কোনো আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। অথচ তারা ভেবে দেখে না যে, আসলে যাকাতের পরিমাণ কতো। আসল পুঁজি ও তার লাভের মধ্য থেকে শতকরা মাত্র আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।(১) ইসলাম যাদেরকে আইন ও বিধান অনুসারে বিশেষভাবে গড়ে তোলে, সেই মুসলিম নাগরিকরা পাই পাই হিসাব করে যাকাত দেয়। ইসলামী রাষ্ট্র একে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ হিসাবে নয় বরং একটা বিধিবদ্ধ অধিকার হিসাবে গ্রহন করে। অতপর এ দ্বারা মুসলিম সমাজের সেইসব সদস্যের প্রয়োজন পূরণ করা হয়, যার নিজের সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিলোনা। ফলে সমাজের প্রতিটি সদস্য অনুভব করে যে, তার ও তার সন্তানদের জীবন সর্বাবস্থায় নিরাপদ আছে এখানে সমাজের প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণও পরিশোধ করে দেয়া হবে, তা বাণিজ্যিক ঋণ হোক কিংবা বা অবাণিজ্যিক ঋণ হোক।

এখানে অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ কী হবে, সেটা বড় কথা নয়। আসলে যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ইসলামের মূল প্রাণশক্তি ও মূলনীতি। যে সমাজকে ইসলাম নিজের শিক্ষা ও বিধান দ্বারা গড়ে তোলে, তা এই জীবন পদ্ধতির বাহ্যিক রূপ ও বাস্তব কর্মকান্ডের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তার আইন ও নৈতিক শিক্ষার একান্ত পরিপূরক। ইসলামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা থেকেই সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভারসাম্যপূর্ণভাবে ও পরিপূরকভাবে অর্জিত হয়। কিন্তু এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা অন্যান্য বস্তুবাদী ব্যবস্থার অধীন জীবন যাপনকারী ও জন্মগ্রহণকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে আমরা মুসলমানরা এ সত্যকে খুব ভালো করে জানি এবং আমাদের ঈমানী রুচিবোধ দ্বারা তা আস্বাদনও করি।

---

(১) কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ, ১০ ভাগ এবং ২০ ভাগে উন্নীত হয়।

তারা যদি তাদের নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণে এবং যে মানবজাতির নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হস্তগত হয়েছে সেই মানব জাতির দুর্ভাগ্যের কারণে এই ঈমানী রুচিবোধ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহ তায়ালা নামায কায়েমকারী ও যাকাতদানকারী সৎকর্মশীল মোমেনদের যে কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন, তা থেকে তারা বঞ্চিত থাকুক, সেই সাথে বঞ্চিত হোক মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি থেকে, সন্তুষ্টি পরকালের পুরস্কার ও থেকেও। এ বঞ্চনা মূলত তাদের নিজেদেরই কর্মফল। তারা তাদের মূর্খতা, অজ্ঞতা, গোমরাহী ও গোয়ার্তুমির ফলেই এ বঞ্চনা কুড়িয়েছে।

যারা ঈমান, সততা, এবাদাত ও সৎকাজে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলে, তাদের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের প্রতিদানকে তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন, তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেবেন, ফলে তাদের ভয় ভীতি থাকবে না এবং তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি দেবেন, ফলে তাদের কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না। এ কথাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না।'

মোমেনদের এ সুখবরের পাশাপাশি সুদখোর ও সুদভিত্তিক সমাজকে তিনি ক্ষয়ক্ষতি, ঘাটতি, ধ্বংস, মানসিক অসুস্থতা ও গোমরাহী এবং ভীতি সন্ত্রাস ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার হুমকি দিয়েছেন।

এখানে ইসলামী সমাজের জন্যে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা যে সমাজে বাস্তবায়িত হয়েছে সেটা মানবজাতি অতীতে বহু বার প্রত্যক্ষ করেছে, আর সুদভিত্তিক সমাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে হুমকি দিয়েছেন, তাও আজকের যুগে মানবজাতি প্রত্যক্ষ করছে। মানুষের উদাসীন মনগুলো যদি আমাদের হাতে থাকতো এবং তাকে প্রবল জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো, তাদের বন্ধ চোখ খুলে দেয়া যদি আমাদের সাধ্যে কুলাতো, তাহলে আমরা তা করে তাদের দেখাতাম, কিন্তু আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। আমরা শুধু এই সত্যের প্রতি ইংগিতটুকুই করতে পারি। আশা করা যায় যে, এতে আল্লাহ তায়ালা হতভাগা মানবজাতিকে সুপথ দেখাবেন। মানুষের মন আল্লাহর হাতের মুঠোয়। আল্লাহর হেদায়াতই তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে।

সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

মোমেনরা তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন থেকে পাপ ও সুদকে দূরে নিক্ষেপ করে নিজেদের জীবনকে ঈমান, সৎ কাজ, এবাদাত ও যাকাতের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছে, সেই মোমেনদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ঝামেলামুক্ত সুখ সমৃদ্ধির ওয়াদা করার পর আবার তাদের হুশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, তারা যদি তাদের জীবনকে সুদের যাবতীয় নোংরামি থেকে পবিত্র না করে, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গড়িমসি, বিলম্ব বা অবহেলার কোনো অবকাশ নেই।

পরবর্তী আয়াত দুটিতে এই বক্তব্যই ধ্বনিত হয়েছে,

'হে মোমেনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যেটুকু আদায় করা বাকী আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো। যদি তা না করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো। আর যদি তাওবা করো তবে তোমাদের জন্যে তোমাদের মূলধন বহাল থাকবে। কারো ওপর যুলুম করো না, নিজেরাও যুলুমের শিকার হয়ো না।'

এ দুটি আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য ভাষায় মোমেনদের ঈমানকে বকেয়া সুদ ছাড়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় করা ও বাদবাকী সুদ মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত তারা

মোমেনই নয়। যতোই মোমেন বলে দাবী আওড়াক তারা মোমেন নয়। কোরআন এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখেনি যে, আল্লাহর হুকুমের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআন কাউকে এ সুযোগ দেয় না যে, সে আল্লাহর আইনকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মেনে নেবে না, নিজ জীবনে তাকে কার্যকরী করবে না, নিজের যাবতীয় লেনদেনে তাঁর ফয়সালার কাছে নতি স্বীকার করবে না, অথচ কলেমায়ে তাইয়েবার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকবে এবং নিজেকে মোমেন পরিচয় দিয়ে সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াবে। যারা ইসলামের আকীদা বিশ্বাসে ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই পরস্পর বিরোধী আচরণ করবে, তারা মোমেন নয় তারা মুখে যতোই ঈমানের দাবী করুক অথবা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক এবাদাত দ্বারা নিজেদের মোমেন বলে যতোই যাহির করুক।

এ আয়াত দুটিতে আল্লাহ তায়ালা অতীতের গৃহীত সুদকে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন,অতীতে গৃহীত সুদ ফেরত দিতে কিংবা সুদের অর্থ ঢুকে গেছে এই অজুহাতে সুদখোরের সকল অথবা আংশিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করারও অনুমতি দেননি। কেননা আল্লাহর অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি ছাড়া কোনো কিছু নিষিদ্ধ হয় না, আর আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ ছাড়া কোনো আদেশ আদেশ বলেও প্রমাণিত হয় না। আর আল্লাহর আইন জারী হওয়ার পরই তা কার্যকর হতে পারে– তার আগে নয়। তার আগে যা কিছু সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার একান্তভাবে আল্লাহর। আইন দ্বারা তার ফয়সালা হতে পারে না।

ইসলামের আইনকে যদি আগে থেকেই কার্যকরী ধরা হতো, তাহলে মানব জাতি এক ভয়ংকর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝাঁকুনি খেয়ে তছনছ হয়ে যেতো। মানব জাতিকে ইসলাম আলোচ্য আয়াত দ্বারা সেই ঝাঁকুনি থেকে রেহাই দিয়েছে। অথচ কিছু কিছু আধুনিক আইন কোথাও কোথাও নিজেকে জারী করার আগে থেকেই কার্যকর বলে ঘোষণা দিচ্ছে। ইসলাম সেটা করেনি। কারণ ইসলামী আইন মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্যে রচিত। এটি প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে, তার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে। আবার একই সাথে তারা আল্লাহর আইনকে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তদনুযায়ী কাজ না করলে তাদেরকে মোমেন বলে বিবেচনা করা হবে না, সে কথাও জানিয়ে দিয়েছে। এই সাথে সে মোমেনদের হৃদয়ে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলে। ইসলাম এই তাকওয়ার চেতনা জাগিয়ে তুলে নিজের আইন বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করে।

বস্তুত এটি হচ্ছে মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরে নিহিত একটি গ্যারান্টি। ইসলামের এই গ্যারান্টির মতো নিখুঁত ও অব্যর্থ গ্যারান্টি কোনো মানব রচিত বিধিতে নেই। অন্যান্য বিধানে বড়জোর বাহ্যিক পাহারাদারী আছে। এই বাহ্যিক পাহারাদারীকে ফাঁকি দেয়া খুবই সহজ যদি না আল্লাহভীতির প্রহরা তার বিবেকে বদ্ধমূল হয়। এখানে প্রথমে হৃদয় কাঁপানো ভয় দেখানো হয়েছে।

'যদি তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো।'

কী সাংঘাতিক কথা! আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ! আর মানুষ এই যুদ্ধের সম্মুখীন! এ যুদ্ধ যে কী বিভীষিকাময় এবং তার পরিণাম যে কী, তা কারো অজানা নেই। আল্লাহর সেই সর্বগ্রাসী ও সর্বধ্বংসী শক্তির সামনে মরণশীল দুর্বল মানুষের টিকে থাকার সামর্থই বা কোথায়?

বিলম্বে নাযিল হওয়া এই আয়াতগুলোর আলোকেই রসূল (স.) মুগীরার পরিবার যদি সুদী কারবার বন্ধ না করে তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে তাঁর মক্কার গবর্নরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি তাঁর প্রথম ভাষণে জাহেলী যুগের সকল সুদ রহিত করার

কথা ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর চাচা হযরত আব্বাসের প্রাপ্য সুদ রহিত করেন। তার থেকে ঋণগ্রহীতারা ইসলামের আবির্ভাবের পরও দীর্ঘকাল যাবত সুদ টেনে চলছিলো। এভাবে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। তার ভিত্তি মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরপর তার গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সুদমুক্ত হয়। এই ভাষণে রসূল (স.) বলেন,

'জাহেলিয়াতের সকল সুদ আমার এই পায়ের তলে দলিত। আমি সর্বপ্রথম আব্বাসের সুদ রহিত করলাম।'

তবে রসূল (স.) জাহেলী যুগে গৃহীত সুদ ফেরত দিতে বলেননি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে রাষ্ট্রের শাসককে সুদভিত্তিক কারবারে জড়িত ও তা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর– এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যারা সুদী কারবার চালিয়ে যাওয়ার ধৃষ্ঠতা দেখায়, তারা যতোই মুসলমান বলে দাবী করুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতেই হবে, ঠিক যেমন হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অথচ তারা 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) তাঁর রসূল' এই কালেমার সাক্ষ্য দিতো এবং নামাযও পড়তো। আসলে যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত ও আইন মানতে অস্বীকার করে এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়িত করে না, সে মুসলমান নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা শুধু তরবারী বা ট্যাংক কামান দ্বারা সম্মুখ সমর পরিচালনাই বুঝায় না বরং এটা তার চেয়েও ব্যাপক ও সর্বাত্মক সর্বধ্বংসী। সুদকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণকারী প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ ও সর্বব্যাপী যুদ্ধ ঘোষণার কথা রসূল (স.)-এর একটি হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। এ যুদ্ধ একাধারে স্নায়ুবিক ও মনস্তাত্তিক যুদ্ধ। এ ঘোষণা বরকত, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সকল শক্তির বিরুদ্ধে মরণ আঘাত হানে এবং তা চলবে মানুষের সুখ শান্তি ধ্বংসকারী শক্তির বিরুদ্ধে। অথবা এ যুদ্ধ হবে বাতিলশক্তিসমূহের পরস্পরের মধ্যে। আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবনের স্থীরতা, সুখ-শান্তি ধ্বংস করে দিতে তাঁর কিছু অবাধ্য বান্দাকে অপর অবাধ্য বান্দাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন।

এভাবে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, নির্যাতন নিপীড়ন, ভীতি সন্ত্রাস ও উৎকণ্ঠা দ্বারা কোনো সমাজ যখন জর্জরিত হয়, তখন সেই সমাজ প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে পরিচালিত যুদ্ধের কবলে পড়ে যায়। কোনো পর্যায়ে গিয়ে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি পৃথিবীতে না থাকলেও তখন কাফের মোশরেকদের মাঝেই জাতিতে জাতিতে সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তা সভ্যতাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণেই সমাজে এ শোচনীয় পরিণতি দেখা দেয়। বৃহৎ পূজিপতি সুদখোর লগ্নিকারকরাই মানব সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব যুদ্ধ সংঘটিত করে। তাদের পাতা ফাঁদে প্রথমে কলকারখানা ও বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলো আটকা পড়ে, তারপর আটকা পড়ে বিভিন্ন জাতি ও সরকার।

তারপর যখন এই ফাঁদে আটকে যাওয়া শিকারগুলোকে ধরার জন্যে সুদখোর পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তখনি শুরু হয় যুদ্ধ। আবার কখনো কখনো তাদের সরকার ও সেনাবাহিনীর বলে বলিয়ান হয়ে দুর্বল জাতি বা শ্রেণীসমূহের সম্পদ লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। আবার কখনো ঋণগ্রস্ত জাতিগুলোর ওপর ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দেয় কর ও শুল্কের বোঝা কঠোরতর করা হয়। ফলে শ্রমজীবী মানুষের

দারিদ্র আরো বেশী ও ব্যাপক হয়। এভাবে তাদের মনকে তারা তাদের ধ্বংসাত্মক মতবাদসমূহের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার ফলেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এ সবের কোনো কিছুই যদি না ঘটে, তবে নিদেন পক্ষে মানুষের অন্তরাত্মা কলুষিত হওয়া, চরিত্রের অধপতন, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রচারণা এবং মানব সত্ত্বার সমূলে ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য, আর এ সব ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দেশে দেশে পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের চেয়েও মারাত্মক।

এটা হচ্ছে একটা চিরন্তন যুদ্ধ যা আল্লাহ তায়ালা সুদী লেনদেনকারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে রেখেছেন। এ যুদ্ধ এখনো অব্যাহত গতিতে চলছে এবং পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে তা দেউলে ও সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। অথচ উদভ্রান্ত মানবজাতি সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন : তারা কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্য সামগ্রীর স্তূপ দেখে ভাবে আমরা তো উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছি। এই পণ্য সামগ্রী যথার্থই মানবজাতিকে সুখী করতে পারতো যদি তার উৎস হতো পবিত্র ও হালাল উপার্জন। কিন্তু সুদের নোংরা উৎস থেকে উৎসারিত বিধায় তা মানব জাতির শ্বাসরোধক সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে এবং তাকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিচ্ছে। এখানে ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছ মুষ্টিমেয় একটি আন্তর্জাতিক সুদখোর মহাজনের দল। সভ্যতার এই ধ্বংসাবেশেষের নিচে চাপা পড়া মানবতার দুঃখ কষ্ট তারা বুঝতে পারে না।

ইসলাম প্রথমত ইসলামী সমাজকে এবং তারপর সমগ্র মানব জাতিকে সুদমুক্ত একটি পবিত্র অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে এবং এখনো ক্রমাগতভাবে জানিয়ে যাচ্ছে। আহ্বান জানিয়েছে পাপ ও নোংরা জীবন পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে। সে বলেছে,

'আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন বহাল থাকবে। তোমরা যুলুম করবেও না, যুলুম নির্যাতনের শিকারও হবে না।'

এ তাওবা হচ্ছে এক মহাপাপ থেকে তাওবা, জাহেলী যুগের পাপ থেকে তাওবা। এই জাহেলিয়াত কোনো বিশেষ যুগ বা সমাজে সীমাবদ্ধ নেই। আল্লাহর আইন ও বিধান থেকে বিচ্যুতির নামই হলো জাহেলিয়াত– তার স্থান ও কাল যাই হোক না কেন। এই পাপের ফল মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিতে, চরিত্রে এবং জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণায় দেখা দেয়। অনুরূপভাবে এর প্রভাব জীবনেও ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। সমগ্র মানব জাতির জীবনে এবং তার অর্থনৈতিক বিকাশেও এই পাপের প্রভাব পড়ে। অথচ সুদখোরদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত লোকেরা মনে করে যে, সুদই অর্থনৈতিক বিকাশের একমাত্র ন্যায়সংগত ভিত্তি।

সুদমুক্ত ঋণ প্রসংগে কোরআন

মূলধনটিকে হ্রাসবৃদ্ধি করা ছাড়া অবিকলভাবে ফেরত দেয়া সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। এতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা কারো ওপরই যুলুম হয় না। মূলধনের বিকাশ-বৃদ্ধির বিষয়টি নিসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ জন্যে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কিছু উপায় আছে। যেমন ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনা, মুদারাবাভিত্তিক অংশীদারী অর্থাৎ ব্যবসার জন্যে একজনের কাছে মূলধন ন্যাস্ত করা অতপর লাভ-লোকসান উভয়টিতে উভয় পক্ষের সমান অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করা, বাজারে সরাসরি শেয়ার বিক্রি করা এবং কারোই বৃহত্তম লভ্যাংশ লাভের নিশ্চয়তামূলক সার্টিফিকেট না দিয়ে হালাল লভ্যাংশ সবাই মিলে ভাগ করে নেয়া, ব্যাংকে বিনা সুদে এই শর্তে আমানত রাখা যে, ব্যাংক এই আমানতের অর্থকে বিভিন্ন শিল্প বা বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ করবে, তার জন্যে কোনো স্থায়ী ও নির্দিষ্ট লাভ দেবে না এবং সর্বশেষে প্রাপ্ত লাভ অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট হারে আমানতকারীদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করবে, আর ক্ষতি হলে তাও বন্টন করবে।

এসব ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো মূলধনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বাবদ একটা নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জও রাখতে পারবে। এ ছাড়াও ব্যবসার আরো অনেকগুলো বৈধ উপায় রয়েছে। এখানে সে সব বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। ঈমান মযবুত থাকলে, পবিত্র ও ন্যায়সংগত পন্থার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে এবং অন্যায় ও অবৈধ পন্থার সাথে কিছুই জড়িত না হওয়ার সংকল্প থাকলে হালালভাবে লাভজনক ব্যবসার উপায় খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন কিছু নয়।(১)

পরবর্তি আয়াতে অভাবকালীন সময়ে ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান আলোচনার মাধ্যমে সুদ সংক্রান্ত এই আলোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, ঋণকে সুদের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী করাটা মূলত এ সমস্যার সমাধান নয়। এ সমস্যার সমাধান হলো অভাব পীড়িত পক্ষকে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া, আর যে ব্যক্তি আরো উচ্চতর জনকল্যাণমূলক অবদান রাখতে চায় তাকে ওই ঋণ সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিতে উৎসাহ প্রদান করা। এরশাদ হয়েছে–

'ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবী হয় তাহলে তার সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তোমরা যদি তাকে সদকা করে দাও, তবে সেটা তোমাদের জন্যে আরো বেশী মংগলজনক, যদি তোমরা এর কল্যাণটুকু জানতে।'

এ হচ্ছে আর্তমানবতার প্রতি ইসলামের উদার সৌহার্দের নীতির নমুনা। অর্থগৃধ্নুতা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিহিংসা, লোভ লালসা ও মোনাফাখুরির প্রতিযোগিতার আগুন ঝরা মরুভূমিতে এটি যেন ক্লান্ত মানবতার আশ্রয় গ্রহণের বিস্তৃত সুশীতল ছায়া। এ ব্যবস্থা ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা এবং গোটা সমাজের জন্যেই কল্যাণকর।

আমরা জানি, আধুনিক বস্তুবাদী জাহেলী সভ্যতার কোলে জন্ম নেয়া ও তার কোলে লালিত পালিত দুর্ভাগা মানুষদের কাছে আমাদের এ সব বক্তব্য 'যুক্তিযুক্ত' মনে হবে না। তাদের নিষ্ক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রীতে এসব কথার আদৌ কোনো স্বাদ অনুভূত হবে না। বিশেষত সেই সব পাশবিক স্বভাবের সুদখোরদের কাছে তো নয়ই, যারা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পৃথিবীর কোণে কোণে অভাবী মানুষদের খাদ্য বস্ত্র, চিকিৎসার সাহায্য করা অথবা মৃতদের সৎকারে সাহায্য বিতরণ করার নামে শুধু শিকারই ধরে বেড়ায়। অথবা যারা সুদী ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের আকারে এ সমাজে বিচরণ করে বেড়ায়। এই উভয় শ্রেণীর মানুষরাই সমান। তবে শেষোক্ত ব্যক্তিরা বসে বড় বড় অফিস আদালতে আরাম কেদারায়, আর তাদের কাছে রয়েছে, অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত মোটা মোটা বই পুস্তক, রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন কানুন, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আদালত ইত্যাদি। তাদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডকে যুক্তিসংগত সাব্যস্ত করা এবং আইনের নামে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার সমালোচনা যারা ধৃষ্টতা দেখায় তাদের এরা পাকড়াও করতে।

আমরা জানি, এই সমস্ত লোকের মনে আমাদের এ কথাগুলো কোনোদিনই পৌঁছবে না। কিন্তু এও জানি যে, এ কথাগুলো সত্য এবং এগুলোকে গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করাতেই মানব জাতির সুখ সমৃদ্ধি নিহিত।

২৮০ নং আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান বর্ণিত হয়েছে। সেটি এই যে, ইসলামে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির ওপর ঋণদাতা, আইন আদালত– কোনো দিক থেকেই চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে সময় দিতে হবে। শুধু তাই নয়, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র এই ঋণগ্রস্ত অভাবী ব্যক্তিকে পরিত্যাগও করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ঋণদাতাকে সেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ঋণ মাফ করে দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং জানাচ্ছেন যে, এটা

---

(১) সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি বিষয়ের ওপর রচিত গ্রন্থগুলো আপনি পড়তে পারেন।– গ্রন্থকার

তার নিজের জন্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে এবং সমগ্র সমাজ ও তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে কল্যাণকর, যদি সে জানতো এতে কতো মংগল নিহিত রয়েছে।

এর একটি নিগুঢ় কারণ এই যে, ঋণদাতা যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাহলে সুদ বাতিল করার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যায়। এখানে তাই তার সচ্ছলতা ও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পুনর্বহাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভাবী ব্যক্তির ঋণ সার্বিক অথবা আংশিকভাবে মাফ করে দিতেও এখানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া কোরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে ঋণ পরিশোধে অক্ষম এমন অভাবী ব্যক্তিদের যাকাতের একটি খাত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে এবং নিজের জীবনকে সচ্ছল করে তুলতে পারে। সূরা 'আত তাওবা'য় সংশ্লিষ্ট আয়াতে 'গারিমীন' বলে যে খাতটির উল্লেখ করা হয়েছে। এবং অর্থ সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে ঋণের অর্থ বিলাসিতায় ও আমোদ প্রমোদে নয় বরং পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করে, কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে বেকায়দায় পড়ে।

পরবর্তি আয়াতে এমন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যার ব্যাপারে প্রত্যেক মোমেনের মন স্বভাবতই প্রকম্পিত থাকে এবং সে সকল ঋণ মাফ করে দিয়ে হলেও কেয়ামতের দিন আল্লাহর হিসাব থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তোমরা 'সেই দিনকে ভয় করো, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং প্রত্যেক প্রাণী নিজ নিজ কৃতকর্মের সমুচিত ফল পাবে। তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।'

বস্তুত আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া ও কর্মফল পাওয়ার দিনটি হবে বড়ই বিভীষিকাময় দিন। মোমেনের মনে সে দিনটির গুরুতর একটা প্রভাব থাকে এবং তার বিবেকে সে দিনটির দৃশ্য সর্বদাই উপস্থিত থাকে। সে দিনের ব্যাপারে তার হৃদয়ে প্রচন্ড ভীতি ও শংকা বিরাজ করে। এই দিনে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া এতো ভয়ংকর যে, এ বিষয়টা তা তার সমগ্র সত্ত্বায় শিহরণ এনে দেয়।

লেনদেন সংক্রান্ত আলোচনার পরিবেশের সাথে এই উপসংহারটি খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে কর্মফলের পরিবেশ ও তার ভয়ানক দৃশ্যটি বিরাজ করছে। এতে সব কিছুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মোমেনের মনে এর ভয় সৃষ্টি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও আখেরাতভীতি মানুষের অন্তরের এক প্রচ্ছন্ন প্রহরী। ইসলাম এই প্রহরীকেই ওখানে বসাতে চায় এ জন্যে যাতে মন তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে না পারে। কেননা মনের গভীরতম প্রকোষ্ঠে এই প্রহরীর অবস্থান।

এ হচ্ছে ইসলামের স্থায়ী ও অনমনীয় একটি ব্যবস্থা। এটি মানুষকে পার্থিব জীবনের সর্বোচ্চ উদারতা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। মানব জাতির প্রতি আল্লাহর কতো দয়া ও করুণা এবং তাকে তিনি কতো সম্মান ও মর্যাদা দেন, সেটাই এখানে ইসলামী বিধানের সার্বিক প্রতিপাদ্য বিষয়। ইসলাম মানবতার জন্যে সেই কল্যাণ নিয়ে এসেছে যা থেকে মানুষরা এখন দূরে পালিয়ে বেড়ায় এবং আল্লাহর দুশমনরা ও মানবতার দুশমনরাও তাদের আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا

اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط وَاسْتَشْهِدُوْا

شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ط وَلَا

يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ط وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا

اِلٰٓى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا

২৮২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো তখন তা লিখে রাখো; তোমাদের মধ্যকার যে কোনো একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দেবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা লেখা শিখিয়েছেন সে যেন কখনো লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়, (লেখার সময়) ঋণ গ্রহীতা (লেখককে) বলে দেবে কি (কি শর্ত সেখানে) লিখতে হবে, (এ পর্যায়ে) লেখক অবশ্যই তার মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা উচিত, (চুক্তিনামা লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে) তার কিছুই যেন বাদ না পড়ে; যদি সে ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ মূর্খ এবং (সব দিক থেকে) দুর্বল হয়, অথবা (চুক্তিনামার কথাবার্তা বলে দেয়ার) ক্ষমতাই তার না থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে কি কি কথা লিখতে হবে; (তদুপরি) তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন পুরুষকে (এ চুক্তিপত্রে) সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো, যদি দুই জন পুরুষ (একত্রে) পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা (সাক্ষী হবে), যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে; এমন সব লোকদের মধ্য থেকে সাক্ষী নিতে হবে যাদেরকে উভয় পক্ষই পছন্দ করবে, (সাক্ষীদের) যখন (সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না; (লেনদেনের সময়) পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক, তার দিন ক্ষণসহ (লিখে রাখতে) অবহেলা করো না; এটা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং (পরবর্তীকালে) যাতে তোমরা সন্দিগ্ধ না

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن
تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ
أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن
يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

হও, তার সমাধানের জন্যেও এটা নিকটতর (পন্থা), যা কিছু তোমরা নগদ (হাতে হাতে) আদান প্রদান করো তা (সব সময়) না লিখলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, তবে ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে, (দলিলের) লেখক ও (চুক্তিনামার) সাক্ষীদের কখনো (তাদের মত বদলানোর জন্যে) কষ্ট দেয়া যাবে না; তারপরও তোমরা যদি তাদের এ ধরনের যাতনা প্রদান করো তাহলে (জেনে রেখো), তা হবে (তোমাদের জন্যে) একটি মারাত্মক গুনাহ, (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবকিছুই শিখিয়ে দিচ্ছেন, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন। ২৮৩. যদি তোমরা কখনো সফরে থাকো এবং (এ কারণে ঋণের চুক্তি লেখার মতো) কোনো লেখক না পাও, তাহলে (চুক্তি লেখার বদলে) কোনো জিনিস বন্ধক রেখে দাও, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো বন্ধকী জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত সেই আমানত যথাযথ ফেরত দেয়া এবং (আমানতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা, যিনি তার মালিক; তোমরা কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে সে অবশ্যই অন্তরের দিক থেকে পাপিষ্ঠ (সাব্যস্ত হয়); বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

রুকু ৪০

২৮৪. আসমান যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহ তায়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর (পুরোপুরিই) হিসাব গ্রহণ করবেন; (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

তাফসীর

আয়াত ২৮২-২৮৪

ইতিপূর্বে সদকা ও সূদ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তারই পরিপূরক হিসাবে ঋণ ব্যবসা ও বন্ধক সংক্রান্ত এই বিধিসমূহ আলোচিত হচ্ছে, পূর্ববর্তী আলোচনায় সূদ হারাম ঘোষিত হওয়ায় সুদভিত্তিক লেনদেন, বেচাকেনা ও ঋণ একটা সুদূর পরাহত বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আর এখানে আলোচিত হয়েছে সুদবিহীন 'করযে হাসানা' এবং সুদমুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে।

কোরআনের ভাষাগত মোজেযা

এখানে কোরআনের আইন বিষয়ক বক্তব্যের ভাষাগত চমৎকারিত্ব পাঠককে মুগ্ধ ও অভিভূত করে দেয়। আইনগত আলোচনায় এতো নিখুঁতভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে যে, এর কোনো একটি শব্দকেও অন্য শব্দ দ্বারা পাল্টানো যায় না কিংবা কোনো একটি লাইনকেও অন্য লাইনের আগে পরে স্থাপন করা যায় না। এই নিখুঁত নিরস আইনগত শব্দ প্রয়োগ আয়াতের ভাষাগত সৌন্দর্যকে কিছুমাত্র ম্লান করেনি। সেই সাথে এই অনাগত ভাষা ধর্মীয় ভাবাবেগের সাথেও সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে যে, তা তার অনুপ্রেরণাকে করেছে আরো গভীর এবং তার প্রভাবকে করেছে আরো শাণিত। অথচ আইনগত অভিব্যক্তির দিক থেকে তা আয়াতের ধারাবাহিকতাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি।

তাছাড়া চুক্তির উভয় পক্ষের ভূমিকা এবং সাক্ষী ও লেখকদের ভূমিকার ওপর সম্ভাব্য অন্য কোনো জিনিসের প্রভাব পড়ে কিনা তাও এতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে সম্ভাব্য বহিরাগত প্রভাবকে প্রতিহত করা হয় এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আলোচনার একটি স্তর থেকে যখনই অপর স্তরে স্থানান্তর ঘটেছে, তখনই ওই স্তরের আলোচনাকে এমনভাবে সম্পূর্ণ করা হয়েছে যে, ওই স্তরের সাথে নতুন কোনো স্তরের সংযোগ ঘটানোর জন্যে যোগসূত্রের উল্লেখ করা ছাড়া আর কোনো কারণে পূর্ববর্তী স্তরের পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা দেখা দেয়নি।

আইন সংক্রান্ত আয়াতের ভাষাগত বিন্যাসে ও শব্দ চয়নে যে অলৌকিক নৈপুণ্য অলংকারিক চমৎকারিত্ব এখানে প্রদর্শিত হয়েছে, তার পারিভাষিক নাম এ'জাযুল কোরআন'। এই এ'জায শিক্ষামূলক ও নির্দেশনামূলক আয়াতগুলোতেও একইভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এখানে উক্ত এ'জায আরো স্পষ্ট এবং আরো শানিত হয়ে উঠেছে। কেননা এখানে বক্তব্য এতো সূক্ষ্ম ও নিপুণ যে, একটি শব্দের হেরফের হলেই তা পাল্টে যেতো এবং তার কোনো বিকল্প থাকতো না। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যদি এই এ'জাযকে সংরক্ষণ না করতেন তাহলে আইনগত শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস এবং ভাষাগত সৌকর্য দুটোই এরূপ পূর্ণমাত্রায় এমন নযীরবিহীনভাবে প্রতিফলিত হতে পারতো না।

লেনদেন ও চুক্তিসংক্রান্ত বিধিবিধান

ফকীহ ও মোহাদ্দেসদের বক্তব্য অনুসারে আধুনিক পৌর ও বাণিজ্যিক আইন প্রণয়নেরও প্রায় হাজার বছর আগে ইসলাম এই সব মূলনীতি সহকারে তার নিখুঁত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ন করেছে। এবার আয়াতটির এক এক অংশের ব্যাখ্যা আলাদা আলাদাভাবে করছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মোমেনরা, যখন তোমরা পরস্পরে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে কোনো ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে নাও।'

এ হচ্ছে সাধারণ মূলনীতি-যাকে এই আয়াতে নির্ধারণ করা হয়েছে, লিখে রাখা পবিত্র কোরআনের অকাট্য আদেশ বলে বাধ্যতামূলক কাজ। নির্ধারিত মেয়াদের ঋণের ক্ষেত্রে এটা আবশ্যিক-স্বেচ্ছামূলক নয়। এই বাধ্যবাধকতা আরোপের মূলে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা আয়াতের পরের অংশে বর্ণিত হয়েছে।

'আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখকের ন্যায়সংগতভাবে লেখা উচিত।'

যে ব্যক্তি ঋণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করবে, তার পদবী এখানে নির্ধারন করা হয়েছে। সে হচ্ছে ঋণের লেখক। সে ঋণের কোনো পক্ষ নয়। লেখার কাজে কোনো পক্ষের পরিবর্তে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্য কারবারে পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও সতর্কতা অবলম্বন। এই লেখককে আদেশ করা হয়েছে, সে যেন ন্যায়সংগতভাবে লেখে, কোনো এক পক্ষের জন্যে সে যেন পক্ষপাতিত্ব না করে এবং দলীলের ভাষায় যেন কোনো হ্রাস বৃদ্ধি না করে।

'কোনো লেখকই যেন আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান ও শিক্ষা অনুযায়ী লিখতে অস্বীকার না করে।'

বস্তুত এখানে লেখকের ওপর দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ন্যস্ত করা হয়েছে, যেন সে বিলম্ব না করে, অস্বীকার না করে এবং নিজের জন্যে কাজটি কষ্টকর ও বোঝাস্বরূপ মনে না করে। কেননা এ দায়িত্বটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'ওহী' যোগে প্রদত্ত। এ ব্যাপারে তাকে আল্লাহর কাছেই জবাবদিহী করতে হবে। তাছাড়া যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই তাকে কিভাবে লিখতে হয় তা শিখিয়েছেন, তাই এ কাজটি করা আল্লাহর ওই অনুগ্রহের স্বীকৃতিও বটে। তাই বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা যেমন শিখিয়েছেন, তেমনি তার লেখা উচিত।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা মেয়াদমুক্ত ঋণ লিখে রাখার বিধান বর্ণনা করে তা লেখার দায়িত্ব কে পালন করবে তা নির্ধারণ করেছেন লেখকের ওপর লেখার দায়িত্ব অর্পণ, সেই সাথে আল্লাহ তায়ালা তাকে যে লেখা শিখিয়েছেন সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং ন্যায়সংগতভাবে লেখার নির্দেশ প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

শর্ত হবে ঋণগ্রহীতার স্বার্থে— ঋণদাতার স্বার্থে নয়

এরপর বিধানটির দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করা হচ্ছে। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে কিভাবে লিখতে হবে।

'ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়, তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং তার কিছুই যেন না কমায়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায়সংগতভাবে লেখার বিষয়বস্তু তাকে বলে দেয়।'

ঋণ গ্রহীতার কর্তব্য এই যে, সে লেখকের কাছে নিজের ঋণ গ্রহণের কথা স্বীকার করবে, ঋণের পরিমাণ, তার শর্ত ও মেয়াদ ইত্যাদি তাকে জানাবে। এই দায়িত্বটা ঋণগ্রহীতাকে দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, ঋণদাতা যদি লেখককে বিষয়বস্তু বলে দিয়ে লেখাতো, তাহলে ঋণ গ্রহীতার ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিলো। সে ঋণের পরিমাণ বেশীও লেখাতে পারতো, মেয়াদ কম করেও লেখাতে পারতো অথবা তার স্বার্থের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্তাবলী লেখাতে পারতো। ঋণগ্রহীতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে থাকে। ঋণের তীব্র প্রয়োজনীয়তার কারণে সে যেন তেন প্রকারে চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী থাকে। সে জন্যে সে এ সব শর্তের বিরোধিতা নাও করতে পারে। অথচ এতে তার ক্ষতির শিকার হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই ঋণ গ্রহীতা যদি চুক্তি লেখায় তাহলে সে যা সানন্দে গ্রহণ করতে পারে তাই লেখাবে এটাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া এতে ঋণ সম্পর্কে তার স্বীকৃতি অধিকতর জোরদার ও মযবুত হবে। কেননা সে-ই তো চুক্তিটা লিখিয়েছে। সেই সাথে এ আয়াত ঋণ গ্রহীতার বিবেককেও আবেদন জানায় যেন সে আল্লাহকে ভয় করে এবং চুক্তিবদ্ধ ঋণকে কম করে না লেখায় বা চুক্তির অন্য কোনো অংশও না কমায়। চুক্তি লেখানোর সময় আল্লাহকে ভয় না করলে এ ধরনের অবৈধ সুযোগ সে সহজেই নিতে পারে। তবে ঋণ গ্রহীতা যদি বোকা হওয়ার কারণে তার ঋণচুক্তিতে যথোচিত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারে অথবা সে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অপরিণত বুদ্ধির হয়, অথবা কোনো অক্ষমতা, নিরক্ষরতা, জিহ্বার কোনো আড়ষ্টতা অথবা কোনো দৈহিক বা মানসিক কারণে চুক্তি লেখককে চুক্তির বিষয় বলে দিতে অপারগ হয়, তাহলে তার দায়িত্ব বহনকারী অভিভাবক 'ন্যায়সংগতভাবে' চুক্তির বিষয় বলে দেবে ও তাই লেখাবে।

এখানে 'ন্যায়সংগতভাবে' কথাটা অধিকতর সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে বলা হয়েছে। কেননা অভিভাবক ঋণের সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত নয় বিধায় সে সামান্য পরিমাণে হলেও অবহেলা করতে পারে। তাই সে যদি 'ন্যায়সংগতভাবে' দায়িত্ব পালনে যত্নবান হয় তাহলে চুক্তির নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুতার জন্যে সর্বদিক থেকে যে গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তার প্রয়োজন, তা অর্জিত হবে।

ইসলামের সাক্ষ্য আইন

ঋণ চুক্তি লেখা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এখানে সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তির পরবর্তী স্তর অর্থাৎ সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী গ্রহণ করো। দু'জন পুরুষ যদি না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী এমন সাক্ষীদের মধ্য থেকে গ্রহণ করো যারা তোমাদের কাছে সন্তোষজনক হয়। দু'জন স্ত্রী নেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, একজন ভুলে গেলে অপরজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

ইসলামের বিধানে দু'জন সাক্ষী অপরিহার্য। 'সন্তোষজনক' শব্দটিতে দুটি অর্থ নিহিত রয়েছে।

প্রথমত, সাক্ষীদ্বয় সমাজে সৎলোক হিসাবে চিহ্নিত ও সাধারণভাবে পছন্দনীয় ব্যক্তি হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, চুক্তির উভয় পক্ষ তার সাক্ষ্য দানে সম্মত হবে এবং কোনো পক্ষই তার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলবে না।

অবশ্য বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া দুর্লভও হতে পারে। তাই এখানে শরীয়ত কাজটাকে সহজ করে দেয়ার জন্যে নারীদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তলব করে। শরীয়ত সাক্ষী হিসাবে পুরুষদের তলব করে শুধু এ জন্যে যে, একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মুসলিম সমাজে তারাই সাধারণত সামাজিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজে নিছক বেঁচে থাকার জন্যে নারীকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজ করতে হয় না। তা যদি সে করতো তাহলে সে তার নারীত্ব ও মাতৃত্বের ওপর যুলুম করতো। যুলুম করতো ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতিনিধি, মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মানব শিশুর লালন পালনে তার যে দায়িত্ব রয়েছে- সেই দায়িত্বের প্রতি। কিছু টাকার জন্যে কাজ করতে গিয়ে তাকে তার বৃহত্তর দায়িত্বের প্রতি অবিচার করতে হতো। আজকে যে বিকারগ্রস্ত পথভ্রষ্ট সমাজে আমরা বসবাস করছি, সে সমাজে নারী এ ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশ্য দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্য দিতে হবে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, দু'জন স্ত্রী লোক কেন? এ প্রশ্নে কোরআন আমাদেরকে আন্দায অনুমান করার সুযোগ দেয়নি। এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোরআনের প্রতিটি বাক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হয়ে থাকে এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেয়। এখানে যে কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হলো,

'যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।'

ভুলে যাওয়ার একাধিক কারণ থাকতে পারে। চুক্তির বিষয়ে নারীর অভিজ্ঞতা কম থাকাও এর একটা কারণ হতে পারে। অভিজ্ঞতা কম থাকার কারণে চুক্তির যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় তার জানা নাও থাকতে পারে। তাই প্রয়োজনের সময় নির্ভুল সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যতোটা সুস্পষ্ট বুঝ দরকার, তার ততোটা নাও থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একে অপরকে বিষয়টির সকল খুঁটিনাটি দিক স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এর আরেকটি সম্ভাব্য কারণ স্বভাবগতভাবে নারীর অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণতা, সংবেদনশীলতা, ঝোঁক প্রবণতা ও অন্যের দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা। কেননা দৈহিক ও জীবতাত্ত্বিকভাবে মাতৃত্বের কাজটি নারীর অভ্যন্তরে অনিবার্যভাবে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিপক্ষ থাকার দাবী জানায়। সে আরো দাবী জানায় নারী যেন দ্রুতগতিতে ও দৃঢ়তার সাথে স্বীয় শিশুর দাবী পূরণে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ও আবেগপূর্ণভাবে সাড়া দেয়। এ ক্ষেত্রে সে একটুও বিলম্বিত চিন্তার ধার ধারে না।

আর এ প্রবণতা নারীর নিজের ও শিশুর জন্যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ। এই স্বভাবটি অবিভাজ্য। নারী যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে, তখন সে একটা অখন্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় এবং এটাই তার স্বভাবসুলভ গুণ। অথচ একটা লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদনে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আবেগ মুক্ত ব্যক্তিত্ব আবশ্যক এবং বিভিন্ন ঘটনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও পক্ষপাতহীন ভূমিকার প্রয়োজন। তাই দু'জন নারী হলে এ ব্যাপার নিশ্চয়তা লাভ করা যেতে পারে যে, একজন যদি কোনো আবেগের প্রভাবে কিছুটা বিপথগামী হয়ে যায় তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে বস্তুনিষ্ট ঘটনার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

লেনদেনের ব্যাপারে একজন পুরুষের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা কেনো দুজন মহিলার স্বাক্ষীর বিধান রাখলেন– এ ব্যাপারে হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমদ রচিত 'সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী' বইটিতে বিশদ আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে। তেমনি এখানে বলা হচ্ছে যে, সাক্ষীরা যেন সাক্ষ্য দিতে আপত্তি না জানায়।

'সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যখন ডাকা হয়, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।'

বস্তুত সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বানে সাড়া দেয়া নফল নয় বরং ফরয। কেননা সাক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সত্য উদঘাটনের একটা উপায়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ দিয়েছেন, যাতে সাক্ষীরা স্বেচ্ছায়, স্বতস্ফূর্তভাবে এবং নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি সাধন ছাড়াই সাক্ষ্য দানের আহ্বানে সাড়া দেয়। অনুরূপভাবে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ বা এক পক্ষ যদি সাক্ষ্য দানের জন্যে ডেকে থাকে তাহলে উভয়ের প্রতি বা একপক্ষের প্রতি অনুগ্রহ দেখানোর মানসিকতা পোষণ করা চলবে না।

মেয়াদী ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা

এ পর্যন্ত এসে সাক্ষ্য সংক্রান্ত আলোচনা শেষ হলো। এরপর মহান আইন প্রণেতা আল্লাহ তায়ালা অপর একটি বিষয়ে আইন প্রণয়নে মনোনিবেশ করেছেন। এখানে তিনি ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেক বিষয়ের লিখিত চুক্তি সম্পাদনে গুরুত্ব দিয়েছেন। ঋণটা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য

বিধায় তা অনেক সময় কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ মনে করা হয় এবং এতোটা কষ্ট করা ও ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়, অথবা সৌজন্যবোধ, লজ্জা, আলসেমি ও তোয়াক্কা না করার কারণে লেখাকে বিরক্তিকর বা বিব্রতকর মনে করা হয়। এ সমস্ত বিষয়ে এখানে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। শুধু সিদ্ধান্ত দিয়ে ক্ষান্ত থাকা হয়নি, সেই সাথে লেখার অপরিহার্যতার দুটি কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ, অপরটি বাস্তব কারণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ঋণ ছোটো হোক বা বড়ো হোক, মেয়াদসহ লিখে রাখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহর কাছে এটি ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্যে দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর।'

মানুষ যখন কোনো কাজের মূল্য অপেক্ষা তার সম্পাদন ব্যয় বেশী দেখতে পায় তখন তার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা উপলব্ধি করেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তোমরা বিরক্ত হয়ো না।'

অতপর চুক্তি লেখাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করে ও অগ্রাধিকার দেন-এই মর্মে মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয় জন্মানোর জন্যে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহর কাছে এটি ন্যায্যতর' অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর ও শ্রেয়তর। এরপর বলা হচ্ছে, 'প্রমাণের জন্যে দৃঢ়তর।'

বস্তুত একটি লিখিত বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দান নিছক স্মৃতি নির্ভর মৌখিক সাক্ষ্য দানের চেয়ে দৃঢ়তর। অনুরূপভাবে দু'জন সাক্ষ্য অথবা একজন, পুরুষও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্য ও একজন পুরুষের বা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীর সাক্ষ্যের চেয়ে দৃঢ়তর। 'তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর।'

অর্থাৎ সন্দেহমুক্ত হওয়ার নিকটতর। আদৌ কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে চুক্তির বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বা অন্যদের মধ্যে যে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

এভাবে এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং লেনদেনকারীর এই আইনের প্রয়োজনীয়তা, তার উদ্দেশ্যের যথার্থতা এবং এ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। মোদ্দাকথা এই যে, লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে লেনদেন করা ও সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করা সংক্রান্ত ইসলামী আইন দ্বারা বিশুদ্ধতা, নির্ভুলতা, বিশুদ্ধতা ও নিশ্চয়তা অর্জিত হয়।

এ হচ্ছে মেয়াদী ঋণ সংক্রান্ত ইসলামী বিধি ব্যবস্থা। তবে চলতি ব্যবসা বাণিজ্যে যে বেচাকেনা হয়ে থাকে। তা এই লেখার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। এতে শুধু সাক্ষ্য দানই যথেষ্ট। কেননা এ দ্বারা দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে জটিলতা থেকে মুক্ত করা যায়। দৈনন্দিন ছোট খাট ব্যবসায়িক কর্মকান্ড দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং অল্প সময়ে বার বার সম্পন্ন করতে হয়। যেহেতু ইসলাম জীবনের সর্ব ক্ষেত্রের জন্যে আইন প্রণয়ন করে তাই সে তার সকল সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখে। সে একটা বাস্তব আইনগত ব্যবস্থা দেয়। এ ব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপনে কোনো জটিলতা বা বাধা বিপত্তি নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তবে যদি সেটা চলতি বাণিজ্য হয়ে থাকে, যা তোমরা নিজেদের মধ্যে পরিচালিত করে থাকো, তাহলে তা না লিখলেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যখন বেচাকেনার ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করো, তখন তার ওপর সাক্ষী রাখো।'

এ উক্তি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, চুক্তি লিখিতভাবে সম্পাদন করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সাক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সাক্ষী রাখাও ঐচ্ছিক-বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু অগ্রগণ্য মতানুসারে এটা বাধ্যতামূলক।

চুক্তিলেখক ও সাক্ষীর নিরাপত্তাবিধান

মেয়াদী ঋণ ও চলতি বাণিজ্য-উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের আলোচনা এখানে শেষ হয়েছে। চুক্তি লেখানো এবং সাক্ষী রাখার বাধ্যবাধকতা ও ঐচ্ছিকতার ব্যাপারেও উভয়টির ভিন্ন ভিন্ন বিধিও আলোচিত হয়েছে। এই লেখকের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অতপর সাক্ষী ও লেখকদের অধিকার নির্ধারণ করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে তাদের ওপর দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে যেন তারা লিখতে ও সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করে। এক্ষণে উক্ত লেখক ও সাক্ষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বসাধারণকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে সামাজিক দায়িত্ব পালনে অধিকার ও কর্তব্যে পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কোনো লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত করো, তবে সেটা তোমাদের জন্যে পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

অর্থাৎ লক্ষ্য রাখা চাই যেন আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো লেখক বা সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এটা যদি লক্ষ্য না রাখো এবং তারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেটা হবে তোমাদের পক্ষ থেকে শরীয়তের বিরোধিতা। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরী। কেননা সাক্ষী ও লেখকরা অনেক সময় দুই পক্ষের কারো না কারো আক্রোশের শিকার হয়ে থাকে। তাই তারা যাতে পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ সহকারে দায়িত্ব সচেতনতা, সততা, উৎসাহ ও নিরপেক্ষতা সহকারে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে জন্য তাদেরকে রক্ষাকবচ সরবরাহ করা উচিত।

কোরআনের চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সে যখনই মোমেনদের ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে চায়, তখন তাকে নিছক আদেশের ভাষার জোরে তা পালনে বাধ্য করতে চায় না, বরং সে যাতে উক্ত দায়িত্ব পালনে অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রেরণা পায়, সে জন্যে সে তার বিবেককে জাগিয়ে তুলতে এবং চেতনাকে উদ্দীপিত ও শাণিত করতে সচেষ্ট হয়। এই চেষ্টা উপলক্ষে সে মোমেনদেরকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অবলম্বনের উপদেশ দেয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানেও আয়াতের শেষভাগে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির আহ্বান জানানো হয়েছে। মোমেনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনেক অনুগ্রহ করে থাকেন, তাদেরকে শিক্ষা দেন ও পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরাত্মাকে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয় এবং আনুগত্য, সন্তোষ ও বিশ্বাস দ্বারা উক্ত অনুগ্রহের প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য বানায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে অবহিত।'

বন্ধকী ঋন সংক্রান্ত বিধান

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঋণের বিধানের কিছু পরিশিষ্ট বর্ণনা করেছেন। এটা বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সাধারণ বিধির সাথে এর উল্লেখ না করে পরে উল্লেখ করেছেন। সেই বিশেষ পরিস্থিতি এই যে, ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতা যখন সফরে থাকে এবং সেখানে কোনো লেখক পাওয়া যায় না, তখন লেনদেন যাতে সহজ হয়, অথচ ঋণ পরিশোধ নিশ্চিতও হয়, সে উদ্দেশ্যে মহান আইন প্রণেতা আল্লাহ রব্বুল আলামীন মৌখিক চুক্তি সম্পাদনের অনুমতি দিয়েছেন। এ চুক্তি লেখার প্রয়োজন নেই, তবে ঋণের নিরাপত্তার খাতিরে ঋণদাতার কাছে কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হবে এবং তা ঋণ দাতার হাতে অর্পণ করতে হবে। আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন,

'যদি তোমরা সফরে থাকো এবং (চুক্তি লেখার মতো) কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা বৈধ।' অতপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বিবেককে খোদাভীতির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আমানত রক্ষায় ও সঠিকভাবে ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বস্তুত এই আল্লাহভীতি বা তাকওয়াই হলো গোটা শরীয়তের বিধানকে বাস্তবায়ন, সকল প্রাপ্য সম্পদ ও বন্দকী সম্পত্তি তার প্রাপকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া এবং তার পূর্ণ সংরক্ষণের একমাত্র ও সর্বশেষ গ্যারান্টি। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।'

উল্লেখ্য যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের ব্যাপারে এবং ঋণদাতা বন্ধকী সম্পত্তির ব্যাপারে আমানতদার। উভয়কে আল্লাহর ভয় দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে নিজ নিজ আমানতকে যথাসময়ে প্রত্যার্পণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। রব্বুল আলামীন মহান আল্লাহই এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অভিভাবক, প্রহরী, তত্ত্বাবধায়ক, মনিব, শাসক ও বিচারক। লেনদেন, আমানত অর্জন ও তা প্রত্যার্পণের বেলায় আল্লাহকে এই সকল অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রহণ করলে যথার্থ পথনির্দেশ পাওয়া যাবে। কারো কারো মত এই যে, বন্ধক দেয়ার ক্ষেত্রে লেখা সংক্রান্ত আদেশ রহিত হয়েছে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার মতে লিখিত চুক্তি সম্পাদন সফর ছাড়া সকল অবস্থায় ওয়াজেব। আর বন্ধক রাখা শুধুমাত্র সফরের অবস্থায়ই বিধেয়। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা তাকওয়া বা আল্লাহভীতির তাগিদ দেয়ার পর সাক্ষ্য সংক্রান্ত যে বক্তব্য সর্বশেষে রাখা হয়েছে তা চুক্তি সম্পাদনের সময়ের সাথে সাথে নয় বরং বিচারের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা এই সাক্ষ্য হচ্ছে সাক্ষীর ঘাড়ের ওপর ও তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটা আমানতস্বরূপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপিষ্ঠ।'

এখানে পাপকে অন্তরে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, পাপ লুকানো এবং সাক্ষ্যকে গোপন করা দুটোই এমন কাজ, যা অন্তরের অন্তস্থলে সম্পন্ন হয়। কিন্তু যেহেতু অন্তরের গভীরতম প্রকোষ্টেও আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যদি কেউ এমনটি করে তাকে হুমকিও দেয়া হয়েছে। প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয়েছে–

'আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন।'

অর্থাৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা অন্তরে লুকানো পাপ জেনে নিয়ে তিনি তার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

অতপর এই প্রচ্ছন্ন ইংগিতকে আরো জোরদারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান সবকিছুর অধিপতি, হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকানো সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, গোপন বা প্রকাশ্য সবকিছুর প্রতিফল দানকারী, স্বীয় বান্দাদের কর্মফল দানে আপন ইচ্ছামতো আযাব বা দয়ার আচরণকারী এবং আপন ইচ্ছাধীন সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মনে ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর। আর যদি তোমরা তোমাদের মনের ভাব লুকাও বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন। অতপর যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, আর আল্লাহ তায়ালা সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।'

সম্পূর্ণ পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে এভাবে নির্ভেজাল ও খালেছ অপার্থিব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং জীবন সংক্রান্ত আইনের সাথে জীবন স্রষ্টার অটুট সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতির প্রতি আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে এই অটুট সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই

আইনগত নিশ্চয়তার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক ও ঐশী রক্ষাকবচও ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। এটাই ইসলামী সমাজে মুসলমানদের অন্তরে রক্ষিত ইসলামী শরীয়তের তৈরী সবচেয়ে মযবুত ও অটুট রক্ষাকবচ। ইসলামে মনস্তাত্ত্বিক রক্ষাকবচ অর্থাৎ আল্লাহর ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের আশা এবং আইন-পরম্পরের পরিপূরক। যে হৃদয়গুলোর জন্যে ও যে সমাজের জন্যে ইসলাম আইন তৈরী করে, সেই সমাজ এবং সেই হৃদয়গুলোকেও ইসলাম উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে চায়।

ইসলামের এই সমাজ গঠন ও হৃদয় গঠন প্রক্রিয়া সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি খোদায়ী প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জন্যে তৈরী করা একটি আইন ও প্রশিক্ষণ, তাকওয়া ও শক্তি প্রয়োগ এবং জীবন যাপনের পদ্ধতি। সুতরাং পার্থিব আইন বিধান ও জীবন যাপনের পন্থা ও পদ্ধতি স্রষ্টার এ বিধানের বাইরে কিভাবে থাকতে পারে? সংকীর্ণ দৃষ্টি, সীমিত আয়ুষ্কাল। সীমিত জ্ঞান ও সীমিত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষের বিবেক বিবেচনা আর কতো ব্যাপক হতে পারে? তাঁর ইচ্ছা ও কামনা বাসনা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনো অবস্থার ওপর তা স্থায়ীভাবে টিকে থাকে না, কোনো দু'জন মানুষের চিন্তা, বিচার বিবেচনা ও উপলব্ধি কখনো এক রকম হয় না।

এমতাবস্থায় মানব জাতি নিজের সেই স্রষ্টা প্রতিপালকের কাছ থেকে কোথায় পালাবে, যিনি তাঁর সৃষ্টি করা প্রাণীকে সম্যকভাবে জানেন, প্রতি মুহূর্তে তার সৃষ্টির কী প্রয়োজন তা যিনি জানেন।

বস্তুত আল্লাহর বিধান ও শরীয়ত থেকে পালানোর চেষ্টাই মানব জাতির সকল দুর্ভাগ্যের উৎস। এই দুর্ভাগ্যের প্রাথমিক সূচনা হয়েছে পাশ্চাত্যে। পাশ্চাত্যবাসী তাদের ধর্মীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে খোদ আল্লাহকেই পরিত্যাগ করে ফেলেছে। তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব স্বয়ং আল্লাহদ্রোহী হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় নেতারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবী করে তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের চিন্তা ও বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং তাঁর নামে তাদের ওপর ঘৃণা যুলুম, স্বৈরাচার ও বিপুল পরিমাণ কর আরোপ করেছে। মানুষ যখন এই যুলুম থেকে মুক্তি পেতে চাইলো, তখন গীর্জা ও তার ক্ষমতা থেকেই সে মুক্তি অর্জন করলো, কিন্তু তারা কোনো সীমারেখা মানলো না। যুলুমবায গীর্জা থেকে মুক্তি অর্জন করতে গিয়ে তারা স্বয়ং আল্লাহকেও অগ্রাহ্য করে বসলো। অতপর পার্থিব জীবন আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করে এমন যে কোনো ধর্মকেই তারা প্রত্যাখ্যান করলো। এর ফলেই মানবতার শোচনীয় দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা নেমে এলো ।(১)

আজআমরা যারা ইসলামের দাবীদার তাদের অবস্থাটা কী? আমরা কোন কারণে আল্লাহর আইন, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর শরীয়ত ও স্বয়ং আল্লাহকেই বর্জন করে চলেছি? আমাদের সুষম ধর্ম তো আমাদের ওপর কোনো যুলুম করেনি। আমাদের ওপর তো ইসলাম এমন কোনো বিধান চাপায়নি, যা আমাদের স্বাধীনতাকে শৃংখলিত করে। বরং এর প্রতিটি বিধান আমাদের ওপর থেকে গোলামী ও পরাধীনতার শৃংখল অপসারণ করে আমাদেরকে হেদায়াতের পথ, কল্যাণ ও উন্নয়নের পথ দেখায় এবং আল্লাহকে পাওয়ার পথে মযবুতভাবে টিকে থাকার উপায় শিক্ষা দেয়। তারপরও আমরা এ জীবন বিধানের সাথে এই আচরণ কেনো করছি?

(১) এ বিষয়ে মোহাম্মাদ কুতুব রচিত 'আল ইসলাম বাইনাল মাদ্দিয়াতি ওয়াল ইসলাম' এবং 'মারিফাতুত্ তাকালীদ' নামক গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

২৮৫. (আল্লাহর) রসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও (সে একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে; এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কেতাবসমূহের ওপর, তাঁর রসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর (পাঠানো) নবী রসূলদের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি ন; আর তারা বলে, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনেও নিয়েছি, হে আমাদের মালিক, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং (আমরা জানি,) আমাদের (একদিন) তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। ২৮৬. আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করবে, আবার সে যতোটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততোটুকু শাস্তিই) পতিত হবে; (অতএব, হে মোমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করো,) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু, অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

তাফসীর

আয়াত-২৮৫-২৮৬

সূরা বাকারার পরিশিষ্ট

এই আয়াতগুলো হচ্ছে কোরআনের দীর্ঘতম সূরাটির পরিশিষ্ট। এই সূরা একদিকে যেমনি দীর্ঘ তেমনি বিষয়বস্তুর আলোকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সূরায় ঈমানী ধ্যান ধারণার মৌলিক নীতিমালার আলোচনা করা হয়েছে, এতে ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, তার কর্মনীতি, তার ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে, সর্বোপরি এই ধরনের একটি ইসলামী দলের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্যও এখানে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী সংগঠনের দুশমন কারা কারা, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এরা কোন কোন পন্থা অবলম্বন করে থাকে, একইভাবে এই সূরায় মানুষ সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্যের বিষয়টির বর্ণনা এসেছে। তার প্রকৃতি ও ভুল ভ্রান্তির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই শেষের আয়াত দুটো হচ্ছে গোটা সূরার পরিশিষ্ট ও এর সংক্ষিপ্ত সার। এই সূরায় আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ের সারসংক্ষেপই এই দুটো আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে গোটা সূরার বিষয়াবলী ও এর লক্ষ্যসমূহের সাথে এই পরিশিষ্টের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। যেমনি করে এই সূরাটি শুরু হয়েছিলো। এই সূরাটির শুরু হয়েছিলো এ আয়াতের মাধ্যমে।

'আলিফ লাম মীম, এই মহাগ্রন্থ (আল কোরআন) যাতে কোনোরকম শোবা সন্দেহ নাই। এই কেতাব শুধু তাদের জন্যেই পথ প্রদর্শক যারা (আল্লাহকে) ভয় করে এরা হচ্ছে যারা না দেখে তার ওপর ঈমান আনে এবং (সে ঈমানের দাবী মোতাবেক) নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার দেয়া সম্পদ থেকে (আমারই পথে) ব্যয় করে, যারা (হে মোহাম্মদ) তোমার ওপর নাযিল করা কেতাবের ওপর ঈমান আনে-ঈমান আনে তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের ওপর অবতীর্ণ কেতাবসমূহের ওপর, সর্বোপরি যারা ঈমান আনে শেষ বিচারের দিনের ওপর।'

এই আয়াতগুলোতে যে মৌলিক সত্যগুলো-বিশেষ করে সব কয়জন নবী রসূলের ওপর ঈমান আনার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তারই সূত্র ধরে এই বলে সূরাটির পরিসমাপ্তি টানা হলো।

হাঁ আল্লাহর রসূল তার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন। তার সাথে (তার সাক্ষী) মোমেনরাও ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর তাঁর কেতাবসমূহের ওপর ও তাঁর রসূলদের ওপর (এবং তারা বলে,) আমরা আল্লাহর এ নবী রসূলদের মাঝে কোনো রকম তারতম্য করি না, (কারণ তারা সবাই আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন)-এভাবেই সূরার প্রথম কথার সাথে শেষ কথার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে।

সূরা বাকারার বৃহৎ অংশ জুড়ে মুসলিম জাতির সার্বিক অবস্থার বর্ণনা, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা কিভাবে এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে এবং কিভাবে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে। আসলে আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি কারো ওপরই তার ক্ষমতা ও সামর্থের বাইরে কোনো দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না- ইহুদীদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা আবার কখনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীকে কোনো কাজ-কর্মের দায় দায়িত্ব না দিয়ে নিষ্কর্মা ও অথর্ব করেও রাখেন না, বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কাউকেই তার নিজস্ব শক্তি সামর্থের বাইরে কষ্ট দেন না। (তাঁর নীতি হচ্ছে) ততোটুকুই বান্দার পাওনা হবে যতোটুকু সে অর্জন করবে- ভালো কাজ করলে সে তার বিনিময় পাবে আবার মন্দ কাজ করলে তার ক্ষতির বোঝা তার ওপরই বর্তাবে।

এই সূরায় বনী ইসরাঈলের কিছু কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে, বলা হয়েছে বিপুল পরিমাণ নেয়ামত ও অনুগ্রহ সত্ত্বেও তারা কিভাবে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে, পরিণামে তাদের ওপর এমন কিছু কাফফারা আরোপ করা হয়েছে যা হত্যার মতো কঠোর বিধানের কাছে পৌঁছে গেছে, যেমন বলা হয়েছে–

'তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে তওবা করো তোমাদের নিজেদের হত্যা করে ফেলো'।

এর শেষ পর্যায়ে মোমেনদের হৃদয় থেকে এই আকুতিপূর্ণ দোয়া আসছে, 'হে আমাদের মালিক, 'আমরা যদি কোনো ভুল করি আমাদের থেকে যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায় তাহলে তুমি আমাদের তার জন্যে পাকড়াও করো না। আমাদের ওপর তুমি এমন কোনো বোঝা দিয়ো না যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর দিয়েছো। হে আমাদের মালিক, যে পরিমাণ বোঝা বইবার শক্তি সামর্থ আমাদের আছে তার অধিক বোঝা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, হে আমাদের মালিক আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দিয়ো আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো।'

এই সূরায় মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে তাদের জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করতে বলা হয়েছে।

তাদের বলা হয়েছে 'কুফুর' ও 'কাফেরদের' নির্মূল করার জন্যে জেহাদের পথে এগিয়ে আসতে- এবার শেষের দিকে এসে মোমেনদের পক্ষ থেকে তাদের মালিকের সাহায্য চেয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় বিজয় ও সাহায্য কামনা করে এই দোয়ার আবেদন পেশ করা হচ্ছে,

'তুমিই আমাদের একমাত্র মালিক। কাফের ও তাদের অনুচরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দাও।

'এই আয়াত দুটো হচ্ছে গোটা সূরায়ে বাকারার এমনি এক পরিশিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সার যাতে মূল সূরায় আলোচিত বিষয়গুলোর একটা মোটামুটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে ঈমানের ধরন ও বৈশিষ্টের বর্ণনা এসেছে একজন সত্যিকারের মোমেনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি কথার মূলে রয়েছে একই আহ্বান, পরিশেষে মোমেন কিভাবে বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া ও প্রার্থনা জানাবে তাও তাকে বলে দেয়া হয়েছে।

এবার আমরা এ বিষয়ের ওপর কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাবো।

ঈমানের সঠিক রূপরেখা

'রসূল ঈমান আনলো যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে (তার সাথে তার সাথী) মোমেনরাও ঈমান আনলো তারা সবাই ঈমান আনলো আল্লাহর ওপর তার ফেরেশতাদের ওপর তার (পাঠানো) কেতাবের ওপর ও তার পাঠানো নবী রসূলদের ওপর (ঈমান আনার পর তারা সবাই বললো) আমরা আল্লাহর পাঠানো নবী রসূলদের মাঝে কোনোরকম তারতম্য করি না, অতপর তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললো, হে মালিক আমরা তোমার কথা শুনলাম এবং তা মেনে নিলাম, হে আল্লাহ তোমার ক্ষমাই প্রার্থনা করি (কেননা এই জীবনের শেষে আমাদের) একদিন তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

এখানে মোমেনদের সঠিক রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এমন একটি পছন্দ করা দল যাদের কর্মজীবনে ঈমানের বাস্তব উপস্থিতি বিদ্যমান এখানে মোমেনদের সাথে আল্লাহর রসূলকে শামিল করে মূলত তাদের সম্মান ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদের উভয়কে একই বাক্যে একই আয়াতে পেশ করে তাদের সম্মানের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনয়ন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

'আল্লাহর রসূল ঈমান আনলো যা কিছু তার ওপর নাযিল করা হয়েছে তার ওপর (তার সাথে তার সাথী) মোমেনরাও (ঈমান আনলো),

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী রসূলের নিজের ওপর নাযিল করা হয় তার ওপর তাদের নিজেদের ঈমান আনার বিষয়টি এবং আল্লাহর স্বীয় সত্ত্বার সাথে সরাসরি সম্পর্কের বিষয়টি এমনি যার ধারণা নবুওতের সাথে জড়িত সম্মানিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। নবীদের ক্ষেত্রে এ সত্যের অনুভূতির জন্যে কোনো রকম পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না। চেষ্টা সাধনা ছাড়াই এ ধারণা ও অনুভূতি সদা জাগরুক থাকে। এ হচ্ছে ঈমানের এমন এক পর্যায় যার ব্যাখ্যা শুধু সে ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি নিজে এর স্বাদ পেয়েছেন। এই হচ্ছে রসূলের ঈমান আর আল্লাহ তায়ালা এই পর্যায়ের ঈমান দান করে নিসন্দেহে তাদের ওপর একটা বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু এই ঈমানের সীমারেখা কতোটুকু?

'তারা ঈমান আনলো আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কেতাবের ওপর এবং তাঁর পাঠানো রসূলদের ওপর। (ঈমান আনার পর তারা বলে) আমরা রসূলদের মাঝে কোনারকম তারতম্য করি না। (আমরা আমাদের মালিকের দুয়ারে আরজী পেশ করে বলি) হে আল্লাহ তায়ালা আমরা তোমার কথা শুনেছি এবং তোমার আনুগত্য কবুল করেছি, হে আমাদের মালিক আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, (কারণ আমরা জানি) আমাদের জীবনের শেষে) তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

এই হচ্ছে সেই পূর্ণাংগ ঈমান- ইসলাম যার শিক্ষা দেয়, আর এ ধরনের ঈমানই মুসলমানদের থাকা উচিত। এই ঈমানের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর প্রদর্শিত সঠিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হতো। এই ঈমানই হামেশা দাওয়াতে দ্বীনের কর্মীদের মাঝে এবং এ দাওয়াতের বাহক নবীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতো। ইতিহাসের সর্বত্রই মানবতা দু'দলে বিভক্ত ছিলো। এর একদল হচ্ছে ঈমানদার যারা আল্লাহর হেদায়াতের ওপর ঈমান এনে সে অনুযায়ী জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত করে, আরেক দল হচ্ছে অবিশ্বাসী কাফেরদের দল, যারা সর্বদাই ঈমানের এই সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করে জাহেলিয়াতের পন্থা অনুসরণ করে। অপর কথায় একটি হচ্ছে আল্লাহর দল অপরটি হচ্ছে শয়তানের দল, মানুষের সমাজে এই দুয়ের বাইরে কখনো তৃতীয় দলের অস্তিত্ব ছিলো না।

ইসলামী জীবন পদ্ধতির মাঝে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার বিষয়টি এমন একটি মৌলিক নীতি যা মোমেনের জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব, শাসন ক্ষমতা, এবাদাত ও মালিকানায় আল্লাহ তায়ালা একক ও অভিন্ন এবং মানুষের জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগ একমাত্র তাঁরই আদেশের আওতাধীন। কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো অংশীদার নাই, এই বিশ্বচরাচর ও তার অধিবাসীদের জীবনের ব্যবস্থাপনায় তিনি ছাড়া আর কোনোই নিয়ন্ত্রণ নাই, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু কারো উপকার কিংবা অপকার কিছুই করতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ও ইংগীত ছাড়া ছোটো বড়ো কোনো কাজই এখানে সাধিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কারো এবাদাতের প্রশ্ন আসে না। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কারো আনুগত্য কিংবা অনুবর্তন বৈধ হতে পারে না। মানুষের সব চিন্তা ও কর্মের ওপর তাঁর একক আধিপত্য বিরাজমান। তাই এই ঈমানের অপরিহার্য ও একক দাবী হচ্ছে যাবতীয় আইন কানুন তাঁরই চলবে। নীতি-নৈতিকতার নীতিমালা কি হবে, তা তিনিই বাতলে দেবেন, সামাজিক নিয়ম নীতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের সব ফর্মূলা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে। মোটকথা জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগে তাঁরই আনুগত্য করতে হবে, জীবনকে তাঁর বন্দেগী ছাড়া অন্য

সব ধরনের বন্দেগী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে, তাঁর বাঁধন ছাড়া অন্য সব বাঁধন থেকে জীবনকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সব কয়টি শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে হবে। ফেরেশতাদের ওপর ঈমানের বিষয়টি হচ্ছে 'অদেখা জিনিসের ওপর ঈমান আনারই আরেকটি অংশ বিশেষ, এ ব্যাপারে এই তাফসীরে সূরা বাকারার শুরুতে আমি আলোচনা করেছি। মূলত এই ঈমান মানুষকে দৃশ্যমান দুনিয়ার বাইরে এক অদৃশ্য পৃথিবী সম্পর্কে জানার আগ্রহের সৃষ্টি করে। যদি এসব ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদের সে অদেখা জগত সম্পর্কে কিছু কিছু খবর বলে না দেয়া হয় তাহলে মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক আগ্রহের বশবর্তী হয়ে নানাধরনের অজ্ঞতা কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনার বিষয়টি এমন এক অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যা কোনোদিনই মানবীয় প্রকৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান অনুধাবন করতে পারে না। অথচ অদৃশ্য ঘটনাসমূহ জানার প্রবল আগ্রহ মানুষের প্রকৃতিতে সব সময়ই বিদ্যমান রয়েছে, এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সামনে সেই অদৃশ্য জগতের এক ঝলক দেখিয়ে তাদের বলেছেন, এই ধরনের কাজে তাদের যোগ্যতার অপচয় না করতে। যেখানে পৌঁছার কোনো ক্ষমতাই তাদের দেয়া হয়নি। এর যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে অদৃশ্য জগতের সত্যসমূহকে অস্বীকার করে তারা প্রকারান্তরে নানা ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও জাহেলী ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং এ ভাবেই তার জ্ঞান প্রতিভা বিনষ্ট হয়ে এদিক সেদিক পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

এর সাথে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা ও আল্লাহর যাবতীয় অদৃশ্য ঘটনাবলীর ওপর ঈমান আনার ফলে এই সৃষ্টিজগত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতিতে অনেক ব্যাপকতা আসে। মোমেন হৃদয়ের সেই সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে যায় যার ফলে দুনিয়ার মানুষরা এই দৃশ্যমান জগতকেই মনে করে চূড়ান্ত। এই দৃশ্যমান জগতের বাইরের কিছুকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া অদৃশ্য জগতের বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনার ফলে মোমেন হৃদয়ে আল্লাহর অসীম জগত সম্পর্কে এক ব্যাপক অনুভূতিও সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আল্লাহর একজন বিশ্বস্ত বান্দা এভাবে অদেখা জগতের আরেক সৃষ্টির সাথেও পরিচিত হতে পারে, যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে সে বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। তার ওপর শুধু যে ঈমান আনতে হবে তাই নয় সে তো প্রতিনিয়ত আমাদের গুনাহমাফীর জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছে এবং সর্বত্রই আল্লাহর হুকুমে আমাদের ভালো কাজে সহযোগিতা যুগিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই মোমেনদের সাথে ফেরেশতাদের এক পরিচয় গড়ে ওঠে।

'আমরা ঈমান এনেছি তাঁর কেতাবসমূহের প্রতি ও তার রসূলদের প্রতি-আমরা এদের কারো সাথেই কারো কোনো ধরনের পার্থক্য করি না।'

আল্লাহর নাযিল করা সব কয়টি কেতাবের ওপর ঈমান আনা এবং তার পক্ষ থেকে পাঠানো সব কয়জন নবী রসূলের প্রতি কারো সাথে কারো কোনোরকম পার্থক্য না করে ঈমান আনা মূলত সেই ঈমানের অপরিহার্য দাবী, যে ঈমানের কথা ইসলাম আমাদের সামনে পেশ করেছে। কেননা আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাবীই হচ্ছে আল্লাহর নাযিল করা সব কিছুরই সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর পাঠানো সব নবীকেই বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী স্বীকার করা এবং এভাবেই আল্লাহর 'একত্ব' কেই সব কিছুর মূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া যার জন্যে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর নবীরা প্রেরিত হয়েছেন এবং সব কয়টি আসমানী গ্রন্থ নাযিল করা হয়েছে। এই কারণেই একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে সব কয়জন নবী ও তাদের সব কয়টি রেসালাতই এক ও অভিন্ন, এদের কোনোটার সাথে

কোনোটারই কোনো পার্থক্য নাই। আদি পয়গাম্বর হযরত আদম থেকে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সবাই হচ্ছে সেই ঈমানের দাওয়াতের কাফেলার এক একজন সাথী এবং একই ঈমানের দাওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত এখানে অব্যাহত থাকবে।

অপর কথায় আজকের মুসলিম উম্মাহ সব কয়জন নবী ও তাদের রেসালাতের সরাসরি উত্তরাধিকার এবং মানবীয় ইতিহাসের এই দীর্ঘ ভান্ডারে রক্ষিত সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদের তারা আমানতদার। এই উম্মতের স্বাভাবিক দায়িত্ব হবে তারা আল্লাহর সেই একই দ্বীন এবং তাঁর প্রদর্শিত একই জীবন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ইতিহাসের সূত্র ধরে তারাই আজ আল্লাহর বাছাই করা উম্মতের মর্যাদা লাভ করেছে। কালের এ দীর্ঘ পরম্পরায় আজ তাদের সেই মূল সূত্রের দিকে ধাবিত হতে হবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে তারা আধুনিক জাহেলিয়াতের সব কয়টি পোশাক-জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, গোত্র ও বংশবাদ, ইহুদীবাদ খৃষ্টবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী আধুনিক মতবাদসমূহকে-সমূলে বিনষ্ট করে শুধু ইসলামের এক ও একক পতাকা উঁচিয়ে ধরবে। দুনিয়ার বুকে গর্জে ওঠা যাবতীয় জাহেলী ধ্যান ধারণা, জাহেলী সভ্যতা সংস্কৃতি, জাহেলী নাম পরিভাষা ও জাহেলী নীতি দর্শনের অপনোদন করে তারা শুধু আল্লাহর দ্বীনকে এসব কিছুর ওপর বিজয়ী করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে।

আল্লাহর ওপর ঈমান আনার এই পবিত্র উত্তরাধিকার– যার সংরক্ষক বানানো হয়েছে মুসলিম উম্মতকে, মানবতার জন্যে এক মহামূল্যবান সম্পদ। মানবতার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এটি হচ্ছে এক আলোকবর্তিকা। আল্লাহকে চেনা ও তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনার ক্ষেত্রেও এই উত্তরাধিকার হচ্ছে এক মূল্যবান সম্পদ তুল্য।

মানুষের অন্তর যখন ঈমান থেকে খালি হয়ে যায় তখন তার অন্তরাত্মা অন্ধকার হয়ে পড়ে, তার প্রকৃতি তখন বিভ্রান্ত ও দিক বেদিক হয়ে যায়, তার মনে তখন নানা ধরনের সন্দেহ শোবা দানা বাঁধতে শুরু করে, দুর্ভাগ্য ও দুঃখ তাকে ঘিরে ফেলে, এভাবেই সে তখন অন্ধকারে হাতড়ে মরতে থাকে, কিছুই সে দেখতে পায় না।

যাদের অন্তরে আজও জীবনের কিছু অংশ বিদ্যমান তারা ঈমানের এই বঞ্চনার ফলে চিন্তা বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে, ইতিহাসের সব স্তরেই এদের অন্তরের এই আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়। তাদের কথা আলাদা যাদের অন্তরে সে জীবনের মৃত্যু হয়ে যায় তারা সবাই দলে দলে জন্তু জানোয়ারদের শামিল হয়ে যায়। এরা জানোয়ারদের মতো খেয়ে দেয়ে আনন্দ ফুর্তি করে আল্লাহর যমীনে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়।এভাবেই এরা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর গোটা সৃষ্টিজগতের অভিশাপের কবলে নিপতিত হয়। যে সমাজ ঈমানের এই মহামূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে তা সত্যিকার অর্থে একটি হতভাগ্য ও নিকৃষ্ট মানের সমাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে তাকে যতোই সমৃদ্ধশালী মনে হোক না কেন, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে সে সমাজ যতোই উন্নত হোক না কেন, মূলত ঈমানের মূল্যবান নেয়ামত ছাড়া তার কোনোই মূল্য নাই। ঈমান থেকে বঞ্চিত জাতিসমূহ হামেশা নৈরাশ্য ও অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকে। না পাওয়ার আক্ষেপ ও মানসিক সামাজিক পেরেসানী থেকে এরা কখনো মুক্তি পায় না। সর্বদাই এরা শিকার থাকে এক সর্বগ্রাসী অসহায়তার। আজ সারা দুনিয়ার তথাকথিত উন্নত ও সম্পদশালী জাতিসমূহের দিকে তাকালে সহজেই এর সত্যতা অনুভব করা যাবে।

অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কেতাবসমূহ ও তাঁর রসূলের ওপর যারা ঈমান আনে তারা সর্বদাই আল্লাহর আনুগত্যের দিকে স্বস্তির সাথে নিবিষ্ট থাকে, তাদের একথার ওপর পূর্ণাংগ ঈমান থাকে যে, একদিন সব কিছুর শেষে তাদের আল্লাহর সামনেই হাযির হতে হবে, আর এ কারণেই তারা তাদের গুনাহ খাতার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

'এবং তারা বলে, হে মালিক আমরা তোমার কথা শুনেছি এবং তা কবুল করে নিয়েছি, হে আমাদের মালিক, আমরা তো শুধু তোমার ক্ষমাই চাই, আমাদের তো তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

মোমেনদের পক্ষ থেকে উচ্চারিত এসব কথায় তাদের আল্লাহর ওপর ঈমান আনার বিষয়টি পরিস্ফূট দেখতে পাওয়া যায়, মোমেন আল্লাহর হুকুম আহকাম শোনে এবং তা মেনে চলার মহান কাজে লেগে যায়, সে জানে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ও একক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর বিধি বিধানের প্রতিপালন এবং নিজেদের জীবনে তাঁর শরীয়তের প্রতিষ্ঠার নামই হলো ইসলাম। একজন মোমেন জীবনের কোনো বড় কিংবা ছোটো ব্যাপারেও যদি আল্লাহর এ হুকুমের প্রতিষ্ঠা না করে, হোক তা নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কিংবা রাজনীতি ও অর্থনীতি কোনো ব্যাপার যদি আল্লাহর আইনের বাইরে এসব কিছুর জন্যে সে অন্য কোনা উৎসের সন্ধান করে তাহলে তার ঈমান আর অবশিষ্ট থাকতে পারে না, ঈমান তো হচ্ছে তা যা অন্তরে স্থান করে নিয়েছে এবং সে নিজের কাজ দিয়ে তার স্বীকৃতি প্রদান করে। এই শোনা ও মানার সাথে সাথে মোমেন তার নিজের ভুল ভ্রান্তিসমূহের ব্যাপারেও সদা সজাগ এবং তার এই অনুভূতিও থাকে যে, আল্লাহর নেয়ামতের যে ধরনের কৃতজ্ঞতা তার আদায় করা উচিত ছিলো- তা সে করতে পারেনি এবং আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বসমূহ যেভাবে পালন করা উচিত ছিলো তা সে করতে পারেনি তাই সে এখন আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছে যেন আল্লাহ তায়ালা তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তার দুর্বলতার ব্যাপারে তার ওপর যেন তিনি অনুগ্রহ করেন।

'হে আল্লাহ তায়ালা আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

সর্বপ্রথম সারা জাহানের মালিকের দরবারে আনুগত্যের মাথা নত করা, তারপর তাঁর বিধি নিষেধ শোনা এবং মানা আবার ভুল ত্রুটির জন্যে তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সাথে সাথে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে সব কিছুর শেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, দুনিয়া আখেরাতের চূড়ান্ত লক্ষবিন্দু হচ্ছে আল্লাহর অমোঘ সত্ত্বা, সব কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে তার একক সত্ত্বা ছাড়া আশ্রয়ের দ্বিতীয় জায়গা নেই, তাঁর বিচার ফয়সালা থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নেই, না তার অমোঘ শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে, হাঁ এসব কিছুর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ তাবারাক তায়ালার অশেষ দয়া ও ক্ষমা।

'শুধু তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে'

একথাটার মাঝে পরকালের ওপর ঈমান আনার বিষয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। আর এই স্বীকৃতি হচ্ছে ঈমানের এক অপরিহার্য ও মৌলিক দাবীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই ঈমানের মূল বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে এ দুনিয়ায় এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন তারা এখানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং তার এই বৈষয়িক জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম হবে সেই চুক্তির ভিত্তিতে যা তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার ব্যাপারে তার সাথে সম্পাদন করা হয়েছিলো। এই চুক্তির শর্তাবলী যতোটুকু সে মেনে চলেছে পরকালে ততোটুকু পরিমাণ তার কাছ থেকে হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং সে মোতাবেক তাকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেয়া হবে। মোট কথা হচ্ছে আখেরাত বিশ্বাসটি ইসলামের একটি মৌলিক চিন্তা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং আখেরাত দিবসের এই ধারণার মাধ্যমে মোমেন হৃদয়ে চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং তার ফলে তার নিজের জীবনে এক মৌলিক বিপ্লব সাধিত হয়। একজন মোমেন ব্যক্তি আখেরাত বিশ্বাসের পর আল্লাহর আনুগত্যের পথ ধরে চলতে থাকে, হামেশা ভালো কাজে তৎপর থাকে। সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের নির্মূল করার কাজে নিজের শক্তি সামর্থ ব্যয় করতে থাকে, নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাগুলোকে নেকী অর্জনের কাজে লাগিয়ে দেয়। তার এ কর্মতৎপরতায় বৈষয়িক কল্যাণ হোক

কিংবা অকল্যাণ হোক কিংবা লোকসান হোক, সফলতা আসুক কিংবা ব্যর্থতা তার পথ রোধ করে দাঁড়াক, জীবনের পদে পদে সুখ সমৃদ্ধি আসুক কিংবা আল্লাহর রাহে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আসুক, সর্বাবস্থায় সে থাকে অনড়, কারণ তার জীবনের সব কিছুর বিনিময় সে শেষ বিচারের দিনেই পাবে। এ কারণেই সত্যের সংগ্রামে তার ওপর আপতিত বিপদ মুসিবত পরীক্ষা নিরীক্ষা-এর কোনো কিছুই তাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কারণ তার লেনদেন সবই আল্লাহর সাথে। সে তো তার মালিকের সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানার কাজেই ব্যস্ত এবং একদিন জীবনের শেষে যখন তাঁর কাছে হাযির হবে তখন দুনিয়ার জীবনের কর্মকান্ডের একটি উৎকৃষ্ট বিনিময় পাবার জন্যে অধির আগ্রহে সে অপেক্ষা করছে। আল্লাহর ওপর, তাঁর রসূলদের ওপর তাঁর ফেরেশতাদের ওপর সর্বোপরি তাঁর কেতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার বিষয়টি এমনি এক অভিন্ন ঐক্য সূত্র যা একমাত্র ইসলামী ধ্যান ধারণারই একক বৈশিষ্ট্য। মূলত দুনিয়ার যাবতীয় ধর্মমত ও বিশ্বাসসমূহের মাঝে একমাত্র ইসলামেরই এতোটুকু যোগ্যতা আছে যে, তা হবে মানুষের শেষ ধর্মবিশ্বাস এবং সকল নবুওত ও রেসালাতের মাঝে তা হবে শেষ রেসালাত।

কেননা ইসলাম ঈমানী কাফেলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতো নবী রসূল এসেছেন যতো কেতাব তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তাদের সবার হেদায়াত ও শরীয়তকে স্বীকার করে এবং পরিষ্কার করে একথা বলে দেয় যে, এইসব নবী রসূলরা একই তাওহীদের আকিদা ও বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন এবং মানবীয় উন্নতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে এরা সবাই মানব জাতিকে একই পরিচিত শিক্ষা প্রদান করেছেন, বার বার তারা মানবতার সামনে একই আইন, একই শরীয়ত উপস্থাপন করেছেন, মানুষের জন্যে একই ধরনের জীবন পদ্ধতি তারা পেশ করেছেন, আর এরই নাম হচ্ছে ইসলাম।

ইসলাম মানুষকে 'মানুষ' হিসেবেই পেশ করেছে। ইসলাম মানুষের মর্যাদাকে জন্তু জানোয়ারের স্তরে নামিয়ে তাকে নিকৃষ্ট করে দেয় না আবার তাকে অতিপ্রাকৃতিক স্তরেও উঠিয়ে দেয় না যে, সে ফেরেশতার স্তরে উন্নীত হয়ে যাবে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মানুষই, সে শয়তান নয় আবার ফেরেশতাও নয়, তার মধ্যে যেমন বেশ কিছু শক্তি সামর্থ নিহিত রয়েছে আবার তাতে কিছু দুর্বলতাও লুকায়িত আছে। তার যেমন রয়েছে জৈবিক প্রবণতায় ভরা একটি দেহ তেমনি রয়েছে অনুধাবনের জন্যে জ্ঞান বুদ্ধি ও উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরা একটি নিবেদিত আত্মা।

এই কারণেই ইসলাম মানুষের ওপর ততোটুকু বোঝাই রাখে যতোটুকুর ভার সইবার ক্ষমতা তার আছে। ইসলাম মানুষের যোগ্যতা ও দায়িত্বের মাঝে এক সুন্দর ভারসাম্য সৃষ্টি করে, ইসলাম মানুষের জৈবিক প্রয়োজন জ্ঞানের দাবী পূরণ এবং আত্মার পরিতৃপ্তির মাঝে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে তাকে এতোটুকু স্বাধীনতা দিয়ে দেয় যে, সে যদি চায় তাহলে নিজেকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে আবার চাইলে নিজেকে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর চক্রবালেও হারিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তিকেই তার সামর্থের বাইরে কষ্ট দেন না, অতপর এই পরীক্ষায় যে ভালো কাজ করবে সে তার ভালো ফল পাবে আর যে অন্যায় করবে তার লোকসান তার ঘাড়েই পড়বে। আল্লাহ তাবারাক ও তায়ালা মোমেনদের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং দুনিয়ায় খেলাফত চালাবার জন্যে তার ওপর যেসব কাজ চাপিয়েছেন সে ব্যাপারে মোমেনদের ধারণা হচ্ছে এর সবই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত মোমেনদের জন্যে রহমতমাত্র, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ওপর তাঁর অনুগ্রহই প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ইনসাফের সাথেই মানুষের ওপর এ দায়িত্ব দিয়েছেন, এ কারণে মোমেনরা হামেশাই আল্লাহর রহমতের ওপর আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট থাকে, এ সব দায়িত্ব পালনে কখনো তারা

মনোক্ষুণ্ন হয় না। নিজেদের ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্বকে তারা কখনো বোঝা মনে করে না। এর ফলে তাদের মনে কোনো সংকীর্ণতাও সৃষ্টি হয় না, বরং সে পূর্ণাংগ বিশ্বাস রাখে যে, যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর দেয়া হয়েছে তা পালনের যথাযথ যোগ্যতা ও ক্ষমতা তার রয়েছে। কেননা তা সম্পূর্ণ তার যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ীই তাকে দেয়া হয়েছে, এই বিশ্বাস ও ধারণা মোমেনের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব সাহস ও মনোবলের জন্ম দেয়। যখনি কোনো সময়ে চলার পথ তার কাছে দীর্ঘ ও বন্ধুর মনে হয় তখন এই বিশ্বাস তার মধ্যে শক্তি যোগায়, তাকে মনোবল দেয়। এই হচ্ছে মোমেন হৃদয়ের প্রশিক্ষণ, তার সাহস শক্তি ও মনোবলের উৎস। এরপর এই ধারণারই দ্বিতীয় দিক- ভালো কাজ করলে সে এর ভালো ফল ভোগ করবে। আবার মন্দ কাজ করলে তার ফলাফলও সেই পাবে।

এ হচ্ছে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও ব্যক্তিগতভাবে সে দায়িত্ব পালনের জবাবদিহী করার ভয় থাকার কারণে সে যে সৎকর্মটুকু করবে তা তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে আর উদাসীনতা দেখানোর ফলে যে পরিণতির সে মুখোমুখি সে হবে তা তার ব্যক্তিগত কর্মকান্ডের ভুলের মাশুল। প্রতিটি মানুষ নিজের মালিকের সামনে নিজের একান্ত নিজের আমলনামা নিয়েই হাযির হবে। যেখানে কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না। প্রতিটি মানুষ আল্লাহর সামনে হবে একা, এই ধারণা ও বিশ্বাসের ফলে প্রতিটি মানুষকে এক একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বায় পরিণত হতে হয়। কোনো অবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর অধিকার আদায়ে যেন কোনো ত্রুটি না দেখা দেয়। গোমরাহী পথভ্রষ্টতা বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির মোকাবেলায় আল্লাহর অধিকারকে যেন সে সংরক্ষণ করে। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিকেই আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে আল্লাহর অধিকার কতোটুকু পালন করেছে। তার আরোপিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে কি না, তার এবাদাতে সদা মশগুল থেকেছে কি না, সর্বোপরি নিজের চিন্তা ও কর্মে হামেশা আল্লাহর অনুগত থেকেছে কি না। যদি কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের ধোঁকা ও লোভে পড়ে আল্লাহর 'হক' পালনের ত্রুটি করে তাহলে সে মানুষ কেয়ামতের দিন তাকে বাঁচাতে পারবে না। কেউই তার গুনাহর বোঝা সেদিন বইবে না, কেউই তার সাহায্য ও সহযোগিতার কাজে এগিয়ে আসবে না, এজন্যেই প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার নিজের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসা এবং আল্লাহর যে সমস্ত 'হক' তার ওপর রয়েছে তারও যথাযথ সংরক্ষণ করে, কেননা আল্লাহর আদালতে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহী তাকে একাই করতে হবে।

অপরদিকে এই ব্যক্তিগত দায়িত্বের অনুভূতির মানে এ নয় যে, ব্যক্তির ওপর সমষ্টির কোনোরকম কোনো দায় দায়িত্ব নাই। ব্যক্তিকে সমষ্টির পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্বসমূহও আ াম দিতে হয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাকে আদেশ দিয়েছেন যেন সে তার মাল সম্পদ রুজী রোজগার চেষ্টা সাধনা ও যাবতীয় ভালো কাজের মাধ্যমে সমষ্টির কল্যাণে এগিয়ে আসে। সামষ্টিকভাবে সত্যের পক্ষে কাজ করা ও অসত্যকে নির্মূল করার কাজে নিয়োজিত থাকাও তার জন্যে জরুরী। যাবতীয় ভালো কাজকে প্রসারিত ও উৎসাহিত করবে এবং যাবতীয় মন্দ কাজকে নির্মূল ও নিরুৎসাহিত করবে, তার এ পর্যায়ের কাজগুলোও মহা বিচারের দিন তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার কোনো কাজ সমষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর ছিলো কিনা এই প্রশ্নও সেদিন তাকে করা হবে। একাই সেদিন তাকে এর জবাব দিতে হবে।

মোমেন হৃদয়ের আকুতি

মুসলমানরা যখন এই সত্য সম্পর্কিত বিষয়টি শুনে নিলো এবং ভালো করে তা অনুধাবন করে নিলো এবার একান্ত বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে তারা দোয়া চাইছে। কোরআন এ দোয়ার কথাগুলোকে তার নিজস্ব ষ্টাইলে এমনভাবে পেশ করছে যেন কোথায়ও বুঝি এখনি তা ঘটছে। ঘটনার বিবরণ দৃষ্টে মনে হয়, একদল নিষ্ঠাবান মোমেন ব্যক্তি করজোড়ে বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাটের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার মুখে রয়েছে এই আকুতি,

'হে আমাদের মালিক যদি আমাদের থেকে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় অথবা কোনো দায়িত্ব পালনের কথা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমাদের তুমি পাকড়াও করো না, হে মালিক আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ো না যেমনি তুমি চাপিয়েছিলে আমাদের আগের লোকদের ওপর, হে মালিক যতোটুকু বোঝা বইবার ক্ষমতা আমাদের নাই সে পরিমাণ বোঝা আমাদের কাঁধে রোখো না, তুমি আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দিয়ে আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো তুমি, আমাদের ওপর দয়া করো, তুমিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, তুমি কাফেরদের ওপর আমাদের বিজয় দাও।'

এই দোয়া মোমেনদের মানসিক অবস্থার সঠিক বর্ণনা পেশ করে, দুর্বলতা ও বিনয়ের প্রকাশ করে, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তার সাহায্য-সহযোগিতার দরকারের বর্ণনা পেশ করে সর্বোপরি এতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর সাথে মোমেনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলায় তাদের ওপর বিজয় লাভের জন্যে জেহাদের শক্তি এবং সাহায্য-সহযোগিতার করুণ আরযী। সমগ্র দোয়ার কথাগুলোকে এমন এক হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করা হয়েছে শুনে মনে হয় এক একটি শব্দ যেন আত্মার গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হচ্ছে,

'হে আমাদের পরওয়ারদেগার তোমার কথা পালনে যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি কিংবা আমরা যদি কোনো কিছু আদৌ ভুলে যাই তুমি আমাদের তার জন্যে পাকড়াও করো না।'

যদি কখনো কোনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে মোমেনের কোনো ভুল কিংবা পদস্খলন হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর দাঁড়িয়ে না থেকে টালবাহানা ও নানা অজুহাত খাড়া না করে সে সঠিক কথাটি মেনে নেয় ও সাথে সাথে আনুগত্যের পথে ফিরে আসে। বিনয়ের পথ থেকে সরে এসে গোড়ামীর রাস্তা অবলম্বন করার বদলে মোমেন এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে একান্ত বিনীতভাবে নিজের ভুল ত্রুটির জন্যে ক্ষমার আরযী নিয়ে হাত উঠায়।

আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সাথে তাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন, রসূলে কারীম (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের ভুল ত্রুটি এবং যে সব গর্হিত কাজে তাদের বাধ্য করা হবে তা সব আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন। (তিবরানী)

'হে আমাদের মালিক, আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা তুমি চাপিয়ো না যেমনি বোঝা তুমি চাপিয়েছো আমাদের পূর্ববর্তী মানুষদের ওপর।'

মুসলিম উম্মাতের পক্ষ থেকে উচ্চারিত এই দোয়া এই সত্যের দিকেই ইংগীত প্রদান করে যে, তারা সব কয়টি রেসালাত ও সব কয়জন নবীরই উত্তরাধিকার। তাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কর্মকান্ড ও তাদের প্রতি নিপতিত আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর তাদের গুনাহ ও বিদ্রোহের কি শাস্তি এসেছে তাও মুসলিম জাতি তাদের কাছে প্রেরিত কেতাবে দেখেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের ওপর কতিপয় পবিত্র জিনিসও হারাম করে দিয়েছেন সূরায়ে 'আনয়ামে' এ প্রসংগে এসেছে,

'যারা ইহুদী ছিলো তাদের জন্যে নখ বিশিষ্ট সব পশু আমি হারাম করে দিয়েছিলাম তেমনিভাবে আমি তাদের ওপর গরু ও ছাগলের চর্বিও হারাম করে দিয়েছিলাম।' (সূরা আল আনয়াম ১৪৬)

অতপর যখন তারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে আল্লাহদ্রোহীতার মতো জঘন্য অপরাধ করেছে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের হুকুম দিয়েছেন নিজেদের হত্যা কর ফেলতে-এই সূরার প্রথম দিকে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। একই ভাবে তাদের ওপর শনিবারের দিনকে হারাম করা হয়েছে, বলা হয়েছে এ দিন যেন তারা কোনো ব্যবসা কিংবা শিকার না করে।

এ কারণেই মোমেন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছে। হে আমাদের মালিক আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না যেমনি করে তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলো আগের লোকদের ওপর।

অথচ মুসলিম জাতির তো ব্যাপারই আলাদা, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রসূল পাঠিয়েছেন যেন তিনি মানুষের কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দেন এবং মানবতার পায়ে এর আগে যেসব বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছিলো তা যেন ফেলে দেন।

এদিক থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ হালকা ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে সাম স্যশীল স্বয়ং আল্লাহর রসূলকে বলা হয়েছে আমি তোমাকে সহজ পদ্ধতির সুযোগ দেবো।' (সূরা আল আনয়াম ৮)

সবচাইতে ভারী যে বোঝা আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতির ওপর থেকে সরিয়ে নিয়েছেন তা হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের গোলামীর শেকল।এই গোলামী বিভিন্নকালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, কোথাও এই গোলামীর ধরন হচ্ছে, একজন কিংবা একদল মানুষ আরেক দল মানুষের জন্যে আইন তৈরী করে। এর আরেক ধরন হচ্ছে, মানুষকে কখনো দল, গোত্র বংশ কিংবা জাতির গোলাম বানিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা মুসলমান জাতিকে এই ধরনের সব গোলামীর জিঞ্জির খুলে ফেলে শুধু আল্লাহর এবাদাত আনুগত্য করতে আদেশ দিয়েছেন। তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সে শুধু আল্লাহর আইনেরই আনুগত্য করবে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে মুসলিম জাতির জ্ঞান, তার রুহ ও তার গোটা জীবনকে অন্যসব গোলামী থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। (১)

একমাত্র আল্লাহর গোলামীই মানুষকে পৃথিবীর অন্য সব কয়টি গোলামী থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারবে। মানুষ আল্লাহর গোলামীর বন্ধনে এসে অত্যাচারী বাদশাহ ও স্বৈরাচারী শাসকের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে একই অবস্থায় সমাজ নেতা ও পথভ্রষ্ট গণকদের গোলামী থেকেও মুক্তি লাভ করে। ভ্রান্ত চিন্তাধারা, কুসংস্কার ও সমাজের পচা ও অচল রসম রেওয়াযের কাছ থেকে আল্লাহর গোলামী তাকে মুক্ত করে দেয়, একবার আল্লাহর গোলামী স্বীকার করলে মানুষের প্রকৃতি ও তার চিন্তাধারায় প্রবৃত্তির গোলামীর কোনো সুযোগ থাকে না। 'আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না' কথাটার মাঝে এই চূড়ান্ত আযাদীর দিকেই ইংগীত করা হয়েছে, মোমেনদের পক্ষ থেকে আরযী পেশ করা হচ্ছে,

'হে মালিক আমাদের ওপর তুমি ছাড়া অন্য কারো গোলামীর বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না যেমনি করে আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এই গোলামীতে নিমজ্জিত ছিলো।

'হে আল্লাহ, যে বোঝা বইবার শক্তি সামর্থ আমাদের নাই সেই বোঝা আমাদের ওপর রেখো না।'

মোমেন ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দোয়া করে, হে আমাদের মালিক, আমাদের দুর্বলতার ব্যাপারে তুমি আমাদের ওপর দয়া করো। সে সব কাজের দায়িত্ব আমাদের দিয়ো না, যেগুলো করার সামর্থ আমাদের নাই, আমাদের শক্তি সীমার ভেতরে যা আছে এবং যতোটুকু সে সীমার ভেতরে থাকবে তা আমরা পালন করবো। আমরা তোমার কতিপয় দুর্বল ও অক্ষম বান্দা, তোমার ক্ষমার প্রার্থী, তোমার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, তুমি আমাদের সাথে দয়া ও সহজ আচরণ করো। অতপর মোমেন আবার নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে এবং প্রতি মুহূর্তে দুর্বলতা হেতু

(১) বর্তমান শতকের মুসলিম দার্শনিক ইকবাল কতো সুন্দর করেই না কথাটা বলেছেন! 'একটি মাত্র সেজদা তুমি আল্লাহর সামনে দাও, দেখবে এই একটি সেজদা তোমাকে অন্য হাজার সেজদা থেকে মুক্ত করে

কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার আশংকার কথা ব্যক্ত করে। সাথে সাথে এটাও আশা করে যে, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ খাতার প্রভাবসমূহকে স্বীয় দয়া ও মেহেরবানী দিয়ে মুছে দেবেন।

'হে আমাদের মালিক, আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও আমাদের তুমি ক্ষমা করো এবং তুমি আমাদের ওপর দয়া করো।'

এ পর্যায়ে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর দয়া ক্ষমা ও অনুগ্রহই হচ্ছে এই পরীক্ষায় টিকে থাকার নিশ্চয়তা বিধানকারী বিষয়। কোনো মানুষই আল্লাহর আনুগত্যের পূর্ণাংগ হক আদায় করতে পারবে না, তাই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দাবীই হচ্ছে তিনি তার করুণা দিয়ে যেটুকু সে করতে পারলো না তা ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই নিজের আমল দিয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না, সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূলুল্লাহ আপনিও নন? তিনি বললেন, না আমিও নই। হাঁ যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর দয়া দিয়ে ঢেকে দেন। (বোখারী)

মোট কথা, একজন খাঁটি মোমেন বান্দার কর্তব্য হবে, সে নিজের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনের চেষ্টা করতে থাকবে, তবে সাথে সাথে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার ব্যাপারেও সজাগ থাকবে এবং আল্লাহর কাছ থেকে এই আশা পোষণ করবে যে, তিনি তাঁর অসীম দয়া দ্বারা তার দুর্বলতাসমূহকে ঢেকে দেবেন এবং তার গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন।

পরিশেষে নেক বান্দা আল্লাহর পথে জেহাদ, ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার সংগ্রামে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে মোমেন তামাম জাহেলী শ্লোগান, জাহেলিয়াতের সব ধরনের রসম রেওয়ায ও জাহেলী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে শুধু আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডাই বুলন্দ করার কাজে এগিয়ে আসে এবং তাঁর দ্বীনকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে বেরিয়ে পড়ে এবং সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে সে আবার মালিকের দুয়ারে দয়া ভিক্ষা করে। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমিই আমাদের অভিভাবক, তুমিই আমাদের মালিক, তোমার দ্বীনকে যারা অস্বীকার করে সে সব কাফেরদের সাথে সংগ্রামে তুমি তাদের ওপর আমাদের বিজয়ী করো।'

সূরায়ে বাকারার এই পরিশিষ্টটুকু হচ্ছে গোটা সূরায় বর্ণিত বক্তব্যের সারাংশ, যাবতীয় আকিদা বিশ্বাসের এই হচ্ছে সার সংক্ষেপ। অনেকটা মোমেন চরিত্রের আয়নাস্বরূপ। সর্বোপরি এটা হচ্ছে মালিকের সামনে সদা বিনয়ের সাথে দোয়া করতে থাকার এক অমূল্য অনুশীলন।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর সম্মানিত ডাইরেক্টর

মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী

রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত

বর্তমান সময়ের ৫টি মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ

বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২শ' পাণ্ডুলিপির মধ্যে
প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ

'আর রাহীকুল মাখতূম'

ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র 'দ্যা ম্যাসেজ' ছবির কাহিনীর বাংলা রূপান্তর

'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'

প্রিয় নবীর ব্যক্তি জীবনের অনুপম সংগ্রহ

'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর'

প্রিয় নবীর সুন্নতের অনুশাসনগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী বই

'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাধিক
নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

'সীরাতে ইবনে কাছীর'

কোরআন পড়ুন কোরআন বুঝুন
কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ুন

হাজার বছরের কোরআন মুদ্রণের ইতিহাসে এই প্রথম–
বিষয়ভিত্তিক কালার নির্ধারণ করে কোরআনের এক বিস্ময়কর প্রকাশনা

'আমার শখের কোরআন মাজীদ'

▼ কোরআন বুঝার জন্যে পড়ুন– আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর ডাইরেক্টর জেনারেল হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের *'কোরআন মাজীদ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ', 'কোরআনের অভিধান', 'কোরআনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ'* (আরবী ছাড়া), *'কোরআনের সাথে পথ চলা', 'মনীষীদের কোরআন গবেষণা'* ও *'বিস্ময়কর গ্রন্থ আল কোরআন'*।

▼ সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত বিশ্বের সর্বাধিক মানুষের পঠিত, সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত এ কালের শ্রেষ্ঠ তাফসীর *'ফী যিলালিল কোরআন'* (২২ খন্ডে সমাপ্ত), শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর *'তাফসীরে ওসমানী'* (৭ খন্ডে সমাপ্ত) ও মওলানা আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই'র *'আসান তাফসীর'*।

▼ কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্য পড়ুন– *'ফতোয়া ইউসুফ আল কারদাওয়ী', 'শহীদে মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব', 'ইসলামী আন্দোলন সংকট ও সম্ভাবনা', 'লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক', 'মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য', 'শোনো শোনো ইয়া এলাহী আমার মোনাজাত', 'জান্নাতের মানচিত্র', 'শুধু তোমাকে চাই'* ও *'গানে গানে লিখি আল্লাহর নাম'*।

▼ আরো রয়েছে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মুনমুন পাবলিশিং হাউস–এর কতিপয় বিশ্লেষণধর্মী রচনা ও উপন্যাস– *'নাম সমাচার', 'দজ্জালের পা', 'বিয়ে নিয়ে ইয়ে', 'তালাকের পাঁচালী', 'প্রজন্মের প্রহসন', 'সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী', 'নির্বাচিতার কলম', 'তিন তলার সিঁড়ি', 'বুবু', 'রাণী এলিজাবেথের দেশে', 'নুরী', 'দর্পণে আপন ছায়া', 'কন্যাকাহিনী'* ও *'জিবরাঈলের জবানবন্দী'*।

▼ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিশ্বের প্রথম ইসলামী তথ্যভান্ডার *'বাংলাদেশ ইসলামিক ডাইরেক্টরী', 'মোমেনের ডায়েরী', 'ইসলামী ক্যালেন্ডার'* ও *রং বেরংয়ের পোস্টার*।

▼ আরো পড়ুন – কোরআনের পাতায় *'ইহুদী জাতির ইতিহাস', 'স্বর্ণযুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ'*, কোরআনের পাতায় *'সন্ত্রাস ও জেহাদ'*, কোরআনের পাতায় *'নারীর অধিকার', 'তাওহীদ শেরক ও আধুনিক জাহেলিয়াত'*। সহজ সরল বাংলা অনুবাদ এবং সূরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ *'আমপারা'* ও *'পাঞ্জে সূরা'*।

কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

سيّد قطب

في ظلال القرآن

باللغة البنغالية

المجلد الثاني

ترجمة القرآن

حافظ منير الدين أحمد

إكاديمية القرآن لندن